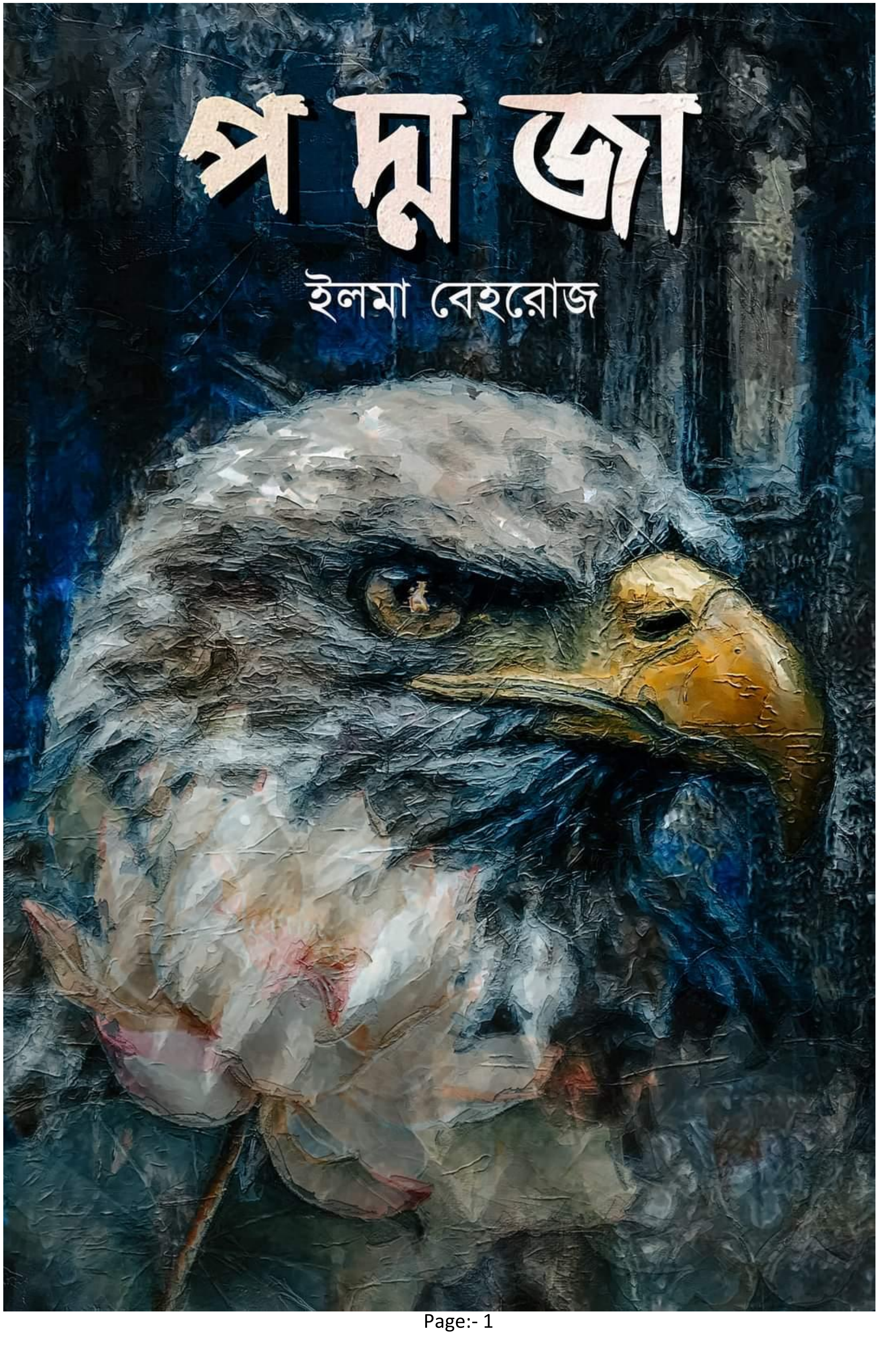

পদ্মজা
ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পার্ট - ১

ফাহিমা ক্লান্ত হয়ে ধপ করে ফ্লোরে বসে পড়ল। হাত থেকে লাঠি পড়ে গিয়ে মৃদু আওয়াজ তুলে। তার শরীর ঘেমে একাকার। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম হাতের তালু দিয়ে মুছে, বার কয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। এরপর চোখ তুলে সামনে তাকাল। রিমান্ডে কোনো পুরুষই টিকতে পারে না,সেখানে একটি মেয়ে আজ চার দিন ধরে রিমান্ডে। তাঁর সামনে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় ঝিমুচ্ছে। চার দিনে একবারও মুখ দিয়ে টু শব্দটি করল না। শারিরীক, মানসিক কত নির্যাতন করা হয়েছে তবুও ব্যথায় আর্তনাদ অবধি করেনি! মনে হচ্ছে, একটা পাথরকে পিটানো হচ্ছে। যে পাথরের রক্ত ঝড়ে কিন্তু জবান খুলে না। তখন সেখানে আগমন ঘটে ইন্সপেক্টর তুষারের। তুষারকে দেখে ফাহিমা কাতর স্বরে বলল, 'সম্ভব না আর। কিছুতেই কথা বলছে না।'

তুষার অভিজ্ঞ চোখে মেয়েটিকে দুয়েক সেকেন্ড দেখল।এরপর গম্ভীর কণ্ঠে ফাহিমাকে বলল, 'আপনি যান।'

ফাহিমা এলোমেলো পা ফেলে চলে যায়। তুষার একটা চেয়ার নিয়ে মেয়েটির সামনে বসল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আপনার সাথে আজ আমার প্রথম দেখা।'

মেয়েটি কিছু বলল না। তাকালও না। তুষা মেয়েটির দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে তাকাল। বলল,'মা-বাবাকে মনে পড়ে?'

মেয়েটি চোখ তুলে তাকায়। ঘোলাটে চোখ। কাটা ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। চোখের চারপাশ গাঢ় কালো। চোখ দু'টি লাল। মুখের এমন রং রিমান্ডে আসা সব আসামীর হয়। তুষার মুখের প্রকাশভঙ্গী আগের অবস্থানে রেখেই আবারও প্রশ্ন করল, 'মা-বাবাকে মনে পড়ে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ায়। মনে পড়ে তার! তুষার একটু ঝুঁকে। মেয়েটি অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকায়। তুষার মেয়েটির হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'নাম কী?'

যদিও তুষার মেয়েটির নাম সহ পুরো ডিটেইলস জানে।তবুও জিজ্ঞাসা করল। তার মনে হচ্ছে,মেয়েটি কথা বলবে। সত্যি তাই হলো। মেয়েটি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে নিজের নাম উচ্চারণ করল, 'পদ্ম...আমি...আমি পদ্মজা।'

পদ্মজা হেলে পড়ে তুষারের উপর। তুষার দ্রুত ধরে ফেলল। উঁচু কণ্ঠে ফাহিমাকে ডাকল,'মিস ফাহিমা। দ্রুত এদিকে আসুন।'

ফাহিমা সহ আরো দুজন দ্রুত পায়ে ছুটে আসে।

১৯৮৯ সাল। সকাল সকাল রশিদ ঘটকের আগমনে হেমলতা ভীষণ বিরক্ত হোন। তিনি বার বার পইপই করে বলেছেন, 'পদ্মর বিয়ে আমি এখুনি দেব না। পদ্মকে অনেক পড়াবো।' তবুও রশিদউদ্দিন প্রতি সপ্তাহে, সপ্তাহে একেক পাত্রের খোঁজ নিয়ে আসবেন। মেয়ের বয়স আর কতই হলো? মাত্র ষোল। শামসুল আলমের মেয়ের বিয়ে হয়েছে চব্বিশ বছর বয়সে। পদ্মর বিয়েও তখনি হবে। পদ্মর পছন্দমতো। হেমলতা রশিদকে দেখেও না দেখার ভান ধরলেন। রশিদ এক দলা থুথু ফেললেন উঠানে। এরপর হেমলতার উদ্দেশ্যে বললেন, 'বুঝছো পদ্মর মা,এইবার যে পাত্র আনছি,এক্কেরে খাঁটি হীরা।'

হেমলতা বিরক্তভরা কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমি আমার মেয়ের জন্য পাত্র চাইনি। তবুও বার বার কেন আসেন আপনি?'

'যুবতী মাইয়া ঘরে রাহন ভালা না।'

'মেয়েটা তো আমার। আমাকেই বুঝতে দেন না।' হেমলতার কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ছে।

রশিদ অনেক চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারলেন না।ব্যর্থ থমথমে মুখ নিয়ে সড়কে পা রাখেন। প্রতিদিনই কোনো না কোনো পাত্রপক্ষ এসে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলবে, 'মোর্শেদের বড় ছেড়িডারে চাই।'

রশিদ নিজে নিজে বিড়বিড় করে আওড়ান, 'গেরামে কি আর ছেড়ি নাই? একটা ছেড়িরেই ক্যান সবার চোক্ষে পড়তে হইব? চাইলেই কি সব পাওন যায়?'

পূর্ণা স্কুল জামা পরে পদ্মজাকে ডাকল, 'আপা? এই আপা? স্কুলে যাবি না? আপারে..."

পদ্মজা পিটপিট করে চোখ খুলে কোনোমতে বলল, 'না।' পর পরই চোখ বুজে ঘুমে তলিয়ে গেল। পূর্ণা নিরাশ হয়ে মায়ের রুমে আসে।

'আম্মা,আপা কী স্কুলে যাইব না?'

হেমলতা বিছানা ঝাড়া রেখে পূর্ণার দিকে কড়াচোখে তাকান। রাগী স্বরে বললেন, 'যাইব কি? যাবে বলবি।'

পূর্ণা মাথা নত করে ফেলল। হেমলতার কড়া আদেশ, মেয়েদের পড়াশোনা করাচ্ছি অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার জন্য নয়। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে। পূর্ণাকে মাথা নত করতে দেখে হেমলতা তৃপ্তি পান। তার মেয়েগুলো মান্যতা চিনে খুব। খুবই অনুগত। তিনি বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'পদ্মর শরীর ভালো না। সারারাত পেটে ব্যাথায় কাঁদছে। থাকুক,ঘুমাক।'

পূর্ণার কিশোরী মন বুঝে যায়,পদ্মজা কীসের ব্যাথায় কেঁদেছিল। সে রাতে নানাবাড়ি ছিল বলে জানতো না।ভোরেই চলে এসেছে। নানাবাড়ি হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিট লাগে। পূর্ণাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেমলতা বললেন, 'তুই যা। মাথা নীচু করে যাবি মাথা নীচু করে আসবি।'

'আচ্ছা,আম্মা।'

পূর্ণা রুমে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এরপর গত মাসে মেলা থেকে আনা লাল লিপস্টিক গাঢ় করে ঠোঁটে মাখে। চৌদ্দ বছরের পূর্ণার ইদানীং খুব সাজতে ইচ্ছে করে। হেমলতা সেজেগুজে স্কুলে যাওয়া পছন্দ করেন না বলে,পূর্ণা আগে লিপস্টিক মাখেনি।

____

টিন দেয়ালের কাঠের ঘড়ির কাঁটায় সকাল দশটা বাজল মাত্র। এখনো পদ্মজা উঠল না। হেমলতা মেয়েদের রুমে ঢুকেন। পদ্মজা দু'হাত ভাঁজ করে ঘুমাচ্ছে। জানালার পর্দা ভেদ করে আসা আলতো পেলব রোদ্দুরের স্পর্শে পদ্মজার মসৃণ, পাতলা ঠোঁট, ফর্সা ত্বক চিকচিক করছে। হেমলতা বিসমিল্লাহ বলে,তিনবার ফুঁ দেন মেয়ের শরীরে। গুরুজনরা বলেন, মায়ের নজর লাগে বেশি। নজর কাটাতে বিসমিল্লাহ বলে ফুঁ দিতে হয়। হেমলতার মায়া লাগছে পদ্মজার ঘুম ভাঙ্গাতে। তবুও আদুরে গলায় ডাকলেন, 'পদ্ম। এই পদ্ম...'

পদ্মজা চোখ খুলে মাকে দেখে দ্রুত উঠে বসে। যেদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় সেদিনই হেমলতা ডেকে তুলেন। পদ্মজা অপরাধী কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'বেশি দেরি হয়ে গেছে আম্মা?'

'সমস্যা নেই। মুখ ধুয়ে খেতে আয়।'

পদ্মজা দ্রুত কলপাড়ে গিয়ে ব্রাশ করে,মুখ ধৌত করে। হেমলতা শিক্ষকের মেয়ে। তাই তাঁর মধ্যে নিয়ম-নীতির প্রভাব বেশি। মেয়েদের শক্তপোক্ত নিয়মে রেখে বড় করছেন। পদ্মজা রান্নাঘরে ঢুকে দেখল প্লেটে খাবার সাজানো। সে মৃদু হেসে প্লেট নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। তখন হেমলতা আসেন। পদ্ম দ্রুত ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকে। হেমলতার দেওয়া আরেকটা নিয়ম, খাওয়ার সময় মাথা ঢেকে খেতে হবে। পদ্মজা নিশ্চুপ থেকে শান্তভঙ্গিতে

খেতে থাকল । হেমলতা মেয়েকে সহজ কণ্ঠে বললেন, 'তাড়াহুড়ো করছিস কেন? মুখ ধুতে গিয়ে চুল ভিজিয়ে এসেছিস।খেয়ে রোদে বসে চুলটা শুকিয়ে নিবি ।'

'আচ্ছা,আম্মা।'

'আম্মা, পূর্ণা, প্রেমা আসে নাই?'

'পূর্ণা আসছে। স্কুলে গেছে। প্রেমা দুপুরে আসব।'

'আম্মা,আব্বা কবে আসবেন?'

পদ্মজার প্রশ্নে হেমলতা দাঁড়িয়ে পড়লেন। শুকনো গলায় জবাব দেন, 'জানি না। খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই।'

হেমলতা চলে যেতেই পদ্মজার চোখ থেকে টুপ করে এক ফোঁটা জল পড়ে পাতে। পদ্মজা দ্রুত হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে। পদ্মজার জীবনে জন্মদাতা আছে ঠিকই। কিন্তু জন্মদাতার আদর নেই। সে জানে না তাঁর দোষটা কী? কেন নিজের বাবা বাকি বোনদের আদর করলেও তাকে করে না? কথা অবধিও বলেন না। দুইবার মাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে, 'আমি কী তোমাদের সত্যিকারের মেয়ে আম্মা? সন্তান হয় না বলে কি দত্তক এনেছিলে? আব্বা কেনো আমাকে এতো অবহেলা করেন? ও আম্মা বলো না?'

হেমলতা তখন নিশ্চুপ থাকেন। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'তুই আমার গর্ভের সন্তান। আর তোর বাবারই মেয়ে। এখন যা,পড়তে বস। অনেক পড়তে হবে তোর।'

ব্যস এইটুকুই! এর বেশি কিছু বলেন না হেমলতা। পদ্মজার কেন জানি মনে হয়,একদিন হেমলতা নিজ থেকে খুব গোপন কোনো কথা বলবেন। তবে সেটা যেন সহ্য করার মতো হয়। এই দোয়াই সারাক্ষণ করে সে।

'এতো কী ভাবছিস? তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠ।'

হেমলতার কথায় পদ্মজার ভাবনার সুতো ছিড়ল। দ্রুত খেয়ে উঠে। আজ আমের আচার বানানোর কথা ছিল।

সন্ধ্যা কাটতেই বিদ্যুৎ চলে গেল। কয়েক মাস হলো গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। আট গ্রাম মিলিয়ে অলন্দপুর। তাঁদের গ্রামের নাম আটপাড়া। প্রতিদিন নিয়ম করে সন্ধ্যারাত থেকে তিন ঘন্টা গ্রাম অন্ধকারে তলিয়ে থাকে। আর

সারাদিন তো বিদ্যুৎ-এর নামগন্ধও থাকে না। বিদ্যুৎ দিয়ে লাভটা কী হলো? পদ্মজা,পূর্ণা,প্রেমা তিন বোন একসাথে পড়তে বসেছিল। বাড়ি অন্ধকার হতেই নয় বছরের প্রেমা খামচে ধরে পদ্মজার ওড়না। পদ্মজা মৃদু স্বরে ডাকল,

' আম্মা? আম্মা..."

' আয়,টর্চ নিয়ে যা।'

হেমলতার আহ্বানে পদ্মজা উঠে দাঁড়াল। প্রেমা অন্ধকার খুব ভয় পায়। পদ্মজার ওড়না ছেড়ে পূর্ণার হাত চেপে ধরে। টর্চ নিয়ে রুমে ঢোকার মুহূর্তে পদ্মজা গেইট খোলার আওয়াজ পেল। উঁকি দিয়ে হানিফকে দেখে সে দ্রুত রুমে ঢুকে পড়ল। হানিফ পদ্মজার সৎ মামা।

' বুবু...বাড়ি আন্ধার ক্যান!বাত্তি-টাত্তি জ্বালাও।' হানিফের কণ্ঠ।

' হানিফ আসছিস?'হেমলতা রুম থেকে বেরিয়ে বলেন। হাতে হারিকেন। হানিফ সবকটি দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'হ,আমি।'

'আয়,ভেতরে আয়।'

হানিফ বারান্দা পেরিয়ে বড় ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমার ছেড়িগুলান কই তে?'

'আছে রুমেই। পড়ছে।'

'এই আন্ধারেও পড়ে!'

হেমলতা কিছু বললেন না। হানিফ এই বাড়িতে আসলে কেন জানি খুব অস্বস্তি হয়। অকারণেই!

'ওদের খাওয়ার সময় হয়েছে। তুইও খেয়ে নে?'

'এইহানেই খামু? না তোমার সরাইখানাত যাইতে হইবো?'

কথাটায় রসিকতা ছিল। গ্রামে থেকেও হেমলতা খাওয়ার জন্য আলাদা রুম নির্বাচন করেছেন সেটা হানিফের কাছে রসিকতাই বটে! হেমলতা প্রশ্নের জবাব সোজাসাপটা না দিয়ে বললেন, 'খেতে চাইলে খেতে আয়।'

পদ্মজা কিছুতেই খেতে আসল না। কেমন জড়োসড়ো হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, হানিফকে ভয় পাচ্ছে বা অবহেলা করছে। হানিফ ছয় বছর সৌদিতে ছিল। তিন মাস হলো দেশে ফিরেছে। তিন মাসে যতবার হানিফ এই বাড়িতে পা রেখেছে ততবারই পদ্মজা অজুহাত দিয়ে দূরে দূরে থেকেছে। হেমলতার বিচক্ষণ মস্তিষ্ক মুহূর্তে ভেবে নিল অনেক কিছু। তাই জোর করলেন না। আজই এই লুকোচুরির ফয়সালা হবে। হানিফ পদ্মজাকে দেখার জন্য অনেক ছলচাতুরী করল। কিছুতেই সুযোগ পেল না। বিদ্যুৎ আসার ঘন্টাখানেক পর হানিফ চলে যায়। পূর্ণা, প্রেমা রুমে ঢুকতেই পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বলল, 'কতবার না করেছি? লোকটার পাশে বেশিক্ষণ না থাকতে? তোরা কেনো শুনিস না আমার কথা?'

পূর্ণা ও প্রেমা বিস্ময়ে হতবিহ্বল। পদ্মজা কখনো তাদের এমন নিষেধ দেয়নি। তাহলে এখন কেন এমন বলছে?হেমলতা রুমে ঢুকতেই পদ্মজা চুপসে গেল।

'পদ্ম আমার রুমে আয়।'

মায়ের এমন কঠিন কণ্ঠ শুনে পদ্মজার কলিজা শুকিয়ে আসে। হেমলতা নিজের ঘরে চলে যান।

হেমলতা মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজা নতজানু হয়ে কাঁপছে। সুন্দরীরা ভীতু আর বোকা হয় তার দৃষ্টান্ত প্রমাণ পদ্মজা। হেমলতার খুব মায়া হয় পদ্মজার সাথে উঁচুকণ্ঠে কথা বলতে। পদ্মজা রূপসী বলেই হয়তো! গোপনে আবেগ লুকিয়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কী লুকোচ্ছিস? হানিফের সামনে কেন যেতে চাস না? সে কী করেছে? '

পদ্মজা ফোঁপাতে থাকে। হেমলতা সেকেন্ড কয়েক সময় নিয়ে নিজেকে সামলান। কণ্ঠ নরম করে বললেন, 'হানিফ ধড়িবাজ লোক! সৎ ভাই বলে বলছি না। আমি জানি। তাঁর ব্যাপারে যেকোনো কথা আমার বিশ্বাস হবে। তুই বল কী লুকোচ্ছিস?'

মায়ের আদুরে কণ্ঠে পদ্মজা আচমকা বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মতো হু হু করে কেঁদে উঠল।

#পদ্মজা

চলবে....

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পাট - ২

বাড়িটা মোড়ল বাড়ি নামে পরিচিত। পদ্মজার দাদার নাম ছিল মিয়াফর মোড়ল। তিনি গ্রামের একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। ছয় কাঠা জমির উপর টিনের বিশাল বড় বাড়ি বানিয়েছিলেন চার ছেলের জন্য। দুই ছেলে ষোল বছর আগে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। দুজনই টগবগে যুবক ছিল। আর একজন আট বছর বয়সে কলেরা রোগে গত হলো। বাকি রইল মোর্শেদ মোড়ল। বর্তমানে এই বাড়ি মোর্শেদের অধীনে। যদিও তিনি থাকেন না সবসময়। পুরো বাড়ির চারপাশ জুড়ে গাছগাছালি। বাড়ির পিছনে নদী। রাত নয়টা বাজলেই পরিবেশ নিশুতি রাতের রূপ ধারণ করে। রাতের এই নির্জন প্রান্তর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে ছেয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার সাথে পদ্মজার ভাঙ্গা কান্না মিলেমিশে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, কোনো আত্মা তার ইহজীবনের না পাওয়া কোনো বস্তুর শোকে এমন মরা সুর ধরেছে। হেমলতা পদ্মজাকে টেনে পাশে বসান। পদ্মজা ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে হেমলতাকে বলল, 'মামা সৌদিতে যাওয়ার আগের দিন আমাদের সবার দাওয়াত ছিল না নানাবাড়ি? খালামণি, ভাই-বোনেরা এসেছিল। সেদিন ঢাকা থেকে যাত্রার লোক আসছিল স্কুলে মনে আছে আম্মা?'

'আছে।'

উঠোনে ধপ করে একটা আওয়াজ হয়। হেমলতা,পদ্মজা কেঁপে উঠল। পূর্ণা, প্রেমা দরজায় কান পেতে রেখেছিল মা-বোনের কথা শুনতে। হুট করে কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ হওয়াতে দুজন ভয় পেয়ে যায়। দরজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে রুমে ঢুকে পড়ে। হেমলতা বড় মেয়ের সাথে গোপন বৈঠক ভেঙে দ্রুত পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান।

উঠানে বিদ্যুৎ নেই। হারিকেন জ্বালান। পিছনে তিন মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন মায়ের তিন মেয়ে নিয়ে একা এতো বড় বাড়িতে বাস করাও যুদ্ধ বটে! হেমলতা গলা উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কে? কে ওখানে?'

'আমি।'

চির পরিচিত এই কণ্ঠ চিনতে হেমলতার বিড়ম্বনা হলো না। তিনি ব্যস্ত পায়ে উঠোনে নেমে আসেন। গেইটের পাশে মোর্শেদ মোড়ল পড়ে রয়েছেন। গায়ে চাদর। হাঁপড়ের মতো বুক উঠা-নামা করছে তার। যেন দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। হেমলতা দু'হাতে মোর্শেদকে আঁকড়ে ধরলেন। পদ্মজা,পূর্ণা, দৌড়ে আসে। মোর্শেদের এমফাইসিমা রোগ আছে। এ রোগে অল্প চলাফেরাতেই শ্বাসটানের উপক্রম হয় এবং দম ফুরিয়ে যায়। শ্বাস নেবার সময় গলার শিরা ভরে যায়। তিন মা-মেয়ে মোর্শেদকে ধরে রুমে নিয়ে আসে। মোর্শেদ এভাবেই হুটহাট করে বাড়ি ফেরে। কখনো কাকডাকা ভোরে, কখনো নিশুতি রাতে বা কখনো কাঠফাটা রোদে।

মোর্শেদ মোড়লেই এমফাইসিমা রোগটা ধরা পড়ে সাত বছর আগে। মোর্শেদের অ্যাজমা ছিল। আবার ধূমপানে খুবই আসক্ত ছিলেন। ফলে ফুসফুসের এই রোগটি খুব দ্রুত আক্রমণ করে বসে। মোর্শেদ খানিকটা সুস্থ হয়ে রাত একটার দিকে ঘুমালেন। পূর্ণা, প্রেমা রুমে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। পদ্মজা বারান্দার রুমে ঝিম মেরে বসে আছেন। জানালার বাইরে চোখের দৃষ্টি। জোসনা গলে গলে পড়ছে! কি সুন্দর দৃশ্য! পদ্মজার মন বলছে, মা আসবে তাঁর খোঁজে। পুরোটা ঘটনা শুনতে আসবেই। সত্যি তাই হলো। কিছুক্ষণ পরই হেমলতা আসলেন।

'আম্মা, বাতিটা নিভিয়ে দাও।' বলল পদ্মজা। কণ্ঠ খাঁদে নামানো। হেমলতা বাতি নিভিয়ে পদ্মজার পাশে বসেন। পদ্মজা তৈরি ছিল তবুও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে। সে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

পদ্মজা তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। বয়স দশ ছিল। খুব কম বয়সেই তাকে স্কুলে পাঠানো শুরু করেন হেমলতা। সেদিন, নানাবাড়িতে সবার দাওয়াত পড়ে। হানিফ চলে যাবে সৌদিতে। তাই এতো আয়জন। পরিবারের মিলন আসর বসে। স্কুল মাঠেও সেদিন নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ির সবাই সেখানেই চলে যায়। বাড়িতে থাকে শুধু পদ্মজা, পদ্মজার বৃদ্ধ নানা, আর হানিফ। পদ্মজা ঘুমে ছিল তাই বাকিদের সাথে যেতে পারেনি। যখন ঘুম ভাঙে আবিষ্কার করল বাড়িতে কেউ নেই। মোর্শেদ হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়াতে হেমলতা বাপের বাড়িতে উপস্থিত ছিল না।

' পদ্ম নাকি?'

পদ্মজা বাড়ি থেকে বের হওয়ার উপক্রম হতেই কানে আসে হানিফের ডাক। পদ্মজা মিষ্টি করে হেসে মাথা নাড়াল। হানিফের লোলুপ দৃষ্টি তখন পদ্মজার সারা শরীর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইটুকু মেয়ের ফর্সা চামড়া বিকৃত মস্তিষ্কের হানিফকে যেন বড্ড টানে!

'আয় তো, আমার ঘরে আয়।'

সহজ সরল শিশুসুলভ পদ্মজা মামার ডাকে সাড়া দিল। সে শুনেছে, মামা-ভাগনে যেখানে আপদ নেই সেখানে। অথচ, সেদিন সে মামাকেই ঘোর বিপদ হিসেবে জানল।

পদ্মজা রুমে ঢুকতেই হানিফ দরজা লাগিয়ে দিল।পদ্মজার মন কেমন করে উঠে হানিফের অদ্ভুত চাহনি আর দরজা লাগানো দেখে। হানিফ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করতে থাকে। পদ্মজার দেখতে খুব খারাপ লাগছে। ভয় করছে।

' এদিকে আয় তোর লগে গল্প করি।'

হানিফ বিছানায় বসে পদ্মজাকে কাছে ডাকে। পদ্মজা কাছে যেতে সংকোচ বোধ করে। হানিফ পদ্মজার ডান হাতে ধরে টেনে কোলে বসায়।

' তুই জানোস? তুই যে সবার থাইকা বেশি সুন্দর?'

হানিফের প্রশ্ন পদ্মজার কানে ঢুকেনি। সে মোচড়াতে থাকে হানিফের কোল থেকে নামার জন্য। আপত্তিকর স্পর্শ গুলো পদ্মজার খুব খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

'মোছড়াস ক্যান রে ছেড়ি। শান্তিমত বইয়া থাক। মামা মেলা থাইকা সাজনের জিনিষ কিইননা দিমু।'

হানিফ শক্ত করে দু'হাতে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। পদ্মজা কিছুতেই নামতে পারছে না।

'মামা, আমি চলে যাব।' কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল পদ্মজা।

'কই যাবি? মামার ধারে থাক।' বলল হানিফ।

হানিফের শক্তপোক্ত হাতের স্পর্শগুলো শুধু অস্বস্তি দিচ্ছে না,স্পর্শকাতর জায়গাগুলো ব্যাথায় বিষিয়ে উঠছে। পদ্মজা কেঁদে উঠে। ভেজা কণ্ঠে বলল,

' বাড়ি যাব আমি। ব্যাথা পাচ্ছি মামা।'

হানিফ হাতের বাঁধন নরম করে আদুরে গলায় বলল,

' আচ্ছা, আর ব্যাথা দিতাম না। কান্দিস না।'

পদ্মজা চট করে কোল থেকে নেমে পড়ে। হানিফকে তার আজরাইল মনে হচ্ছে। মায়ের কাছে সে আজরাইলের অনেক গল্প শুনেছে। আজরাইল যখন জান নিতে আসবে তখন শরীরে খুব কষ্ট অনুভব হবে। এই মুহূর্তে যেন ঠিক তেমনই অনুভূতি হলো। তাহলে তার হানিফ মামাই আজরাইল। পদ্মজা দরজা খুলতে পারবে না। তাই হানিফকে ভীতিকণ্ঠে অনুরোধ করল,

' মামা দরজা খুলে দাও।'

'ক্যান? আমি তোরে যাইতে কইছি?'

হানিফের কর্কশ কণ্ঠের ধমকে পদ্মজা ভয়ে কেঁপে উঠল। তার চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে। হানিফ পদ্মজাকে জোর করে কোলে তুলে নেয়। পদ্মজা কাঁদছে। তার খুব ভয় লাগছে। বার বার বলছে, 'মামা আমি বাড়ি যাব।'

হানিফের তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। বাড়িতে কেউ নেই। বৃদ্ধ সৎ বাবা কানে শুনে না। পদ্মজা হানিফকে কিল,ঘুষি দিতে থাকে। সেই সাথে জোরে জোরে কান্না শুরু করে। এভাবে কাঁদলে পাশের বাড়ির যে কেউ চলে আসবে। হানিফের রক্ত টগবগ করছে উত্তেজনায়। সে দ্রুত ওড়না দিয়ে পদ্মজার মুখ, হাত, পা বেঁধে ফেলল। পদ্মজার দু'চোখের পানি হানিফের চোখে লাগেনি। হানিফ ভীষণ আনন্দ পাচ্ছে। পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছে! সে সিগারেট জ্বালায়। খুব আনন্দ হলে তার সিগারেট টানতে ইচ্ছে হয়। সিগারেট টানতে গিয়ে মাথায় আসে নৃশংস ইচ্ছে। নাক,মুখ দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে সিগারেট দুই আঙ্গুলের মাঝে রেখে পদ্মজার বাম পায়ের তালুতে চাপ দিয়ে ধরে রাখে।

পদ্মজা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হেমলতা দু'হাতে শক্ত করে মেয়েকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে বলল, ' আম্মা, তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার দমটা বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। আমি তোমাকে খুব ডাকছি আম্মা। তুমি আসোনি। '

পদ্মজার কথাগুলো হেমলতার বুক রক্তাক্ত করে দেয়। এ যেন ১৯৭১ সালের পাকিস্তানিদের নৃশংসতা। নিজের চোখে তিনি দেখেছেন পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতা। হানিফ আর তার দেখা অত্যাচারী পাকিস্তানিদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। হেমলতা নির্বাক,বাকরুদ্ধ। শুধু অনুভব হচ্ছে, তার বুকে পড়ে আদরের পদ্মজা হাউমাউ করে কাঁদছে। সর্বাঙ্গ যেন কাঁপছে। হানিফকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে হাত নিশপিশ করছে। সেদিন একটুর জন্য পদ্মজা ধর্ষণ হয়নি। বাড়িতে সবাই ফিরে এসেছিল। পদ্মজা পোড়া স্থানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়।

বাকিটুকু আর পদ্মজাকে বলতে হয়নি,হেমলতা জানেন। পদ্মজার গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে। একুশ দিন বিছানায় ছিল। ততদিনে হানিফ দেশ ছেড়ে চলে যায়। পদ্মজা ভয়ে, লজ্জায় ঘটনাটি কাউকে বলেনি। পায়ের পোড়া দাগ দেখে যখন হেমলতা প্রশ্ন করেছিল, 'পা এমনভাবে পুড়ল কি করে?'

পদ্মজা সহজভাবে জবাব দিয়েছিল, ' চুলার কাছে গিয়েছিলাম। চুলার লাকড়ির আগায় পা লাগছিল।'

কথাটা পদ্মজা সাজিয়েই রেখেছিল। সাথে অনেক যুক্তি। তাই মিথ্যে বলতে একটুও কাঁপেনি। পুরো ঘটনাটা পদ্মজার বুকে তাজা হয়ে আছে। এই ছয় বছরে লুকিয়ে কতবার কেঁদেছে সে। সবসময় চুপ করে কোথাও বসে থেকেছে। হেমলতা মেয়ের নিশ্চুপতা দেখে মাথা ঘামাননি। কারণ,পদ্মজা ছোট থেকেই চুপচাপ ছিল। কিন্তু আজ হেমলতার খুব আফসোস হচ্ছে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন, তার তিনটা মেয়েই তার কাছে খোলা বইয়ের মতো। চাইলেই পড়া যায়। বিশেষ করে পদ্মজাকে বাড়ির পিছনের নদীর বুক দিয়ে তরতর করে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ টলটলে পানির মতো মনে হতো। যার জীবনে অস্বচ্ছ বলতে কিছু নেই। সবই সাদামাটা, সহজ সরল। অথচ, পদ্মজার জীবনেই কত বড় দাগ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে! কতবড় ঘটনা লুকিয়ে ছিল! মেয়েরা কথা লুকিয়ে রাখার সীমাহীন ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। কথাটি নিজের মেয়েদের ক্ষেত্রে মাথায়ই আসেনি। পদ্মজা শান্ত হলে হেমলতা বললেন, 'পা টা দেখি।'

পদ্মজা বাঁ পা বিছানায় তুলল। হেমলতা পদ্মজার পা কোলে নিয়ে পোড়া দাগটা দেখেন মনোযোগ দিয়ে। রক্ত টগবগ করে উঠে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিংস্রতা যেন লুটোপুটি খাচ্ছে।

'এই পোড়া দাগ হানিফের রক্ত দিয়ে মুছবো।'

কথাটি কত সহজ করে বলেছেন হেমলতা। তবুও পদ্মজা কেঁপে উঠল। কী যেন ছিল কথাটিতে! শরীরের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে। হেমলতা বারান্দার রুম ছেড়ে বড় ঘরে ঢুকেন। মিনিট কয়েক পর, রামদা, ছুরি হাতে নিয়ে উঠোনে যান। উঠোনের এক পাশে শক্ত পাথর আছে। ছুরিটা পাথরে ঘষতে থাকলেন সাবধানে। ঘষতে ঘষতে পাথর গরম হয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। মানে ধার হয়ে গেছে। পদ্মজা বারান্দা থেকে দেখছে। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কাঁপছে। হেমলতা বারান্দা পেরিয়ে রুমে ঢুকতে যাবে তখন পদ্মজা উৎকণ্ঠিত গলায় ডাকল, 'আম্মা!'

'আন্নার চাচার এক মেয়ে নিখোঁজ শুনেছিস তো বড়দের মুখে? সেই মেয়ের ধর্ষক হানিফ। ধর্ষণের পর পুঁতে ফেলেছে। অলন্দপুরের এই একটা মানুষই এতোটা নৃশংস। আমি তখন ঢাকা পড়তাম। বাড়ি এসে জানতে পারি ঘটনা। আম্মার অনুরোধ আর কান্নায় আমি সেদিন মুখ খুলিনি। এত বড় পাপ চেপে যাই। সেই শাস্তি আমি ধীরে ধীরে পাচ্ছিলাম। আজ পুরোপুরি পেয়ে গেলাম। আমার পাপের শাস্তি শেষ হয়েছে।'

হেমলতা কথা শেষ করে জায়গা ত্যাগ করলেন। কী ধারালো প্রতিটি বাক্য! হেমলতার মুখ দিয়ে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে পড়ে।

#পদ্মজা

চলবে....

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পাট- ৩

'আপা,স্কুলে যাবা না?' পূর্ণা পদ্মজাকে জিজ্ঞাসা করল।

'যাব।'

'তাড়াতাড়ি করো।'

তাড়া দিয়ে পূর্ণা বাড়িতে ঢুকল। পদ্মজা বাড়ির পিছনের নদীর ঘাটে উদাসীন হয়ে বসে আছে। এ নদীর নাম মাদিনী (ছদ্মনাম)। গ্রীষ্মকাল বিদায়ের তিন সপ্তাহ চলছে। এখন বর্ষাকাল। মাদিনী জলে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সে যেন স্রোতস্বিনী। ঘোলা জলের একটানা স্রোত বয়ে যায় সাগরের দিকে। উজান থেকে ভেসে আসছে ঘন সবুজ কচুরিপানা। পদ্মজার এই দৃশ্য দেখতে বেশ লাগে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে মাদিনীর স্বচ্ছ জলের দিকে। মাদিনীর বুকের উপর দিয়ে একটা লঞ্চ যাচ্ছে। লঞ্চ দেখে এক মাস আগের ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। সেদিন রাতে হেমলতা ছুরি ধার দিয়ে রুমে ঢুকে গেলেন। পদ্মজা কাঁপা পায়ে রুমে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। এরপরদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নামায পড়ে খেতে বসল। তখন হিমেল হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকে। হিমেল হচ্ছে হেমলতার ছোট ভাই।

' আপা? এই পদ্ম, আপা কই? ' হিমেলের কণ্ঠ।

' কি হইছে মামা?' জবাব দিল পদ্মজা।

পদ্মজার প্রশ্ন উপেক্ষা করে হেমলতাকে হিমেল ডাকল,' আপা,এই আপা।'

হেমলতা বাড়ির পিছন থেকে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে আসেন।

' কি হয়েছে?'

হিমেল হেমলতাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

' আপা, ভাইজান খুন হইছে। রাইতে কে জানি মাইরা ফেলছেরে আপা..."

হিমেল কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। পদ্মজা তাৎক্ষণিক সন্দিহান চোখে মায়ের দিকে তাকাল। হেমলতাকে দেখে মনে হলো, তিনি চমকেছেন। অথচ, তার চমকানোর কথা ছিল না। নাকি হিমেলের সামনে অভিনয় করলেন?

' পূর্ণা,প্রেমাকে ওদিক আসতে দিস না পদ্ম। আমি আসছি।'

হেমলতা বাড়ির বাইরে মিলিয়ে যান। হিমেল পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ছেলেটা বোকাসোকা, জন্মগত প্রতিবন্ধী। বাইশ বছরের হিমেল এখনো শিশুদের মতো আচরণ করে। কথায় কথায় খুব কাঁদে। সেখানে তার ভাই খুন হয়েছে। এক মাস তো প্রতিদিন নিয়ম করে কাঁদবে।

পদ্মজা রাতেই ভেবেছিল এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তবুও এখন ভয় পাচ্ছে খুব। পুলিশ কী এসেছে? মাকে কী ধরে নিয়ে যাবে? ভাবতে গিয়ে, পদ্মজার বুক ধক করে উঠল। গ্রামের কাছেই শহর, থানা। পুলিশ নিশ্চয় চলে এসেছে। পদ্ম ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। সে ঘামছে খুব। নাক,মুখ,গলা ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণা খুনের কথা শুনেই খুব ভয় পেয়েছে। তার মনে হচ্ছে সেও খুন হবে। খুব বেশি ভীতু পূর্ণা। পদ্মজার শরীর কাঁপতে থাকে। চোখে ভাসছে, হেমলতাকে পুলিশ শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তার খুব কান্না পাচ্ছে। আর সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল পদ্মজা। মাথায় ওড়নার আঁচল টেনে নিয়ে পূর্ণার উদ্দেশ্যে বলল,

' প্রেমারে দেখে রাখিস বোন। '

বাড়ি ভর্তি মানুষ। আরো মানুষ আসছে। হেমলতা মানুষজনকে ঠেলে হানিফের লাশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন ফর্সা রঙের দুই জন মহিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। আকস্মিক আক্রমণে হেমলতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। খেয়াল করে দেখেন, দুজন মহিলা তাঁর মা আর বোন। তারা হাউমাউ করে কাঁদছে। কিন্তু হেমলতার তো কান্না পাচ্ছে না। ব্যাপারটা লোকচক্ষু ঠেকছে না? একটু কী কান্নার অভিনয় করা উচিৎ? হানিফের মৃত দেহ দেখে মনে হচ্ছে কেউ ইচ্ছেমতো কুপিয়েছে। হেমলতার তা দেখে শান্তি লাগছে! এমন শান্তি অনেকদিন পাওয়া হয়নি। পদ্মজা সেখানে উপস্থিত হয়। হেমলতার নজরে পড়ে। ভীতু চোখে মায়ের চোখের দিকে তাকাল পদ্মজা। হেমলতা ভ্রু কুঞ্চিত করে আবার স্বাভাবিক করে নেন। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে দেখছে পুলিশ এসেছে নাকি। চারিদিকে এতো

মানুষ। পদ্মজাকে এদিক ওদিক উঁকি দিতে দেখে হেমলতা এগিয়ে আসেন। চোখমুখ শক্ত করে পদ্মজার মুখ ঘুরে দেন। পদ্মজা দ্রুত ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধরে গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ল। তার মা চায় না সে কখনো এতো মানুষের সামনে থাকুক।

হেমলতা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, পদ্মজা গোয়ালঘর থেকে উঁকি দিয়ে বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ আসল। জিজ্ঞাসাবাদ করে হানিফের লাশ নিয়ে গেল। লোকমুখে শোনা যায়, হানিফ খুন হয়েছে শেষ রাতে। এরপর নদীতে ফেলা দেওয়া হয়। লঞ্চ ঘাটে লাশ ভাসে।

হেমলতাকে পুলিশ নিয়ে যায়নি বলে পদ্মজা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। মানুষের ভীরও কমে গেছে। হেমলতার মা কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে উঠোনের এক কোণে বসে আছেন। পদ্মজা গুটি পায়ে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসল। হেমলতা পদ্মজার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। সেই হাসি দেখলেন হেমলতার মা মনজুরা। তিনি কিছু একটা ভেবে নেন। হেমলতার কাছে এসে কিড়মিড় করে বলেন, 'তুই খুন করছস?'

' তোমার কেন মনে হচ্ছে এমন?'

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। অথচ, পদ্মজা এই প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়েছে খুব। যদি নানু পুলিশকে বলে দেয়? পুলিশ তো তার মাকে নিয়ে যাবে!

' কাইল রাইতে তুই আইছিলি হানিফের ঘরে। আমি দেহি নাই?' রাগে কাঁপছেন মনজুরা।

' হুম আসছি।' হেমলতার নির্বিকার স্বীকারোক্তি।

'কেন মারলি আমার ছেড়ারে? তোর কি ক্ষতি করছে? '

' আসছি বলেই আমি খুন করেছি?'

' এতো রাইতে তুই তার কাছে আর কী দরকারে আইবি?'

'আমি তাকে মারতেই যাব কেন?'

মনজুরা আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হেমলতার দিকে। হেমলতার চোখ মুখ শক্ত। নিস্তব্ধতা কাটিয়ে মনজুরা চেঁচিয়ে উঠলেন, ' পুলিশের কাছে যামু আমি।'

পদ্মজা কেঁদে উঠল। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে, 'নানু এমন করো না।'

হেমলতা নীচু স্বরে কঠিন করে বললেন, ' আমার মেয়েদের থেকে আমাকে দূরে সরানোর চেষ্টা করো না আম্মা। ফল খুব খারাপ হবে।'

পদ্মজার মনে হলো মনজুরা ভয় পেয়েছেন। মনজুরা সবসময়ই হেমলতাকে ভয় পান। তিনি চুপসে যান। শুধু ঘৃণা ভরা দৃষ্টি নিয়ে হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকেন। পদ্মজা বুঝে উঠতে পারে না, তার নানু কেন ভয় পায় মাকে? মায়ের অতীতে কী ঘটেছে? কেন তিনি এমন কাঠখোট্টা? ছেলের খুনীকে কোনো মা ছেড়ে দেয়? নানু কেন ছাড়লেন? মেয়ে বলে? নাকি অন্য কারণ? কোনো উত্তর নেই। এসব ভাবলে উল্টো মাথা ব্যাথা ধরে। অন্য আট-দশটা পরিবারের মতো কেনো না তারা? নাকি গোপনে সব পরিবারেই এমন জটিলতা আছে? প্রশ্ন হাজারটা! উত্তর কোথায়?

সেদিন রাতে খাওয়ার সময় হেমলতা নিম্নস্বরে পদ্মজাকে বললেন, 'পদ্ম?'

'জ্বি,আম্মা।'

'আমি হানিফকে খুন করিনি। কারা করেছে তাও জানিনা।'

কথাটি শুনে পদ্মজা খুব চমকায়। তার মা মিথ্যে বলে না। তাহলে কারা খুন করল? পদ্মজা প্রশ্ন করল, 'তাহলে শেষ রাতে মামার কাছে কেন গিয়েছিলে আম্মা?'

হেমলতা জবাব দেননি। খাওয়া ছেড়ে উঠে যান।

পদ্মজার ভাবনার সুতো কাটল কারো পায়ের আওয়াজ শুনে। ঘাড় ঘুরিয়ে মোর্শেদকে দেখতে পেল। মোর্শেদ পদ্মজাকে ঘাটে বসে থাকতে দেখে বিরক্তিতে কপাল কুঁচকান।

' এই ছেড়ি যা এন থাইকা। '

পদ্মজার কান্না পায়। খুব খারাপ লাগে। নিঃশব্দে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তা আড়াল করে ব্যস্ত পায়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

কয়েক মাস পর পদ্মজার মেট্রিক পরীক্ষা। তিন বোন বই নিয়ে সড়কে উঠল। পদ্মজার কোমর অবধি ওড়না দিয়ে ঢাকা। পূর্ণা একনাগাড়ে বকবক করে যাচ্ছে। স্কুলে যাওয়া অবধি কথা বন্ধ হবে না। মাঝে মাঝে জোরে জোরে হাসছে। মেয়েটার হাসির রোগ আছে বোধহয়। একবার হাসি শুরু করলে আর থামে না। পদ্মজা বার বার বলছে, 'আম্মা রাস্তায় কথা বলতে আর হাসতে মানা করছে। চুপ কর না।'

তবুও পূর্ণা হাসছে। বাড়ির বাইরে এসে সে মুক্ত পাখির মতো আচরণ করে। তাকে দেখে মনে হয়, খাঁচা থেকে মুক্ত হয়েছে।

' পদ্ম... ওই পদ্ম। খাড়া।'

পদ্মজা ক্ষেতের দিকে তাকাল। লাবণ্য ক্ষেতের আইল ভেঙে দৌড়ে আসছে। লাবণ্য আর পদ্মজা এক শ্রেণীতে পড়ে। লাবণ্য কাছে এসে হাঁপাতে থাকল। শান্ত হওয়ার পর চারজন মিলে স্কুলের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল।

' বাংলা পড়া শিখে এসেছি আজ?'

পদ্মর প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে লাবণ্য বলল, 'আরে ছেড়ি বাড়িত শুদ্ধ ভাষায় কথা কইলে বাইরেও কইতে হইব নাকি?'

'আমি আঞ্চলিক ভাষা পারি না।'

লাবণ্য অসন্তোষ প্রকাশ করল। সে অলন্দপুরের মাতব্বর বাড়ির মেয়ে। তাদের বাড়ির সবাই শিক্ষিত। তবুও তাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। পরিবারের দুই-তিন জন সদস্য ছাড়া। আর পদ্মজার চৌদ্দ গুষ্ঠি মূর্খ,দুই-তিন জন ছাড়া। তবুও এমন ভাব করে! আঞ্চলিক ভাষা নাকি পারে না!

'সত্যি আমি পারি না। ছোট থেকে আম্মা শুদ্ধ ভাষা শিখিয়েছেন। উনিও বলেন। তাই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেই আরাম পাই।'

' পূর্ণা তো পারে। '

'আমার চেষ্টা করতে ইচ্ছে হয় না।'

' আইচ্ছা বাদ দে। শুন, কাইল আমরার বাড়িত নায়ক-নায়িকারা আইব।'

পূর্ণা বিগলিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন আসব? কোন নায়ক?'

' শুটিং করতে। ছবির শুটিং।'

পদ্মজা এসবে কোনো আগ্রহ পাচ্ছে না। পূর্ণা খুব আগ্রহবোধ করছে। সপ্তাহে একদিন সুমিদের বাড়িতে সাদাকালো টিভিতে সে ছায়াছবি দেখতে যায়। তাই অভিনয় শিল্পীদের প্রতি তার আগ্রহ আকাশছোঁয়া। পূর্ণা গদগদ হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কোন নায়ক নায়িকা? বল না লাবণ্য আপা!'

' দাঁড়া! মনে করি। '

পূর্ণা কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। লাবণ্য চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল। এরপর মনে হতেই বলল, 'লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী।'

'তুমি আমার ছবির নায়ক-নায়িকা?'

'হ।'

স্কুলের যাওয়ার পুরোটা পথ লাবণ্য আর পূর্ণা ছায়াছবি নিয়ে আলোচনা করল। মূল বক্তব্যে ছিল লিখন শাহ।

#পদ্মজা

চলবে...

Next পার্টের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পাট-৪

দিনটাকে পদ্মজার অলক্ষুণে মনে হচ্ছে। সকালে উঠে দেখল, লাল মুরগিটার একটা বাচ্চা নেই। নিশ্চয় শিয়ালের কারবার। রাতে মুরগি খোপের দরজা লাগানো হয়নি। আর এখন আবিষ্কার করল, দেয়াল ঘড়িটার কাঁটা ঘুরছে না। ঘড়িটা রাজধানী থেকে হানি খালামণি দিয়েছিলেন। গ্রামে খুব কম লোকই হাত ঘড়ি পরে। দেয়াল ঘড়ি হাতেগুণা

দুই-তিনজনের বাড়িতে আছে। পদ্মজা সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময়ের আন্দাজ করার চেষ্টা করল। পূর্ণা, প্রেমা দুপুরে খেয়েই ঘুম দিয়েছে। পদ্মজা মায়ের রুমে উঁকি দিল। হেমলতা মনোযোগ দিয়ে সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করছেন। আটপাড়ায় একমাত্র হেমলতাই সেলাই কাজ করেন। প্রতিটি ঘরের কারো না কারো পরনে তার সেলাই করা কাপড় আছেই।

'লুকিয়ে দেখছিস কেন? ঘরে আয়।'

হেমলতার কথায় পদ্মজা লজ্জা পেল।

'না আম্মা। কাজ আছে। '

'পানি দিয়ে যা।'

হেমলতা জগ বাড়িয়ে দেন। পদ্মজা জগ হাতে নিয়ে বলল, 'আম্মা,ছদকা কোন মুরগিটা দেব?'

হেমলতা গতকাল স্বপ্নে দেখেছেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। তাই তিনি ছদকা দিবেন বলে মনস্থির করেছেন। সকালেই পদ্মজাকে মনের কথা জানালেন।

' সাদা মোরগটা দিয়ে দিস। মুন্না কি আসছে?'

'না। প্রতিদিন বিকেলবেলা তো পানি নিতে আসে। কিছুক্ষণ পরই আসবে।'

হেমলতা আর কথা বাড়ালেন না। পদ্মজা কলপাড় থেকে পানি নিয়ে আসে। আছরের আযানের সাথে সাথে মুন্না আসল। গ্রামে সচ্ছল পরিবার নেই বললেই চলে। হাতে গোনা কয়েকটা পরিবারে সচ্ছলতা আছে। হেমলতার পরিবারটা টিকে আছে, হেমলতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের জন্য। পুরো আটপাড়ায় টিউবওয়েল মাত্র পাঁচটা। পদ্মজাদের টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে প্রতিদিন অনেকেই আসে। তার মধ্যে নিয়মিত একজন মুন্না। দশ বছরের একটা ছেলে। মা নেই। বাবা পঙ্গু। সদরে বসে ভিক্ষা করে। পদ্মজা মোরগ নিয়ে কলপাড়ে এসে দেখে মুন্না নেই। একটু সামনে হেঁটে এসে ঘাটে মুন্নাকে দেখতে পেল। ডাকল,'মুন্না।'

মুন্না ফিরে তাকায়। পদ্মজার হাতে সাদা মোরগ দেখে মুন্না খুব খুশি হয়। পদ্মজা না বললেও বুঝে যায়, ছদকা পাবে আজ। মুন্না এগিয়ে আসল। দাঁত কেলিয়ে হাসল।

'হাসিস কেন? নে মোরগ। তোর আব্বাকে নিয়ে খাবি।'

মুন্না যে খুব খুশি হয় তা দেখেই বোঝা গেল। খুশিতে গদগদ হয়ে মোরগটাকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজার ঠোঁট দুটি নিজেদের শক্তিতে প্রশান্তির হাসিতে মেতে উঠল। কী সুন্দর মুন্নার হাসি! পদ্মজা বলল, 'খুব খুশি?'

'হ।'

'দোয়া করবি আমরা যেন ভাল থাকি।'

'করবাম আপা।'

'আচার খাবি মুন্না?'

'হ,খাইবাম।'

পদ্মজা আবার হাসল। মুন্না পেটুক। খাওয়ার কথা শুনলেই চোখ চকচক করে উঠে। পদ্মজা আচার নিয়ে আসে। মুন্নার সাথে বসে আরাম করে খায়। মুন্না একটু একটু করে খেতে খেতে বলল, 'আপা, তুমি খুব ভালা।'

'তাই?'

'হ।বড় হইয়া তোমারে বিয়া করবাম আমি।'

পদ্মজা বিষম খেল। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ শুনল নাকি। বিয়ে তার কাছে খুব লজ্জাজনক শব্দ। বিয়ে নামটা শুনলেই লজ্জায় লাল টুকটুকে হয়ে যায়। ফিসফিসিয়ে মুন্নাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ের কথা কোথায় শিখলি?'

' আব্বা কইছে।'

' আর বলবি না এসব। যা,বাড়িত যা।'

পদ্মজা তড়িঘড়ি করে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখল, হেমলতা রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ থাকে না। হারিকেন জ্বালিয়ে রান্না করতে হয়। প্রতিদিন ঘরে একটা হারিকেন আর রান্নাঘরে একটা হারিকেন জ্বালানো অনেক খরচের ব্যাপার। তাই তিনি বিকেলে রাতের রান্না সেড়ে ফেলেন।

'আম্মা আমি রাঁধি?'

'লাগবে না। সাহায্য কর শুধু।'

পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে দেখল, কী কাজ করা যায়। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। হেমলতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, ' লাউ নিয়ে আয়।'

'ছিড়ে আনব? না লাহাড়ি ঘরে আছে?'

'লাহাড়ি ঘরে নাই।'

পদ্মজা মায়ের আদেশ পেয়ে যেন চাঁদ পেয়েছে। এমন ভাব ধরে দ্রুত ছুটে যায় লাউ আনতে। লাউ,বরবটি, ঢেঁড়স, কাঁকরোল, করলা, চিচিঙ্গা, পটল, ঝিঙা.. ইত্যাদি, ইত্যাদি সব রকমের সবজির মেলা বাড়ির চারপাশ ঘিরে। পদ্মজা সাবধানে ঘাসের উপর দিয়ে লাউ গাছের দিকে এগোয়। বর্ষাকাল হওয়াতে জোঁকের উপদ্রব বেড়েছে। জোঁকের ভয় অবশ্য নেই তার।

হেমলতা পদ্মজার যাওয়া পানে ঝিম মেরে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটাকে দেখলে তার মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠে। পদ্মজার চুল দেখলে মনে হয়, এই সুন্দর ঘন কালো রেশমী চুল পদ্মজার একেকটা কাল রাত। পদ্মজার ছিমছাম গড়নের দুধে আলতা দেহের অবয়ব দেখলে মনে হয়, এই দেহ পদ্মজার যন্ত্রণা। এই দেহ ধ্বংস হবে। পদ্মজার ওষ্ঠদ্বয়ের নিম্নে স্থির হয়ে থাকা কালো সূক্ষ্ম তিল দেখলে মনে হয়, এই তিল পদ্মজার এক জীবনের কান্নার কারণ। হেমলতা পদ্মজার রূপের বাহার নিতে পারেন না। কেন কৃষ্ণকলির ঘরে ভুবন মোহিনী রূপসীর জন্ম হলো! জন্ম,মৃত্যু, বিয়ে কারো হাতে থাকে না। যদি থাকতো, হেমলতা মোর্শেদকে বিয়ে করতেন না এবং পদ্মজার মতো রূপসীর জন্ম দিতেন না। আল্লাহর কাছে,রূপসী মেয়ে ভুলেও চাইতেন না। হেমলতার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আজ শুক্রবার। স্কুল নেই। ফজরের নামায পড়ে তিন বোন পড়তে বসেছে। প্রেমা নামায পড়তে চায় না। ঘুমাতে চায়। হেমলতার মারের ভয়ে নামায পড়ে। সে ঝিমুচ্ছে আর পড়ছে। তা দেখে পদ্মজা আর পূর্ণা ঠোঁট টিপে হাসছে। হেমলতা বিরক্ত হোন। প্রেমার তো পড়া হচ্ছেই না। সেই সাথে পদ্মজা, পূর্ণার মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে। তিনি কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন, 'প্রেমা,ঘুমাচ্ছিস কেন? ঠিক হয়ে পড়।'

প্রেমা সচকিত হলো। চট করে চোখ খুলে, ভয়ে তাড়াতাড়ি পড়া শুরু করল। হেমলতা কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'পড়তে হবে না। ঘরে গিয়ে ঘুমা।'

প্রেমা একটু অবাক হয়। পরেই খুশি হয়ে ছুটে যায় ঘরে। পূর্ণা মুখ ভার করে ফেলল। তার ও তো পড়তে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু, মা কখনো তাকে ছাড় দেন না। হয়তো ছোটবেলা ছাড় দিতেন। মনে নেই। সে আবার খুব দ্রুত সব ভুলে যায়। ব্রেন ভাল প্রেমার। যা পড়ে মনে থাকে। পূর্ণা খুব দ্রুত ভুলে যায়। পদ্মজার সবকিছুই স্বাভাবিক। শুধু রূপ বাদে।

সূর্য উঠার সাথে সাথে মোর্শেদ বাড়িতে ঢুকেন। হাতে ঝাকি জাল আর বড়শি। কাঁধে পাটের ব্যাগ ঝুলানো। ভোরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। মোর্শেদ বাড়ি ফিরলে পূর্ণা আর প্রেমা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। মাছ খেতে পারে অনেক।

অর্থের জন্য হেমলতা খুব কম মাছ আনেন। মোর্শেদ বাড়িতে যতদিন থাকেন ততদিন মাছের অভাব হয় না। মোর্শেদ বলার পূর্বেই পূর্ণা ও প্রেমা গামলা নিয়ে ছুটে আসে উঠানে। মোর্শেদ কাঁধের ব্যাগ উল্টে ধরেন গামলার উপর। পুঁটি, ট্যাংড়া, পাবদা,চিংড়ি মাছের ছড়াছড়ি। হেমলতা ভারী খুশি হোন। পদ্মজা লতা দিয়ে চিংড়ি খেতে খুব পছন্দ করে। আর প্রেমা, পূর্ণা পছন্দ করে পাবদা মাছের ভুনা। মেয়েগুলো খুব খুশি হয়েছে মাছ দেখে। তিনি জানেন, মোর্শেদ বাড়ি থেকে বের হতেই পদ্মজা ছুটে যাবে বাড়ির পিছনে লতা আনতে।

'হুনো, লতা। আমার আম্মারারে পাবদা ভুনা কইরা দিবা। সবজি টবজি দিয়া রাঁনবা না।'

'আব্বা,আপনি বাড়িতে থাকবেন? তাইলে তো প্রতিদিনই মাছ খেতে পারি।'

মোর্শেদ আড়চোখে পদ্মজাকে একবার দেখে তীক্ষ্ণ চোখে হেমলতার দিকে তাকান। এরপর পূর্ণাকে জবাব দিলেন, 'কোনোরহম অশান্তি না হইলে তো থাকবামই।'

গামছা নিয়ে তিনি কলপাড়ে চলে যান। পদ্মজার মুখটা ছোট হয়ে যায়। প্রতিবার বাড়ি ছাড়ার পূর্বে মোর্শেদ পদ্মজাকে রাগে কটুকথা শোনান। তখন, হেমলতা মোর্শেদকে শাসান। ফলস্বরূপ মোর্শেদ বাড়ি ছাড়েন।

'মোর্শেদ নাকি? বাড়ি ফিরলা কোনদিন?'

মোর্শেদ গোসল সেড়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন। সকালের মিষ্টি রোদ। ঘাড় ঘুরিয়ে রশিদ ঘটককে দেখে হাসলেন।

'আরে মিয়া চাচা। আহেন, আহেন। পূর্ণারে চেয়ার আইননা দে। খবর কী?'

পূর্ণা চেয়ার এনে দিল। রশিদ এক দলা থুথু উঠানে ফেলে চেয়ারে বসলেন আরাম করে। প্রেমাকে উঠানে খেলতে দেখে ফরমায়েশ দিলেন, 'এই মাইয়া যা পানি লইয়া আয়। অনেকক্ষণ ধইরা দমডা আটকাইয়া আছে।'

প্রেমা পানি নিয়ে আসে। রশিদ পানি খেয়ে মোর্শেদকে বললেন, 'খবর তো ভালাই। বাবা ছেড়িডারে কী বিয়া দিবা না?'

'দুই বছর যাক। পড়তাছে যহন,মেট্রিকটা পাশ করুক। কী কন?'

'মেজোডা না। বড়ডা। তোমার বউ তো মরিচের লাহান। কোনোবায়ও রাজি অয় না। তুমি বোঝাওছেন। পাত্র খাঁটি হীরা। বাপ-দাদার জমিদারি আছে। '

মোর্শেদ আড়চোখে হেমলতা এবং পদ্মজার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। নেই তারা। তিনি জানেন, পদ্মজার উপর কোনোরকম জোরজবরদস্তি তিনি করতে পারবেন না। হেমলতা তা হতে দিবেন না। এসব তো আর বাইরের মানুষের সামনে বলা যায় না। মোর্শেদ রশিদ ঘটককে নরম গলায় বললেন, 'থাকুক না পড়ুক। মায়ে যহন চায় ছেড়ি পড়ুক। তাইলে পড়ুক।'

রশিদ নিরাশ হলেন। ভেবেছিলেন, মোর্শেদ রাজি হবে। তিনি মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে ছিলেন। এরপর বড় অসুখে পড়লেন। তাই মোর্শেদ বাড়ি ফিরেছে শুনেও আসতে পারেননি। আজ একটু আরামবোধ হতেই ছুটে এসেছেন অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু মোর্শেদের জবানবন্দিতে তিনি আশাহত হলেন। কটমটে গলায় বললেন, 'যুবতী ঘরে রাহন ভালা না। যহন বংশে কালি পড়ব তহন বুঝবা। হুনো মোর্শেদ, এই বয়সী মাইয়াদের স্বভাব চরিত্র বেশিদিন ভালা থাহে না। পাপ কাম এদের চারপাশে ঘুরঘুর কর। বেলা থাকতে জামাই ধরাইয়া দেওন লাগে। বুঝছোনি? তোমার বউরে বোঝাও।'

রশিদ, পাত্রের অনেক প্রশংসা করলেন। জমিজমা, বাড়িঘর সবকিছুর বাড়াবাড়ি রকমের বর্ণনা দিলেন। ফলে,মোর্শেদের মস্তিষ্ক কাজ করা শুরু করল। রশিদ ঘটক যেতেই তিনি হেমলতার পাশে গিয়ে বসেন। ইনিয়েবিনিয়ে পদ্মজার বিয়ের কথা তুলেন। হেমলতা সাফ নাকচ করে দেন। তিনি শান্তকণ্ঠে বুঝিয়ে দেন, পদ্মজার বিয়ে তিনি দিচ্ছেন না। আর মোর্শেদকে পদ্মজার ব্যাপারে নাক গলাতে না করেছেন। শেষ কথাটা বেশ কঠিন করেই বলেন, 'আগে বাপ হও। পরে বাপের কাজ করতে আসবা।'

মোর্শেদের তিরিক্ষি মেজাজ। তিনি রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। রগে রগে রাগ টগবগ করছে। পদ্মজাকে বারান্দায় দেখে তিনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, 'ছেড়ি যহন রূপ দিয়া নটি হইব। তহন আমার ঠ্যাংও পাইবা না। এই ছেড়ি মজা বুঝাইবো। '

পদ্মজার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হেমলতা রান্নাঘর থেকে বের হলেন মোর্শেদকে কিছু কঠিন কথা শোনাতে। পদ্মজা তখন দৌড়ে আসে। হেমলতার হাতে ধরে রান্নাঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। মোর্শেদ যতক্ষণ বাড়িতে থাকে তারও খুব ভাল লাগে। পূর্ণা,প্রেমা কত খুশি হয়। বাড়িটা পরিপূর্ণ লাগে। সে চায় না তার বাবা ঝগড়া করে রাগ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাক। হেমলতা রাগে এক ঝটকায় মেয়ের হাত সরিয়ে দেন। তার সহ্য হয় না মোর্শেদকে। মানুষের কথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বদমেজাজি একজন মানুষ মোর্শেদ। ভালটা কখনো বুঝে না। মানুষের কথায় নাচে। সারাক্ষণ মস্তিষ্কে একটা বাক্যেরই পূজা করে, 'মানুষ কী বলবে? '

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মাথার উপর বৃষ্টি নিয়ে মোর্শেদ বাড়ি ফেরেন। মুখ দেখে বোঝা গেল, তিনি খুব খুশি। হেমলতাকে ডেকে বললেন, 'এক মাসের লাইগগা ঘরটা ছাইড়া লাহাড়ি ঘরে উইঠ্ঠা পড়।'

'কীসের দরকারের জন্য?'

'শুটিং করার লাইগগা মাতব্বর বাড়ির যারা আইছে, তারার বুলি আমরার বাড়ি পছন্দ অইছে। বিরাট অংকের টেকা দিব কইছে। আমিও কথা দিয়া আইছি। কাইলই উঠতে কইয়া আইছি।'

হেমলতা বিরক্ত হতে গিয়েও পারলেন না। সত্যি অর্থের খুব দরকার। পদ্মজার সামনে মেট্রিক পরীক্ষা। কত খরচ। কলেজে পড়াতে ঢাকা পাঠাতে হবে। তিনি মোর্শেদকে বললেন, 'টাকার ব্যাপারটা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে বলবা। নয়তো জায়গা হবে না।'

'আরে..বলামনে। এখন সব গুছাইয়ালাও ।'

পূর্ণা আড়াল থেকে সবটা শুনেছে। সাত দিন হয়েছে লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী এই গ্রামে এসেছে। অথচ, সে দেখতে পারল না। হেমলতা যেতে অনুমতি দেননি। পূর্ণা নামাযের দোয়ায় খুব অনুনয় করেছে আল্লাহকে। যেন লিখন শাহ আর চিত্রা দেবীকে স্বচক্ষে দেখতে পারে। আর এখন শুনলো, তাদের বাড়িতেই নাকি আসছে ওরা! পূর্ণার মনে হচ্ছে সে খুশিতে মরে যাচ্ছে।

'এই মগা? আমাকে এক কাপ চা দাও তো।'

মগা ঝড়ের গতিতে চা নিয়ে আসে। লিখন চিত্রার পাশের চেয়ারটায় বসল। এরপর মগাকে বলল, 'দারুণ চা করো তো তুমি।'

মগা কাচুমাচু হয়ে হাসল। ভাবে বোঝা গেল, প্রশংসা শুনে সে ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। চিত্রা মগার ভাবভঙ্গি দেখে হেসে উঠল। চিত্রা হাসলে মগা মুগ্ধ হয়ে দেখে। মাতব্বর বাড়ির কামলা সে। চিত্রনায়ক লিখন শাহ এবং চিত্র নায়িকা চিত্রা দেবীর সেবা করার দায়িত্ব মগাকে দেয়া হয়েছে। মগা এতে ভীষণ খুশি। চিত্রার সুন্দর মুখশ্রীর সামনে সবসময় থাকতে পারবে ভেবে। চিত্রা বলল, 'তোমার ভাইয়ের নাম জানি কী বলছিলে?'

চার ফুট উচ্চতার মগা উৎসাহ নিয়ে জবাব দিল, 'মদন।'

চিত্রার হাসি পায়। অনেক কষ্টে চেপে রাখল। মগা,মদন কারো নাম হয়?

শুটিংয়ের মাঝে হুট করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। তাই আপাতত শুটিং স্থগিত আছে। সবাই বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছে। হাতে সবার রং চা । ডিরেক্টর আবুল জাহেদ দারুণ খিচুড়ি রান্না করেন। বৃষ্টি দেখেই তিনি রান্নাঘরে ঢুকেছেন।

' আচ্ছা, মগা এই বাড়ির দুইটা মেয়ে কোথায়? আসার পর একবার এসেছিল। এরপর তো আর এলো না।'

চিত্রা প্রশ্ন করল। মগা বলল, 'ওই যে লাহাড়ি ঘর। ওইডাত আছে।'

'লাহাড়ি ঘর মানে কি?'

মগার বদলে লিখন বলল, ' যে ঘরের অর্ধেক জুড়ে ধান রাখা হয়। আর অর্ধেক জায়গায় চৌকি থাকে কামলাদের জন্য ওই ঘরকে লাহাড়ি ঘর বলে এখানে। বোঝা গেছে?

চিত্রা চমৎকার করে হাসল।

' বোঝা গেছে। মগা, বৃষ্টি কমলে লাহাড়ি ঘরে যাব। ঠিক আছে?'

'আইচ্ছা আপা।'

'এই লিখন যাবা? ওইতো সামনেই। আলসেমি করো না।'

মগা হৈহৈ করে উঠল, 'না না, বেঠা লইয়া যাওন যাইত না। বাড়ির মালিকের মানা আছে। '

লিখন মগার না করার ভাব দেখে ভীষণ অবাক হলো। চিত্রা প্রশ্ন করল, 'মানা কেন?'

'বাড়ির বড় ছেড়িডারে তো আপনেরা দেহেন নাই। আগুন সুন্দরী। এই লিখন ভাইয়ের লাহান বিলাই চোখা। ছেড়িডারে স্কুল ছাড়া আর কোনোহানো যাইতে দেয় না। বাড়ি দিবার আগে কইয়া রাখছে লাহাড়ি ঘরে বেঠামানুষ না যাইতে। এই ছেড়ি লইয়া বহুত্তা কিচ্ছা আছে।'

চিত্রা বেশ কৌতুহল বোধ করল। লিখন তীক্ষ্ণ ঘোলা চোখে লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকাল। দেড় দিন হলো এখানে এসেছে। উঠানের শেষ মাথায় থাকা লাহাড়ি ঘরটা একবারো মনোযোগ দিয়ে দেখা হয়নি।

সামনের দরজাটা বন্ধ। দুটো ছোট মেয়ে এসেছিল ঘরটার ডান পাশ দিয়ে। ঘরটার ডানে-বামে পিছনে গাছপালা। বাড়িটা পুরনো হলেও দারুণ। তবে এই মুহূর্তে তাঁর অন্যকিছুর প্রতি তীব্র কৌতূহল কাজ করছে।

#পদ্মজা

চলবে....

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পাট- ৫

লাহাড়ি ঘর দু'ভাগ করা হয়েছে চাদর টানিয়ে। একপাশের চৌকিতে হেমলতা এবং মোর্শেদ থাকেন। অন্যপাশের চৌকি পদ্মজা,পূর্ণা ও প্রেমার দখলে। লাহাড়ি ঘরের পিছনের দরজা আপাতত প্রধান দরজা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পিছনে অনেক কচু গাছ ছিল। হেমলতা মোর্শেদকে নিয়ে জায়গা খালি করেছেন। এরপর সেখানে মাটির চুলা তৈরি করা হয়েছে। বড় সড়কে উঠার জন্য ঝোপঝাড় কেটে সরু করে পথ করা হয়েছে। এতে মোর্শেদের সাহায্য ছিল না। হেমলতা দুই মেয়েকে নিয়ে একাই করেছেন। শুটিং দলে অনেক পুরুষ। পদ্মজাকে ভুলেও তাদের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করতে দেওয়া যাবে না । হেমলতার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, পদ্মজার মুখ পুড়িয়ে দিতে। পরক্ষণেই নিজের উপর ঘৃণা চলে আসে। কী করে নিজের মেয়ের প্রতি এমন মনোভাব আসতে পারে? অথচ,পদ্মজার হাতে সূচ ফুটলে হেমলতার মনে হয় নিজের শরীরে আঘাত লেগেছে। কী জন্য এতো টান পদ্মজার প্রতি? ভেতরে ভেতরে হেমলতা এই প্রশ্নের উত্তর জানেন। শুধু প্রকাশ পায় না। না জানার ভান ধরে থাকেন।

' আম্মা? আজ আমি রাঁধি?'

পদ্মজার প্রতিদিনের প্রশ্ন! হেমলতা রাঁধতে দিবেন না জানা সত্ত্বেও পদ্মজা প্রতিদিন অনুরোধ করে। হেমলতা বিপদ-আপদ ছাড়া পদ্মজাকে রান্নাঘরে পাঠান না। সোনার শরীরে মাটির চুলার কালি লাগাতে হেমলতার মায়া লাগে। তিনি হাসেন। পদ্মজা মুগ্ধ হয়ে দেখে। হেমলতার বয়স ছয়ত্রিশ। শ্যামলা চেহারা। দাঁতগুলো ধবধবে সাদা। চোখের মণি অন্যদের তুলনার বড় আর গাঢ় কালো। চোখ দুটিকে গভীর পুকুর মনে হয়। ছিমছাম গড়ন। পূর্ণা যেনো মায়েরই কিশোরী শরীর। তবে তারা তিন বোনই মায়ের মতো চিকন আর লম্বা।

'আচ্ছা,আজ তুই রাঁধবি।'

পদ্মজা ভাবেনি অনুমতি পাবে। আদুরে উল্লাসে প্রশ্ন করে, 'সত্যি আম্মা?'

'যা, জলদি। আছরের আজান কবে পড়েছে!'

পদ্মজা রান্নার প্রস্তুতি নিতে থাকে। পূর্ণা আর প্রেমা হিজল গাছের নিচে পাটি বিছিয়ে লুডু খেলছে। প্রেমা বাটপারি করে। এ নিয়ে কিছুকক্ষণ পর পর তাদের মাঝে তর্ক হচ্ছে। সকালে বৃষ্টি হয়েছে। রান্না করতে গিয়ে পদ্মজা ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ পেল। কী সুন্দর অনুভূতি!

মোর্শেদ পদ্মজাকে রাঁধতে দেখে কপাল কুঁচকে ফেললেন।

ঘরে ঢুকে হেমলতাকে মেজাজ দেখিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'এই ছেড়ি রাঁন্ধে ক্যান? '

হেমলতা নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন, 'আমি বলেছি।'

'কতদিন কইছি এই ছেড়ির হাতের রাঁন্ধন আমারে না খাওয়াইতে?'

মোর্শেদের কঠিন স্বর পদ্মজার কানে আসে। মুহূর্তে খুশিটুকু ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়। সে জানে এখন ঝগড়া শুরু হবে। তার আম্মা, আব্বার অনুচিত কথাবার্তা মাটিতে পড়তে দেন না। তার আগেই জবাব ছুঁড়ে দেন।

'খেতে ইচ্ছে না হলে খাবা না। '

'রাইতবেলা না খাইয়া থাকবাম আমি?'

'খাবার রেখেও যদি না খেতে চাও সেটা তোমার সমস্যা। আমি বা আমার মেয়ে কেউই না করিনি। '

মোর্শেদ কিছু নোংরা কথা শোনাতে প্রস্তুত হোন। হেমলতা সেলাই মেশিন রেখে উঠে দাঁড়ান। তিনি যেন বুঝে গিয়েছেন মোর্শেদ কী বলবেন। আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে মোর্শেদকে বললেন, 'একটা নোংরা কথা উচ্চারণ করলে আমি

আজ তোমাকে ছাড় দেব না। পদ্ম তোমার মেয়ে। আল্লাহ সইবে না। নিজের মেয়ে সম্পর্কে এতো নোংরা কথা কোনো বাবা বলে না।'

মোর্শেদ নোংরা কথাগুলো হজম করে নিলেন। তবে কিড়মিড় করে বললেন, 'পদ্ম আমার ছেড়ি না।'

'পদ্ম তোমার মেয়ে। আর,একটা কথাও না। বাড়িতে অনেক মানুষ। নিজের বিকৃত রূপ লুকিয়ে রাখ।'

মোর্শেদ দমে যান। চৌকিতে বসে বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। চোখের দৃষ্টি অস্থির। পদ্মজার জন্মের পর থেকেই হেমলতার রূপ পাল্টে গেছে। কিছুতেই এই নারীর সাথে পারা যায় না। অথচ, একসময় কত মেরেছেন হেমলতাকে। হেমলতার পিঠে,উরুতে, ঘাড়ে এখনো মারের দাগ আছে। সময় কোন যাদুবলে হেমলতাকে পাল্টে দিল, জানা নেই মোর্শেদের।

\-------------

রাতের একটা শুট করে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছিল। চিত্রা তখন কথায় কথায় জানাল, 'লাহাড়ি ঘরে গিয়েছিলাম। মগা যে মেয়েটার কথা বলেছিল তাকে দেখতে। '

চিত্রার কথায় লিখন আগ্রহ পেলো না। চিত্রা কখনো কোনো মেয়ের প্রশংসা করে না। খুঁত খোঁজে বের করতে ভালো জানে। নিজেকে খুঁতহীন সেরা সুন্দরী মনে করে।

'মেয়েটার নাম পদ্মজা।মগা, পুরো নাম জানি কী?'

চিত্রা মগার সাথে কথা বললে, মগা খুব লজ্জা পায়। এখনো পেল। লাজুক ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'উম্মে পদ্মজা।'

'ওহ হ্যাঁ। উম্মে পদ্মজা।'

চিত্রার পাশ থেকে সেলিনা পারভীন প্রশ্ন করলেন,'কী নিয়ে আলাপ হচ্ছে?'

সেলিনা পারভীন চলমান চলচ্চিত্রে চিত্রার মায়ের অভিনয় করছেন। চিত্রা বলল, 'এই বাড়ির মালিক যিনি উনার বড় মেয়ের কথা বলছি। এমন সুন্দর মুখ আমি দু'টি দেখিনি। মেয়েটার মুখ দেখলেই বুকের ভেতর নিকষিত, বিশুদ্ধ ভালো লাগার জন্ম হবে। এতো শ্রী ভগবান দিয়েছেন মেয়েটাকে।'

লিখন সহ উপস্থিত সবাই অবাক হলো। চিত্রার মুখে কোনো মেয়ের প্রশংসা! অবিশ্বাস্য! সবাইকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে চিত্রা বিব্রতবোধ করল। গলার জোর বাড়িয়ে বলল, 'সত্যি বলছি! সন্ন্যাসী ছাড়া কোনো পুরুষ এই মেয়েকে উপেক্ষা করতে পারবে না।'

পদ্মজাকে নিয়ে বেশখানিকক্ষণ আলোচনা চলল। আগ্রহ বেশি লিখনের ছিল। যখন শুনলো পদ্মজার ষোল বছর সে দমে গেল। ছোট মেয়ে! হয়তো এমন বয়সী বেশিরভাগ মেয়েরা স্বামীর ঘরে থাকে। তবুও লিখনের পদ্মজাকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। তার একটা বোন আছে, ষোল বছরের। এখনো দুই বেণি করে স্কুলে যায়। কত ছোট দেখতে! লিখন আনমনে হেসে উঠল।

হিজল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা। রাতের জোনাকি পোকা চারিদিকে। পদ্মজা প্রায় রাতে মুগ্ধ হয়ে দেখে জোনাকি পোকাদের। মনে হয় দল বেঁধে হারিকেন নিয়ে নাচছে তারা। তবে, এই মুহূর্তে রাতের এই সৌন্দর্য পদ্মজার মনে ঢুকতে পারছে না। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে। চোখ দু'টো জ্বলছে খুব। মোর্শেদ রান্না খারাপ হওয়ার অজুহাতে থালা ভর্তি ভাত,তরকারি ছুঁড়ে ফেলেছে পদ্মজার মুখে। চোখে ঝোল পড়েছে। তা নিয়ে হেমলতার সেকী রাগ! মোর্শেদ অবশ্য চুপ ছিলেন। তিনি তো রাগ মিটিয়েই ফেলেছেন। আর তর্ক করে কী হবে?

'পদ্ম?'

পদ্মজা তাকাল। হেমলতা ভেজা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'খুব জ্বলছেরে মা?'

পদ্মজা জবাব দিতে পারল না। ঠোঁট ভেঙে কেঁদে উঠল। মা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই তার। মায়ের আদর ছাড়া কারো আদর পাওয়া হয়নি। সবাই তার দোষ খোঁজে। হেমলতার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরোল। পদ্মজা ছিঁচকাঁদুনে। ছোট থেকেই কাঁদছে। তবুও জল ফুরোয় না। মন শক্ত হয় না। এমন হলে তো চলবে না! পদ্মজার কান্নার বেগ বাড়ল। হেমলতা সদ্য কাটা বড় গাছের বাকী অংশে বসলেন। চুপ করে পদ্মজার ফোঁপানো শুনছেন। পদ্মজা শান্ত হয়ে মায়ের পাশে বসল। তার মাথা নত। হেমলতা উদাস গলায় বললেন,'এভাবে চলবে না পদ্ম।

পদ্মজা তাকাল। হেমলতা বললেন,'শোন পদ্ম, কেউ আঘাত করলে কাঁদতে নেই। কারণ মানুষ আঘাত করে কাঁদানোর জন্যই। আর যখন উদ্দেশ্য সফল হয় তখন তারা শান্তি পায়। যে আঘাত করল তাকে কেন শান্তি দিবি? শক্ত থাকবি। বুঝিয়ে দিবি তুই এতো দূর্বল নয়। যারে তারে পাত্তা দিস না। হাজার কষ্টেও কাঁদবি না। কান্না সাময়িক সময়ের জন্য মন হালকা করে। পুরোপুরি নয়। যে তোকে আঘাত করবে তাকে তুই তোর চাল-চলন দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিবি। তখন তার মুখটা দেখে তোর যে শান্তিটা হবে সেটা কান্না করার পর হবে না। এই শান্তি স্থায়ী!'

হেমলতার কথা পদ্মজার উপর প্রভাব ফেলল না। সে করুণ স্বরে বলল, 'কিন্তু আব্বার ব্যবহার আমার সহ্য হয় না আম্মা। আমার সাথে কেন এমন করে আব্বা?'

'তাকে কখনো সামনাসামনি আব্বা ডাকার সুযোগ পেয়েছিস? পাসনি! তবুও কেন আব্বা, আব্বা করিস?

তাকে তুই পাত্তা দিবি না।'

'তুমি খুব কঠিন আম্মা।'

'তোকেও হতে হবে।'

'আব্বা কেন এমন করে আম্মা? আমিকি আব্বার মেয়ে না? আব্বা কেন বার বার বলেন, আমি তার মেয়ে না।'

হেমলতা চোখ সরিয়ে নেন। পদ্মজা জানে এই জবাব সে পাবে না। দাঁতে দাঁত চেপে কান্না আটকানোর চেষ্টা করে। হেমলতা এক হাত পদ্মজার মাথায় রাখেন।

'কাঁদিস না আর। মায়ের রং না হয় পাসনি। মায়ের মতো শক্ত হওয়ার তো চেষ্টা করতেই পারিস।'

পদ্মজা নির্লজ্জ হয়ে আবার প্রশ্ন করল, 'আম্মা, আমি কি আব্বার মেয়ে না? বলো না আম্মা।'

পদ্মজার চোখ বেয়ে জল পড়ছে। খুব মায়া লাগছে হেমলতার। বুক ভারী হয়ে আসছে। তিনি আবেগ লুকিয়ে কণ্ঠ কঠিন করার চেষ্টা করলেন, 'মার খাবি পদ্ম। কতবার বলব, তুই আমার আর তোর আব্বার মেয়ে। '

'কি নাম আমার আব্বার?'

কী শান্ত কণ্ঠ পদ্মজার! হেমলতা চমকান তবে প্রকাশ করলেন না। মেয়েদের সামনে তিনি কখনো দূর্বল হতে চান ন। পদ্মজার দিকে ঝুঁকে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললেন, 'তোর আব্বার নাম মোর্শেদ মোড়ল।'

পদ্মজা হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। মাকে খুব বিরক্ত লাগছে এখন। খুব কঠিন করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, ' যাও এখান থেকে। আমার কাছে আর আসবা না। কখনো না। '

কিন্তু সে এমন ব্যবহার বাস্তবে কখনো পারবে না। কখনো না। রাতের বাতাসে ভেসে আসছে হাসনাহেনা ফুলের ঘ্রাণ। আকাশে থালার মতো চাঁদ। ঝিরিঝিরি মোলায়েম বাতাস চারিদিকে। পদ্মজার চোখের জল শুকিয়ে গেল। হেমলতা ঝিম মেরে বসে আছেন। একসময় নিস্তব্ধতা কাটিয়ে একটা অসহায় কণ্ঠ ভেসে আসল।

'মায়েরা তাদের জীবনের গোপন গল্প সন্তানদের বলতে পারে নারে পদ্ম।'

পদ্মজা তাকাল। হেমলতা ছলছল চোখে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজার কান্না পেল। মানুষটাকে এতো নরম রূপে মানায় না। পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল, 'আমি আর কখনো জানতে চাইব না আম্মা।'

শুটিং দলের একজনও বাড়িতে নেই। সবাই স্কুলে মাঠে গিয়েছে। কয়দিন ধরে নদীর ঘাটে যেতে না পেরে তৃষ্ণার্থ হয়ে উঠেছে পদ্মজা। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। হেমলতার অনুমতি নিয়ে সে ঘাটে চলে আসল। ঘাটের সিঁড়িতে বসল। কয়েক সেকেন্ড পর টের পেল, গান বাজছে কোথাও। গানের সুর অনুসরণ করে কয়টা সিঁড়ি নেমে আসে। ঘাটের বাম পাশে বাঁধা নৌকায় একজন পুরুষ বসে আছে। হাতে রেডিও। গানের উৎস তাহলে এখানেই। পদ্মজা বিব্রতবোধ করল। উল্টো দিকে ঘুরে ব্যস্ত পায়ে লাহাড়ি ঘরে চলে আসে। পদ্মজা এতো দ্রুত ফিরাতে হেমলতা প্রশ্ন করেন, 'কেউ ছিল?'

পদ্মজা মাথা নাড়াল। হেমলতা চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'কিছু বলেছে? দেখতে কেমন?'

' না আম্মা, কিছু বলেনি। আমাকে দেখেনি। মাথার চুল ঝাঁকড়া। মুখ খেয়াল করিনি।'

'এইটাই তো লিখন শাহ। নায়ক।'

পূর্ণা পুলকিত হয়ে বলল। হেমলতা আর কিছু বললেন না।

পূর্ণা সারাক্ষণ শুটিং দলটার আশেপাশে ঘুরঘুর করে। হেমলতা বিরক্ত হয়ে পূর্ণাকে কড়া নিষেধ দিয়েছেন, আর না যেতে। যদি যায় মার একটাও মাটিতে পড়বে না। পূর্ণা ভয় পেয়েছে। কিন্তু লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী জুটিটা এতো ভাল লাগে তার যে শুটিং না দেখলে দম বন্ধ লাগে। তাই সে চুপিসারে টিনে একটা ছিদ্র করেছে। হেমলতা সেলাই মেশিন লাহাড়ি ঘরের পিছন বারান্দায় রেখেছেন। সারাক্ষণ সেখানেই থাকেন। সে সেময় পূর্ণা ছিদ্র দিয়ে উঁকি দেয়। শুটিং দেখে। পূর্ণাকে সবসময় দেখতে দেখে পদ্মজার আগ্রহ জাগল। সে উঁকি দিল।

ঝাকড়া চুলের মানুষটা একজন অতি সুন্দরী মেয়েকে কোলে তুলে নিয়েছে। দৃষ্টি মোহময়। প্রেমময় গানের সুরধ্বনি বাড়ি জুড়ে। ক্যামেরা ধরে রেখেছেন কেউ কেউ। গানের শুটিং বোধহয়! পদ্মজা অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করল। লজ্জা পেল। চোখ সরিয়ে নিল।

#পদ্মজা

চলবে....

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পাট - ৬

রাতে ঝড় এসেছিল। লাহাড়ি ঘরের পিছনে তৈরি পথ বন্ধ হয়ে গেছে গাছের ভাঙা ডালপালা দিয়ে। মোর্শেদ রাতে বাড়ি ফেরেননি। হেমলতার একার পক্ষে সম্ভব নয় পথ খালি করার। তাই পদ্মজা, পূর্ণা স্কুল থেকে বাড়ির সামনে দিয়ে ফিরছিল। উঠোনে শুটিং দলের সবাই ছিল। পদ্মজা মাথা নত হয়ে থেমে থেমে কাঁপতে থাকে। পথ শেষই হচ্ছে না। মাথায় ঘোমটা টানা। অনেকের নজরে পদ্মজা চলে আসল। মিলন নামে একজন পূর্ণাকে ডাকল, 'এই পূর্ণা?'

পূর্ণা দাঁড়াল, সাথে পদ্মজা। পদ্মজা শুটিং দলটার দিকে তাকাচ্ছে না। মিলন পদ্মজার দিকে চোখ স্থির রেখে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল, 'পাশের মেয়েটা কে? প্রথম দেখছি।'

'আমার বড় আপা।'

'আপন?'

মিলন ভারী আশ্চর্য হয়ে বলল। দশ দিন হলো এখানে আসার। কখনো পূর্ণা,প্রেমা ছাড়া কোনো মেয়েকে চোখে পড়ল না। কণ্ঠও শোনা যায়নি। তাই বড় বোন বলাতে সে খুব অবাক হলো। পূর্ণা হেসে বলল, 'হুম। আপন।'

মিলন বিড়বিড় করে বলল, 'চেহারার তো মিল নেই।'

'সবাই বলে।'

'আচ্ছা,যাও।'

দু'বোন লাহাড়ি ঘরে চলে আসল। পদ্মজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভেতরটা এতো কাঁপছিল। অনেক মানুষের পা দেখেছে, চোখ তুলে মানুষগুলোর মুখ দেখার সাহস হয়নি। তবে, ইচ্ছে হয়েছিল চোখ তুলে তাকাতে!

বিকেলে হাজেরা আসল। সবুর মিয়ার স্ত্রী। সবুর দিনরাত গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকে। বউ - বাচ্চাদের খোঁজ রাখে না। হাজেরা এর বাড়ি ওর বাড়ি এটা-ওটা চেয়ে নেয়। এরপর দুই বাচ্চা নিয়ে খায়। পদ্মজার খুব মায়া হয় হাজেরার প্রতি। হাজেরা আসতেই হেমলতা পদ্মজার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'লাউ গাছে কয়টা লাউ দেখেছিস?'

'নয়টা আম্মা।'

'পূর্ণা কই? ওরে বল দুইটা লাউ হাজেরাকে দিয়ে দিতে। কাঁচামরিচও দিতে বলবি।'

পদ্মজার মুখে কালো আঁধার নেমে আসে। হেমলতা পদ্মজার মুখ দেখে বুঝতে পারেন, পূর্ণা বাড়িতে নেই।

'টিভি দেখতে গেছে তাই না?'

পদ্মজাকে দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা গেল। বিব্রতভাবে বলল,

'আম্মা, আমাকে ব..বলে গেছে।'

'তুই ওর অভিভাবক? একটু শরীরটা খারাপ লাগছে বলে শুয়েছি। ওমনি সুযোগ লুটে নিছে! '

'আম্মা, আমার দোষ। পূর্ণারে কিছু বলো না।'

পদ্মজার ভেজা কণ্ঠ হেমলতার রাগ উড়িয়ে দিল। তিনি অন্য দিকে মুখ করে শুয়ে বললেন, 'হাজেরারে নিয়ে যা। ঘোমটা টেনে যাবি। বেগুন বেশি হলে, কয়টা দিয়ে দিস।'

পদ্মজার মন ভরে গেল। তার মা এতো বেশি উদার! কখনো কাউকে ফিরিয়ে দেন না। সামর্থ্যের মধ্যে আরো বেশি কিছু দেওয়ার মতো থাকলে, তিনি কার্পণ্য করেন না। তবে, হাজেরার স্বভাব অভাবে নষ্ট হয়েছে। চুরি করার প্রবণতা আছে। তাই পদ্মজাকে যেতে বললেন।

উঠোনের এক কোণে এবং লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে লাউয়ের মাচা। নয়টা লাউ ঝুলে রয়েছে। তরতাজা টাটকা সবুজ পাতা নজর কাড়ে। পদ্মজা বাড়ির দিকে তাকাল না। একটা লাউ হাজেরার হাতে দিয়ে বলল,'কি দিয়ে রাঁধবা?'

'জানি না গো পদ্ম। গিয়া দেহি মাছ মিলানি যায়নি।'

'তোমার ছেলেটার ঠান্ডা কমছে?'

পদ্মজা কাঁচামরিচ ছিঁড়ে হাজেরার আঁচল ভরে দিল। হাজেরা গুনগুন করে কাঁদছে আর বলছে, 'ছেড়াডা সারাদিন মাডিত পইড়া থাহে একলা একলা। রাইত হইলে জ্বরে কাঁপে। দম ফালায়তে পারে না।'

'ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?'

'টেহা লাগব না? কই পামু?'

'তুমি,মাতব্বর বাড়িতে যেও। শুনছি, উনারা খুব দান-খয়রাত করেন।'

হাজেরা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। বেগুন গাছ বাড়ির পিছনে। পদ্মজা বাড়ির পিছনে সাবধানে আসল। মনে মনে ভাবছে, হাজেরার ছেলে সুস্থই আছে। সকালে সে দেখেছে। হাজেরা মিথ্যা বলছে। মানুষের খুব অভাব পড়লে বুঝি এমনই হয়?

'এতো সবজি আছে। টমেটো নেই? পাওয়া যাবে?'

পরিষ্কার সহজ গলায় বলা পুরুষালী কণ্ঠটি পদ্মজাকে মৃদু কাঁপিয়ে তুলল। ঘুরে তাকাল। লিখনকে দেখে বিব্রত বোধ করল। কারো সামনে নিজের অস্বস্তি প্রকাশ করা উচিত না। কথাটি হেমলতা বলেছেন। পদ্মজা হাসার চেষ্টা করল। জবাব দিল, 'এই বর্ষাকালে টমেটো কোথায় পাবেন?'

'বর্ষাকালে টমেটো চাষ হয় না?'

'টমেটো শীতকালীন ফসল।'

'গ্রীষ্ম,বর্ষাতেও তো পাওয়া যায়।'

পদ্মজা অস্বস্তি লুকিয়ে রাখতে পারছে না। স্কুলের শিক্ষক আর খুব আপন মানুষগুলো ছাড়া কোনো পর-পুরুষের সাথে তার কখনো কথা হয়নি। লিখনের সাথে কথা বলতে গিয়ে তার জবান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে চুপচাপ বেগুন বুঝিয়ে দিল হাজেরাকে। লিখন বলল,

'আমি তো গতবার বর্ষাকালে টমেটোর সালাদ তৈরি করেছি।'

'হয়তো টমেটোর জাত আলাদা ছিল। সাধারণত আমাদের শীতকালেই টমেটো হয়।'

কথা শেষ করে দ্রুত লাহাড়ি ঘরে ফিরল সে। মনে হচ্ছে পর-পুরুষের সাথে কথা বলে ঘোর পাপ হয়ে গেছে।পাপ মোচন করতে হবে। ঘরে ঢুকে ঢকঢক করে দুই গ্লাস পানি খেল। হেমলতা ঘুমাচ্ছেন। নয়তো পদ্মজার মুখ দেখে নির্ঘাত বুঝে যেতেন, কিছু একটা ঘটেছে। পদ্মজা ভক্তি নিয়ে আল্লাহ তায়া'লার প্রতি শুকরিয়া আদায় করল।

হেমলতা সালোয়ার-কামিজ সেলাই করছিলেন। তখন বারান্দার সামনে একজন পুরুষ লোক এসে দাঁড়াল।

হেমলতা শাড়ির আঁচল মাথায় টেনে নেন। জিজ্ঞাসুকদৃষ্টি নিয়ে তাকান। লোকটি হেসে বলল, 'আমি মিলন। শুটিং দলের। '

হেমলতা জোরপূর্বক হাসেন। আড়চোখে ঘরের দরজার দিকে তাকান। পদ্মজা ঘুমাচ্ছে।দরজাটা লাগানো উচিত।

'কোনো দরকার?'

'না,এমনি। দেখতে আসলাম। কতদিন হলো আপনাদের বাড়িতে উঠলাম। আর, এদিকটায়ই আসা হয়নি।'

হেমলতা প্যাঁচিয়ে কথা বলা পছন্দ করেন না। সরাসরি বলে উঠলেন, 'এদিকে আসা নিষেধ। আপনাদের বলা হয়নি?'

মিলনের চোখেমুখে ছায়া নেমে আসে। সে অপমান বোধ করল। আমতা আমতা করে বলল, ' ইয়ে...আচ্ছা, আসছি।'

মিলন স্থান ত্যাগ করল। যাওয়ার পূর্বের তার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি হেমলতার নজর এড়াতে পারল না। হেমলতা চোখ বুজে জীবনের হিসেব কষেন। এরপর ঘুমন্ত পদ্মজার দিকে তাকান।

পূর্ণার চেয়ে পদ্মজার বেশি আগ্রহ শুটিং দেখায়। টিনের ছিদ্র আরো দু'টো করেছে। লিখন শাহকে দেখলে তাঁর মায়াময়, কোমল অনুভূতি হয়। এই অনুভূতির নাম সে জানে না। শুটিংয়ে লিখন শাহ কত ভালোবাসেন চিত্রা দেবীকে। পদ্মজার দেখতে খুব ভাল লাগে। পূর্ণা তেলের বোতল নিয়ে বলল, 'আপা, তেল দিয়ে দাও না।'

'সোনা বোন, একটু দাঁড়া।'

পদ্মজা ছিদ্র দিয়ে লিখন শাহর হাসি, কথা বলার ভঙ্গী দেখছে। লজ্জাও পাচ্ছে খুব। সময়টাকে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

'এই,আপা। পরেও তো দেখতে পারবা। দিয়ে দাও না।'

'আরেকটু। শুটিং শুরু হচ্ছে। একটু..."

পূর্ণার বিরক্তিতে রাগ হয় খুব। কিন্তু সে তার আপাকে কিছু বলবে না। তার সব ইচ্ছের সঙ্গী, সব গোপন কথার স্বাক্ষী তার আপা। সে তার আপাকে খুব ভালোবাসে। মাঝে মাঝে মনে হয়, মায়ের চেয়েও বেশি বোধহয় সে তার আপাকেই ভালোবাসে। বা হয়তো না। পদ্মজা মিটিমিটি হাসছে। পূর্ণা তেল রেখে ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিল। নাহ! তাঁর এখন ভাল লাগছে না এসব দেখতে। চোখ সরিয়ে নিল।

'কিরে পদ্ম? কী দেখছিস?'

হেমলতার কণ্ঠ শুনে পদ্মজা চমকে উঠল। আরক্ত হয়ে উঠল। ডাকাতি করতে গিয়ে বাড়ির মালিকের কাছে ধরা পড়লে যেমন অনুভূতি হয় তেমন অনুভূতি হচ্ছে পদ্মজার। বা আরো ভয়ংকর অনুভূতি। হেমলতার দৃষ্টি টিনের ছিদ্রে গেল। সাথে সাথে পদ্মজা অনুভব করল, তাঁর পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। পূর্ণা ভয়ার্ত চোখে একবার মাকে একবার বোনকে দেখছে। ছিদ্রের গুরু তো সে!

চলবে...

Next পার্টের লিংক কমেন্ট বক্সে

® ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট- ৭

হেমলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দুই মেয়েকে দেখেন। তিনটা ছিদ্র দেখেন। এরপর দৃষ্টি শীতল করে বললেন, 'শুটিং দেখছিলি?'

পদ্মজা বাধ্যের মতো মাথা ঝাঁকাল। হেমলতার রাগ হলো না। তিনি চৌকিতে বসে প্রশ্ন ছুঁড়লেন,'ছিদ্রের বুদ্ধি পূর্ণার?'

প্রশ্নটা শুনে পূর্ণার গলা শুকিয়ে আসল। এক ফোঁটা পানি দরকার। নয়তো দম বেরিয়ে যাবে। পদ্মজা চকিতে চোখ তুলে তাকাল। অসহায় কণ্ঠে বলল, 'আম্মা, আর হবে না। পূর্ণাকে কিছু বলো না। ওর দোষ নাই,আমি... "

হেমলতা পদ্মজাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। প্রেমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রেমা, তোর আব্বা কই?'

'উঠানে।'

'গিয়ে বল,আমি ডাকছি।'

প্রেমা ছুটে গেল। আবার ছুটে আসল। হেমলতা বারান্দা পার হয়ে চুলার দিকে এগোলেন। তখন মোর্শের আসলেন।

'কি হইছে? ডাক কেরে?'

'লাহাড়ি ঘরে একটা জানালা করে দাও। মেয়েদের চৌকির পাশে। কাঠ আছে মুরগির খোপের কাছে। '

'কী জন্যে?'

'আমি চাইছি, তাই। না পারলে বল। অন্য কাউকে ডাকব।'

'ত্যাড়া কথা কওন ছাড়।'

'আমার তোমার সাথে ভালো করে কথা বলতে ভালো লাগে না।'

'লাগব কেরে? তোমার তো আমারে পছন্দ না। তোমার পছন্দ বিলাই চোখা ব্যাঠা ছেড়ারে।'

'অহেতুক কথা বল না। মাসের পর মাস কোথায় থাকো তা আমার অজানা নয়। রোগে ধরলেই লতার কথা মনে পড়ে।'

মোর্শেদ মিনিট খানেক রাগ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

মোর্শেদ ঘন্টাখানেক সময় নিয়ে দুই ফুট উচ্চতার জানালা করলেন। পদ্মজা, পূর্ণা হতবাক। সেই সাথে খুশি। হেমলতা ছোট পর্দা টানিয়ে দেন। রুম থেকে বাহির দেখা যায়। কিন্তু জানালার ওপাশে কে আছে বাহির থেকে দেখা যায় না।

সন্ধ্যা মুহূর্তের শুটিং শুরু হয়। পদ্মজা,পূর্ণা, প্রেমা চৌকিতে বসল চিড়া নিয়ে। তাদের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। হেমলতা তা দেখে মৃদু হাসলেন। বড় মেয়ে দুটো কখনো মুখ ফুটে শখ আহ্লাদের কথা বলে না। না বলা সত্ত্বেও অনেকবার দুই বোনের ইচ্ছে পূরণ করেছেন তিনি। আর কিছু ইচ্ছে বুঝতে পারলেও পূরণের সামর্থ্য হয়নি হেমলতার।

হেমলতা ঘরের বাইরে যেতেই পূর্ণা বলল, 'আমাদের মায়ের মতো সেরা মা আর কেউ না। তাই না আপা?'

'মায়ের মতো কেউ হয় না। সবার কাছে সবার মা সেরা। আমাদের মা আমাদের কাছে সেরা। লাবণ্যর মা লাবণ্য আর ওর ভাইদের কাছে সেরা। মনির মা মনির কাছে সেরা।'

'ওরা বলছে?'

'বোকা! এসব বলতে হয় না।'

'না, আমাদের আম্মাই সবচেয়ে ভালো মা। এমন মা আর একটাও নেই।'

হেমলতার কানে প্রতিটি কথা আসে। পূর্ণা সবার অনুভূতি অনুভব করতে জানে না। পদ্মজা জানে।

'আমাদের আম্মা সত্যি সেরা। আলাদা। 'পদ্মজা হেসে বলল।

পূর্ণা জানালার বাইরে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'আপা, চিত্রা দিদিরে কেমন লাগে?'

পদ্মজা চিত্রার দিকে তাকাল। ছাইরঙা শাড়ি পরা। হাতে কালো রঙের ঘড়ি। ফুলহাতা ব্লাউজ। শালীন তবে সর্বাঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া। নাকে সাদা পাথরের নাকফুল। লম্বা চুল বেণি করে রেখেছে। মুখে খুব মায়া।স্নিগ্ধ একটা মুখ। যেন শরৎ-এর শুভ্র এক টুকরো মেঘ। পদ্মজা বলল, 'আমার দেখা দ্বিতীয় সুন্দর মেয়েমানুষ চিত্রা দিদি।'

পূর্ণা আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'প্রথম কে?'

পদ্মজা কণ্ঠ খাদে নামিয়ে মোহময় কণ্ঠে বলল, 'আমাদের আম্মা।'

হেমলতার বুক শীতল, স্নিগ্ধ, কোমল অনুভূতিতে ছেয়ে গেল। পদ্মজা এতো সুন্দর করে 'আমাদের আম্মা' বলেছে! হেমলতা প্রথম...এই প্রথম শুনলেন, তিনি সুন্দর! ভুবন মোহিনী রূপসীর মুখে শুনলেন। এই আনন্দ কোথায় রাখবেন তিনি। কেন ছেলেমানুষী অনুভূতিতে তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি! প্রেমা অবাক স্বরে বলল, ' আম্মা তো কালো। চিত্রা দিদির চেয়ে সুন্দর কীভাবে?'

'এভাবে বলছিস কেন প্রেমা? তুই ফর্সা হয়ে গেছিস বলে কালোকে ভালো মনে হয় না?'

পূর্ণা গমগম করে উঠল। প্রেমা ভয় পেল। পদ্মজা বলল, 'পূর্ণা, বকছিস কেন? প্রেমা কত ছোট। ও কী সুন্দরের গভীরতা বুঝে? ও খালি চোখে ফর্সা, কালোর তফাৎ দেখে।'

'সুন্দরের গভীরতা তো আমিও বুঝি না।'

পূর্ণার কণ্ঠ ভারী নিষ্পাপ শোনাল। পদ্মজা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল হেমলতার উপস্থিতি। এরপর বলল, 'আম্মার রং কালো। কিন্তু সৌন্দর্যের কমতি নেই। আম্মাকে কখনো এক মনে দেখিস,বুঝবি। আমাদের আম্মার চোখ দুটি গভীর,বড়,বড়। পাতলা,মসৃণ ঠোঁট। আম্মার ঘন চুলের খোঁপায় এক আকাশ কালো মেঘ। আম্মার শাড়ির

কুচির ভাজে আভিজাত্য লুকোনো। আম্মা যখন তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকান, তখন মনে হয়, বিরাট বড় রাজত্বের রানী তাঁর পূর্বপুরুষের ক্ষমতা প্রকাশ করছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। এতকিছু থাকা সত্ত্বেও ও কী আম্মা আমাদের দেখা প্রথম সুন্দর মানুষ হতে পারেন না?'

পদ্মজার প্রতিটি কথা পূর্ণার উপর ভীষণ ভাবে প্রভাব ফেলল। প্রেমা চোখ পিটপিট করে কিছু ভাবছে। পূর্ণা বলল, 'হতে পারে। কাল থেকে আমি আম্মাকে দেখব মন দিয়ে। '

'আমিও।' প্রেমা পূর্ণার দলে ঢুকল।

হেমলতার চোখ বেয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। এই কালো রঙের জন্য ছোট থেকে সমাজে তুচ্ছতাচ্ছিল্য হয়ে এসেছেন। কত লুকিয়ে কাঁদা হয়েছে। কত করে চাওয়া হয়েছে, কেউ সুন্দর বলুক। কিন্তু সেই কপাল কখনো হয়নি। আর আজ, এই বয়সে এসে শুনলেন, তিনি কুৎসিত নন। তার মাঝেও সৌন্দর্য আছে। জন্মদাত্রী মা কালো রঙের জন্য গরম চামচ দিয়ে পোড়া দাগ করেছিলেন ঘাড়ে। আর গর্ভের সন্তান আজ সেই অনুচিত কাজের জবাব দিল। আল্লাহর সৃষ্টি কেউ অসুন্দর নয়। সবার মধ্যেই সৌন্দর্য আছে। যা ধরা পড়ে শুধুমাত্র সুন্দর একজোড়া চোখে।

নিশুতি রাত। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। হেমলতা চোখ খুলেন। হুট করে ঘুমটা ভেঙে গেল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ইঙ্গিত করছে কোনো ষড়যন্ত্রের। লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে দু'জোড়া পায়ের আওয়াজ। হেমলতার বুক কেঁপে উঠল। তিনি দ্রুত উঠে বসেন। দুই চৌকির মাঝের পর্দা সরিয়ে দেখেন পদ্মজার অবস্থান। পদ্মজাকে ঘুমাতে দেখে আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস ছাড়েন। পায়ের আওয়াজ একদম পাশে শোনা যাচ্ছে। হেমলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ডান পাশে তাকান। গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবুও তিনি তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে, অদৃশ্য গোপন শত্রুকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

'কে ওখানে?'

হেমলতার ঝাঁঝালো কণ্ঠে পায়ের আওয়াজ থেমে গেল। সেকেন্ড কয়েক পর দুই'জোড়া পা যেন ছুটে পালাল।

#পদ্মজা

চলবে....

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট- ৮

আলো ফোটার পূর্বে নিদ্রা ত্যাগ করে চার মা-মেয়ে একসাথে নামায পড়ল। এরপর বারান্দায় শীতল পাটি বিছিয়ে তিন বোন পড়তে বসল। রাতভর ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়েছে। বর্ষা স্নানে স্নিগ্ধ প্রকৃতি। মায়াবী সকাল। এমন সকালে কেউ ঘুমাতে চায়। আর কেউ বা বই পড়তে পছন্দ করে। অথবা,পছন্দের অন্য যেকোনো কাজ করে। পূর্ণার ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। পড়া একদমই সহ্য হচ্ছে না। পড়া থেকে উঠেই সে মনোবাসনা পূর্ণ করতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। সাথে সাথে ঘুমে হারাল। পদ্মজা অনেক ডাকল, উঠল না। এদিকে স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। হেমলতা বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'পূর্ণা ঘুমে?'

'জ্বি,আম্মা।'

'সে জানে না স্কুল আছে। তবুও কোন আক্কেলে ঘুমাল।'

মায়ের কঠিন স্বরে পদ্মজা ভয় পেল। পূর্ণা নির্ঘাত মার খাবে আজ। সে হেমলতাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'তুমি যাও আম্মা। পূর্ণা কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।'

হেমলতা জানেন, পূর্ণা এতো সহজে ঘুম থেকে উঠবে না। অহরহ এমন হয়ে আসছে। যতই আদর করে ডাকা হোক না কেন, বৃষ্টিমাখা সকালে তার ঘুম ছুটানো যায় না। বাঁশের কঞ্চি পূর্ণা খুব ভয় পায়। কঞ্চির বারি না খাওয়া অবধি ঘুম পূর্ণাকে কিছুতেই ছাড়বে না। এ যেন ভূত ছাড়ানোর মতো। হেমলতা বাঁশের কঞ্চি আনতে যান। এদিকে পদ্মজা ডেকেই যাচ্ছে, 'পূর্ণা? উঠ। মারটা খাওয়ার আগে উঠ। এই পূর্ণা। পূর্ণারে...পূর্ণা উঠ। '

পূর্ণা পিটপিট করে চোখ খুলে আবার ঘুমিয়ে যাচ্ছে। প্রেমা এই ব্যাপারটা খুব উপভোগ করে। একটা মানুষ এতো ডাকাডাকিতেও কী করে না জেগে থাকতে পারে?

সে নিষকম্প স্থির চোখে তাকিয়ে আছে বড় দুই বোনের দিকে। হেমলতা হাতে বাঁশের কঞ্চি নিয়ে ঘরে ঢুকেন। তা দেখে পদ্মজা পূর্ণাকে জোরে চিমটি দিল। পূর্ণা মুখে বিরক্তিকর আওয়াজ তুলে আবার ঘুমে তলিয়ে গেল।

'তুই সর পদ্ম। ও মারের যোগ্য। পিটিয়ে ওর ঘুম ছুটাতে হবে।'

পদ্মজা মায়ের উপর কিছু বলার সাহস পেল না। দূরে গিয়ে দাঁড়াল। হেমলতা পূর্ণার পায়ের গোড়ালিতে বারি দেন। প্যাঁচ করে আওয়াজ হয়। পদ্মজা ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। পা ছিঁড়ে গেছে বোধহয়। ঘুমন্ত পূর্ণার মস্তিষ্ক জানান দেয়, আম্মা এসেছেন। এবং তিনি আঘাত করেছেন। সে চোখ খোলার আগে দ্রুত উঠে বসল। চোখ খুলতে খুলতে যদি দেরি হয়ে যায়! এরপর চোখ খুলল। বোকাসোকা মুখ করে মায়ের দিকে তাকাল পরিস্থিতি বুঝতে। পদ্মজা ঠোঁট টিপে হাসছে। প্রেমা জোরে হেসে উঠল। হেমলতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেই হাসি থামিয়ে দিল। পূর্ণা ভীতু কণ্ঠে বলল, 'আর হবে না আম্মা।'

'সে তো, প্রতিদিনই বলিস।'

এমন সময় ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। পূর্ণা, প্রেমা মনে মনে খুশি হলো। আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। বাড়ি থেকে দুই ক্রোশ দূরে স্কুল। আম্মা নিশ্চয় যেতে না করবেন। পূর্ণা খুশি লুকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আম্মা, মেঘ আসবে মনে হয়। যাবো স্কুলে?'

'মেঘ কী করল তোকে? যাবি স্কুলে।'

হেমলতা চলে যেতেই পূর্ণা ভ্রুকুঞ্চন করল। থম মেরে বসে রইল। পদ্মজা তাড়া দিল, 'বসে আছিস কেন? জলদি কর। নয়তো আবার পিটানি খাবি।'

পূর্ণা বিরক্তি নিয়ে তৈরি হলো। তিন বোন স্কুলের দিকে রওনা দিল। বর্ষাকাল চলছে। রাতে বিরতিহীনভাবে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় প্রচুর কাঁদা জমেছে। পথ চলা কষ্টকর।

তিন বোন হাতে জুতা নিয়ে পা টিপে হাঁটছে। পিছলে পড়ে বই খাতা নষ্ট করার ভয় কাজ করছে মনে। অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। পদ্মজা পথের পাশ থেকে বড় কচু পাতা ছিঁড়ে নিল তিনটা।

তিন বোন কচু পাতায় মাথা আড়াল করল। কিন্তু দেহ ও বই-খাতা আড়াল করা গেল না। ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণা বিরক্তি প্রকাশ করল, 'ধ্যাত! ভিজে স্কুলে গিয়ে লাভ কী আপা? দেখ,পায়জামা হাঁটু অবধি কাঁদায় আর বৃষ্টির পানি দিয়ে কী হয়েছে।'

পদ্মজা চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'বুঝতে পারছিনা কী করব! স্কুলে যাব? নাকি বাড়ি ফিরব।'

'আপা, বাড়ি যাই।'

বলল প্রেমা। পদ্মজা ভাবল। এরপর দু'বোনকে বলল, 'ভিজে তো কতবারই গেলাম। আজও যাই। সমস্যা কী?'

অগত্যা স্কুলেই যেতে হলো। স্কুল ছুটির আগেও বৃষ্টি পুরোপুরি থামেনি। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই বাড়ি ফেরার পথ ধরল দুই বোন।

প্রেমার এক ঘন্টা আগে ছুটি হয়েছে। পদ্মজা নীচু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'আব্বা আসছিল স্কুলে?'

'হ আসছিল। প্রেমারে নিয়ে গেছে।'

'তোর সাথেও তো দেখা করল।'

পদ্মজার গলাটা করুণ শোনাল। পূর্ণার মন খারাপ হয়। আব্বা কেন তার এতো ভাল আপাকে ভালোবাসেন না?

'পূর্ণা, পড়ে যাবি। সাবধানে হাঁট।'

পদ্মজা সাবধান বাণী দিতে দিতে পূর্ণা ধপাস করে কাঁদা মাটিতে পড়ল। পদ্মজা আঁতকে উঠল। পূর্ণার পা নিমিষে ব্যাথায় টনটন করে উঠে। পদ্মজা পূর্ণাকে তোলার চেষ্টা করে। পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরেও উঠতে পারছে না পূর্ণা। কাঁদো কাঁদো হয়ে পদ্মজাকে বলল, 'আপা, পা ভেঙে গেল মনে হয়। কী ব্যথা করছে।'

'মচকেছে বোধহয়। ঠিক হয়ে যাবে। উঠার চেষ্টা কর। আমার গলা ধরে চেষ্টা কর।'

গ্রামের পথ। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। পথে কেউ নেই। গৃহস্থরা ভাত ঘুম দিয়েছে। সামনে বিলে থইথই জল। তার পাশে ক্ষেত। ডানে-বামে কাঁদামাটির পথ। পিছনে ঝোপঝাড়। পদ্মজা সাহায্য করার মতো আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। পূর্ণা পা সোজা করার শক্তি পাচ্ছে না। পায়ে প্রচন্ড ব্যথা! ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে সে। পদ্মজা না পারছে পূর্ণাকে তুলতে আর না পারছে পূর্ণার কান্না সহ্য করতে। সে মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। পদ্মজার উৎসাহে পূর্ণা মনকে শক্ত করে পায়ের পাতা মাটিতে ফেলল। সাথে সাথে শরীরে ব্যথার বিজলি চমকাল।

'আপারে, পারছি না। আমার পা শেষ। মরে যাব আমি।'

'এসব বলিস না। পায়ের ব্যথায় কেউ মরে না।'

আহত পা ফুলে দুই ইঞ্চি উঁচু হয়ে গেছে। তা দেখে আতঙ্কে পদ্মজার চোখ মুখ নীল হয়ে গেল। তার কান্না পাচ্ছে খুব। পদ্মজা পূর্ণার পায়ে আলতো করে চাপ দিতেই পূর্ণা চেঁচিয়ে উঠল।

'একটু সাবধানে হাঁটলে কী হতো? ইশ, এখন কী কষ্টটা হচ্ছে।'

'আপা, পা ব্যথা খেয়ে নিচ্ছে।'

পদ্মজা খুব কাছে পায়ের শব্দ পেল। চকিতে চোখ তুলে ক্ষেতের দিকে তাকাল। মুহূর্তে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সে পূর্ণাকে বলল, 'পূর্ণারে, আম্মা আসছে।'

হেমলতাকে দেখে পূর্ণা কলিজায় পানি পেল। মনে হলো, মাকে দেখেই ব্যথা অনেকটা কমে গেছে। হেমলতা ছুটে আসেন। পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'কিছু হয়নি। এসব সামান্য ব্যাপার।'

এরপর পদ্মজাকে বললেন, 'তুই বইগুলো নে।'

হেমলতা এদিকে সেলাই করা কাপড় দিতে এসেছিলেন। যার কাপড় ছিল, সে অসুস্থ। তাই যেতে পারছিল না।

বাড়িতেও কোনো কাজে মন টিকছিল না। তাই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘরে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে একটা মানুষকে সাহায্য করা ভালো। ফেরার পথে তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন দুটো মেয়েকে। একটা মেয়ে পথে বসে আছে। আরেকটা মেয়ে পাশে। বিপর্যস্ত অবস্থা তাদের। মেয়ে দু'টিকে চিনতে পেরে বুক কেঁপে উঠল। পথ দিয়ে আসলে দেরি হবে। তাই তিনি ক্ষেতের পথ ধরেন।

পূর্ণা ব্যথায় যেন নিঃশ্বাস নেয়ার শক্তি পাচ্ছে না। একটা ভ্যান পাওয়া গেলে খুব উপকার হতো। দুই মিনিটের মাথায় ভ্যানের দেখা মিলল। অনেক দূরে ভ্যানের অবস্থান। ভ্যানে চিত্রা, লিখন সহ আরো দুজন।

তারা মাতব্বর বাড়িতে গিয়েছিল। যখন কাছাকাছি ভ্যানের অবস্থান তখন চিত্রা পদ্মজা আর তার মা, বোনকে দেখল। উদ্বিগ্নতা নিয়ে ভ্যান থামাতে বলল। লিখনের নজরে ব্যাপারটা আসতেই সে তাড়াহুড়ো করে ভ্যান থেকে নামল। চিত্রা আগে আগে এগিয়ে আসে। চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে বলল, 'পূর্ণার কী হয়েছে ?'

পদ্মজা বলল, 'কাঁদায় পড়ে পা মচকেছে।'

হেমলতা, চিত্রা,পদ্মজা এবং পূর্ণাকে তুলে দিয়ে লিখন সহ বাকি দুজন সহকর্মী ভ্যান ছেড়ে দিল। তারা হেঁটে ফিরবে।

____

পা ব্যথা অনেকটা কম লাগছে। দুটি বালিশের উপর পা রাখা। ব্রেস নেই বিধায় ব্রেসের মতো কাপড় বেঁধে দিয়েছেন হেমলতা। যা ব্যাথা পেয়েছে কয়দিন বোধহয় স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে না। হেমলতা মুখে তুলে খাইয়ে দিলেন। এরপর বললেন, 'এবার খুশি? স্কুলে যেতে হবে না। কাজ করতে হবে না। সকালে উঠে পড়তে বসতে হবে না।'

পূর্ণা রাজ্যের দুঃখ নিয়ে বলল, 'সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমি টিভি দেখতে যাব কী করে?'

কোনো সাড়া না পেয়ে পূর্ণা বুঝতে পারল, সে মুখ ফসকে ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে। সে বিব্রত হয়ে উঠল। ঢোক গিলল। এরপর কাঁচুমাচু হয়ে মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'মোটেও খুশি হইনি।'

বিকেলে মগা এসে জানাল, মুন্নার বাপ খুন হয়েছে। কথাটি শোনার সাথে সাথে উপস্থিত সকলের মাথায় যেন বজ্রপাত পড়ল। পঙ্গু, ভিক্ষুক অসহায় মানুষটাকে কে মারল? এমন মানুষের শত্রু থাকে? এমনই শত্রু যে, একদম মেরে ফেলল। হেমলতা শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়লেন 'কখন?'

মগা বলল, দুপুরের কথা। দুপুর দুটো কি তিনটায় গ্রামবাসী জানতে পারে এই ঘটনা। আস্তে আস্তে সব গ্রামে খবর যাচ্ছে। লাশ নোয়াপাড়ার ধান ক্ষেতে পাওয়া গেছে।

মুন্নার আত্মীয় বলতে কেউ নেই। দুঃসম্পর্কের যারা আছে তারা মুন্নার দায়িত্ব নিতে চাইল না। মাতব্বর মুন্নার ভার নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুন্না পদ্মজাদের বাড়ি থাকতে চায়। হেমলতা সানন্দে নিয়ে আসলেন মুন্নাকে।

এখন থেকে মুন্না এই বাড়ির ছেলে। পদ্মজা, পূর্ণা খুব খুশি হলো। খুশি হলো না প্রেমা। মুন্না, প্রেমা সমবয়সী। প্রেমা ভাবছে, তার আদরের ভাগ বসাতে মুন্না এসেছে।

হেমলতা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। পদ্মজাকে বললেন, 'প্রেমার পছন্দ হচ্ছে না মুন্নাকে। দুজনের মধ্যে সখ্যতা করে দিস। যাতে একজন আরেকজনকে আপন চোখে দেখে।'

পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল,'কয়দিনে মিশে যাবে দুজন।'

পূর্ণা ব্যথায় ঘুমাতে পারছে না। প্রেমা, মুন্না ঘুমে। মুন্না খুব কেঁদেছে। এখন ক্লান্ত হয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাত তো কম হলো না। পূর্ণা মা-বোনের বৈঠক দেখে বলল, 'আম্মা, মুন্নার নতুন নাম রাখা উচিৎ। '

'কেন?'

'এখন থেকে মুন্না আমাদের ভাই। আমাদের নাম প দিয়ে। তাইলে ওর নাম ও প দিয়ে হবে। তাই না আপা?'

হেমলতা হেসে বলেন,'তুই নাম রাখ তাহলে।'

'রাখছি তো। প্রান্ত মোড়ল।'

'মুন্নাকে জানা সকালে। রাজি হলে এরপর সবাই নাহয় ডাকব।'

'রাজি হবে না মানে? পিটিয়ে রাজি করাব।'

হেমলতা মৃদু হাসলেন। পূর্ণা অসুস্থ হলে খুব কথা বলে। মুখ বন্ধ রাখতেই পারে না। অনেক বছর আগের ঘটনা, বা কয়েক বছর পর কি হবে তা নিয়ে অনবরত কথা বলতে থাকে।

গহীন অন্ধকার। আজ বোধহয় অমাবস্যা। হেমলতা কালো চাদরের আবরণে ঘাপটি মেরে বারান্দায় বসে আছেন। হাতের কাছে ছুরি,লাঠি। গত তিন'দিন ধরে তিনি ঘরের পাশে পায়ের আওয়াজ শুনছেন। তখন ঘরে মোর্শেদ ছিল। একজন পুরুষ ছিল। বুকে সাহস ছিল। আজ মোর্শেদ নেই। মুন্নাকে বাড়িতে আনাতে তিনি ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই! আজ কিছুতেই ঘুমানো যাবে না। হাতেনাতে সন্দেহকারীকে ধরে এই বিপদ থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ হলো কেউ আসছে না। চোখ বুজে আসছে হেমলতার। সারাদিন অনেক খাটুনি গেল।

কাঁদামাটিতে ছপছপ শব্দ তুলে কেউ আসছে। হেমলতা সতর্ক হয়ে উঠেন। শক্ত হাতে লাঠি ও ছুরি ধরেন। পায়ের শব্দটা কাছে আসতেই তিনি বেরিয়ে আসেন। অন্ধকারে পরিষ্কার নয় মুখ। আন্দাজে ছুঁড়ে মারেন হাতের লাঠি। লাঠিটা বেশ ভাল ভাবেই পড়ল সামনের জনের উপর। পিছনের জন দৌড়ে পালাল। লোকটি আর্তনাদ করে বসে পড়ল মাটিতে। পরক্ষণেই পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না হেমলতার জন্য। হেমলতা দ্বিতীয় লাঠি দ্বারা আবার আঘাত করলেন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির।

আহত ব্যক্তির আর্তচিৎকার শুনে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে আসে সবাই। টর্চের আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল। হেমলতা স্বাভাবিক ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যেন জানতেন এই লোকেরই আসার কথা ছিল। শুটিং দলকে তিনি আজই বের করবেন। তবেই শান্তি!পদ্মজা, প্রেমা, মুন্না বেরিয়ে আসে। পূর্ণা ঘরেই রইল। পদ্মজা ডিরেক্টর আবুল জাহেদকে দেখে চমকাল! তখন কোথেকে আগমন ঘটলো মোর্শেদের!

#পদ্মজা

চলবে...

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ৯

আবুল জাহেদকে আহত অবস্থায় দেখে সবাই চমকে উঠল। কপাল বেয়ে তার রক্ত ঝরছে। একজন দৌড়ে গেল বাড়ির ভেতর ফার্স্ট এইড বক্স আনতে। লিখন কিছু সময়ের জন্য থমকাল। আবুল জাহেদের কপাল ব্যান্ডেজ করার পর তাকে একটা চেয়ারে বসতে দেয়া হলো। হেমলতা লাঠিতে এক হাতের ভর দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। লিখন প্রশ্ন করল,' কী হয়েছিল? আপনি উনাকে আঘাত করলেন কেন?'

হেমলতা বললেন, 'এই অসভ্য লোক আজ চারদিন ধরে মাঝরাতে এখানে ঘুরঘুর করে। তার উদ্দেশ্য খারাপ।'

লিখন আড়চোখে পদ্মজাকে দেখল। এরপর আবুল জাহেদকে প্রশ্ন করল, ' উনি যা বলছেন,সত্যি?'

আবুল জাহেদ গমগম করে উঠল, 'আমি আজই প্রথম এসেছি এখানে। ঘুম আসছে না। তাই হাঁটতে হাঁটতে এদিক চলে এসেছি। হুট করেই উনি আক্রমণ করে বসলেন।'

হেমলতা প্রতিবাদ করেন দৃঢ় স্বরে, ' মিথ্যে বলবেন না একদম।'

আবুল জাহেদ কিছুতেই তার উদ্দেশ্য স্বীকার করল না। তর্কেতর্কে ভোরের আলো ফুটল। হেমলতা কঠিন করে জানিয়ে দিয়েছেন আজই এই বাড়ি ছাড়তে হবে। হেমলতার সিদ্ধান্ত শুনে দলটির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তীরে এসে নৌকা ডুবতে কীভাবে দেয়া যায়? সিনেমার শেষ অংশটুকু বাকি। শর্ত অনুযায়ী আরো দশদিন আছে। দলের একজন বয়স্ক অভিনেতা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে হেমলতা জবাব দিলেন, 'আমার তিনটা মেয়ের নিরাপত্তা দিতে পারবেন? একটা পুরুষ মানুষ রাতের আঁধারে যুবতী মেয়েদের ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরঘুর করবে কেন? কীসের ভিত্তিতে?'

হেমলতা সবাইকে এড়িয়ে লাহাড়ি ঘরে ঢুকেন। এদের সাথে তর্ক করে শুধু সময়ই নষ্ট হবে। আবুল জাহেদের ধূর্ত চাহনি তার নজরে এসেছে বারংবার। প্রথম রাতে পায়ের আওয়াজ শুনে চিনতে পারেননি। এরপরদিন, সন্দেহ তালিকায় থাকা চার-পাঁচ জনকে অনুসরণ করে তিনি নিশ্চিত হোন, রাতে কে লাহাড়ি ঘরের পাশে হেঁটেছিল। লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে তুষের স্তূপ। পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢাকা। অসাবধান বশে আবুল জাহেদের কাঁদা মাখা জুতা তুষের স্তূপে পড়ে। ফলে জুতায় তুষ লেগে যায়। এরপরদিন হেমলতা বাড়ির বারান্দায় জুতাজোড়া দেখতে পান। তুষ বাড়ির আর কোথাও নেই। তিনি ব্যস্ত হয়ে তুষের স্তূপের কাছে এসে দেখেন, এক জোড়া জুতার চাপ। সেই জুতা যখন আবুল জাহেদ পরল তিনি পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হোন।

শুটিং দলটার মধ্যে একটা হাহাকার লেগে গেল। বেশ কিছুকক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলল। এরপর সবাই মোর্শেদকে ধরল। বিনিময়ে তারা আরো টাকা দিতে রাজি। হেমলতার ধমকের ভারে তখন চুপ হয়ে গেলেও টাকার কথা শুনে মোর্শেদের চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করে উঠল। ঘরে এসে হেমলতার সাথে ধুন্ধুমার ঝগড়া লাগিয়ে দিলেন। হেমলতা কিছুতেই রাজি হননি। শেষ অবধি তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারলেন না। দলের কিছু ভাল

মানুষের অনুরোধ ফেলতে গিয়ে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। দশদিনের বদলে পাঁচ দিনের সময় দেন। হেমলতা স্বস্থিতে নিঃশ্বাস ফেলেন। ভাগ্যিস কোনো ঘটনা ঘটার আগে ব্যাপারটা খোলাসা হয়েছে।

বেশ গরম পড়েছে আজ। মুন্নাকে পাশে নিয়ে পদ্মজা পাটিতে বসে আছে। মনোযোগ দিয়ে মুন্নাকে শিখাচ্ছে, কাকে কী ডাকতে হবে।

'আমায় ডাকবি, বড় আপা। পূর্ণাকে ছোট আপা। আর প্রেমাতো তোর সমান। তাই প্রেমা ডাকবি। দুজন মিলেমিশে থাকবি। বুঝেছিস?'

'হ, বুঝছি।'

'আম্মাকে তুইও আম্মা ডাকবি। আমাদের আম্মা,আব্বা আজ থেকে তোরও আম্মা,আব্বা। বুঝছিস?'

মুন্না বিজ্ঞ স্বরে বলল, 'হ, বুঝছি।'

হেমলতা রান্না রেখে উঠে আসেন। মুন্নাকে বলেন, 'শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবি। তোর পদ্ম আপা যেভাবে বলে।'

'কইয়ামনে।'

পদ্মজা বলল, 'কইয়ামনে না। বল, আচ্ছা বলব।'

মুন্না বাধ্যের মতো হেসে বলে, 'আচ্ছা, বলব।'

হেমলতা হেসে চলে যান। পূর্ণা রুম থেকে মুন্নাকে ডাকল,'মুন্নারে?'

'হ,ছুডু আপা।'

পদ্মজা মুন্নার গালে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে বলল, 'বল, জি ছোট আপা।'

মুন্না পদ্মজার মতো করেই বলল, 'জি, ছোট আপা।'

পদ্মজা হাসল। পূর্ণা মৃদু হেসে বলল, 'তোর নাম পাল্টাতে হবে। আমি তোর নতুন নাম রেখেছি।'

'কেরে? নাম পাল্ডাইতাম কেরে?'

পদ্মজা কিছু বলার আগে মুন্না প্রশ্ন করল, 'আইচ্ছা এই কথাডা কেমনে কইতাম?'

পদ্মজা হেসে কপাল চাপড়ে। এই ছেলে তো আঞ্চলিক ভাষায় বুঁদ হয়ে আছে। পূর্ণা বলল, 'তুই এখন আমাদের ভাই। আমাদের নামের সাথে মিলিয়ে তোর নাম রাখা উচিত। কি উচিত না?'

মুন্না দাঁত কেলিয়ে হেসে সায় দিল, 'হ।'

'এজন্যই তোর নাম পাল্টাতে হবে। আজ থেকে তোর নাম প্রান্ত মোড়ল। সবাইকে বলবি এটা। মনে থাকবে?'

'হ, মনে রাহাম।'

'বল, আচ্ছা মনে রাখব।'

'আচ্ছা, মনে রাখব।'

দুপুর গড়াতেই হাজেরা আসল। সাথে নিয়ে এসেছে বানোয়াট গল্প আর বিলাপ। ইশারা, ইঙ্গিতে সে লাউ চাইছে। মোর্শেদ গতকাল সব লাউ বাজারে তুলেছেন। গাছে আর একটা ছিল। ঘরে চিংড়ি মাছ আছে। প্রান্ত লাউ দিয়ে চিংড়ি খাবে বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে।

হেমলতা হাসিমুখে শেষ লাউটা নিয়ে এসেছেন। এখন আবার হাজেরারও চাই। কেউ কিছু চাইলে হাতে থাকা সত্ত্বেও হেমলতা ফিরিয়ে দেননি। আজও দিলেন না। তিনি হাজেরাকে হাসিমুখে লাউ দিলেন। হাজেরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে চলে গেল। পদ্মজা মায়ের দিকে অসহায় চোখে তাকায়। প্রান্ত এই বাড়িতে এসে প্রথম যা চাইল তাই পেল না। মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না তো! হেমলতা পদ্মজার দৃষ্টি বুঝেও কিছু বললেন না। প্রান্তকে ডেকে কোলে বসান। ছেলেটাকে দেখতে বেশ লাগছে। দুপুরে তিনি গোসল করিয়েছেন। মনে হয়েছে কোনো ময়লার স্তূপ পরিষ্কার করা হচ্ছে। জন্মদাতার মৃত্যু প্রান্তের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলল না। এজন্য কেউই অবাক হয়নি। বাপ-ছেলের শুধু রাতেই একসাথে থাকা হতো। অনেক রাত প্রান্ত একা থেকেছে। এইটুকু ছেলে কত রাত ভয় নিয়ে কাটিয়েছে! হেমলতা আদুরে কণ্ঠে বললেন, 'একটা গল্প শোনাই। শুনবি?'

'হুনাও।'

পদ্মজা প্রান্তের ভাষার ভুল ধরিয়ে দিল, 'হুনাও না। বল, শোনাও আম্মা।'

প্রান্ত মাথা কাত করে। এরপর হেমলতাকে বলল, 'শোনাও আম্মা।'

আম্মা ডাকটা শুনে হেমলতা বুক বিশুদ্ধ ভাললাগায় ছেয়ে গেল। তিনি কণ্ঠে ভালবাসা ঢেলে বললেন, 'আমাদের একদিন মরতে হবে জানিস তো?'

'হ।'

'জান্নাত,জাহান্নামের কথা কখনো কেউ বলেছে?'

প্রান্ত মাথা দুই পাশে নাড়াল। কেউ শোনায়নি। হেমলতা এমনটা সন্দেহ করেছিলেন। প্রান্ত এ সম্পর্কে জানে না। তিনি ধৈর্য্য নিয়ে সুন্দর করে জান্নাত, জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন। জান্নাতের বর্ণনা শুনে প্রান্তের চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করে উঠল। প্রশ্ন করল হাজারটা। হেমলতাকে জানায়, সে জান্নাতে যেতে চায়। জাহান্নামে যেতে চায় না। হেমলতা বললেন, 'আচ্ছা, এখন গল্পটা বলি। মন দিয়ে শুনবি।'

প্রান্ত মাথা কাত করে হ্যাঁ সূচক সম্মতি দিল। হেমলতা বলতে শুরু করেন, 'একজন মহিলা একা থাকত বাড়িতে। না, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। খুব ছোট ছোট। খুব অভাব তাদের। ছোট একটা জায়গায় মাটির ঘর। ঘরের সামনে শখ করে একটা লাউ চারা লাগায়। লাউ গাছ বড় হয়। লাউ পাতা হয় অনেক। এই লাউ পাতা দিয়ে দিন চলে তার। কখনো সিদ্ধ করে খায়। নুন, মরিচ পেলে শাক রেঁধে খায়। তো একদিন একজন ভিক্ষুক মহিলা আসল। ভিক্ষুক মহিলাটি খায় না দুই দিন ধরে। লাউ গাছে লাউ পাতা দেখে খেতে ইচ্ছে করে। লাউ গাছের মালিক যে মহিলাটি,তাকে ভিক্ষুক বলে, লাউ পাতা দিতে। রেঁধে খাবে। খুব অনুনয় করে বলে। মহিলাটির মায়া হয়। ভিক্ষুক মহিলাকে কথা শোনাতে শোনাতে কয়েকটা লাউ পাতা ছিঁড়ে দেয়। তার কয়দিন পর লাউ গাছের মালিক যিনি, তিনি মারা গেলেন। গ্রামবাসী সহ মসজিদের ইমাম মিলে দাফন করেন। বুঝছিস তো প্রান্ত?'

'হ।'

প্রান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সে খুবই মনোযোগী শ্রোতা। হেমলতা বাকিটা শুরু করলেন, 'গ্রামের ইমাম একদিন স্বপ্ন দেখেন, যে মহিলাটিকে তিনি দাফন করেছেন তার চারপাশে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। কিন্তু তার গায়ে আঁচ অবধি লাগছে না। মহিলাটিকে ঘিরে রেখেছে লাউ পাতা। যার কারণে আগুন ছুঁতে পারছে না। ওইযে তিনি একজন ভিক্ষুককে নিজের একবেলা খাবারের লাউ পাতা দান করেছিলেন। সেই লাউপাতা তাকে কবরের শাস্তি থেকে বাঁচাচ্ছে। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে আমাদের অনেক এবাদত করা উচিত। তার মধ্যে একটি হলো দান। সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা উচিত। কাউকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত না। বোঝা গেছে?'

'হ, বুঝছি। আমি দান করাম।'

'হুম। করবি। অনেক বড় হবি জীবনে। আর অনেক দান-খয়রাত করবি। আচ্ছা, প্রান্ত এখন যদি কোনো অভাবী এসে বলে, তোর লাউটা দিতে। তুই কী করবি?'

প্রান্ত গম্ভীর হয়ে ভাবে। এরপর বলল, 'দিয়া দিয়াম।'

'একটু আগে একজন মহিলা আসছিল না? দেখেছিস তো?'

'হ, দেখছি।'

' সে খুব গরীব। বাড়িতে বাচ্চা আছে ছোট। এসে বলল, লাউ দিতে। তাই তোর লাউটা দিয়ে দিয়েছি। এজন্য কী এখন তোর মন খারাপ হবে?'

'লাউডা তুমি দিছ। তাইলে তোমারে আগুন থাইকা বাঁচাইব লাউডা?'

'লাউটা আমি দিলেও, তোর জন্য ছিল। তুই এখন খুশি মনে মেনে নিলে লাউটা তোকে আগুন থেকে বাঁচাবে।'

হেমলতার কথায় প্রান্ত খুশি হয় খুব। পরপরই মুখ গম্ভীর করে প্রশ্ন করল, 'একটা লাউ কেমনে বাঁচাইব আমারে?'

প্রান্তর নিষ্পাপ কণ্ঠে প্রশ্নটা শুনে হেমলতা, পদ্মজা, পূর্ণা হেসে উঠল। পদ্মজা বলল, 'কয়টা পাতা অনেকগুলো হয়ে মহিলাটাকে বাঁচিয়েছিল। তেমন একটা লাউ অনেকগুলো হয়ে তোকে বাঁচাবে। '

প্রান্ত একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। হেমলতা হেসে হেসে তার উত্তর দিচ্ছেন। পদ্মজার হুট করেই প্রান্তের থেকে চোখ সরে হেমলতার উপর পড়ে। মা হাসলে সন্তানদের বুকে যে আনন্দের ঢেউ উঠে তা কী জানেন? পদ্মজার আদর্শ তার মা। সে তার মায়ের মতো হতে চায়।

পাঁচদিন শেষ। শুটিং দলের মধ্যে খুব ব্যস্ততা। সবকিছু গুছানো হচ্ছে। পাঁচ দিনে তাড়াহুড়ো করে শুট শেষ করা হয়েছে। লিখন উঠানে চেয়ার নিয়ে বসে আছে। চিত্রা এসে তার পাশে বসল। কাশির মতো শব্দ করল লিখনের মনোযোগ পেতে। লিখন তাকাল। ম্লানমুখে প্রশ্ন করল, ' সব গুছানো শেষ? '

'হুম, শেষ। তুমি তো কিছুই গুছাওনি।'

'বিকেলে রওনা দেব। আমার আর কি আছে গুছানোর? দুপুরেই শেষ করে ফেলব।'

'মন খারাপ?'

লিখন কিছু বলল না। লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে শূন্যতা। কিছু ফেলে যাওয়ার বেদনা। বুকের বাঁ পাশে চিনচিন করা ব্যাথা। চিত্রা হাত ঘড়ি পরতে পরতে বলল, 'ছোট বোনের সমান বলে ঠোঁট বাঁকিয়ে ছিলে। এখন তার প্রেমেই পড়লে।'

লিখন কিছু বলল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। চিত্রা বলল, 'পদ্মজা কিন্তু অনেক বড়ই। আগামী মাসে ওর সতেরো হবে শুনেছি। এই গ্রামে সতেরো বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে হাতেগোনা কয়টা। পদ্মজার শ্রেণীর বেশিরভাগ মেয়ে বিবাহিত। আর খুব কম মেয়ে পড়ে।'

চিত্রার কথা অগ্রাহ্য করে লিখন বলল, 'তোমার বিয়েটা কবে হচ্ছে?'

'বছরের শেষ দিকে। সব ঠিকঠাক থাকলে। আর ভগবান চাইলে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ঢাকা রওনা দেবে। হেমলতা, মোর্শেদ বিদায় দিতে এসেছেন। দলটার তিন-চার জনের চরিত্রে সমস্যা থাকলেও বাকিরা খুব ভাল। হেমলতার সাথে মিশেছে খুব। নিজের বাড়ি মনে করে থেকেছে। বাড়ির দেখাশোনা করেছে। লিখন হেমলতার আড়ালে একটি সাহসিকতার কাজ করে ফেলল। ব্যস্ত পায়ে লাহাড়ি ঘরে আসল। বারান্দায় বসেছিল পদ্মজা। লিখনকে দেখে ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। পদ্মজাকে কিছু বলতে দিল না লিখন। সে দ্রুত বারান্দায় উঠে পদ্মজার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে জায়গা ত্যাগ করল। পদ্মজা অনবরত কাঁপতে থাকে। পূর্ণা চৌকি থেকে ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। সে হতভম্ব। ধীর পায়ে হেঁটে আসে। পদ্মজার সারা শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। হাত থেকে চিঠি পড়ে যায়। পূর্ণা কুড়িয়ে নিল। পদ্মজার গলা শুকিয়ে কাঠ।

হেমলতা এসে দেখেন পদ্মজা হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে। কেমন দেখাচ্ছে যেন। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেব, ' পদ্ম? শরীর খারাপ?'

মায়ের কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ভয় পেল। বাতাসে অস্বস্তি। নিঃশ্বাসে অস্বস্থি। চোখ দু'টি স্থির রাখা যাচ্ছে না। নিঃশ্বাস এলোমেলো। পূর্ণা পরিস্থিতি সামলাতে বলল, 'আম্মা, আপার মাথা ব্যথা।'

'হুট করে এমন মাথা ব্যথা উঠল কেন? পদ্মরে খুব ব্যথা?'

পদ্মজা অসহায় চোখে পূর্ণার দিকে তাকাল। আকস্মিক ঘটনায় সে ভেঙে পড়েছে। ডান হাত অনবরত কাঁপছে। হেমলতা তীক্ষ্ণ চোখে দু'মেয়েকে দেখেন। কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কি লুকোচ্ছিস দুজন? কেউ এসেছিল?'

মায়ের প্রশ্নে পদ্মজার চেয়ে পূর্ণা বেশি ভয় পেল। হাতের চিঠিটা আরো শক্ত করে চেপে ধরল। কি লিখা আছে না পড়ে, এই চিঠি হাতছাড়া করবে না সে।

#পদ্মজা

চলবে...

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট- ১০

হেমলতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীরের ফলার মতো পদ্মজার গায়ে বিঁধছে। সে কাঁপা স্বরে জানিয়ে দিল, 'শুটিং দলের একজন এসেছিল।'

হেমলতার ঠোঁট দুটো ক্ষেপে উঠল প্রচন্ড আক্রোশে। পদ্মজা সবাইকে চিনে না। তাই তিনি পূর্ণাকে প্রশ্ন করেন, 'পূর্ণা, কে এসেছিল?'

পূর্ণা দুই সেকেন্ড ভাবল। এরপর নতমুখে বলল, 'কালো দেখতে যে... মিলন।'

পদ্মজা আড়চোখে পূর্ণার দিকে তাকাল। তার ভয় হচ্ছে, মা যদি এখন বলে মিলন তো তার সামনেই ছিল। তখন কী হবে? পূর্ণা মিথ্যে বলল কেন! সত্য বললেই পারতো।

হেমলতা বিশ্বাস করেছেন নাকি করেননি দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল না। পূর্ণা মাথা নত করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল। হেমলতা বারান্দা অবধি এসে আবার ঘুরে তাকালেন। মনটা খচখচ করছে। মনে হচ্ছে,ঘাপলা আছে। নাকি তার সন্দেহ মনের ভুল ভাবনা? কে জানে!

রাতে পদ্মজা খেতে চাইল না। বিকেলের ঘটে যাওয়া ঘটনা তাকে ঘোরে রেখেছে। চিঠিটা পড়তে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হচ্ছে না। তবুও কেমন, কেমন যেন অনুভূতি হচ্ছে। অচেনা,অজানা অনুভূতি। পদ্মজার হাব-ভাব হেমলতার বিচক্ষণ দৃষ্টির অগোচরে পড়ল না। তিনি ঠিকই খেয়াল করেছেন। কিন্তু মেয়েরা স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার থেকে কথা লুকোনোর ক্ষমতা নিয়ে যে জন্মায় তা তো অস্বীকার করা যায় না। যেমন তিনি এই ক্ষমতা ভাল করেই রপ্ত করতে পেরেছেন। পদ্মজাকে জোর করে খাইয়ে দিলেন। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলেন না।

রাতের মধ্যভাগে মোর্শেদ হেমলতাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলে হেমলতা এক ঝটকায় সরিয়ে দিলেন। চাপা স্বরে ক্রোধ নিয়ে বললেন, 'তোমার বাসন্তীর কী হয়েছে? সে কী তোমাকে ত্যাগ করেছে? সেদিন ফিরে এলে কেন?'

মোর্শেদ চমকালেন, অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন। হেমলতা বাসন্তীকে চিনল কী করে? এই নাম তার গোপন অধ্যায়। অবশ্য হেমলতা মতো মহিলা না জানলেই বোধহয় বেমানান লাগতো। মোর্শেদ বিব্রত কণ্ঠে বললেন,

'হে আমারে কী ত্যাগ করব। আমি হেরে ছাইড়া দিছি।'

হেমলতা বাঁকা হাসলেন। অন্ধকারে তা নজরে এলো না মোর্শেদের।

'বিশ বছরের সংসার এমন আচমকা ভেঙ্গে গেল যে!'

হেমলতার কণ্ঠে ঠাট্টা স্পষ্ট। চাপা দীর্ঘশ্বাসটা গোপনে রয়ে গেল। মোর্শেদের শরীরের পশম দাঁড়িয়ে গেল। এ খবরও হেমলতা জানে? এতকিছু কী করে? হেমলতার চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল। তিনি চাদর গায়ে দিয়ে চলে যান বারান্দায়। রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে। মোর্শেদের কোনো কৈফিয়ত তিনি শুনতে চান না। তাই বারান্দার রুমে এসে বসেন। কতদিন পর রাতের আঁধারে বারান্দার রুমে তিনি। বিয়ের এক বছর পরই জানতে পারেন, মোর্শেদ তাকে বিয়ে করার ছয় মাস আগে বাসন্তী নামে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে। স্বামীর ঘর ছাড়া আর পথ ছিল না বলে, এতো বড় সত্য হজম করে নিতে হয়।

বাসন্তীর মা বারনারী। আর একজন বারনারীর মেয়েকে সমাজ কিছুতেই মানবে না। মোর্শেদের বাবা মিয়াফর মোড়ল টাকার বিনিময়ে দেহ বিলিয়ে দেওয়া একজন বারনারীর মেয়েকে ছেলের বউ হিসেবে মানতে আপত্তি করেন। ততদিনে মোর্শেদ বিয়ে করে নিয়েছে। সে খবর মিয়াফর মোড়ল পেলেন না। তিনি মোর্শেদের মন ফেরাতে শিক্ষিত এবং ঠান্ডা স্বভাবের হেমলতাকে বেছে নিলেন। কুরবান হলো হেমলতার! তখন কলেজে উঠার সাত মাস চলছিল! এরপর পড়াটাও আর এগুলো না। জীবনের মোড় করুণরূপে পাল্টে গেল।

পরদিন সকাল সকাল স্কুলে রওনা হলো তারা। পূর্ণা পথে চিঠিটা পড়ার পরিকল্পনা করেছিল। পদ্মজা হতে দিল না। সেয়ানা দুইটা মেয়ের হাতে কেউ চিঠি দেখে ফেললে? ইজ্জত যাবে। পূর্ণা পদ্মজার প্রতি বিরক্তবোধ করল। চিঠিটা তার কাছে। পথে নতুন করে পরিকল্পনা করল সে ক্লাসে বইয়ের চিপায় রেখে চিঠি পড়বে। তাও হলো না। পর পর দুই দিন কেটে গেল। সুযোগ পেলেও পদ্মজা পড়তে দিতে চাইতো না। সারাক্ষণ হাতে জান নিয়ে যেন থাকে। এই বুঝি মা এলো! দুই দিন পর মোক্ষম সুযোগ পেল। হেমলতা বাপের বাড়ি গিয়েছেন। প্রান্ত এবং প্রেমাকে নিয়ে। যদিও কয়েক মিনিটের পথ। দ্রুতই ফিরবেন। পদ্মজার চেয়ে পূর্ণার আগ্রহ বেশি। সে চিঠি খোলার অপেক্ষায় ছিল। আজ খুলতে গিয়ে মনে হলো, যার চিঠি তার খোলা উচিত এবং আগে তার পড়া উচিত। তাই পদ্মজার দিকে চিঠি বাড়িয়ে দিল। পদ্মজা চিঠি খুলতে দেরি করছিল বলে পূর্ণা তাড়া দিল, 'এই আপা, খোল না। লজ্জা পাচ্ছো কেন? চিঠি এটা। কারো গায়ের কাপড় খুলতে বলছি না।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। যেন পূর্ণা কাউকে খুন করার কথা বলেছে। পদ্মজা বলল, 'কিসব কথা পূর্ণা।'

'আচ্ছা, মাফ চাই। আর বলব না। '

পদ্মজা ভাঁজ করা সাদা কাগজটা মেলে ধরল চোখের সামনে। প্রথমেই বড় করে লেখা ' প্রিয় পদ্ম ফুল'।

পূর্ণা পাশে এসে বসল। দুজনের মনোযোগ চিঠিতে।

প্রিয় পদ্ম ফুল,

আমি ভেবে উঠতে পারছি না কীভাবে কী বলব। আজ চলে যাব ভাবতেই বুকে তোলপাড় চলছে। তার কারণ তুমি। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি, থমকে গিয়েছিল নিঃশ্বাস,কণ্ঠনালী। এতটুকুও মিথ্যে বলিনি। সেদিন

শুটিংয়ে সংলাপ বলতে গিয়ে ভুল করেছি বার বার। না চাইতেও বার বার চোখ ছুটে যাচ্ছিল লাহাড়ি ঘরের দিকে। বুকে থাকা হৃদপিণ্ডটায় শিরশিরে অনুভূতি শুরু হয় সেই প্রথম দেখা থেকেই। প্রতিটা ক্ষণ গুণেছি তোমাকে দ্বিতীয় বার দেখার আশায়। দ্বিতীয় বার দেখা পাই যখন বেগুন নিতে আসো। সেদিন কথা বলার লোভ সামলাতে পারিনি।

টমেটোর অজুহাতে শ্রবণ করি পদ্ম ফুলের কণ্ঠ। মনে হচ্ছিল, এমন রিনরিনে গলার স্বর আর শুনিনি। রাতের ঘুম আড়ি করে বসে। তোমায় প্রতিনিয়ত দেখার একমাত্র পন্থা তোমার স্কুল। সবার অগোচরে কতবার তোমার পিছু নিয়েছি। তুমি বোকা, ধরতে পারোনি একবারও। সুন্দরীরা বোকা হয় আবার প্রমাণ হলো। এই রাগ করবে না, বোকা বলেছি বলে।

জানতে পারি, তোমার মায়ের ইচ্ছে তুমি অনেক পড়বে। অনেক উঁচু বংশ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেখানে আমি অতি সামান্য। তবুও সাহস করে তোমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেই। পদ্ম ফুলটাকে যে আমার চাই। তিনি রাজি হননি।নায়কের সাথে আত্মীয়তা করবেন না। আর বললেন, তোমার অনেক পড়া বাকি। তোমার মা কিছুতেই রাজি হবেন না। আহত মনে দু পা পিছিয়ে আসি। ভেবেছি, তোমার কলেজ পড়া শেষ হলে পরিবার নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসব। তোমার মা সম্পর্কে যা জেনেছি, বুঝেছি তাতে এতটুকু বিশ্বাস আছে, তিনি নায়ক বলে আমাকে এড়াবেন না। তিনি বিচক্ষণ মস্তিষ্কের মানুষ।

আমি তোমায় ভালবাসি পদ্ম ফুল।

ইতি

লিখন শাহ্

পদ্মজার মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। পূর্ণা হাসছে। ভ্রু উঁচিয়ে পদ্মজাকে বলল, 'আপারে, লিখন ভাইয়ার সাথে তোমাকে যা মানাবে! কী সুন্দর করে লিখেছে।'

পদ্মজা লজ্জায় চোখ তুলতে পারছে না। পূর্ণা বলল, 'একদম বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ! আপা তুমি কিন্তু বিয়ে করলে লিখন ভাইয়াকেই করবে।'

'আর কিছু বলিস না।'

পদ্মজা মিনমিনে গলায় বলল। পূর্ণা শুনল না। সে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে, ' আমার ভাবতেই কী যে খুশি লাগছে আপা। নায়ক লিখন শাহ আমার বোনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। একদিন বিয়ে হবে।'

'চুপ কর না।'

'এই আপা, লিখন ভাইয়াকে ফেরত চিঠি দিবে না?'

পদ্মজা চোখ বড় করে তাকাল। অবাকস্বরে বলল, 'কীভাবে? ঠিকানা কই পাব? আর আম্মা জানলে? না, না।'

পূর্ণা আর কিছু বলতে পারল না। হেমলতার উপস্তিতি টের পেয়ে চুপ হয়ে গেল। পদ্মজা দ্রুত চিঠিটা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রাখল। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে।

#পদ্মজা

চলবে...

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পাট -১১

মাঘ মাস চলছে। কেটে গেছে চার মাস। শুষ্ক চেহারা আর হিমশীতল অনুভব নিয়ে পদ্মজা বসে আছে নদীর ঘাটে। গুনে গুনে তিন নম্বর সিঁড়িতে। নাকের ডগায় মেট্রিক পরীক্ষা। দিনরাত পড়তে হচ্ছে। নিয়ম করে প্রতিদিন ভোরে পড়া শেষ করে পদ্মজা। এরপর ঘাটে এসে বসে নিজের অনুভূতিদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। কখনো উদাস হয়ে আবার কখনো লাজুক মুখশ্রী নিয়ে ভাবে কারো কথা। সেই যে চিঠি দিয়ে হারালো আর সাক্ষাৎ মিললো না তার। কখনো কী মিলবে? তিনি কী আসবেন? এক চিঠি প্রতিদিন নিয়ম করে পড়ে পদ্মজা। ধীরে ধীরে অনুভব করে তার মধ্যে আছে অন্য আরেক সত্ত্বা। যে সত্ত্বা প্রতিটি মেয়ের অন্তঃস্থলের গভীরে জেঁকে বসে থাকে ভালবাসার অনুভূতি নিয়ে। পূর্ণা আসল শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে। দুই দিন আগে তার অষ্টম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। হিমেল হাওয়ার হাড় কাঁপানো শীতে পূর্ণা থেমে থেমে কাঁপছে।

'আপা?'

পদ্মজা তাকাল। মৃদু হেসে বলল, 'কী?' পরপরই আবার উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, 'আম্মা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে?'

পূর্ণা পদ্মজার পাশ ঘেঁষে বলল,'না, আম্মার কিছু হয় নাই।'

পদ্মজা হাঁফ ছেড়ে বলল,'আম্মা সারাদিন সেলাইর কাজ করে। একদিকে তাকিয়ে থাকে, এক জায়গায় বসে থাকে। এজন্যই শরীরে এতো অশান্তি। দূর্বল হয়ে পড়ছে। আব্বারে বলিস, আম্মারে নিয়ে সদরে যেতে। আমার কথা তো আব্বা শুনবে না।'

'আচ্ছা।'

দুজন নদীর ওপারে চোখ রাখল। অতিথি পাখির মেলা সেখানে। রোমাঞ্চকর আকর্ষণ। এত পাখি দেখে মন ভরে গেল। পাখিদের কলকাকলিতে এলাকা মুখরিত। এপার থেকে শোনা যাচ্ছে। কোত্থেকে দৌড়ে আসে প্রান্ত। সে চার মাসে শুদ্ধ ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে ভালভাবে। এসেই বলল, 'আপারা কী করো?'

পূর্ণা বলল,'পাখি দেখি। আয়, দেখে যা।'

প্রান্ত দূরে চোখ রাখল। সকালের ঘন কুয়াশার ধবল চাদরে ঢাকা নদীর ওপার। পাখিদের ভাল করে চোখে ভাসছে না। শীতের দাপটে প্রকৃতি নীরব। তাই পাখির কলকাকলি শোনা যাচ্ছে দারুণভাবে। প্রান্ত বলল, 'বড় আপা,একটা পাখি ধরে আনি?'

'একদম না। পাখি ধরা ভাল না। অতিথি পাখিদের তো ভুলেও ধরা উচিত না। ওরা আমাদের দেশে অতিথি হয়ে এসেছে।'

প্রান্ত চুপসে গেল। এরপর মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল,'আচ্ছা,ঠিকাছে।'

'তোরা এইহানে কী করস?'

মোর্শেদের কণ্ঠস্বর শুনে তিনজন ফিরে তাকাল। প্রান্ত হাসিমুখে ছুটে এসে বলল, 'আব্বা,আমি আজ তোমার সাথে মাছ ধরতে যাব।'

মোর্শেদ প্রান্তকে কোলে তুলে নেন। এরপর বললেন,'তোর মায় আমার লগে কাইজ্জা করব।'

'আম্মারে, আমি বলব।'

'আইচ্ছা যা, তুই রাজি করাইতে পারলে লইয়া যামু।'

পদ্মজা চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল। মোর্শেদ গত দু'মাস ধরে প্রান্তকে চোখে হারাচ্ছেন। ছেলে নাই বলেই হয়তো!প্রতিটা বাবা-মায়ের একটা ছেলের আশা থাকে।

হেমলতা পর পর তিনটা মেয়ে জন্ম দিলেন। এ নিয়ে মোর্শেদ অভিযোগ করেননি। তবে, মনে মনে খুব করে একটা ছেলে চাইতেন। প্রান্তকে যখন প্রথম আনা হলো, মোর্শেদের খুব রাগ হয় ভিক্ষুকের ছেলে বলে। সময়ের সাথে সাথে প্রান্তকে চোখের সামনে ঝাঁপাতে, লাফাতে দেখে ছেলের জন্য রাখা মনের শূন্যস্থানটা নাড়া দিয়ে উঠল। মোর্শেদ দু'হাত বাড়িয়ে দেন অনাথ ছেলেটির দিকে। এখন দেখে আর বোঝার উপায় নেই, মোর্শেদ আর প্রান্তের মধ্যে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। মোর্শেদ কাঠখোট্টা গলায় দুই মেয়েকে বললেন,'সদরে যাইয়াম। দুইডার লাইগা চাদর আনতাম না সুইডার?'

পদ্মজা কথাটা শুনে চমকাল। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু পেলে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। পদ্মজার অবস্থাও তাই হলো। খুশিটা প্রকাশ করার মতো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। স্নায়ু কোষ থমকে গেছে। শীতের তান্ডবে প্রকৃতি বিবর্ণ অথচ তার মনে হচ্ছে, বসন্তকাল চলছে। ঢোক গিলে ঝটপট উত্তর দিল,'আব্বা,তোমার যা পছন্দ তাই এনো আমার জন্য।'

খুশিতে পদ্মজার গলা কাঁপছে। মোর্শেদ অনুভব করলেন সেই কাঁপা গলা। গত সপ্তাহ রমিজের মেয়ে এক ছেলের সাথে রাত কাটাতে গিয়ে ধরা পড়ে। অলন্দপুরে সে কী তুলকালাম তাণ্ডব! ছেলেটাকে ন্যাড়া করে জুতার মালা পরিয়ে চক্কর দেওয়ানো হয়েছে পুরো অলন্দপুর। আর মেয়ের পরিবারকে সমাজ থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

পদ্মজা এতো সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও আজও কোনো চারিত্রিক দোষ কেউ দিতে পারেনি। মেয়েটার দ্বারা কোনো অনৈতিক কাজ হয়নি। তার ঘরে যেন সত্যি একটা পদ্মফুলের বাস। মোর্শেদ পদ্মজাকে নিয়ে দোটানায় ভোগেন। খারাপ ব্যবহারটা আগের মতো আসে না। তিনি দ্রুত জায়গা ত্যাগ করেন।

পরদিন সকাল সকাল কলস ভরে খেজুরের মিষ্টি রস নিয়ে আসেন মোর্শেদ। প্রেমা খেজুরের রস দেখেই মাকে বলল, 'আম্মা,পায়েস খাবো।

'আচ্ছা, খাবি।'

সূর্য অনেক দেরিতে উঠল। প্রকৃতির ওপর সূর্যের নির্মল আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের আলোতে কোনো তেজ নেই। চার ভাই-বোন কাঁচা খেজুরের রস নিয়ে উঠানে বসল পাটি বিছিয়ে। খেজুরের কাঁচা রস রোদে বসে খাওয়াটাই যেন একটা আলাদা স্বাদ,আলাদা আনন্দ। মোর্শেদ নারিকেল গাছে উঠেছেন। পায়েসের জন্য নারিকেল অপরিহার্য উপকরণ। আচমকা পদ্মজা প্রশ্ন করল, 'আজ কী সোমবার? '

পূর্ণা কথা বলার পূর্বে হেমলতা বারান্দা থেকে বললেন, 'আজ তো সোমবারই। কেন?'

পদ্মজা খেজুরের বাটি রেখে ছুটে আসল বারান্দায়।

'আজ স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল আম্মা। ঝুমা ম্যাডাম বলেছিলেন,গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। সবাইকে যেতে বলেছেন।'

'আমায় বলে রাখতি। সামনে পরীক্ষা। গুরুত্বপূর্ণ দেখে পড়া দিবেন এজন্যই ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি যা। এই পূর্ণা, তুইও যা।'

দুই বোন বাড়ি থেকে দ্রুত বের হলো। সূর্য উঠলেও কনকনে শীতটা রয়ে গেছে। দুজনের গায়ে মোর্শেদের আনা নতুন সোয়েটার। পদ্মজা যখন মোর্শেদের হাত থেকে সোয়েটার পেল আবেগ লুকিয়ে রাখতে পারেনি। মোর্শেদের সামনে হাউমাউ করে কান্না করে উঠে। মোর্শেদ অপ্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ফিরেন অনেক রাত্রিরে। পূর্ণা বলল, 'আব্বার পছন্দ ভালো তাই না আপা?'

'কীসের পছন্দ?'

'সোয়েটার গুলো কী সুন্দর।'

পদ্মজা হাসল। সামনের ক'টি দাঁত ঝিলিক দিল। হাতের ডান পাশে ধানক্ষেত। ধান গাছের ডগায় থাকা বিন্দু বিন্দু জমে থাকা শিশির রোদের আলোয় ঝিকমিক করছে। অনেকে হাতে কাঁচি নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে ধান কাটার। বাতাসে নতুন ধানের গন্ধ। হঠাৎ পূর্ণা চেঁচিয়ে উঠল, 'আপারে, লিখন ভাই।'

পদ্মজার নিঃশ্বাস গেল থমকে। মুহূর্তে বুকের মাঝে শুরু হয় তাণ্ডব। পূর্ণার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকাল পদ্মজা। লিখন ব্যস্ত পায়ে এদিকে আসছে। পাশে মগা।

পদ্মজা অজানা আশঙ্কায় চোখ ফিরিয়ে নিল। পূর্ণাকে বলল, 'এখানে আর এক মুহূর্তও না।' কথা শেষ করে পদ্মজা স্কুলের দিকে হাঁটা শুরু করল। পূর্ণা অবাক হয়। কিন্তু, এ নিয়ে রা করল না। লিখন পিছন পিছন আসছে। পদ্মজার বুক কাঁপছে বিরতিহীন ভাবে। চাহনি অশান্ত।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট - ১২

বট গাছের সামনে চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লিখন।

শীতের শুষ্কতায় বটগাছের অধিকাংশ পাতা ঝরে পড়েছে। লিখনের কাছে শীতকাল খুবই অপছন্দের ঋতু। শীত চরম শুষ্কতার রূপ নিয়ে প্রকৃতির ওপর জেঁকে বসে থাকে যা সহ্য হয় না লিখনের। ঠান্ডা লেগেই থাকে। ছোট থেকে কয়েকবার নিউমোনিয়ায় ভুগেছে। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে রুক্ষতা, তিক্ততা ও বিষাদের প্রতিমূর্তি শীতকাল। তখন পদ্মজা এতো দ্রুত হাঁটছিল যে মনে হচ্ছিল, সে পালাতে চাইছে। লিখন আর এগোয়নি। পালাতে দিল পদ্মজাকে। মগা বলেছে, পদ্মজার লোকসমাজের ভয় খুব। তাই লিখন এই নির্জন মাঠের পাশে বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা এ পথ দিয়েই বাড়ি ফিরবে। তখন যদি একটু কথা বলা যায়।

পদ্মজা জড়সড় হয়ে হাঁটছে। আতঙ্কে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। বার বার জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে।

পদ্মজা মিনমিনে গলায় পূর্ণাকে ডাকল, 'পূর্ণা রে..."

পূর্ণা তাকাল। পদ্মজা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে। উনি মাঝপথে দাঁড়িয়ে নেই তো?'

পূর্ণা চরম বিরক্তি নিয়ে বলল, 'থাকলে কী হয়েছে? খেয়ে ফেলবে?'

পদ্মজা আর কথা বলল না। পূর্ণার সাথে কথা বলে লাভ নেই। তখন লিখন শাহকে পাত্তা না দেয়ার জন্য পূর্ণার খুব রাগ হয়েছে। পদ্মজা বরাবরই মাথা নিচু করে হাঁটে। তাই লিখন শাহকে দেখতে পেল না। পূর্ণা দূর থেকে দেখতে পেল। কিন্তু এইবার আর আগে থেকে বলল না পদ্মজাকে। সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ভাবে, লিখন শাহ্ যখন আপার সামনে এসে দাঁড়াবে কী যে হবে!

লিখন-পদ্মজার দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। তখন পদ্মজা আবিষ্কার করল লিখনের উপস্থিতি। ওড়নার ঘোমটা চোখ অবধি টেনে নেয় দ্রুত। ভয়ে-লজ্জায় সর্বাঙ্গে কাঁপন ধরে। লিখনের পাশ কাটার সময় পুরুষালি একটি কণ্ঠ ডেকে উঠল, 'পদ্ম।'

পদ্মজা দাঁড়াতে চায়নি। তবুও কেন জানি দাঁড়িয়ে গেল। লিখন দুয়েক পা এগিয়ে আসল। পূর্ণা ঠোঁট টিপে সেই দৃশ্য গিলছে। লিখন উসখুস করছে। কথা গুলিয়ে ফেলেছে। পদ্মজা লিখনকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। লিখন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখল। পূর্ণা বলল, 'আমাকে বলুন, আমি বলে দেব।'

লিখন পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল। এরপর অনুরোধ স্বরে বলল,'দয়া করে, তোমার বোনকে দিও। আমি কাল বিকেলে ঢাকা চলে যাব।'

পূর্ণা হাসিমুখে চিঠি নিল। এরপর বলল, 'আপা আপনার আগের চিঠিটা প্রতিদিন পড়ে।'

লিখনের ঠোঁট দু'টি হেসে উঠল। পূর্ণা দৌড়ে ছুটে গেল পদ্মজার দিকে। লিখন আর পিছু নিল না। পূর্ণা আসতেই পদ্মজা ধমকে উঠল, 'কী কথা বলছিলি এতো? কেউ দেখলে কী হতো? তুই আম্মার কথা কেন ভাবছিস না।'

পদ্মজার কাঁদোকাঁদো স্বরে পূর্ণা চুপসে গেল। সত্যি কী সে বেশি করে ফেলল? পূর্ণা চোখ নামিয়ে চুপচাপ হেঁটে বাড়ি চলে আসে। চিঠির কথা পদ্মজাকে বলা হয়নি।

গোধূলি বিকেল। হেমলতা পদ্মজাকে ফরমায়েশ দেন, 'পদ্ম, কয়টা টমেটো নিয়ে আয়।'

'আচ্ছা আম্মা।'

পদ্মজা লাহাড়ি ঘরের ডান দিকে হেঁটে আসে। দু'মাস আগে মোর্শেদ এ'দিকের সব ঝোপজঙ্গল সাফ করে টমেটোর ছোটখাটো ক্ষেত করেছেন। লাল টকটকে টমেটো। হেমলতা রান্নার ফাঁকে বারান্দার দিকে উঁকি দিলেন। মোর্শেদ আর প্রান্ত কিছু নিয়ে বৈঠক করছে।

হেমলতা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। বাসন্তী নামক মানুষটা কী জন্যে ত্যাগের স্বীকার হলো? জানতে ইচ্ছে করলেও হেমলতা প্রশ্ন করেন না। তবু এতটুকু বুঝেছেন মোর্শেদের বাইরের ঘোর কেটে গেছে। যার ফলস্বরূপ সংসারে তার মন পড়েছে। হেমলতাকে খুব সমীহ করে চলেন। তবে হেমলতা জানেন, মোর্শেদ পদ্মজাকে নিজের মেয়ে হিসেবে এখনো বিশ্বাস করেননি। তা নিয়ে মাঝে মাঝে খোঁচা দিতেও ভুলেন না।

পদ্মজা সাবধানে ক্ষেতের মধ্যিখানে আসল। টমেটো ছিঁড়তে গিয়ে তার লিখনের কথা মনে হলো। মনে মনে ভাবে, কেন এসেছেন তিনি? কি বলতে চেয়েছিলেন?

জানার জন্য পদ্মজার মনটা ব্যকুল হয়ে হয়ে উঠল।

'আপা,একটা কথা বলি?'

পদ্মজা চমকে তাকাল। হঠাৎ পূর্ণার আগমনে ভয় পেয়েছে। বুকে ফুঁ দিয়ে বলল, 'বল।'

'রাগ করবে না তো?'

পদ্মজা চোখ ছোট ছোট করে তাকাল। বলল, 'করব না।'

পূর্ণা লিখনের দেয়া চিঠি দেখিয়ে বলল, 'লিখন ভাইয়ার চিঠি।'

পদ্মজা ছোঁ মেরে চিঠি নিল। পূর্ণা অবাক হলো। মনে মনে খুশি হলো পদ্মজার আকুলতা দেখে। পদ্মজা দ্রুত চিঠির ভাঁজ খুলল। পূর্ণা বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছে, কেউ আসছে নাকি! পদ্মজা পড়া শুরু করল।

প্রিয় পদ্ম ফুল,

চার মাস কেটে গেল। চার মাসে একটুর জন্যও অবসর মেলেনি। কিন্তু মনে ছিল এক আকাশ ছটফটানি। তোমার মনের কথা তো জানাই হলো না। তোমাদের অলন্দপুরের প্রায় প্রতিটি বাড়ির ছেলের স্বপ্ন তোমাকে ঘরে তোলার। তাই সারাক্ষণ ভয়ে ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে কেউ তুলে নেয়নি তো! তিন দিনের সময় নিয়ে চলে এসেছি। শুধু একবার দেখতে আর জানতে, তুমি কী আমার জন্য অপেক্ষা করবে? মেট্রিক পরীক্ষা অবধি অপেক্ষা করলেই হবে। এরপর আমি আমার মা আর বাবাকে নিয়ে তোমার মায়ের কাছে আসব। উনার কাছে অনুরোধ করব, তোমার পড়া শেষ হলে যেন আমার সাথেই বিয়ে দেন। তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারব। এখন অনিশ্চয়তায় ভুগছি। আমি গুছিয়ে লিখতে পারছি না আজ। কয়েকটা চিঠি লিখেছি। একটাও মনমতো হয়নি। অনুগ্রহ করে তুমি মানিয়ে নিও।

ইতি

লিখন শাহ্

বাড়ির সবাই ঘুমে। পদ্মজা চুপিচুপি উঠে বসল পড়ার টেবিলে। রাত অনেক। গাছের পাতায় নিশ্চয় শিশির বিন্দু জমছে। এরপর ভোররাতে টিনের চালে শিশিরকণা বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির মতো ঝরবে। গাঁ হিম করা ঠান্ডা। তা উপেক্ষা করে পদ্মজা হাতে কলম তুলে নিল। সাদা কাগজে লিখল, অপেক্ষা করব আমি। এরপর কাগজটা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়ল।

ফজরের নামায পড়ে চার ভাইবোন পড়তে বসল। পড়ায় মন টিকছে না পদ্মজার। বই আনার ছুতোয় পদ্মজা রুমে গেল। রাতের লেখা কাগজটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে জানালার বাইরে ফেলে দিল। এরপর আবার নতুন করে লিখল, আমার আম্মা যা চান তাই হবে।

পড়াশেষে নিয়মমাফিক ঘাটে আসল পদ্মজা। হাতের মুঠোয় তিনটা চিঠি। দু'টো লিখনের। একটা তার লেখা। পূর্ণাও পাশে। প্রেমা, প্রান্ত বাড়িজুড়ে ছুটাছুটি করছে। সামনের কোনোকিছু ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। সবকিছুই অস্পষ্ট। কুয়াশার স্তর এত ঘন যে, দেখে মনে হচ্ছে সামনে কুয়াশার পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড় ভেদ করে একটা নৌকা এসে ঘাটে ভীরে। নৌকায় লিখন আর মগা। আকস্মিক ঘটনায় পদ্মজার পিল উঠল চমকে। পালানোর মতো শক্তিটুকু পায়ে নেই।

লিখন মায়াভরা কণ্ঠে পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি বাধ্য হয়ে এসেছি। আজ বিকেলে চলে যাব। মগা বলল, প্রতিদিন সকালে ঘাটে নাকি বসো তুমি। তাই এসেছি।'

পদ্মজা মনে মনে সূরা ইউনুস পড়ছে। ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে। মা দেখে ফেললে কী হবে? বা অন্য কেউ? একটু সাহস যোগাতেই নিজের লেখা চিঠি সিঁড়িতে রেখে, পদ্মজা ছুটে গেল বাড়িতে। পূর্ণা বড় বড় চোখে শুধু দেখল। লিখন নৌকা থেকে নেমে চিঠিটা হাতে তুলে নিল। ভাঁজ খুলে একটা লাইন পেল শুধু। লিখনের মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। পূর্ণার কৌতূহল হলো চিঠিতে কী আছে জানার জন্য। তবে তা প্রকাশ করল না। শুধু বলল, 'আপা আপনার কথা প্রতিদিন ভাবে।'

১৯৯৬ সাল। পদ্মজা থেমে থেমে কাঁপছে। হাঁটুর উপর মুখ লুকিয়ে রেখেছে। তুষার কালো চাদর তার গায়ে টেনে দিল। পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। বিষাদভরা কণ্ঠে বলল, ' সেদিন আমার লেখা প্রথম চিঠিটা কুটিকুটি কেন করেছি,জানি না। ইচ্ছে হয়েছিল তাই করেছি। তবে জানেন, আমি একদম ঠিক করেছিলাম। সেদিন যদি আমি কথা দিয়ে দিতাম। আমার কথা ভঙ্গ হতো।'

পদ্মজা হাসল। তুষার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পদ্মজার দিকে। এরপর বলল, 'লিখনের সাথে আর দেখা হয়নি?'

পদ্মজা হাতের কাঁটা অংশে ফুঁ দিয়ে বলল, 'হয়েছিল।'

'তাহলে, কথা ভঙ্গ হতো কেন বললেন?'

পদ্মজা তুষারের দিকে তাকাল। এরপর আবার হাঁটুতে মুখ লুকালো। এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট করে করে দশ মিনিট কেটে গেল। পদ্মজার সাড়া নেই। তুষার ডাকল, 'পদ্মজা? শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি।'

'আপনার কী কষ্ট হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'মুখ তুলে তাকান।'

পদ্মজা ছলছল চোখে তাকাল। তুষার উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'কী সমস্যা হচ্ছে?'

তুষারের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে পদ্মজা ভেজা কণ্ঠে বলল, 'আমার আম্মা আমার সাথে কেন বিশ্বাসঘাতকতা করল?'

তুষার চমকাল। হেমলতা নামে মানুষটার সম্পর্কে যা জানল, তাতে তার নামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা শব্দটা যায় না। পরপরই নিজেকে সামলে নিল। এমন কেইস শত শত আছে। ভাল মানুষের খারাপ রূপ। তুষার সাবধানে প্রশ্ন করল, 'কী করেছেন তিনি?'

পদ্মজা উত্তর দিল না। ফ্লোরে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল। তুষার গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পদ্মজা এখন আর কিছু বলবে না। সে ক্লান্ত। অতীত হাতড়াতে গিয়ে মনের অসুস্থতা বেড়ে গেছে তার। তুষার পদ্মজার মুখের দিকে তাকাল। আঁচল সরে গেছে বুক থেকে। চাদরের অংশ ফ্লোরে পড়ে আছে। তুষার চাদরটা টেনে দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল, পদ্মজার গলায় কালো-খয়েরি মিশ্রণে কয়টা দাগ। গলা টিপে ধরার দাগ! তুষার হুংকার ছাড়ল, 'ফাহিমা?'

ফাহিমা কাছেই ছিল। ছুটে আসল। তুষার বলল, 'আপনি আসামীর গলা টিপে ধরেছেন?'

ফাহিমা চট করে বলল, 'না, স্যার। প্রথম থেকেই গলায় দাগ গুলো দেখছি। প্রশ্নও করেছি। মেয়েটা উত্তর দিল না।'

তুষার কপাল ভাঁজ করে ফেলল। হাজারটা প্রশ্নে মাথা ভনভন করছে। মস্তিষ্ক শূন্য প্রায়। পদ্মজা যতটুকু বলেছে তার পরবর্তী সাত বছরে কী কী হয়েছিল, না জানা অবধি শান্তি মিলবে না। মাথা কাজ না করলে তুষার সিগারেট টানে। তাই বেরিয়ে গেল।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট - ১৩

বাড়ির গিন্নির মতো কোমরে ওড়নার আঁচল গুঁজে রান্নাবান্না করছে পদ্মজা। হেমলতার কোমরে ব্যাথা। তিনি রান্না করতে চাইলেও পদ্মজা রাঁধতে দিল না। মোর্শেদও বললেন, 'বেদনা লইয়া রান্ধা লাগব না। তোমার মাইয়া যহন রানতে পারে তে হেই রান্ধক।'

শেষ অবধি হেমলতা হার মানলেন। পদ্মজা মাটির চুলায় মুরগি মাংস রান্না করছে। খড়ি বা লাকড়ি হিসেবে আছে বাঁশের মুড়ো। আগুনের শিখার রং নীলচে। শীতের মাঝে রান্নার করার শান্তি আলাদা। মুরগি মাংস রান্না হচ্ছে। আজ এতিম-মিসকিন খাওয়ানো হবে। হেমলতা বলেন, সামর্থ্য থাকলে মাসে একবার হলেও এতিম-মিসকিনদের খাওয়ানো উচিৎ। নয়তো ঘরে রহমত থাকে না। রান্না শেষ করে পদ্মজা হেমলতার কাছে এলো। বলল, 'আম্মা, রান্না শেষ।'

শুকনো মুখখানা তুলে তাকালেন হেমলতা। বললেন, 'তোর আব্বারে গিয়ে বল, আলী,মুমিন,ময়না তিনজনরে নিয়ে আসতে।'

পদ্মজা কিছু না বলে মাথা নিচু করে ফেলল। মোর্শেদের সাথে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে তার ভয় হয়। অনেকদিন বাজে ব্যবহার করেন না। হুট করে যদি করে ফেলেন। কষ্ট হবে। হেমলতা মৃদু হাসলেন। বললেন,'কিছু বলবে না। যা তুই।'

পদ্মজা দূর্বল গলায় বলল, 'সত্যি যাব?'

হেমলতা মাথা সামনে ঝুঁকে ইঙ্গিত করেন, যাওয়ার জন্য। পদ্মজা মোর্শেদকে উঠানেই পেল। মোর্শেদ চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছেন। পদ্মজা গুটিগুটি পায়ে হেঁটে আসল। আব্বা ডাকতে গিয়ে গলা ধরে আসছে তার। ঢোক গিলে ডাকল, 'আব্বা?'

মোর্শেদ তাকান। পদ্মজার মনে হলো বুকে কিছু ধপাস করে পড়ল। পদ্মজা দৃষ্টি অস্থির রেখে মিনমিনে গলায় বলল,'আম্মা বলছে, আলীদের নিয়ে আসতে।'

' রান্ধন শেষ?'

'জি, আব্বা।'

মোর্শেদ গলায় গামছা বেঁধে বেরিয়ে যান। পদ্মজা মোর্শেদের যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। অনুভূতিগুলো থমকে গেছে। পদ্মজার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসল। তাড়াতাড়ি ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। গাছ থেকে পাখির কিচিরমিচির শব্দ আসছে। সে সেদিকে তাকাল। তখনি হেমলতা ডাকলেন, 'পদ্ম।'

পদ্মজা ছুটে গেল। হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকে বলল, 'কিছু লাগবে আম্মা?'

'না। পূর্ণারা কোথায়?'

'ঘাটে।'

'কী করে?'

'মাছ ধরে।'

'বড়শি দিয়ে?'

'জালি দিয়ে।'

'এতো বড় মেয়ে নদীতে নেমে জাল দিয়ে মাছ ধরে! আচ্ছা, থাকুক। তুই আয়। বস আমার পাশে।'

পদ্মজা হেমলতার পায়ের কাছে বসল। পায়ে হাত দিল টিপে দেওয়ার জন্য। হেমলতা পা সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'লাগবে না।'

এরপর শাড়ির আঁচল দিয়ে পদ্মজার কপালের ঘাম মুছে দিলেন। বললেন, 'কোমরের ব্যাথাটা কমে আসছে। তোর আব্বা কিছু বলছে?'

'না, আম্মা। আচ্ছা আম্মা, আব্বা এতো পাল্টাল কী করে?'

হেমলতা মৃদু হাসেন। উদাস হয়ে টিনের দেয়ালে তাকান। এরপর বললেন, 'তোর বাপ ভালো মানুষ শুনছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর তার ভালমানুষি দেখিনি ভুলেও। কারণ, তার কানে, মগজে মন্ত্র দেয়ার মানুষ ছিল। অন্যের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখন আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না তাই পাল্টাচ্ছে। তোর বাপের ব্যক্তিত্ব নাই। নিজস্ব স্বকীয়তা নাই। অন্যের কথায় নাচে ভালো।'

শেষ কথাটা হেমলতা হেসে বললেন। পদ্মজা কিছু বলল না। হেমলতা শুয়ে পড়লেন। আজ সারাদিন বিশ্রাম নিবেন। আগামীকাল অনেক কাজ। অনেকগুলো কাপড় জমেছে।

'রূপ ক্ষণিকের, গুণ চিরস্থায়ী। শেষ বয়েসে এসে আব্বা বুঝছে।'

পদ্মজার শীতল কণ্ঠ এবং কথার তীরে হেমলতা ভীষণভাবে চমকালেন। তিনি সেকেন্ড কয়েক কথা বলতে পারলেন না। পদ্মজা চলে যাওয়ার জন্য উপক্রম হয়। হেমলতা অবিশ্বাস্য স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'এই খবর কোথায় শুনেছিস?'

পদ্মজা ঘাড় ঘুরে ফিরল। বলল, 'আমি তো তোমারই মেয়ে, আম্মা।'

পদ্মজা চলে গেল। রেখে গেল হেমলতার অবিশ্বাস্য চাহনি।

বিকেলবেলা হেমলতা ঘর থেকে বের হলেন। শরীরে শান্তি এসেছে। পূর্ণা বরই ভর্তা করছিল। পাশে প্রেমা। পদ্মজাকে দেখা গেল না। নিশ্চয়ই ঘাটে বসে আছে। প্রান্তও তো নেই। হেমলতা পূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পূর্ণা, প্রান্ত কোথায়?'

পূর্ণা কয়েক সেকেন্ড ভাবল কী উত্তর দিবে। এরপর ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'জানি না আম্মা।'

'জানস না কী? প্রেমা, প্রান্ত কই?'

প্রেমা সহজ স্বরে বলল, 'আমরা ঘাটে ছিলাম। প্রান্ত উঠানে ছিল। এরপর এসে দেখি নাই।'

হেমলতা গলা উঁচিয়ে বলেন, 'কোন মুখে বলছিস জানি না? একসাথে নিয়ে থাকতে পারিস না। একা ছাড়িস কেন? কোথায় গেছে ছেলেটা।'

পদ্মজা বাড়ির পিছন থেকে ছুটে আসল। হেমলতার ধমক ঘাট অবধি শোনা গেছে।

'কী হয়েছে?'

'প্রান্ত বাড়ি নাই। দুইটা এই কথা বলেও নাই। বসে বরই ভর্তা করে খাচ্ছে। দিন দিন অবাধ্য হচ্ছে মেয়েগুলো।'

পূর্ণা ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। প্রেমা হেমলতার ধমকে ভয় পাচ্ছে কিন্তু অতোটা না। হেমলতার মন কু গাইছে। তিনি নিজ রুমে যেতে যেতে পদ্মজাকে বললেন, 'বের হচ্ছি আমি। সাবধানে থাকবি।'

দুজন লোক প্রান্তকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। প্রান্তর কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। পদ্মজা হেমলতাকে ডাকল, 'আম্মা।' এরপর দৌড়ে এলো উঠানে। প্রান্ত কাঁদছে। হেমলতা ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে আসেন। প্রান্তকে আহত অবস্থায় দেখে ভড়কে যান। বুকটা হাহাকার করে উঠে। তিনি ছুটে আসেন। প্রান্তকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে লোক দুটিকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হয়েছে?'

একজন লোক বলল, 'পলাশ মিয়ার ছেড়ার লগে মাইর লাগছিল। হেই ছেড়ায় পাথথর দিয়া ইডা মারছে। আর ফাইট্টা গেছে।'

মোর্শেদ লাহাড়ি ঘরের সামনে গাছ কাটছিলেন। চেঁচামেচি শুনে এগিয়ে আসেন। প্রান্তকে এমতাবস্থায় দেখে লোক দু'টিকে তেজ নিয়ে বললেন, 'কোন কুত্তার বাচ্চায় আমার ছেড়ারে মারছে? কোন বান্দির ছেড়ার এতো বড় সাহস?'

মোর্শেদ উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। প্রান্তকে নিয়ে ছুটে যান বাজারে। হেমলতা রয়ে গেলেন বাড়িতে। বাজারে আজ হাট বসেছে। মোর্শেদ হেমলতাকে নিষেধ করেছেন সাথে যেতে। বাড়িতে থেকে হেমলতা হাঁসফাঁস করতে থাকেন। প্রান্ত একা বড় হয়েছে। কতবার কতরকম আঘাত পেয়েছে। দেখার কেউ ছিল না। তাই মিনমিনিয়ে কেঁদেছে। এমন বাচ্চা ছেলের এতো বড় আঘাত পেয়ে চেঁচিয়ে কাঁদার কথা। কষ্ট তো আর কম পায়নি! দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। হেমলতার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পদ্মজা ঘরে লুকিয়ে কাঁদছে। পূর্ণা, প্রেমা বাড়ির বাইরে বার বার উঁকি দিয়ে দেখছে, মোর্শেদ প্রান্তকে নিয়ে ফিরল নাকি!

দেখতে দেখতে চলে এলো মেট্রিক পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্র শহরে। যেতে লাগে ছয় ঘন্টা। বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দেয়া অসম্ভব। পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশেই মোর্শেদের মামা বাড়ি। মামা নেই। মামাতো ভাইয়েরা আছে। কথাবার্তা বলে, সেখানেই দেড় মাসের জন্য হেমলতা আর পদ্মজা উঠল। মোর্শেদ বাকি দুই মেয়ে আর প্রান্তকে নিয়ে বাড়িতে রয়ে গেছেন। হেমলতা পদ্মজাকে নিয়ে আসার পূর্বে এসে দেখে গেছেন, পরিবেশ কেমন। মোর্শেদের দুই মামাতো ভাইয়ের মধ্যে একজন রাজধানীতে থাকে। আরেকজনের বয়স হয়েছে অনেক। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে একাই থাকেন। ছেলেরা শহরে চাকরি করে। পদ্মজার জন্য উপযুক্ত স্থান। তাই আর অমত করেননি।

মোর্শেদের যে ভাইটি বাড়িতে আছেন, তার নাম আকবর হোসেন। ষাটোর্ধ বয়সের একজন মানুষ। তবে আকবর হোসেনের স্ত্রী জয়নবের বয়স খুব কম। হেমলতার বয়সী। হেমলতা আকবর হোসেনকে ভাইজান বলে সম্বোধন করেন। দালান বাড়ি। বেশিরভাগ সময় বিদ্যুৎ থাকে। ফলে, পদ্মজা মন দিয়ে পড়তে পারছে। পরীক্ষাও ভাল করে দিচ্ছে। হেমলতা আকবর হোসেনের দৃষ্টি অনুসরণ করেছেন। শীতল প্রকৃতির লোক। তিনি নিশ্চিন্তে বিশ্বাসী লোক।

রাতের খাবার আকবর হোসেনের সাথেই খেতে হয়। হেমলতা দেড় মাসের খাওয়ার খরচ নিয়ে এসেছেন। আকবর হোসেন কিছুতেই আলাদা রাঁধতে দিচ্ছেন না। এভাবে অন্যের বোঝা হয়ে থাকতে হেমলতার আত্মসম্মানে লাগে। তিনি কথায় কথায় জানতে পারেন, আকবর হোসেন এবং জয়নবের নকশিকাঁথা খুব পছন্দ। তাই তিনি নকশিকাঁথা সেলাই করছেন। যতক্ষণ পদ্মজা পরীক্ষা দেয় ততক্ষণ হেমলতা কেন্দ্রের বাইরে কোথাও বসে বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন।

অনেক রাত অবধি পদ্মজা পড়ে। আজ অনেকক্ষণ ধরে সে কী যেন ভাবছে। হেমলতা ব্যাপারটা খেয়াল করেন। পদ্মজার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করেন, 'পদ্ম, কী ভাবছিস?'

পদ্মজা এক নজর হেমলতাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল। হেমলতা তাকিয়ে আছেন, জানার জন্য। পদ্মজা দ্বিধা নিয়ে বলল, 'রাগ করবে না তো?'

হেমলতা পদ্মজাকে পরখ করে নিলেন। এরপর বললেন, ' কী জানতে চাস?'

পদ্মজা এদিক-ওদিক চোখ বুলায়। কীভাবে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। দুই মিনিট পর নিরবতা ভেঙে বলল,' দুপুর থেকে আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, হানিফ মামাকে কে মারল। তোমার সাথে মামার কী কথা হয়েছিল? হানিফ মামাকে... মানে তুমিতো অন্য কারণে গিয়েছিলে। কিন্তু ফিরে এলে। খুনও হলো। আমি সবসময় এটা ভাবি। কখনো উত্তর পাই না। মনে মনে অনেক যুক্তি সাজাই। কিন্তু যুক্তিগুলো মিলে না। খাপছাড়া, এলোমেলো।'

'কাল পরীক্ষা। আর আজ এসব ভেবে সময় নষ্ট করছিস।'

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। তবুও পদ্মজা ভয় পেয়ে গেল। তবে কিঞ্চিৎ আশা মনে উঁকি দিচ্ছে।

#পদ্মজা

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ##আমিপদ্মজা পাট- ১৪

চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে হুইসেলের শব্দ। গভীর রাতের ট্রেন ছুটে চলেছে গন্তব্যের দিকে। আরেকটা আওয়াজও আসছে। কাছে কোথাও নেড়ি কুকুরের দল ঘেউঘেউ করছে। পদ্মজা ইংরেজি বইয়ের দিকে চোখ রেখে মিনমিনে স্বরে বলল,'পরীক্ষা তো কালদিন পর।'

হেমলতা খোলা চুল মুঠোয় নিয়ে হাত খোঁপা করেন। এরপর বললেন,'কাল আর কালদিন পর একই হলো।'

পদ্মজা চুপ হয়ে গেল। এমন ভান ধরল যেন সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। হেমলতা চোখ ছোট করে পদ্মজাকে দেখছেন। মেয়েটা পড়ায় মনোযোগ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু সফল হতে পারছে না। বার বার নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে টিপছে।

'পদ্ম, ছাদে যাবি?'

হেমলতার এহেন প্রস্তাবে পদ্মজা একটু অবাক হলো। নাকের পাটা হয়ে গেল লাল। এতে নাক লাল হওয়ার কী আছে জানা নেই। পদ্মজা কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। হেমলতা আবার বলেন,'যাবি?'

পদ্মজা টেবিল থেকে প্রফুল্লচিত্তে ছুটে এলো। বলল,'যাব।'

আকবর হোসেনের বাড়িটির নাম সিংহাসনকুঞ্জ। বাড়ির নাম এমনটা হওয়ার কারণ ছাদে না গেলে জানা সম্ভব নয়। মা-মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে উঠছে। তাদের পায়ের শব্দ মোহময় ছন্দ তুলে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। অথবা মিলে যাচ্ছে চাঁদের আলোর সাথে একাকার হয়ে। ছাদের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সিংহাসন। তা দেখে পদ্মজার চক্ষু চড়কগাছ। বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল,'আম্মা! এত বড় সিংহাসন কার?'

হেমলতা পদ্মজার মুখের ভাব দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। তিনি দুইদিন আগে এই সিংহাসন আবিষ্কার করেছেন। আকবর হোসেনের কাছে প্রশ্ন করেছেন, ঠিক পদ্মজার মতো করেই। আকবর হোসেনের উত্তর হেমলতা পুনরাবৃত্তি করলেন,' তোর আকবর কাকার আব্বু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের। উনার ইচ্ছে

ছিল,নিজের বাড়ির ছাদে একটা সিংহাসন করার। শেষ বয়সে এসে ইচ্ছে পূরণ করেন। দিনরাত নাকি রাজকীয় ভঙ্গীতে সিংহাসনে বসে থাকতেন। মৃত্যুও হয় সিংহাসনে ঘুমানো অবস্থায়।'

পদ্মজা হা অবস্থায় স্থির হয়ে রইল। সে সিংহাসন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ময়ূর সিংহাসন! সিংহাসন যেন পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ইট-সিমেন্টের তৈরি সিংহাসন। অনেক বড় দেখতে। পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্যের বা আরো বেশি হবে। হেমলতা বলেন,'মোঘল সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনের মতো সিংহাসনের স্বপ্ন বোধহয় তিনি দেখতেন। অর্থের জন্য পারেননি।'

হেমলতার কথা পদ্মজা শুনল নাকি বোঝা গেল না। পদ্মজা অনুরোধ করে অন্য কথা বলল, 'আম্মা, সিংহাসনে বসো তুমি।'

এক কথায় হেমলতা সিংহাসনে বসেন। এরপর পদ্মজাকে ডাকেন পাশে এসে বসতে। পদ্মজা আসল না। দূর থেকে বলল, 'মাঝে বসো আম্মা।'

'কী শুরু করেছিস।'

'বসো না।'

হেমলতা কপাল কুঁচকে সিংহাসনের মাঝে বসেন। পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটে আবার হারিয়ে গেল। বলল,'আরেকটু বাকি।'

'কি বাকি?'

'বাম পায়ের উপর ডান পা তুলে রানিদের মতো বসো।'

হেমলতা বিরক্তি নিয়ে উঠে পড়েন। পদ্মজাকে বলেন,'পাগলের প্রলাপ শুরু করেছিস!'

পদ্মজা নাছোড়বান্দা হয়ে দৃঢ়ভাবে বলল,'আম্মা, বসো না। নইলে আমি কাঁদব।'

পদ্মজার এমন কথায় হেমলতা হাসবেন না রাগবেন ঠাওর করতে পারলেন না। রাতের সৌন্দর্য, রাতের মায়াবী রূপ প্রতিটি মানুষের ভেতরের আহ্লাদ, ইচ্ছে, কষ্ট, ঠেলেঠুলে বের করে আনার ক্ষমতা বোধহয় নিজে আল্লাহ সাক্ষাৎ করে দিয়েছেন। তাই হেমলতা তার নিজের শক্ত খোলসে ফিরতে পারলেন না। পদ্মজার পাগলামোর সুরে সুর মিলিয়ে তিনি সিংহাসনে রাজকীয় ভঙ্গীতে বসেন। পদ্মজার কেমন কেমন অনুভূতি হয়। বুকের ভেতর ঝিরিঝিরি কাঁপন। এইতো তার কল্পনার রাজ্যের রাজরানি হেমলতা। এবং তার কন্যা সে পদ্মজা। চোখের মণিকোঠায় ভেসে উঠল একটি অসাধারণ দৃশ্য। হেমলতার সর্বাঙ্গে হীরামণি-মুক্তার অলংকার। অসম্ভব সুন্দর শ্যামবর্ণের এই সাহসী নারীকে দেখতে কতশত দেশ থেকে মানুষ ভীড় জমিয়েছে। আর সে হেমলতার পাশে বসে আছে। চারিদিকে ঢাকঢোল পিটানো হচ্ছে। হাতিশাল থেকে হাতির হুংকার আসছে। তারাও যেন খুশি এমন রানি পেয়ে।

'তোর পাগলামি শেষ হয়েছে?'

পদ্মজা জবাব দিল না। হেমলতার পাশে এসে বসল। কোলে মাথা রেখে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। এরপর আক্ষেপের স্বরে বলল,'আম্মা, তুমি রানি আর আমি রাজকন্যা কেন হলাম না। সবাই আমাদের ভালোবাসত। সম্মান করতো। মুগ্ধ হয়ে দেখতো।'

হেমলতার বুক চিঁরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল। সমাজ কেন তার প্রতিকূলে থাকল? কেন পদ্মজা ছোট থেকে সমাজের কারোর মেয়ের সাথে মেশার অধিকার পেল না? তিনি বললেন,'জন্ম যেভাবেই হউক। জীবনে সফলতা না এনে মৃত্যুতে ঢলে পড়া ব্যক্তির ব্যর্থতা। তুই এমন জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা কর যাতে মানুষ সম্মান করে। সম্মান করতে বাধ্য হয়। চোখ তুলে তাকাতেও যেন ভয় করে। যারা দূরছাই করেছে তাদের যেন বিবেকে বাঁধে।'

'পারব আমি?'

'কেনো পারবি না? পুরো জীবন তো দুঃখে,অবহেলায় যায় না।'

'তোমার জীবন থেকে এতোগুলো বছর দুঃখে আর অবহেলায় তো গেছে আম্মা।'

হেমলতা কিছু বলতে পারলেন না। তিনি জীবনে কী পেয়েছেন? উত্তরটা চট করে পেয়ে গেলেন। পদ্মজাকে বলেন,'আমার মেয়ে তিনটা আমার সফলতা। আমার অহংকার। প্রেমা তো ছোট। তোরা দুইজন নিজেদের মতো

থাকিস, পড়িস, কোনো দুর্নাম নাই। এজন্য মানুষ বলে, এইযে এরা হচ্ছে হেমলতার মেয়ে। তখন আমার অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যায়।'

পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল,'কখনো ভুল কাজ করব না আম্মা। তোমাদের সম্মান আমাদের জন্য আংশিকও নষ্ট হতে দেব না।'

হেমলতা পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে মাঝে মাঝে পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাখ-পাখালির ডানা নাড়ার শব্দ ভেসে আসছে। পদ্মজা চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে একটা চাঁদ, অগণিত তারা। আকাশকে তারায় পরিপূর্ণ একটি কালো গালিচার মত লাগছে। হেমলতা বিভ্রম নিয়ে বললেন,'সমাজের সাথে আমার সখ্যতা কখনো হয়ে উঠেনি। কালো রংয়ের দোষে। প্রকৃতির মতিগতি অবস্থা দেখে দেখে আমার সময় কাটে। আব্বা শিক্ষক ছিলেন বলে, কালো হয়েও পড়ার সুযোগ পাই। অবশ্য আব্বার সামর্থ্যও ছিল। আমাদের সব ভাই-বোনকে পড়িয়েছেন। আম্মা আমাকে পড়ানোতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। রং কালো। কেউ বিয়ে করবে না। একটু পড়ালেখা থাকলে হয়তো করবে,সেই আশায়। যখন আমি তোর বয়সে ছিলাম বড় আপার মেয়ে হয়। মেয়েটার গায়ের রং কালো। শ্বশুর বাড়িতে তুলকালাম কান্ড। বংশের সবাই ফর্সা। বাচ্চা কেন কালো হলো। আপাকে বের করে দিল। আপা বাপের বাড়ি ফিরল। সমাজের কতো কটুক্তি কথা হজম করেছে আপা। তখন আমি নামাযের দোয়ায় আকুতি করে চাইতাম একটা সুন্দর মেয়ের। আমার বিয়ে হলে,মেয়েটা যেন পরীর মতো সুন্দর হয়। আমার মতো অবহেলার পাত্রী যেন না হয়। বড় আপার মতো কালো মেয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে যেন না হয়। তুই যখন পেটে,এবাদত বাড়িয়ে দেই। পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাদে সময় পেলেই সেজদায় লুটিয়ে আল্লাহকে একই কথা বলতাম। আমার পরীর মতো মেয়ে চাই। দোয়া কবুল হলো। তোর যেদিন জন্ম হয়, সবাই অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই ছিল। আমি তো খুশিতে কেঁদেই দিয়েছিলাম। এতো সুন্দর বাচ্চা এই গ্রামে কেন, পুরো দেশেও বোধহয় ছিল না। চোখের পাপড়ি যেন ভ্রুতে এসে ঠেকছিল। ঠোঁট এতো লাল ছিল। যেন ঠোঁট বেয়ে রক্ত ঝরছে। সদ্য জন্মানো শিশুর মাথা ভর্তি ঘন কালো রেশমি চুল।অলন্দপুরের সবার কাছে ছড়িয়ে পরে এই কথা। দল বেঁধে দেখতে আসে। এক সপ্তাহ বেশ তোড়জোড় চলে। কী খুশি ছিলাম আমি। সারাক্ষণ তোকে চুমোতাম। রাতেও ঘুমাতে ইচ্ছে করত না। মনে হতো এই বুঝি আমার পরীর মতো মেয়ে চুরি হয়ে গেল। তোর আব্বা সারাক্ষণ খুশিতে বাকবাকম করতো। বাইরে থেকে এসে গোসল ছাড়া কোলে নিত না। যখন কোলে নিত বার বার আমাকে বলতো, 'ও লতা। ছেড়িডা মানুষ না শিমুল তুলা।'

হেমলতা থামেন। চোখ তার ছলছল। পদ্মজা বলল,'তারপর?'

'কেউ বা কারা ছড়িয়ে দিল তুই তোর বাপের মেয়ে না। যুক্তি দাঁড় করাল। বাপ,মা কালো মেয়ে এতো সুন্দর কেন হবে? গ্রামের প্রায় সব মানুষ অশিক্ষিত। তাই বিবেচনা ছাড়াই বিশ্বাস করে নিল। '

হেমলতা চুপ হয়ে যান। পদ্মজা টের পেল হেমলতা কিছু একটা লুকিয়েছেন। শুধু গ্রামের মানুষ বললেই এতো বড় দাগ লেগে যায় না কপালে। অন্য কোনো কারণ আছে। যা যুক্তি হিসেবে শক্ত ছিল। হেমলতা দম নিয়ে বলেন,'একা হয়ে যাই। তোর বাপ সরে গেল। সমাজ সরে গেল। আঁতুড়ঘরে একা সময় কাটাতে থাকি। তোকে দেখলেই মনে হতো, আল্লাহ নিজের কোনো মূল্যবান সম্পদ আমাকে দেখে রাখতে দিয়েছেন। আমি অন্য আমি হয়ে যাই। খোলসটা পাল্টে যেতে থাকে। রাত জেগে স্বপ্ন সাজাই। তোর সাথে ফুল কুড়নোর স্বপ্ন দেখি। ফুল গাছ লাগাই। যখন তোর চার বছর হয় বাড়ি ভরে যায় ফুলগাছে। ছোট শাড়ি পরিয়ে প্রতিদিন মা-মেয়ে মিলে ফুল তুলে মালা গেঁথেছি। নিশুতি রাতে পাকা ছাদে জোছনা পোহানোর স্বপ্ন ছিল। আজ পূরণ হলো। আর দুইটা ইচ্ছে বাকি, সাগর জলে মা-মেয়ে পা ডুবিয়ে পুরো একটা বিকেল কাটাব। আর, শেষ বয়সে নাতি-নাতনীদের নিয়ে তাদের মায়ের জীবনি বলব।'

পদ্মজা দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হেমলতার কোমর। তিনি টের পান পদ্মজা ফোপাঁচ্ছে। উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,'পদ্ম, কাঁদছিস কেন?'

পদ্মজা বাচ্চাদের মতো কাঁদতে থাকল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আমাকে কখনো একা থাকতে দিও না আম্মা। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। তোমার মতো কেউ হয় না।'

'এজন্য কাঁদতে হয়?আমি সবসময় তোর সাথে আছি। কান্না থামা। কী মেয়ে হয়েছে দেখ! কেমন করে কাঁদছে। পদ্ম, চুপ...আর না...মারব এবার...পদ্ম।'

পদ্মজা থামে। কিন্তু ছটফটানি হচ্ছে ভেতরে। কেন এমন হচ্ছে জানে না। কিন্তু হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে। আকাশ ভরা রাতের দিকে তাকিয়ে ভয় হচ্ছে। একটু আগেই সুন্দর লাগছিল এই আকাশ। আচমকা ভয়ংকর মনে হচ্ছে। মায়ের

কোল ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, চারিদিকে অশরীরীদের ভীর। তাদের কোলাহলে মস্তিষ্ক ফেটে যাচ্ছে। পদ্মজা মায়ের কোলে মুখ লুকালো।

'পদ্ম,ঘুমিয়ে পড়েছিস?'

'না আম্মা।'

'সেদিন মাঝ রাত্রিরে ছুরি নিয়ে বের হয়েছিলাম। হানিফের ঘরটা আব্বা,আম্মার ঘর থেকে দূরে হওয়াতে সুবিধা ছিল। হানিফের ঘরের পাশে গিয়ে দেখি মদনও ঘরে। দুজনকে সামলানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই অপেক্ষা করতে থাকি মদন কখন যাবে। এরপর আরেকজন লোক আসে। একটু দূরে সরে যাই। গোয়ালঘরের পিছনে। মিনিট কয়েক পর উঁকি দিয়ে দেখি দরজা লাগানো। সাড়াশব্দ নেই। সাবধানে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখি হানিফ নেই। তখন হয়তো আম্মা দেখছে। তাই ভাবছে আমি খুন করেছি।'

'নানু কেন এমন ভাবল? হানিফ মামা তো তোমারই ভাই।'

হেমলতা তাৎক্ষণিক জবাব দিলেন না। সময় নিয়ে একটা গোপন সত্যি বললেন,'আমি তোর নানুর ভাইকে খুন করেছি। তাই তিনি আমাকে ঘৃণা করেন। ভয় পান। সন্দেহ করেন।'

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। পদ্মজা চমকে উঠে বসল। মুখখানা হা অবস্থায় স্থির হয়ে গেল হেমলতার দিকে। দৃষ্টি গেল থমকে। হেমলতা পদ্মজাকে সামলে নিতে সময় দেন। দূরের রাতের আকাশে চোখ রাখেন। পদ্মজা নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে বলল,'তিনি কী হানিফ মামার মতো ছিলেন?'

হেমলতা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ান। সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ। হেমলতা সাবধান হয়ে যান। পদ্মজাকে আড়াল করে দাঁড়ান। সেকেন্ড কয়েক পর একটা ছেলের দেখা মিলল। অচেনা মুখ। হেমলতা আগে কখনো দেখেননি। ছেলেটিও তাদের দেখে ভড়কে গেল।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ১৫

ভোর বেলার সূর্য উদয়ের সময় পরিবেশে মৃদু সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ল। ট্রেনের জানালা দিয়ে সূর্যের আগুনরঙা আলো পদ্মজার মুখশ্রী ছুঁয়ে দিল। ফজরের নামায পড়ে ট্রেনে উঠেছে তারা। গন্তব্য অলন্দপুর। পদ্মজার মেট্রিক শেষ হলো আজ তিন দিন। হেমলতার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল পদ্মজা। পুরো দেড় মাস পর পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্তর দেখা পাবে। খুশিতে আত্মহারা সে।

মাঝে একটু জিরিয়ে ফের চলছে ট্রেন। হেমলতা জানালার বাইরে তাকিয়ে আকাশ দেখছেন। কারণে, অকারণে তিনি এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। শুষ্ক চক্ষুদ্বয় যখন তখন সজল হয়ে উঠে। কিছুতেই বারণ মানে না। নীল আকাশের বুকে যেন সেদিন রাতের স্মৃতি আকার নিয়ে ভেসে উঠল। ছেলেটার বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর হবে। অবাক চোখে তাকিয়েছিল। দেখতে বেশ ভাল। হেমলতা পদ্মজাকে আড়াল করে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি?'

ছেলেটি হেমলতার কথার ধরনে বিব্রতবোধ করল।ইতস্তত করে বলল,'মুহিব, মুহিব হোসেন।'

হেমলতার টনক নড়ল। তিনি সাবধানে জিজ্ঞাসা করলেন,'বারেক হোসেন তোমার বাবা?'

মুহিব ভদ্রতা সহিত বলল,'জ্বি।'

হেমলতা কী যেন বলতে চেয়েছিলেন,বলতে পারলেন না। তার আগে মুহিব বলল,'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি আসছি।' এরপরই হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। সেদিন আর রাত জাগা হলো না। ছাদ থেকে নেমে গেল তারা। গোপন বৈঠকে একবার বাঁধা পড়লে আর মন সায় দেয় না আলোচনা চালিয়ে যেতে। অনুভূতি গুলো ভোতা হয়ে যায়।

এরপরদিন জানা গেল, মুহিব তার পিতার সাথে রাগ করে ঢাকা ছেড়ে চাচার বাড়ি উঠেছে। এখনকার ছেলে-মেয়েদের ক্ষমতা খুব। তারা খুব সহজ কারণে মা-বাবার সাথে রাগ করে দূরে সরে যেতে পারে। হেমলতা অবজ্ঞায়

কপাল কুঞ্চিত করতে সঙ্কোচবোধ করলেন না। পরে অবশ্য বুঝেছেন, মুহিব খুবই ভাল ছেলে। নম্র,ভদ্র,জ্ঞানী। মেধাবী ছাত্র। বিএ পড়ছে। সবচেয়ে ভাল গুণ হলো, মুহিবের নজর সৎ। হেমলতা চোখের দৃষ্টি চিনতে ভুল করেন না। ঠিক সতেরো দিন পর বারেক হোসেন ছেলেকে নিতে আসেন। যেদিন আসেন এরপরদিন রাতে হেমলতাকে প্রস্তাব দেন। মুহিবের বউ হিসেবে পদ্মজাকে নিতে চান। হেমলতা অবাক হোন। মুহিব মনে মনে পদ্মজার উপর দূর্বল অথচ বোঝা গেল না। নিঃসন্দেহে মুহিব পাত্র হিসেবে উপযুক্ত। মুহিবের বড় দুই ভাই মুমিন, রাজীব। দুজনই চাকরিজীবী। মুমিন বিয়ে করে বউকে ডাক্তারি পড়াচ্ছে। সমর্থনে আছে পুরো পরিবার। অতএব বোঝা গেল, পরিবারের প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্ক, ভাবনা উচ্চ মানের। বারেক হোসেন বিয়ের প্রস্তাবের সাথে এটিও বলেছেন,'আমার মেয়ে নেই। ছেলের বউরাই আমার মেয়ে। আপনার মেয়ের যতটুকু ইচ্ছে পড়বে। কোনো বাঁধা নেই।'

হেমলতা প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন না। তিনি আনন্দ সহিতে জবাব দিলেন,'পদ্মজা আইএ শেষ করুক। এরপরই না হয়।'

বারেক হোসেন হেসে বলেন,'তাহলে এটাই কথা রইল।'

স্মৃতির পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন হেমলতা। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। গলাটা কাঁপছে। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। ব্যাগ থেকে বোতল বের করে পানি পান করলেন।

প্রেমা,প্রান্ত বাড়ির বাইরে সড়কে পায়চারি করছে। পূর্ণা গেইটের আড়াল থেকে বার বার উঁকি দিয়ে দূর রাস্তা দেখছে। মোর্শেদ হেমলতা আর পদ্মজাকে আনতে গঞ্জে সেই কখন গেল, এখনো আসছে না। পুরো দেড় মাস পর মা-বোনের সাক্ষাৎ পাবে তারা। হৃদপিণ্ড দ্রুতগতিতে চলছে। মিনিট পাঁচেক পর কাঁচা সড়কের মোড়ে মোর্শেদের পাশে কালো বোরখা পরা দুজন মানুষকে দেখতে পেল তারা। পূর্ণা লাজলজ্জা ভুলে আগে আগে ছুটে গেল। পিছনে প্রান্ত এবং প্রেমা। ছুটে এসে মা-বোনকে একসাথে জড়িয়ে ধরে প্রবল কণ্ঠে কেঁদে উঠল পূর্ণা। হেমলতা পূর্ণাকে ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি করা দোষের নয়। পদ্মজার চোখ বেয়েও টপটপ

করে জল পড়ছে। প্রায় প্রতিটা রাত সে ভাই বোনদের মনে করেছে। বিশেষ করে পূর্ণাকে বেশি মনে পড়েছে। মনে হচ্ছে কত শত বছর পর দেখা হলো। আর পূর্ণা বাড়ির আনাচে কানাচে পদ্মজার শূন্যতা অনুভব করেছে। সে অশ্রুসিক্ত চোখ মেলে তাকাল পদ্মজার দিকে। এরপর আবার জড়িয়ে ধরে বলল,'আপা, আমার এতো আনন্দ হচ্ছে। এতো আনন্দ কখনো হয় নাই।'

পদ্মজার কোমল হৃদয় পূর্ণার ভালবাসা দেখে বিমোহিত হয়ে উঠল। সে স্নেহার্ধ কণ্ঠে বলল,'আমার সোনা বোন। আর কাঁদিস না।'

পূর্ণা চোখের জল দ্রুত মুছল। প্রফুল্লচিত্তে বলল,' আপা, আমি তোমার পছন্দের চিংড়ি মাছ দিয়ে লতা রেঁধেছি।'

পদ্মজা অবাক চোখে তাকাল। হেমলতা প্রশান্তিদায়ক সুখ অনুভব করলেন। এক বোনের প্রতি আরেক বোনের নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখে। পদ্মজা বাকহারা হয়ে পূর্ণার দুই গালে চুমো দিল। মোর্শেদ দৃশ্যটি মুগ্ধ হয়ে দেখেন। এরপর তাড়া দেন, 'দেহো মাইয়াডির কারবার। মানুষ আইতাছে। আর হেরা রাস্তায় কান্দাকাটি লাগাইছে। হাঁট সবাই,হাঁট।'

খাওয়া দাওয়া শেষ করে চার ভাই বোন ঘাটে গিয়ে বসল। দেড় মাসে কী কী হলো, না হলো সব পূর্ণা বলছে। প্রেমা পূর্ণার নামে বিচার দিল। প্রান্ত প্রেমার নামে বিচার দিল। প্রান্ত কেন বিচার দিল, তা নিয়ে প্রেমা বাকবিতন্ডা লাগিয়ে দিল। সে কী কান্ড! দুজন তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। এরপর দুজনই বিচার নিয়ে গেল হেমলতার কাছে। তখন পদ্মজা শুষ্ককণ্ঠে পূর্ণাকে বলল,'জানিস পূর্ণা, আম্মা আমার বিয়ে ঠিক করছে।'

পূর্ণা ভীষণ চমকাল। চমকিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,'কবে? কার সাথে?'

'যে বাড়িতে ছিলাম ওই বাড়ির ছেলের সাথে। বিএ পড়ছে। আমার আইএ শেষ হলে বিয়ের তারিখ পড়বে।'

'আপা, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আম্মার না ইচ্ছে তোমাকে অনেক পড়াবে। তোমার চাকরি হবে।'

পদ্মজা চুপ থাকল ক্ষণকাল। এরপর বলল,'আম্মার কী যেন হয়েছে। পাল্টে গেছেন।'

'কী রকম?'

'আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বেশিরভাগ কথা এড়িয়ে যান। আমার ভবিষ্যত নিয়ে আগের মতো আগ্রহ দেখান না। আমি কথা তুললে এড়িয়ে যান। গল্প করেন না। মানে,আগের মতো নেই।' কথাগুলো বলতে গিয়ে পদ্মজার গলা কিঞ্চিৎ কাঁপল।

'সেকী!'

'সত্যি।'

'কিছু হয়েছে ওখানে?'

'না। আমি যতটুকু জানি তেমন কিছুই হয়নি।'

পূর্ণা সীমাহীন আশ্চর্য হয়ে চিন্তায় ডুবল। পদ্মজা শূন্যে তাকিয়ে রইল। লিখন শাহ নামে মানুষটার কথা মনে পড়ছে। তিনি যখন শুনবেন এই খবর, সহ্য করতে পারবেন? সত্যি ভালবেসে থাকলে সহ্য করতে কষ্ট হবে নিশ্চয়ই। পূর্ণা দ্বিধাভরে প্রশ্ন করল, 'আপা, লিখন ভাইয়ের কী হবে?'

পদ্মজা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকাল। বলল, 'আমি তাকে বলেই দিয়েছি, আম্মা যা বলবেন তাই হবে।'

পূর্ণার বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল। তার আপার মতো সুন্দরীকে শুধুমাত্র লিখন শাহর পাশেই মানায়। কত স্বপ্ন দেখল সে, লিখন শাহ এবং পদ্মজাকে নিয়ে। সব স্বপ্নে গুড়ো বালি। সে কাতর কণ্ঠে বলল, 'লিখন ভাইয়ের সাথে তোর বিয়ে না হলে আমি কষ্ট পাব খুব।'

'আমিতো আম্মার কথার বাইরে যেতে পারব না।'

পূর্ণা গলার স্বর খাদে এনে বলল,'যদি লিখন ভাই রাজি করাতে পারে?'

পদ্মজা অবিশ্বাস্য দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। সেই দৃষ্টি যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে, এ হওয়ার নয়! পূর্ণা কপাল কুঁচকে ফেলল। বিরক্তিতে বলে উঠল,'ধ্যাত!'

বাতাসটা গরম গরম ঠেকছে। ক্রমশ মাথা ব্যাথা বেড়ে চলেছে। এতো এতো গাছগাছালি চারিদিকে তবুও এতটুকুও শীতলতা নেই পরিবেশে। হেমলতা আলমারির কাপড় গুছিয়ে বিছানার দিকে তাকালেন। মোর্শেদ এই রোদ ফাটা দুপুরে কখন থেকে ঝিম মেরে বিছানায় বসে আছে। মুখখানা বিমর্ষ, চিন্তিত। হেমলতা প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'কোনো সমস্যা?'

মোর্শেদ তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। হেমলতা তাকিয়ে রইলেন জবাবের আশায়। ক্ষণকাল সময় নিয়ে মোর্শেদ বললেন,'বাসন্তী এই বাড়িত আইতে চায় থাকবার জন্যে।'

হেমলতার চোখ দু'টি ক্রোধে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। নির্বিকার কণ্ঠে বলেন,'তোমার ইচ্ছে হলে নিয়ে এসো। বাড়ি তো তোমার।'

মোর্শেদ চকিত চোখে তাকান। তিনি ভেবেছিলেন হেমলতা রাগারাগি করবে। মোর্শেদের চোখ দু'টির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ রূপ নিল। কিড়মিড় করে হেমলতাকে বলেন, 'আমি তারে চাই না।'

হেমলতা ঠাট্টা করে হাসলেন। বললেন,'বিশ বছর সংসার করে এখন তাকে চাও না! আমি হলে মামলা ঠুকতাম।'

মোর্শেদ আহত মন নিয়ে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। চোখ দুটিতে অসহায়ত্ব স্পষ্ট। হেমলতা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে সরে পড়েন। মোর্শেদ তখন কপট রাগ নিয়ে নিজে নিজে আওড়ান,'আমারে ডর দেহায়। মা*ডারে খুন করতে পারলে জীবনে শান্তি পাইতাম।'

হেমলতা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান। মোর্শেদকে পরখ করে নেন। রাগে ছটফট করছে মোর্শেদ। বাসন্তীর প্রতি তার এতো রাগ কেন? তিনি দু পা এগিয়ে আসেন। বললেন,'ভালোবাসার মানুষকে এভাবে গালি দিয়ে ভালোবাসা শব্দটির সম্মান খুইয়ে দিও না। '

'আমি তারে কোনকালেও ভালোবাসি নাই। বাসলে তোমারে বাসছি।'

হেমলতা ভীষণ অবাক হয়ে, চোখ তুলে তাকান। ভোতা অনুভূতি গুলো মুহূর্তে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল। মোর্শেদ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। দৃষ্টি অস্থির। বিছানা থেকে নেমে, গটগট পায়ে বেরিয়ে যান। হেমলতা মোর্শেদের যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকেন,ঝাপসা চোখ মেলে। এই মানুষটার থেকে এই একটি শব্দ শোনার জন্য একসময় কত পাগলামি করেছেন তিনি। কত কেঁদেছেন। আকুতি, মিনতি করেছেন। সত্য হোক কিংবা মিথ্যে হেমলতার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। বয়সটা কম হলে আজ তিনি অনেক পাগলামি করতেন,অনেক!

____

পূর্ণার ভীষণ জ্বর। তাই পূর্ণাকে নানাবাড়ি রেখেই পদ্মজা বাড়ি ফিরল। সাথে এলো হিমেল, প্রান্ত,প্রেমা। বাড়িজুড়ে ছোটাছুটি করে লাউ,শিম,লতা,পুঁইশাক বন্দোবস্ত করল। হিমেল বাজার থেকে মাছ এনে দিল। বাড়িতে শুটকি ছিল। আজ হেমলতা আর মোর্শেদ ফিরবে। তাই এতো আয়োজন। দুই দিন আগে ঢাকা গেলেন তারা। হেমলতার বড় বোন হানির মেজো মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। হানি বলেছেন,হেমলতা না গেলে তিনি বিয়ের তারিখ ফেলবেন না। তাই বাধ্য হয়ে হেমলতা গিয়েছেন। তবে,পদ্মজার খটকা লাগছে শুরু থেকে। তার মা তাকে রেখে পাশের

এলাকায় যেতেও আপত্তি করেন। আর আজ দু'দিন ধরে তিনি মাইলের পর মাইল দূরে পদ্মজাকে ছাড়া রয়েছেন। এসব এখন ভাবার সময় নয়। পদ্মজা যত্ন করে কয়েক পদের রান্নার প্রস্তুতি নিল। সকাল থেকে সূর্যের দেখা নেই। পরিবেশ ঠান্ডা,স্তব্ধ। এ যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। প্রান্ত-প্রেমা উঠান জুড়ে মারবেল খেলছে। হিমেল শুধু দেখছে। মাঝে মাঝে প্রবল কণ্ঠে হাসছে। হাত তালি দিচ্ছে। রান্না শেষ হলো বিকেলে। প্রেমা,প্রান্ত,হিমেলকে খাবার বেড়ে দিল পদ্মজা। খাওয়া শেষ হলে বলল,'হিমেল মামা, প্রান্ত আর তুমি পূর্ণারে নিয়ে আসো। সন্ধ্যা হয়ে যাবে একটু পর। আম্মা,আব্বাও চলে আসবে।'

হিমেল, প্রান্ত বের হতেই পিছন পিছন ছুটে গেল প্রেমা। পদ্মজা একা হয়ে গেল। রান্নাঘর গুছিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বাতাস বইছে প্রবলবেগে। বাতাসের দাপটে চুল, ওড়না উড়ছে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। পরিবেশ অন্ধকার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মনটা কু গাইতে লাগল। পদ্মজা এক হাত দিয়ে অন্য হাতের তালু চুলকাতে চুলকাতে গেইটের দিকে বারংবার তাকাচ্ছে। যতক্ষণ কেউ না আসবে শান্তি মিলবে না। বিকট শব্দ তুলে কাছে কোথাও বজ্রপাত পড়ল। ভয়ে পদ্মজার আত্মা শুকিয়ে গেল। চারিদিক কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে! ঘোমটা টেনে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বিকট বজ্রপাত, দমকা হাওয়া, বড় বড় ফোটার বৃষ্টি। সব মিলিয়ে প্রলয়ঙ্কারী ঝড় বইছে যেন। লাহাড়ি ঘরের মাথার উপরে থাকা তাল গাছ অবাধ্য বাতাসের তেজে একবার ডানে আরেকবার বামে ঝুঁকে পড়ছে। পদ্মজার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল ভয়ে। ছুটে গেল নিজের রুমে। বিছানার উপর কাচুমাচু হয়ে বসল। টিনের চালে ধুমধাম শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলেছে। এতসব শব্দ ভেদ করে আরেকটি শব্দ কানে এলো। সদর ঘরে কিছু একটা পড়েছে। পদ্মজা ভয় পেয়ে গেল। পরপরই খুশিতে আওড়াল,'আম্মা আসছে।'

বিছানা থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে সদর ঘরে আসল। সদর ঘর অন্ধকারে তলিয়ে আছে। জানালা দিয়ে আসা ইষৎ আলোয় পদ্মজা টের পেল একজন পুরুষের অবয়ব। সাথে সাথে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে পড়ল। পা'দুটি স্তব্ধ হয়ে গেল। পদ্মজা কাঁপা কণ্ঠে বলল,'কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?'

কোনো জবাব আসল না। পদ্মজা অনুরোধ করে ভেজা কণ্ঠে বলল,' বলুন না কে আপনি?'

একটি ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। সেই আলোয় দু'টি গভীর কালো চোখ বিভ্রম নিয়ে তাকিয়ে রইল পদ্মজার দিকে। শীতল, স্পষ্ট কণ্ঠে চোখের মালিক বলল,'আমির হাওলাদার।'

পদ্মজা পুরুষালী কণ্ঠটি শুনে আরো ভড়কে গেল। রগে,রগে বরফের ন্যায় ঠান্ডা সুক্ষ্ম কিছু একটা দৌড়ে গেল। এক হাত দরজায় রেখে, পদ্মজা আকুতি করে বলল,'আপনি চলে যান। কেন এসেছেন?'

উত্তরের আশায় না থেকে পদ্মজা দৌড়ে নিজের রুমে চলে গেল। রুমে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল। মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে পড়েছে। কাজ করছে না। লোকটা যদি সম্মানে আঘাত করে বা গ্রামের মানুষ যদি দেখে ফেলে খালি বাড়িতে অচেনা পুরুষের সাথে, কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সে আর ভাবতে পারছে না। দরজায় করাঘাত শুনে পদ্মজা রুমের সব আসবাবপত্র ঠেলেঠুলে দরজার কাছে নিয়ে আসল। এরপর মাটিতে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। দু'হাত মাথায় রেখে আর্তনাদ করে ডাকল,'আম্মা, কই তুমি? আমি খুব একা আম্মা। আম্মা...।'

#পদ্মজা

চলবে....

@ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পাট- ১৬

টিনের চালে ঝুম ঝুম শব্দ। বৃষ্টির এই ছন্দ অন্যবেলা বেশ লাগলেও এই মুহূর্তে ভয়ংকর লাগছে পদ্মজার। একেকটা বজ্রপাত আরো বেশি ভয়ানক করে তুলেছে পরিবেশ। সে কাচুমাচু হয়ে ফোঁপাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ একটু কমলে কিছু কথা ভেসে আসে বাতাসে,'আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাকে ভয় পাবেন না। বিপদে পড়ে এই বাড়িতে উঠেছি। বিশ্বাস করুন।'

পদ্মজা কান্না থামাল। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। দরজার ওপাশ থেকে আমির নামের মানুষটা বলছে,'দরজা খুলুন। বিশ্বাস করুন আমাকে। আমি আপনার সাথে কোনো সুযোগ নিতে আসেনি। ভয় পাবেন না।'

পদ্মজা একটু নড়েচড়ে বসল। আমির আবার বলল,'শুনছেন?'

পদ্মজা ঢোক গিলে কথা বলার চেষ্টা করল। কথা আসছে না। এরপর খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করল। বলল,'আ...আমি দরজা খুলব না।'

ক্ষণকাল উত্তর আসল না। এরপর আমির বলল,'আচ্ছা, খুলতে হবে না। আপনি ভয় পাবেন না প্লীজ।'

'আপনি চলে যান।'

'বৃষ্টি থামতে দিন। হঠাৎ বৃষ্টির জন্যই তো আপনার বাড়িতে উঠা। আমার বৃষ্টিতে সমস্যা হয়।'

আমিরের মুখে স্পষ্ট শুদ্ধ ভাষা শুনে পদ্মজা বুঝল, লোকটা শিক্ষিত। কথাবার্তা শুনে ভালো মানুষ মনে হচ্ছে। তবুও সাবধানের মার নেই। সে দরজা খুলল না। বিছানায় গিয়ে বসল। ভয়টা কমেছে।

'শুনছেন?'

পদ্মজা জবাব দিল,'বলুন।'

'আপনার নাম কী? ডাকনাম বলুন।'

'পদ্মজা।'

' সুন্দর নাম। আমার নাম জিজ্ঞাসা করবেন না?'

'জানি।'

আমির অবাক হওয়ার ভান ধরে প্রশ্ন করল,'কীভাবে? আমাকে চিনেন?"

'না, কিছুক্ষণ আগেই নাম বললেন।'

'তখন তো ভয়ে কাঁপছিলেন, নাম শুনেছেন! বাব্বাহ!'

আমিরের কণ্ঠে রসিকতা। পদ্মজা মৃদু হাসল। কেন হাসল জানে না। আমির বলল,'শুনছেন?'

'শুনছি।'

'আপনি কী এরকমই ভীতু?'

'আমার সাহসিকতা প্রমাণ করানোর জন্য এখন বের হতে বলবেন তাই তো?'

ওপাশ থেকে গগন কাঁপানো হাসির শব্দ আসল। আমির হাসতে হাসতে বলল,'বেশ কথা জানেন তো।'

এই বিষয়ের কথাবার্তা এড়িয়ে গেল পদ্মজা। বলল,'বৃষ্টি কমলেই চলে যাবেন কিন্তু।'.

'এতো তাড়াতে হবে না। বৃষ্টি কমলেই চলে যাবো।'

'কষ্ট নিবেন না। খালি বাড়ি তো।'

'বাকিরা কোথায়? এটা মোর্শেদ কাকার বাড়ি না?'

'জি।'

'উনার ধানের মিল তো এখন আমার আব্বার দখলে। ছুটিয়ে নিবেন কবে?'

পদ্মজা অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকাল। বিস্ময় নিয়ে বলল,'আপনি মাতব্বর কাকার ছেলে?'

'অবাক হলেন মনে হচ্ছে।'

'মাতব্বর কাকার ছেলের নাম তো বাবু।'

আমির হেসে বলল,'আমার ডাকনাম বাবু। আম্মা আর আব্বা ডাকে। ভাল নাম, আমির।'

পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। বজ্রপাত থেমেছে। বৃষ্টি রয়েছে। আমির জিজ্ঞাসা করল,'বাকিরা কোথায় বললেন না?'

'আম্মা,আব্বা ঢাকা। আজ ফেরার কথা ছিল। আর আমার দুই বোন আর ভাই নানাবাড়ি। বোধহয় বৃষ্টির জন্য আসতে পারছে না।'

'এখনো আমাকে ভয় পাচ্ছেন?'

'একটু,একটু।'

'এটা ভালো। অচেনা মানুষকে একেবারেই বিশ্বাস করতে নেই।'

বাসন্তী ভ্যান থেকে নেমে সামনে এগোলেন। মোর্শেদের বাড়িটা তিনি চিনেন না। তাই কোনদিকে যাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। এদিকে আকাশের অবস্থা ভাল না। রাস্তাঘাটেও মানুষ নেই। ঝড়ো হাওয়া বইছে। আরো কিছুটা পথ হাঁটার পর আচমকা ঝড় শুরু হলো। তিনি দৌড়ে একটা বাড়িতে উঠলেন। রমিজ আলি বারান্দায় বসে হুঁকা টানছিল। সিল্কের শাড়ি পরনে,পেট উন্মুক্ত,লম্বা চুলের বেণুনীতে ধবধবে সাদা বাসন্তীকে দেখে তিনি অবাক হয়ে এগিয়ে আসেন। বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন,'কেডা আপনে? কারে চান?'

বাসন্তী কেঁপে উঠলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে রমিজকে দেখে, লম্বা করে হাসেন। বলেন,'হুট কইরা মেঘখান আইয়া পড়ল তো।'

'তে আপনে কার বাড়িত যাইতেন?'

'মোর্ছেদের বাড়ি।'

রমিজ আলি বিরক্তিকর ভাব নিয়ে সরে যান। ঘরের ভেতর থেকে চেয়ার এনে দেন। বলেন,'মোর্শেইদদার কী লাগেন আপনে?'

বাসন্তী চিন্তায় পড়েন। গ্রামের মানুষ তো জানে না তার আর মোর্শেদের সম্পর্ক। এখন জানানোটা কতটা যুক্তিসংগত? সেকেন্ড কয়েক ভাবার পর যুক্তি মিলে গেল। গ্রামবাসীকে বলা উচিত। নয়তো সে তার অধিকার কখনো পাবে না। একমাত্র গ্রামবাসীই পারে তার জায়গাটা শক্ত করে দিতে। বাসন্তী রমিজ আলির চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,'আমি তার বউ লাগি। পরথম বউ। তার লগে আমার বিছ বছরের ছম্পর্ক।'

রমিজ আলির চক্ষুদ্বয় যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পাওয়ার মতো আনন্দ অনুভব করেন। তিনি প্রবল উৎসাহ নিয়ে বলেন,'হের পরের বউয়ে জানে?'

'না।'

'থাহেন কই আপনে?'

'রাধাপুর।'

'লুকাইয়া রাখছিল বিয়া কইরা?'

'হ। এখন মোর্ছেদ আমারে তালাক দিতে চায়। আমার সাথে ছংছার করতে চায় না। তাই আমি আমার অধিকার নেয়ার জন্যে আইছি। আমি তার বাড়িতে থাকবার চাই। আপনেরা আমারে ছাহায্য কইরেন। গ্রামবাছী ছাড়া মোর্ছেদ আমারে জায়গা দিব না।'

রমিজ আলি প্রবল বৃষ্টি, আর বজ্রপাতকে হটিয়ে উঁচু স্বরে বলেন,'আপনের জায়গা করে দেওন আমরার কাম। আপনি চিন্তা কইরেন না।মেঘডা কমতে দেন। এরপর খালি দেহেন কী হয়।'

বাসন্তী চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠল। ভরসা পাওয়া গেল। রমিজ আলির প্রতিশোধের নেশা পেয়েছে। মোর্শেদ তাকে কতো কটু কথা বলেছে,অবজ্ঞা করেছে,অপমান করেছে। এইবার তার পালা। প্রতিটি অপমান ফিরিয়ে দিবেন বলে শপথ করেন। তিনি বাসন্তীকে ভরসা দিয়ে বলেন,'আপনি বইয়া থাহেন। আমি আরো কয়জনরে লইয়া আইতাছি।"

রমিজ আলি খুশিতে গদগদ হয়ে বেরিয়ে যান। ছইদ, রজব, মালেক, কামরুলকে নিয়ে ফিরেন। সবার হাতে হাতে ছাতা। কামরুল আটপাড়া এলাকার মেম্বার। গ্রামে কোনো অনাচার হলে তা দেখার দায়িত্ব তার। তাই তিনি মাথার উপর বজ্রপাত, ঝড় নিয়েই ছুটে আসেন।

____

পদ্মজা উসখুস করছে। টয়লেটে যাওয়া প্রয়োজন। প্রস্রাবের বেগ বাড়ছে। এভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায়। সাহসও পাচ্ছে না বের হওয়ার। রুমে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। চোখ বন্ধ করে জোরে নিঃশ্বাস নিল। এরপর কাঁচি কোমরে গুঁজে নিল। আয়তুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিল। তারপর দরজা খুলল। আচমকা দরজা খোলার আওয়াজ শুনে আমির চমকে তাকাল। আকাশ থেকে কালো মেঘের ভাব কেটে গেছে অনেকটা। সন্ধ্যার আযান পড়ছে।

সালোয়ার,কামিজ পরা পদ্মজাকে দেখে মুহূর্তে হৃদস্পন্দন থমকে গেল তার। পদ্মজা ওড়না টেনে নিল নাক অবধি। এরপর কাঁপা পায়ে আমিরের পাশ কাটাল। আমিরের চোখ স্থির। নিঃশ্বাস এলোমেলো। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। পদ্মজা যখন ফিরছিল রুমে তখন আমির ডাকল,'পদ্মজা?'

পদ্মজা দাঁড়াল। মানুষটা খারাপ হলে এতক্ষণে আক্রমণ করতো। যেহেতু করেনি, মানুষটার উদ্দেশ্য খারাপ না। তাই দাঁড়াল। তবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল না। আমিরের গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি পরা। শার্ট ভিজে গেছে। তাই বারান্দার দড়িতে রেখেছে,বাতাসে শুকাতে। আমির বলল, 'অলন্দপুরে এমন রূপবতী আছে জানতাম না।'

পদ্মজা লজ্জা পেল। বিব্রতবোধও করল। বৃষ্টি প্রায় কমে এসেছে। পদ্মজা বলল,'আপনি এবার আসুন। কেউ দেখলে খারাপ ভাববে।'

'যেতে তো ইচ্ছে করছে না।'

লোকটা বলে কী! এতক্ষণ বলল,বৃষ্টি কমলেই চলে যাবে। এখন বলছে, যাবে না। পদ্মজা ঘুরে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে আকুতি নিয়ে বলল,'চলে যান।'

আমির কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। না চাইতেও পদ্মজা আমিরকে খেয়াল করল। শ্যামবর্ণের একজন পুরুষ। থুতনির মাঝে কাটা দাগ। সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল পদ্মজা। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,'বৃষ্টি কমে গেছে। আম্মা,আব্বা চলে আসবে। চলে যান।'

আমিরের নিস্তব্ধতা পদ্মজাকে বিরক্ত করে তুলল। এতো ঘাড়ত্যাড়া, দুই কথার মানুষ কীভাবে হয়? উঠানে পায়ের শব্দ! কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ। বারান্দা থেকে তাকাল আমির এবং পদ্মজা। গ্রামের এতোজনকে দেখে পদ্মজার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দৌড়ে রুমে ঢুকে পড়ল। রমিজ আলি চেঁচিয়ে ডাকেন,'কইরে মোর্শেদা। আকাম কইরা এখন লুকায়া আছস ক্যান? বাইর হ। তোর আকাম ধইরা লইয়া আইছি।'

আমির বারান্দা পেরিয়ে বেরিয়ে আসে। গম্ভীরমুখে বলল,'উনারা বাড়িতে নেই।'

উৎসুক জনতা আমিরকে দেখে অবাক হলো। কামরুল বললেন,' আরে আমির। শহর থেকে আইলা কবে?'

'এইতো চার দিন হলো। আছেন কেমন?'

'এইতো আছি। তা এইহানে কি করো?'

আমির উত্তর দেয়ার আগে রমিজ আলি প্রশ্ন করেন,'বাড়িত কী কেউ নাই?'

আমির বেশ সহজ,সরল গলায় বলল,'আছে। পদ্মজা আছে।'

উপস্থিতি পাঁচ-ছয়জন তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। সবার দৃষ্টি দেখে আমির বুঝল,সে কত বড় ভুল করে ফেলল। তাহলে পদ্মজা এটারই ভয় পাচ্ছিল? আমির দড়ি থেকে শার্ট নিয়ে দ্রুত পরল। এরপর কৈফিয়ত স্বরে বলল,'আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। বাড়ি ফিরছিলাম। বৃষ্টি নামে তাই এই বাড়িতে উঠে পড়ি। বাড়িতে কেউ নাই জানলে..."

আমির কথা শেষ করতে পারল না। রমিজ আলি চেঁচিয়ে আশেপাশে বাড়ির সব মানুষদের ডাকা শুরু করল। মাতব্বর তাকে কম অপদস্ত করেনি। কোণঠাসা করেছে। মোর্শেদ পথেঘাটে কটু কথা শুনিয়েছে। আজ সেই যন্ত্রণা কমানোর দিন। আমির ভড়কে গেল। কামরুল আঙ্গুল শাসিয়ে কঠিন স্বরে বললেন,'তোমার কাছে এইডা আশা করি নাই। তোমার আব্বারে ডাকাইতাছি। উনি যা করার করবেন।'

আমির বিরক্তি নিয়ে বলল,'আরে আজব! কী শুরু করেছেন আপনারা?'

ছইদ আমিরের বয়সের কাছাকাছি। ব্যক্তিগত ভেজাল আছে তাদের মধ্যে। ছইদ হুংকার ছেড়ে বলল,'চুপ থাক তুই! তোর বাপে মাতব্বর বইলা তোরে ডরাই আমরা? আকাম করবি আর ছাইড়া দিমু?'

আমিরের চোখ লাল বর্ণ ধারণ করে। রেগে গেলে চোখের রং পাল্টে যায় তার। কালো মুখশ্রীর সাথে লাল চোখ ভয়ংকর লাগে। ছইদ ভেতরে ভেতরে ভয় পেল। আমিরের হাতে কম মার সে খায়নি। তবে, আজ সুযোগ আছে। পুরো গ্রামবাসী এক দলে। সে কিছুতেই ছাড়বে না। ঢোক গিলে বলে,'চোখ উলডাইয়া লাভ নাই। কুকামের উসুল না তুলে যাইতাছি না।'

আমির রাগে শক্ত হাতে ছইদের কানের কাছে থাপ্পড় দিল। মুহূর্তে ছইদের মাথা ভনভন করে উঠল। ততক্ষণে রমিজের উস্কানিতে মানুষ জমে গেছে। সবার হাতে হাতে টর্চ,হারিকেন। আঁধার নেমে এসেছে। আমির আবারো ছইদকে মারতে গেলে কয়জন এসে জাপটে ধরল। কামরুল একজন মহিলাকে আদেশ স্বরে বলেন,' শিউলির আম্মা কয়জনরে লইয়া মাইয়াডারে বার কইরা আনো। লুকাইছে নটি। গ্রামডা নটিদের ভীরে ধ্বংস হইয়া যাইতাছে'

পদ্মজা মাটিতে নতজানু হয়ে বসে কাঁপছে। দ্রুতগতিতে পা থেকে মাথার চুল অবধি কাঁপছে। বাইরের প্রতিটি কথা কানে এসেছে। চারপাশ যেন ভনভন করছে। শিউলির আম্মা পদ্মজার রুমে আসল। দরজা খোলা ছিল। টর্চ ধরে দেখল পদ্মজা মাটিতে বসে কাঁপছে। সে পদ্মজার মাথায় হাত রেখে বলল,'কেন এমন কাম করছস?'

পদ্মজা ঝাপসা চোখ মেলে তাকাল। শিউলির আম্মা পাশের বাড়ির। পদ্মজার সাথে ভাল সম্পর্ক। পদ্মজা শিউলির মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল,'ভাবী আমি কোনো খারাপ কাজ করি নাই। সবাই ভুল বুঝছে।'

রীনা নামে একজন মহিলা পদ্মজাকে জোর করে টেনে দাঁড় করাল। হেমলতার অনেক বাহাদুরি এই মেয়ে নিয়ে। অনেক অহংকার। সেই অহংকার আজ ভাল করে ভাঙ্গবে। সে মনে মনে পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠেছে। ঘৃণিত কণ্ঠে পদ্মজাকে বলল,'ধরা পড়লে সবাই এমনডাই কয়। আয় তুই।'

পদ্মজা আকুতি করে বলল,'বিশ্বাস করুন আমি খারাপ কিছু করিনি। আম্মা এসব শুনলে মরে যাবে। আপনারা এমন করবেন না।'

কারো কানে পৌছালো না পদ্মজার কান্না,আর্তনাদ, আকুতি। সবাই গ্রামের সবচেয়ে সুন্দর মনের, সুন্দর পরিবারের সদস্য গুলোকে ধ্বংস করায় মেতে উঠল। পদ্মজাকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনে। কখনো ঘোমটা ছাড়া কোনো পুরুষের সামনে না যাওয়া মেয়েটার বুকের ওড়না পড়ে রইল ঘরে। তিন-চার জন মহিলা শক্ত করে চেপে ধরে রাখল। সবাইকে উপেক্ষা করে পদ্মজা ঘৃণা চোখে তাকাল আমিরের দিকে। আমির চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়ানোর, কিছুতেই পারছে না। পূর্ণা জ্বরের চোটে কাঁপছে। বাড়িতে ঢুকে দেখল কোলাহল। ভয় পেয়ে গেল। একটু এগিয়ে দেখল,পদ্মজার বিধ্বস্ত অবস্থা। জ্বর মুহূর্তে উবে গেল। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল। চেঁচিয়ে উঠল,'আমার আপারে এমনে ধরছেন কেন? আপা..এই আপা? কাঁদছো কেন?'

পদ্মজা কেঁদে বলল,'পূর্ণা, আম্মা মরে যাবে এসব দেখলে। আমি কিছু করি নাই পূর্ণা।'

পূর্ণা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু অনুভব করছে,তার বুক কাঁপছে। ব্যথায় বিষে যাচ্ছে। সে রীনাকে বলল,'খালা আপনি আমার বোনরে এভাবে ধরেছেন কেন? ছাড়েন।'

রীনা কর্কশ কণ্ঠে বলল,'তোর বইনের রস বাইড়া গেছিল। এজন্যে খালি বাড়িত ব্যাঠা ছেড়া ডাইকা আইনা রস কমাইছে।'

পূর্ণার গা রিরি করে উঠল! তেজ নিয়ে বলল,'খারাপ কথা বলবেন না। আমার আপা এমন না।'

পাশ থেকে একজন মহিলা পূর্ণার উদ্দেশ্যে বলল,'তোর মা যেমন হের মাইডাও এমন অইছে। নিজেও এমন কিচ্ছা করল। মাইয়াও করল।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। মহিলা বলে যাচ্ছে,'বুঝলা তোমরা সবাই, মায় এক বেশ্যা, মাইয়ারে বানাইছে আরেক বেশ্যা।'

পদ্মজা আচমকা রেগে গেল খুব। আক্রোশে শরীর কাঁপতে থাকল। রীনা সহ দুজন মহিলাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। এরপর রাগে চেঁচিয়ে বলল,'আমার মা নিয়ে কিছু বললে,আমি খুন করব। মেরে ফেলব একদম। জিভ ছিড়ে ফেলব।'

পদ্মজার এহেন রূপে সবাই থতমত খেয়ে গেল। লম্বা চুলগুলো খোঁপা থেকে মুক্ত হয়ে পিঠময় ছড়িয়ে পড়ল। চোখের মণি অন্যরকম হওয়াতে মনে হচ্ছে, কোনো প্রেতাত্মা রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। গ্রামের কয়েক মহিলা আবার বিশ্বাস করে, পদ্মজা কোনো পরীর মেয়ে। তাই এতো সুন্দর। এই মুহূর্তে তারা ভাবছে,পদ্মজার ভেতর কেউ ঢুকেছে। তাই সামনে এগোল না। রীনা একাই এগিয়ে আসল। পদ্মজার চুলের মুঠি ধরে বিশ্রি গালিগালাজ করল। এরপর কামরুলকে বলল,'কামরুল ভাই, এই বান্দিরে বাঁন্ধা লাগব।'

পূর্ণা,প্রেমা পদ্মজাকে ছাড়াতে গেলে ছইদসহ আরো তিন চারজন এগিয়ে আসল। অন্ধকারের ভীরে পড়ে পদ্মজা, পূর্ণা, প্রেমা বাজেভাবে উত্যক্ত হলো। কয়টা কালো হাত নিজেদের তৃপ্তি মিটিয়ে নিল। তিন বোনের কান্না,আর্তনাদ কারো হৃদয় ছুঁতে পারল না। হেমলতার অনুপস্থিতিতে তার আদরের তিন কন্যার জীবন্ত কবর হচ্ছিল,বাধা দেয়ার কেউ ছিল না।

#পদ্মজা

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ১৭

নৌকা ছাড়ার পূর্বে আকাশের কালো মেঘের ঘনঘটা চোখে পড়ল। তার কিছুক্ষণ পর হঠাৎই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এলো। খোলা নৌকা হওয়াতে চোখের পলকে যাত্রী পাঁচজন কাকভেজা হয়ে গেল। ভিজলেন না হেমলতা। মোর্শেদ ছাতা ধরে রেখেছেন। বজ্রপাতের সাথে সাথে হেমলতার আত্মা দুলে উঠছে। মনটা খচখচ করছে। তিনি জলের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার সঙ্গেই বলের মতো একদলা পানি লাফিয়ে উঠছে। তারপর ছোট্ট ছাতার মতো আকৃতি নিয়ে চারপাশে প্রসারিত হয়ে হাওরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে সুন্দর! কিন্তু সেই সৌন্দর্য মনে ধরছে না। অজানা আশঙ্কায় তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে। মোর্শেদ গলা খাকারি দিয়ে হেমলতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এরপর বলেন,'কিছু খাইবা?'

হেমলতা নিরুত্তর। মোর্শেদ শুষ্ক হাসি হেসে বলল,

'আর কিছুক্ষণ। আইয়াই পড়ছি।'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। নিরুত্তরেই বসে রইলেন। বৃষ্টির স্পর্শ নিয়ে আসা হাওরের হিমেল বাতাসের ছোঁয়া লাগছে চোখেমুখে। হাওরের ঘোর লাগা বৃষ্টি দেখতে দেখতে তন্দ্রা এসে ভর করে। হেমলতা নিকাব খুলে চোখেমুখে পানি দিয়ে তন্দ্রা কাটান। এরপর ক্লান্ত চোখ দু'টি মেলে তাকান মোর্শেদের দিকে। মোর্শেদের হাতে হাত রেখে বলেন,'আমার এতো খারাপ লাগছে কেন? বুক পোড়া কষ্ট হচ্ছে।'

মোর্শেদ হেমলতার কণ্ঠ শুনে সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। চিত্ত ব্যাথায় ভরে উঠল। কিছুসময় অতিবাহিত হওয়ার পর আশ্বস্ত করে বললেন,'আইয়া পড়ছি তো। ওইযে বাজারের ঘাট দেহা যাইতাছে।'

হেমলতা মোর্শেদের হাত ছেড়ে দূরে তাকান। অলন্দপুরের বাজারটা ছোট পিঁপড়ার মতো দেখাচ্ছে। নৌকাটা বার বার দুলছে। চারিদিকে ঝড় বইছে। মনেও তো বইছে। তিনি নিজেকে শান্ত করতে চোখ বুজে বার কয়েক প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেন। ব্যাথাতুর মন আর্তনাদ করে শুধু জানতে চাইল,আমার মেয়েগুলো কেমন আছে?

রীনা চুল এতো শক্ত করে ধরেছে যে পদ্মজার সারা শরীর ব্যথায় বিষিয়ে উঠছে। পদ্মজা আকুতি করেও ছাড়া পাচ্ছে না। পূর্ণা,প্রেমা খামচে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। কিছুতেই তারা বোনকে ছাড়বে না।

আমির ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কামরুল চাচা এটা ঠিক হচ্ছে না! মেয়েগুলোর অভিশাপে পুড়ে যাবেন।'

আমিরের উৎকট উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য কামরুল হতবুদ্ধি হয়ে গেল। রমিজ আলী কামরুলের নরম, নিঃশ্বব্দ, ভয়ার্ত মুখের দিকে চেয়ে ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল,'বেশ্যাদের শাপে কেউ পুড়ে না।'

জলিল প্রেমাকে সরিয়ে নিয়েছে। প্রেমার কান্না শোনা যাচ্ছে। বড় আপা,বড় আপা করে গলা ফাটিয়ে কাঁদছে। ছইদ অনেক টেনেও পূর্ণাকে সরাতে পারল না, তাই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পূর্ণার বুকে নোংরা হাতের দাগ বসিয়ে দিল। পূর্ণা এমন ঘটনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। কোনো মেয়েই এমন নীচু ঘটনার সাক্ষী হতে চায় না। অকস্মাৎ এই ঘটনা কাটিয়ে উঠার পূর্বেই একটা শক্ত হাত পায়জামার ফিতা টেনে ধরল। পূর্ণার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। ভয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল,'আপা...আপা।'

পূর্ণার আর্তনাদ পদ্মজার মস্তিষ্ক প্রখর করে তুলল। পদ্মজা মুখ তুলে পূর্ণার দিকে তাকাল। তার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি দূরে পূর্ণা। পদ্মজার এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। কাছে আসতে পারছে না ছইদের জন্য। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজা আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। চারিদিকে কোলাহল। গালি দিচ্ছে মা বাপ তুলে। কেউ বলছে না, মেয়েটা ভালো। এরকম করতেই পারে না। পূর্ণা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কেঁদে মাকে ডাকছে। পদ্মজা এক দৃষ্টে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষ এরকম কেন হয়?

পূর্ণার হাত ছইদ আলগা করতেই সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল পদ্মজাকে। তার পুরো শরীর কাঁপছে। হৃৎপিণ্ড এতো জোরে চলছে যে অনুভব করা যাচ্ছে। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আপা...আপা...কেন মেয়ে হলাম আপা? এত কষ্ট হচ্ছে আপা। আপা..."

পদ্মজার দু'চোখ বেয়ে টুপ করে দু'ফোটা জল পড়ে। এক হাতে শক্ত করে পূর্ণাকে বুকের সাথে চেপে ধরল। রমিজের উস্কানিতে কামরুল গলা উঁচিয়ে বলল,'নটিরে বাঁন ছইদ।'

পূর্ণার কানে কথাটা আসতেই সে আরো জোরে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা ঠান্ডা স্বরে বলল,'পূর্ণা ছেড়ে দে আমায়।'

রীনা পদ্মজাকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেও পদ্মজা জায়গা থেকে এক চুলও নড়ল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। পূর্ণাকে ফিসফিসিয়ে বলল,'বেঁচে থাকলে সব উসুল হবে। ছেড়ে দে।'

পদ্মজার কণ্ঠে কী যেন ছিল। পূর্ণা সাথে সাথে শান্ত হয়ে গেল। চোখ তুলে পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজার গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে।ছইদ পূর্ণাকে নিতে আসলে পদ্মজা একটি দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। ছইদের অণ্ডকোষ বরাবর লাথি বসিয়ে দিল। ছইদ মাগো বলে কুঁকিয়ে উঠল। জলিলসহ উপস্থিত তিন জন তেড়ে আসল পদ্মজার দিকে। পূর্ণাকে ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে কেউ পদ্মজাকে থাপ্পড় দিল, কেউ বা দিল লাথি। দু'তিনজন গ্রামবাসীর মনে মায়া উদয় হলো। ছুটে আসল পদ্মজাকে বাঁচাতে। প্রান্ত ভয়ে চুপসে গিয়েছিল। পদ্মজাকে কাঁদায় ফেলে মারতে দেখে দৌড়ে আসে, জলিলের হাতে শরীরের সব শক্তি দিয়ে কামড় দিল। জলিল প্রান্তের কান বরাবর থাপ্পড় বসাতেই প্রান্তের মাথা ভনভন করে উঠল। পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে দেখে কামরুল হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। মনে মনে বেশ ভয় পান। কেশে গলা পরিষ্কার করে, দুই হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন,'তোমরা থামো,এইডা কি করতাছো? থামো, কইতাছি। সবাই সইরা আসো। থামো...!"

সবকিছু থেমে গেল। পদ্মজা কাচুমাচু হয়ে পড়ে রইল কাঁদায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নাভির নিচে একটা লাথি পড়েছে বেশ জোরে। চোখ বুজে রেখেছে। দু'হাত বুকের উপর। লম্বা চুল কাঁদায় মেখে ছড়িয়ে আছে আশেপাশে।

যন্ত্রনায় যেন পাঁজরগুলো মড়মড় করে ভেঙ্গে যাচ্ছে। পূর্ণা জ্বরের তোপে জ্ঞান হারিয়েছে। হেমলতার মা মনজুরা বাড়িতে ঢুকে পদ্মজাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠলেন। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে তুলতে চাইলে কামরুল হুংকার ছাড়েন,'এই ছেড়িরে ধরন যাইব না। যান এন থাইকা।'

মনজুরা পদ্মজার কামিজ ঠিক করে দিলেন। এরপর দুজন লোককে নিয়ে পূর্ণাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। মনজুরার বুক কাঁপছে হেমলতার ভয়ে। হেমলতা বার বার বলেছিল, দুই দিন তার মেয়েদের চোখের আড়াল না করতে! আর তিনি একা বাড়িতেই ছেড়ে দিয়েছেন! ইচ্ছে হচ্ছে এক ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে। হিমেল নাক টেনে টেনে কাঁদছে। জপ করছে হেমলতার নাম। মনজুরা রেগে ধমক দেন,'আহ! থাম তো।'

বাপের বাড়িতে কাউকে না পেয়ে হেমলতা চিন্তায় পড়েন। মোর্শেদ বললেন,'আমরার বাড়িত গিয়া বইয়া রইছে মনে হয়। আও বাড়িত যাই।'

হেমলতা মিনমিনে গলায় বলেন, 'তাই হবে।'

দুজন হেঁটে বাড়ির রাস্তায় উঠে। তখন পাশ কেটে একজন মহিলা হেঁটে যায়। কিছুটা হাঁটার পর মোর্শেদের খটকা লাগল। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান। মহিলাটি অনেক দূর অবধি চলে গিয়েছে। মহিলার অবয়ব দেখে মোর্শেদের বাসন্তীর কথা মনে হলো। মনে মনে আওড়ান,'বাসন্তী আইছে?'

পরপরই নিজের মনকে বুঝ দেন,'না,না হে আইব কেমনে। আর আইলেও যাইব গা ক্যান?'

তিনি আর মাথা ঘামালেন না। হেমলতার বুক দুরুদুরু করছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। তবুও তিনি ঘামছেন অজানা আশঙ্কায়। বাড়ির কাছাকাছি এসে তিনি দেখতে পেলেন,মাতব্বরকে। মাতব্বরের সাথে আরো দুজন ব্যক্তি। এছাড়া বাড়ির সামনে মানুষের ভীরও দেখা যাচ্ছে। হেমলতার হৃৎপিণ্ড যেন থমকে গেল। মেরুদণ্ড বেয়ে বরফের ন্যায় ঠান্ডা কিছু একটা ছুটে গেল। তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ছুটতে থাকেন। পিছলা খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন। হেমলতার দৌড় দেখে মোর্শেদ অবাক হোন। প্রশ্ন করেন,'তুমি দৌড়তাছো ক্যান?'

হেমলতা প্রশ্নটি শুনলেন না। নিকাব বাতাসের দমকে উড়ে পড়ল দূরে। তিনি ভীর ঠেলে বাড়িতে ঢুকেন। কোলাহল বেড়ে গেল। এতো ভীরের মাঝে একটা মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হোন। অন্ধকারে মেয়েটিকে চিনতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। তিনি আঙ্গুল তুলে বিড়বিড় করেন,'মেয়েটা কে?'

হেমলতার প্রশ্ন কারো কান অবধি গেল না। কোথা থেকে একটি আলো এসে পড়ে পদ্মজার উপর। সাথে সাথে হেমলতার চক্ষুদ্বয়ের সামনে পদ্মজার কাঁদারক্তে মাখা মুখ ভেসে উঠল। হেমলতা গগণ কাঁপিয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠলেন,'পদ্মজারে...."

পদ্মজার বুক ধড়াস করে উঠল! অস্তিত্ব কেঁপে উঠল। আম্মা এসেছে! তার পৃথিবী! তার শক্তি! পদ্মজা দূর্বল দুই হাতে ভর রেখে উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। ভাঙ্গা গলার জোর দিয়ে শুধু ডাকল,'আম্মা...আম্মা।"

হেমলতার পৃথিবী থমকে গিয়েছে। বিধ্বস্ত, পর্দাহীন,কাঁদা,রক্তমাখা পদ্মজাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না, এটা তার মেয়ে। তিনি দ্রুত নিজের বোরখা খুলে পদ্মজাকে ঢেকে, বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। অসহনীয় যন্ত্রনায় যেন কলিজা বেরিয়ে আসছে তার। তার সোনার কন্যার এ কী রূপ! কে করলো? কাঁপা কণ্ঠে বললেন,'পদ্ম...আমার পদ্ম।"

হেমলতার বুকে মাথা রেখে পদ্মজা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল,'আম্মা...আম্মা।'

হেমলতা পদ্মজাকে আরো জোরে চেপে ধরেন বুকের সাথে। দৃষ্টি অস্থির। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে।

মোর্শেদ বাড়িতে ঢুকে উঁচু গলায় বলেন,'এইহানে এতো মানুষ ক্যান? মাতব্বর মিয়া আপনে এইনে ক্যান? কী অইছে?'

প্রান্ত,প্রেমা দৌড়ে এসে মোর্শেদকে জড়িয়ে ধরল। দুজন ভয়ে কাঁদছে,কিন্তু কান্নার শব্দ হচ্ছে না। মোর্শেদ বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মাতব্বর মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে কামরুলকে প্রশ্ন করেন,' মেয়েটার এই অবস্থা কারা করেছে? এটা কী নিয়মের মধ্যে পড়ে?'

কামরুল মাথা নিচু করে রেখেছেন। মিনমিনে গলায় বলেন,'আমি ছেড়িডারে মারতে কই নাই। জলিল,ছইদ, আর মজনুর ছেড়ায় নিজ ইচ্ছায় মারছে।'

'আপনি আটকালেন না?'

'আটকাইছি বইললাই মাইয়াডা বাঁইচা আছে। আর এমন নটিদের বাঁচার অধিকার নাই।'

'থামেন মিয়া! কার কী শাস্তি হবে সেটা আমার দায়িত্ব। আপনার না। ছইদ,জলিল আর মজনুর ছেলেকে তো দেখা যাচ্ছে না। আগামীকাল তাদের আমি মাঠে দেখতে চাই।'

কামরুল মাথা নিচু করে রাখলেন। মজিদ হাওলাদার ভারি সৎ এবং নিষ্ঠাবান মানুষ। গ্রামের মানুষদের দুই হাতে আগলে রেখেছেন। পুরো অলন্দপুরের মানুষ মজিদকে ফেরেশতা সমতূল্য ভাবে। পঁচিশ বছর ধরে অলন্দপুর সামলাচ্ছেন তিনি।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। হেমলতা কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারছেন না। অনেক বছর আগের ঘটনা আর এই ঘটনা হুবুহু একরকম কী করে হলো? তিনি নিজের ভেতর একটা হিংস্র পশুর উপস্থিতি অনুভব করছেন। কামরুলের মুখ থেকে শোনা তিনটা নাম মস্তিষ্কে নাড়া দিচ্ছে প্রচন্ডভাবে! ছইদ,জলিল আর মজনুর ছেলে!

মজিদ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,'আগামীকাল সবাই স্কুল মাঠে চলে আসবেন। মিয়া মোর্শেদ মেয়ে নিয়ে আলো ফুটতেই চলে আসবেন। এই বাড়ি পাহারায় থাকবে মদন আর আলী। আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে সেও উপস্থিত থাকবে।'

#পদ্মজা

চলবে....

@ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট- ১৮

ভীর কমতেই কানে তালা লাগা প্রচন্ড শব্দে বজ্রপাত হয়। হেমলতা একা পদ্মজাকে তুলতে গিয়ে হিমশিম খান। মোর্শেদ এগিয়ে আসেন। দুই হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নেন পদ্মজাকে। বিজলি চমকাল। বিজলির আলোয় পদ্মজার মুখটা দেখে মোর্শেদের বুক কেমন করে উঠল! কষ্টে বুক চুরমার হয়ে গেল। জন্মের দিন পদ্মজাকে কোলে নেয়ার পর যে অনুভূতিটুকু হয়েছিল ঠিক সেরকম একটা অনুভূতি হয়। অনুভূতিটুকুর নাম বোধহয় পিতৃত্ব! প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইছে। তারা ঘরে ঢুকতেই ভারী বর্ষণ শুরু হলো। মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব দেখা দিল! তবে সেই তাণ্ডব ছুঁতে পারল না মোড়ল বাড়ির মানুষদের মন। ঝড়ের তান্ডবের চেয়েও বড় তান্ডবের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে তারা। হেমলতা গরম পানি করে পদ্মজাকে গোসল করালেন। জামাকাপড় পাল্টে দিলেন। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে নীরবে কেঁদে গেল। চোখের জল আটকে রাখতে পারছে না কিছুতেই। ইচ্ছে হচ্ছে বাড়ির পিছনের সবচেয়ে বড় আম গাছটার সাথে ফাঁস লেগে মরে যেতে। মন দূর্বলতার শূন্য ছুঁই ছুঁই। হেমলতা পদ্মজার চুল মুছে কপালে চুমু দিলেন। পদ্মজার নাকে এক ফোঁটা জল পড়ল। পদ্মজা চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল।

'আম্মা আসছে? আমার আম্মা কই? আম্মা আসে নাই?'

পাশের ঘর থেকে পূর্ণার চিৎকার ভেসে আসল। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে পূর্ণা ছুটে এলো। হেমলতাকে দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ল হেমলতার বুকে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। পূর্ণার শরীর আগ্নেয়গিরি মনে হচ্ছে। এতো গরম! জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজাও ডুকরে কেঁদে উঠল। হেমলতা স্তব্ধ হয়ে দুই মেয়ের কান্না শুনলেন। সামলানোর চেষ্টা করলেন না। মনজুরা দরজার সামনে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। টিনের চালে ভারী বর্ষণের শব্দ। জগৎসংসার সেই শব্দে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

মাঝরাত। বাতাসের বেগ প্রচন্ড। হেমলতা কালো রংয়ের শাড়ি পরে, একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ান। মনজুরা বারান্দার ঘর থেকে উঁচু কণ্ঠে বলেন,'রাম দা ব্যাগে ক্যান ঢুকাইছস? আর কোন কেলাঙ্কারি বাকি?'

হেমলতা বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়ালেন। পলকমাত্র মনজুরার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে,নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বর্ষণ মাথায় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনজুরা শুষ্ক হয়ে উঠলেন। ছুটে পদ্মজার ঘরে গেলেন। পদ্মজা চুপচাপ শুয়ে আছে। মৃদু ফোঁপানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পূর্ণা ঘুমাচ্ছে। তিনি এ ঘর ছেড়ে দ্রুত বারান্দার ঘরে আসলেন। বড্ড অস্থির লাগছে। জীবনে প্রথম হেমলতার জীবন ভিক্ষা চেয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন!

____

ফজরের আযান শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। সবকিছু শান্ত। পদ্মজা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসল। গেইটে শব্দ পেয়ে চমকে তাকাল। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল। হেমলতা ঢুকেন। বিধ্বস্ত অবস্থা। মনজুরা পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, পদ্মজা টের পেল না। হেমলতা বাড়িতে ঢুকে কাঁধের ব্যাগটা মুরগির খুপীর সামনে ছুঁড়ে ফেলেন। অন্ধকারের জন্য মুখ স্পষ্ট নয়। হেমলতা বাড়ির পিছনের দিকে চলে গেলেন। পদ্মজার বুক দুরুদুরু করছে। সে ধীর পায়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। পিছনে মনজুরা। পায়ের শব্দে চমকে তাকাল পদ্মজা, দেখতে পেল মনজুরাকে। ফিসফিসিয়ে বলল,'নানু,আম্মা কোথায় গিয়েছিল?'

মনজুরা ক্ষণকাল নীরব থেকে এরপর বললেন,'জানি না।'

মনজুরার কণ্ঠে ভয়। পদ্মজা দূর্বল শরীর ঠেলে নিয়ে আসল বাড়ির পিছন। দেখতে পেল,হেমলতা নদীতে নেমে গোসল করছেন। এক নিঃশ্বাসে কয়েকটা ডুব দিলেন। পদ্মজা ব্যস্ত পায়ে ঘাটের কাছে এলো। ক্ষীণ স্বরে ডাকল,'আম্মা।'

হেমলতা ঘুরে তাকালেন। ঝড় শেষে আকাশ ধবধবে সাদা । অন্ধকার কাটার পথে। পদ্মজা বলল,'ঠান্ডা লাগবে।'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। গোসল শেষ করে উঠে আসেন উপরে। পদ্মজা আর কিছু বলল না। হেমলতা উঠানে এসে মনজুরাকে বললেন,'পূর্ণারে নিয়ে আসো আম্মা।'

পদ্মজা অবাক হয়ে শুধু দেখছে। পূর্ণা আসে ধীর পায়ে হেঁটে। তার জ্বর অনেকটা কমে এসেছে। মনজুরা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। হেমলতা মৃদু হেসে পূর্ণাকে বললেন,'পদ্মজা পাশে এসে দাঁড়া।'

পূর্ণা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। সে বাধ্যের মতো পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। হেমলতা মুরগির খুপীর পাশ থেকে কালো ব্যাগটা হাতে তুলে নিলেন। ব্যাগ থেকে একটা রাম দা আর একটা কৌটা বের করলেন। পূর্ণা রাম দা দেখে চমকে উঠল। দু'বোন চাওয়াচাওয়ি করল একবার। হেমলতা রক্তেমাখা রাম দা দুই মেয়ের পায়ের সামনে রাখলেন। শীতল কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন,'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আর পৃথিবীতে সেরা মানুষগুলোরই বাঁচার অধিকার আছে। মানুষরূপী পশুদের না। যখন যেখানে কোনো মেয়েকে অসম্মান হতে দেখবি এক কোপ দিয়ে অমানুষটার আত্মা দেহ থেকে আলাদা করে দিবি। যে তোকে অসম্মান করেছে সে দোষী, তুই না। তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ, তোর না। তাই আত্মহত্যার কথা কখনো ভাববি না। দোষীর আত্মা হত্যা করা উচিৎ। আর আমি মনে করি, এতে পাপ নেই। বরং পাপীকে বিনাশ না করা পাপ। আর আমার মেয়েরা যেন সেই পাপ কখনো না করে। সেই...."

'মেয়েদের এসব কি শিক্ষা দিতাছস তুই? মাথা খারাপ হইয়া গেছে তোর?'

মনজুরা হইহই করে উঠলেন। হেমলতা ঢোক গিলে মনজুরার কথা হজম করে নিলেন। এরপর আবার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন,' আমি কখনো ছেলে চাইনি। মেয়ে চেয়েছি। প্রতিবাদী, দুঃসাহসীক মেয়ে চেয়েছি। আল্লাহ আমাকে তিনটা মেয়ে দিয়েছেন।

এখন সেই মেয়েরা যদি এইটুকুতে দূর্বল হয়ে পড়ে কীভাবে হবে? ঠিক আগের মতোই মাথা উঁচু করে বাঁচবি। যতদিন আমি আছি কেউ তোদের অসম্মান করে টিকতে পারবে না। আমি না হয় যতদিন বেঁচে থাকি তাদের

শাস্তি দেব। পৃথিবী থেকে মুছে দেব। কিন্তু যখন থাকব না? তখন,তখন কী তারা বেঁচে থাকবে? বেঁচে থাকতে দেয়া ঠিক হবে? অন্য কোনো মেয়ের সাথে নোংরামো করবে না তার নিশ্চয়তা আছে? নেই। এখন থেকে নিজেদের শক্ত কর। মেয়েদের সাহস মেয়েদরই হতে হয়। নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজের। রাতের স্মৃতি দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে বলব না। মনে রাখ। প্রতিটি মানুষের ভেতর লুকানো হিংস্র শক্তি আছে। সবাই প্রকাশ করতে জানে না। চিনতে পারে না নিজেকে। গত রাতের ঘটনাটা মনে রেখে নিজের ভেতর লুকানো হিংস্র শক্তিটাকে জাগিয়ে হাতের মুঠোয় রাখ। যাতে সঠিক সময়ে হাতের মুঠো খুলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারিস। আঘাতে, আঘাতে চুরমার করে দিতে পারিস পাপের জগত।"

এইটুকু বলে হেমলতা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। দপ করে বসে পড়েন। পদ্মজা 'আম্মা' বলে হেমলতাকে ধরতে চাইলে, হেমলতা হাত উঠিয়ে বলেন,'দাঁড়িয়ে থাক।'

হেমলতা সময় নিয়ে দম নেন। এরপর কৌটাটা খুলে ঠান্ডা তরল কিছু ঢেলে দেন দুই মেয়ের পায়ে। পূর্ণা কেঁপে উঠে দূরে সরে গেল। পদ্মজা আতঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন করল,'আম্মা, কার রক্ত?'

রক্তের কথা শুনে ঘৃণা আর ভয়ে পূর্ণার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। মনে হচ্ছে,পায়ে পোকা কিলবিল করছে। টাটকা তাজা লাল রক্ত! বমি গলায় এসে আটকে গেছে। হেমলতা পদ্মজাকে জবাব দিলেন না। শুধু মৃদু হাসলেন। পূর্ণা এই ভয়ংকর দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারাল। পদ্মজা দু'হাতে জাপটে ধরল পূর্ণাকে। কী আশ্চর্য, এই ভয়ংকর ঘটনা তাকে একটুও বিচলিত করল না! হেমলতার গায়ে ভেজা শাড়ি। তাই পূর্ণাকে ধরলেন না। মনজুরাকে বললেন,'পূর্ণারে ঘরে নিয়ে যাও, আম্মা।'

মনজুরা কঠোর চোখে তাকান হেমলতার দিকে। হেমলতা আবারো হাসেন। ভেজা কণ্ঠে বলেন,'কালো বলে অবহেলা না করে বুকে আগলে রাখলে আমার জীবনটা, আমার মেয়েদের জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো আম্মা।"

হেমলতার কথায় মনজুরার সারামুখ বিষণ্নতা ছেয়ে গেল। তিনি হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। অপরাধবোধে মাথা নুইয়ে ফেললেন। পূর্ণাকে ধরে নিয়ে গেলেন ঘরে। হেমলতা সেখানেই পড়ে রইলেন। আকাশের

দিকে তাকিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন। আলো ফুটেছে পুরোপুরি। পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। পানি দিয়ে উঠানের রক্ত মুছে দিলেন চিরতরে। রাম দা ধুয়ে লুকিয়ে রাখলেন লাহাড়ি ঘরে। শাড়ি পাল্টে উঠানে পা রাখেন। তখন মগা আসল। এসে খবর দিল, বিচার বসবে দুপুরে। রাতের ঘূর্ণিঝড়ে গ্রামের বেশিরভাগ ঘরবাড়ি উড়ে গেছে। পশুপাখি সহ বিভিন্ন ক্ষতি হয়েছে। অনেক মানুষ আহত হয়েছে! এই খবর শুনে হেমলতার চোখ সজল হয়ে উঠল। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। প্রকৃতি কখনো কাউকে ছাড়ে না! গ্রামবাসী অন্যায় দেখেও নিস্তব্ধ থেকেছিল। এ বুঝি তারই শাস্তি!

মাথার উপর সূর্য। প্রচন্ড তাপদাহ । পূর্ণা,পদ্মজা, হেমলতা কালো বোরখার আবরণে নিজেদের ঢেকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে অলন্দপুরের মাধ্যমিক স্কুলের উদ্দেশ্যে। খাঁ খাঁ রোদ্দুর, তপ্ত বাতাসের আগুনের হলকা । সবুজ পাতা নেতিয়ে পড়ার দৃশ্য পড়ছে চোখে। মোর্শেদ বাকিদের নিয়ে আসছে। রীনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে করুণ কান্নার স্বর ভেসে আসে। পদ্মজা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল,রীনার বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে। গাছপালা ভেঙ্গে উঠানে পড়ে আছে। হেমলতা পদ্মজাকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যান।

বটের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছিল এক রাখাল ছেলে। সে হেমলতার মুখ দেখে বুঝল, পিছনের দুটি মেয়ে পদ্মজা আর পূর্ণা। ছুটে আসল। পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে বলল,'পদ্ম আপা তুমি ডরাইও না। তোমার কিচ্ছু হইব না।'

চারদিকে নিঝুম , নিস্তব্ধ,ঝিমধরা প্রকৃতি । ঘামে দরদর তৃষ্ণার্ত রাখাল। হাঁপিয়ে কথা বলছে। স্কুলে যাওয়ার পথে, মাঝে মাঝেই এই পনেরো বছর রাখালের সাথে দেখা হতো পদ্মজার। পদ্মজার জন্য পাগল সে। বড় বোনের মতো মান্য করে। পদ্মজা মৃদু করে হাসল। পদ্মজার মুখের উপর পাতলা পর্দা বলে, রাখালের চোখে তা পড়ল না। রাখালকে পিছনে ফেলে তিন মা মেয়ে এগিয়ে চলল।

স্কুল মাঠে অনেক মানুষ জমেছে। রাতের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অলন্দপুরের বেশি অর্ধেক মানুষ আসেনি। তবুও প্রায় পাঁচ'শ মানুষ তো এসেছেই! ঘটনা ঘটেছে আটপাড়ায় আর তা ছড়িয়ে পড়েছে সব পাড়ায়! যথাসময়ে বিচার কার্য

শুরু হলো। পদ্মজা এবং আমির দুজন দু'দিকে দাঁড়ানো। মাতব্বর ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন,'এদের একসাথে কারা দেখেছেন?'

রমিজ আলী,কামরুল, মালেক হাত তুলল। মজিদ মাতব্বর বললেন,'কী দেখেছেন? ব্যাখ্যা করুন।'

রমিজ আগে আগে উঁচু কণ্ঠে বলল,'আমি দেখছি ঝড়ের সন্ধ্যায় আপনের পোলারে পদ্মজার ঘর থেকে বাইর হইতে। বাড়িত আর কেউ আছিলো না।'

আমির রেগে গিয়ে কিছু বলতে চাইল, মজিদ মাতব্বর হাতের ইশারায় আটকে দিলেন। আমির বাপের বাধ্য সন্তান তাই থেমে গেল। মজিদ মাতব্বর বললেন,'আপনি আমিরকে পদ্মজার ঘর থেকেই বের হতে দেখেছেন?'

রমিজ আলী দৃষ্টি অস্থির রেখে আমতা আমতা শুরু করলেন। দম নিয়ে বললেন,'তারে বারান্দা থাইকা বাইর হইতে দেখছি।'

মজিদ মাতব্বর নীরব থেকে এরপর বললেন,'তাহলে কোন আন্দাজে আপনি বলছেন,তারা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত ছিল?'

পদ্মজার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। সে চোখ বুজে ফেলল। রমিজ আলী থমকে গিয়ে পরপরই হুংকার দিয়ে উঠেন,'একটা অচেনা ছেড়া খালি বাড়িত কোনো ছেড়ির কাছে কেন যাইব? আপনার নিজের ছেড়া বলে,তার দোষ ঢাকতে পারেন না। আমার ছেড়ির বেলা কিন্তু ছাড়েন নাই।'

'যুক্তি দিয়ে কথা বলুন। আপনার মেয়েকে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল। তার গায়ে কাপড় ছিল না। তারা একসাথে একই ঘরের একই বিছানায় ধরা পড়েছে। আমির আর পদ্মজার বেলা সেটা হয়নি।'

মজিদ মাতব্বরের ক্ষমতা এবং কথার দাপটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে রমিজ আলীর। কামরুল চুপসে গিয়েছেন। সামনে নির্বাচন। মজিদ মাতব্বরকে ক্ষেপানো মানে নিজের কপালে দুঃখ বয়ে আনা। ভীরের মাঝ থেকে কেউ একজন বলল,'তাহলে আপনার ছেলে একটা মেয়ের কাছে খালি বাড়িতে গেল কেন?'

মজিদ মাতব্বর উঁকি দিয়ে প্রশ্নদাতাকে খুঁজে বের করলেন। তারই প্রতিপক্ষ হারুন রশীদ! মজিদ মাতব্বর আমিরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,'তুমি কেন গিয়েছিলে পদ্মজার বাড়িতে?'

আমির সহজ গলায় বলল,'বাড়ি ফিরছিলাম হঠাৎ ঝড় শুরু হলো। সামনে মোর্শেদ কাকার বাড়ি ছিল। মোর্শেদ কাকা বাড়ি নাই জানতাম না। জানলে,বৃষ্টিতে ভিজতাম। তবুও ওই বাড়ি যেতাম না। এই গ্রামের অনেকেই জানে আমার শ্বাসকষ্ট আছে। বাড়ির সবাই জানে,বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগে। শ্বাসকষ্ট হয়।'

হারুন রশীদ বললেন,'যখন দেখলা ছেড়িডা বাড়িত একলা তখন বাইর হইয়া গেলা না ক্যান?'

আমির সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,'আমার মাথায় আসেনি এমন কিছু হতে পারে। আর... "

আমির পদ্মজার দিকে একবার তাকাল। পদ্মজা সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিল। আমির বলল,'আর...পদ্মজা কতটা সুন্দর যারা দেখেছে সবাই জানে। আমি প্রথম দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। তাই মস্তিষ্কে একবারো কোনো বিপদের আশঙ্কা আসেনি।'

মজিদ মাতব্বর ছেলের শেষ কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। তবুও স্বাভাবিক থেকেই বললেন,'গ্রামবাসী কোনো প্রমাণ ছাড়াই লাফিয়েছে। মেয়েটাকে অপদস্থ করেছে। প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে নোংরামো অপবাদ দেয়া অপরাধ।'

মজিদ মাতব্বর কামরুলের দিকে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললেন,'ছইদ,মজনুর ছেলে আরেকটা কে জানি? কোথায় তারা?'

কামরুল ধীরভাবে বলল,'পাই নাই খোঁজে। মনে হয়, ভয়ে কোনহানো লুকাইছে।'

রমিজ আলী হঠাৎ গমগম করে উঠলেন,'এইডা আমি মানি না। তারারে আপনে ছাইড়া দিতে পারেন না। আপনের ক্ষমতা বেশি দেইখা আপনে এমনে নিজের ছেড়ারে ঢাইকা রাখতে পারেন না। ধূর্তবাজ লোক।'

আমির রেগেমেগে রমিজ আলীকে ধরতে এলে, মজিদ গর্জন করে উঠলেন,'আমির!'

আমির কিড়মিড় করে রাগ হজম করার চেষ্টা করল। হারুন অতিশয় ধূর্ত লোক। তিনি রসিকতা করে বললেন,'সত্য হউক আর মিথ্যাই। বদনাম তো বদনামই।'

মজিদ সবার প্রশ্ন কথা উপেক্ষা করে উপস্থিত গ্রামবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন,'আপনাদের আমার বিচারের প্রতি বিশ্বাস আছে?'

সবাই আওয়াজ করে বলল,'আছে।'

মজিদ মাতব্বর তৃপ্তির সাথে হাসলেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কণ্ঠ উঁচু করে বললেন,'মোর্শেদের মেয়েদের সাথে খারাপ হয়েছে। পদ্মজার নামে অনেক প্রশংসা শুনেছি। সে খুবই ভাল মেয়ে। আর আমার ছেলেকেও সবাই চিনেন, সে কেমন। যারা যারা দোষ করেছে তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়া হবে। পদ্মজা আর আমির নামে যে পাপের অভিযোগ করা হয়েছে তার যুক্তিগত প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ছাড়া আমি কখনো কাউকে শাস্তি দেইনি। আজও দেব না। তবে আমি আজ সবার সামনে মোর্শেদ আর তার স্ত্রীর কাছে একটা প্রস্তাব রাখব।'

হেমলতা, মোর্শেদ সহ উপস্থিত সবাই কৌতূহল নিয়ে তাকাল। মজিদ মাতব্বর বললেন,'পদ্মজাকে আমিরের বউ করে নিয়ে যেতে চাই।'

চারিদিকে কোলাহল বেড়ে গেল। সব কোলাহল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু মজিদ মাতব্বরের প্রস্তাবটি পদ্মজার কানে বাজতে থাকল। জীবনের কোন মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে?

#পদ্মজা

চলবে....

@ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট- **১৯**

সূর্যের প্রখর তাপে সমস্ত প্রকৃতি যেন নির্জীব হয়ে ওঠেছে। উপস্থিত সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। রমিজ আলি,হারুন রশীদ নামক ধূর্ত মানুষগুলোর চোখ ছানাবড়া। মজিদ মাতব্বর ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন,'আপনারা চাইলে সময় নিতে পারেন। আজ এখানে...'

হেমলতা কথার মাঝে আটকে দিয়ে বললেন,'আপনি বিয়ের তারিখ ঠিক করুন।'

মজিদ মাতব্বরের প্রস্তাবের চেয়ে এই প্রস্তাবে হেমলতার রাজি হওয়াটা যেন কোলাহল মুহূর্তে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। পদ্মজা হতবাক, বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়! মোর্শেদ চোখ বড় করে হেমলতার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। আশপাশ থেকে ফিসফিসানি ভেসে আসছে। মজিদ মাতব্বর মৃদু হাসলেন। এরপর আনন্দসহিত সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন,'আগামী শুক্রবার আমার ছেলের সাথে মোর্শেদের বড় মেয়ের বিবাহ। আপনাদের সবার নিমন্ত্রণ রইল।'

কথা শেষ করে হেমলতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,'দিন তারিখ ঠিক আছে?'

হেমলতা সম্মতি জানালেন। মোর্শেদ অবাকের চরম পর্যায়ে। কোনো কথা আসছে না মুখে। পদ্মজা ঢোক গিলে ব্যাপারটা হজম করে নিল। মুহিবের সাথে যখন তার বিয়ের আলোচনা হলো তখন সে ভারি অবাক হয়েছিল।

লিখন শাহ নামে একটা মানুষকে মনে পড়েছিল। এখন তেমন কিছুই হচ্ছে না। অনুভূতিগুলো ভোঁতা। যা হওয়ার হবে। সেসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। বিচার সভা ভেঙ্গে গেল। মজিদ মাতব্বর আলাদা করে মোর্শেদের সাথে কথা বলেন। তিনি আগামীকাল নিজ স্ত্রী এবং বাড়ির অন্যান্য বউদের নিয়ে পদ্মজাকে দেখতে আসবেন। মোর্শেদ, হেমলতা সমস্বরে অনুমতি দিলেন। বাড়ি ফেরার পথে অনেকের কটু কথা কানে আসে। পদ্মজা, আমির দুজনেরই চরিত্র খারাপ। এজন্যই বিয়ে হচ্ছে। মাতব্বর ক্ষমতাবান বলে,পুরো ব্যাপারটা ঘুরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু,তলে তলে তো নিজেরা জানে তাদের ছেলেমেয়ে কেমন। তাই তাড়াতাড়ি করে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন খুব বিশ্রীভাবে পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে বলল,' কে জানে, মনে কয়তো ছেড়ি পেট বাঁধাইছে। রাইতে বাপ মারে দিয়া পায়ে ধরাইয়া বিয়া ঠিক করছে।'

পদ্মজার মন তিক্ত হয়ে উঠে। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এতো নোংরা মন্তব্য সহ্য করা খুব কঠিন। মিথ্যে অপবাদ চারিদিকে। বোরখার আড়ালে পদ্মজার চোখ দু'টি ছলছল করে উঠল। খুব কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। হেমলতা পদ্মজার একহাত শক্ত করে চেপে ধরেন। মানুষদের ছায়া ছেড়ে ক্ষেতের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে তিনি বললেন,'জীবন খুব ছোট। এই ছোট জীবনে ঘটে অনেক ঘটনা। যে ভাল তার সাথে যে শুধুই ভালই হবে তা কিন্তু ঠিক না, উচিতও না। ভাল খারাপে মিলিয়েই জীবন। তাই বলে,সেই খারাপকে পাত্তা দিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে তার কোনো মানে নেই। খারাপটাকে পাশে রেখে ভাল মুহূর্ত তৈরি করার চেষ্টা করবি। ভালটা ভাববি। শুধুমাত্র কয়জনের কথায় কী আসে যায়? পুরো গ্রামবাসী জানে,তুই কেমন। পুরো অলন্দপুরের যত মানুষ আজ এসেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই মনে মনে তোর গুণগান গেয়েছে। তারা মনে মনে বিশ্বাস করে তুই নির্দোষ। কিন্তু চুপ ছিল। যারা খারাপের দলে তারা সংখ্যায় কম বলে কোলাহল করে নিজেদের দাপট দেখাতে চেয়েছিল। সবার অগোচরে বোঝাতে চেয়েছিল,আমরা অনেকজন। কিন্তু পারেনি। কোলাহল কোনো কিছুর সমাধান নয়। এখন যারা নিন্দা করলো তারা নিজেদের নীচু মনের পরিচয় দিয়েছে, সেই সাথে আমলনামায় পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল। তাদের শাস্তি পৃথিবী এবং আখিরাত দুটোতেই হবে। একদিন এদের শাস্তি হবেই,এই কথাটা ভেবে খুশি হ। সব ভুলে যা। বাকি জীবন পড়ে রয়েছে। সেসব নিয়ে ভাব। চোখের জল অতি আপনজন এবং আল্লাহর জন্য ফেলা উচিত। এদের মতো কু-মানুষের জন্য না।'

পদ্মজা হুহু করে কেঁদে উঠল। আচমকা হেমলতাকে মাঝপথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে,কান্নামাখা কণ্ঠে বলল,'তুমি জাদুকর আম্মা। তুমি জাদু জানো।'

হেমলতা পদ্মজার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। মোর্শেদ পদ্মজাকে কান্না থামাতে বলতে চাইলে,হেমলতা ইশারায় চুপ করিয়ে দেন। পাশেই বিস্তীর্ন ক্ষেত। গ্রীষ্মের দুপুরের রূপ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মোর্শেদের কপাল বেয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে। তার দৃষ্টি থমকে আছে হেমলতার দিকে। একটা অপ্রিয় সত্য সম্ভাবনার কথা মনে হতেই চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। তিনি দ্রুত চোখ সরিয়ে, বড় করে নিঃশ্বাস ফেলেন। জীবনের লীলাখেলায় তিনি নিঃস্ব। পদ্মজার কান্না থামার লক্ষণ নেই। হেমলতা ছদ্ম গাম্ভীর্যের সহিত বললেন,'এতো কাঁদলে কিন্তু মারব।'

আকাশ জুড়ে তারার মেলা। জানালা গলে চাঁদের আলো পদ্মজার মুখশ্রী ছুঁয়ে দিচ্ছে। সে বারান্দার ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বুকটা কেমন করছে। অনবরত কাঁপছে। হেমলতার উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত উঠে বসল। হেমলতা পদ্মজার দিকে মুহূর্ত কাল তাকিয়ে রইলেন। পদ্মজা নখ খুঁটছে। হেমলতা বললেন,'ঘুম আসছে না?'

পদ্মজা মাথা দুই পাশে নাড়াল। হেমলতা আর কিছু বললেন না। পদ্মজা পিনপতন নীরবতা কাটিয়ে বলল,'মেজো আপার বিয়ের তারিখ পড়ছে?'

হেমলতা পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। বিছানার উপর বসে পদ্মজাকে টেনে কোলে শুতে ইশারা করেন। পদ্মজা শুয়ে পড়ল। মায়ের কোলটা তার এখন ভীষণ দরকার ছিল। হেমলতা পদ্মজার প্রশ্ন এড়িয়ে অন্য কথা তুললেন। বললেন,'আমি জানি না কোনো মা তার মেয়ের কাছে নিজের বিয়ে সম্পর্কিত আলোচনা করেছে নাকি। কিন্তু আমি আমার বিয়ের গল্প তোকে বলতে চাই। শুনবি?'

পদ্মজা সায় দিল। হেমলতা পদ্মজাকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলার জন্য অতীতে নিয়ে যান,'সেদিন রাতে আব্বা এসে বলল, তিনদিন পর আমার বিয়ে। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। কষ্ট হয়েছিল। আমি আরো পড়তে চেয়েছিলাম। এরপর শুনলাম, যার সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে তার পড়াশোনা নেই। জ্ঞানও যথেষ্ট কম। রাগচটা লোক। এসব তথ্য জেনে রাগ,মন খারাপ কিছুই হয়নি। ভয় হয়। না জানি কেমন যাবে সংসার! বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলো। তোর আব্বাকে তখনো আমি দেখিনি। বিয়ের দিন আয়নায় প্রথম দেখি। কালো একটা মুখ। চোখ দু'টি গভীর। কখনো না দেখা মানুষটাকে, প্রথম দেখেই মনে হয় আমার সবচেয়ে আপন একজন মানুষ। সব ভয় কেটে

গেল। বিদায়ের সময় সবাই বলছিল,দুজনকে খুব মানিয়েছে। রাজযোটক। একজন হিন্দু দিদি বলেছিলেন,সাক্ষাৎ রাম সীতা। আটপাড়ায় যদি একজন ছয় ফুট লম্বার মানুষ থাকে তবে সেটা তোদের আব্বা ছিল। বিয়ের পর জানতে পারি,তোর আব্বাকে বিয়ে করার জন্য অনেক মেয়েই পাগল ছিল। নিজেকে খুব সৌভাগ্যবতী মনে হতো। অশিক্ষিত ভেবে নাক কুঁচকেছিলাম। সেই আমি তোর আব্বার জন্য দিনকে রাত, রাতকে দিন মানতে রাজি ছিলাম। এতোটাই ভালবাসা হয়ে গেছিল যে, তোর আব্বা ছুরি নিয়ে রক্তের আবদার করলে আমি আমার বুক পেতে দিতাম...।"

পদ্মজা মাঝপথে আটকে দিয়ে বলল,'তাও তো আব্বা তোমাকে ভালোবাসেনি আম্মা।'

হেমলতার হাসি উজ্জ্বল মুখটা নিভে গেল। অপ্রতিভ হয়ে উঠলেন। তিনি দৃষ্টি এলোমেলো রেখে বললেন,'তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল।'

পদ্মজা চুপ করে রইল। হেমলতাও নিশ্চুপ। দরজার পাশে মোর্শেদ বসেছিলেন। বিড়ি ফুঁকছিলেন। হেমলতার প্রতিটি কথা বুড়ো হয়ে যাওয়া মনটাকে দুমড়ে, মুচড়ে দিল। তিনি বিড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান চৌরাস্তার উদ্দেশ্যে। চৌরাস্তার পাশে একটা বড় ব্রিজ আছে। ব্রিজে দখিনা হাওয়ার তীব্রতা খুব বেশি। সেখানেই এসে দাঁড়ান। ফেলে আসা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর পদ্মজা বলল,'আম্মা, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর প্রশ্ন করব না। তবুও...'

'বলব একদিন।'

পদ্মজা আর জিজ্ঞাসা করল না,কোনদিন বলবে। নিশ্চুপতার অবস্থানে ফিরে গেল। মুহূর্ত কাল স্থির থেকে হেমলতা বললেন,'পূর্ণা খুব কান্নাকাটি করে দেখলাম। মেয়েটা এতো দূর্বল কী করে হলো?'

পদ্মজা হেমলতার এক হাত মুঠোয় নিয়ে আশ্বস্ত করল,'আমি আছি আম্মা। সামলে নেবো।'

'ঘরে যা। রাত হয়েছে অনেক।'

পদ্মজা উঠে বসল। ওড়নাটা ভাল করে টেনে নিয়ে,জুতা পরল। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। হেমলতা বিছানার শেষ অংশ থেকে বালিশ টেনে নেন। বালিশের নিচে দুটি কাগজ ভাঁজ করা ছিল। হেমলতা হাত বাড়িয়ে নেন। পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলেন,'পদ্মজা,এগুলো কী?'

হেমলতা ভাঁজ খুলেন। পদ্মজা ফিরে তাকায়। হেমলতার হাতে লিখনের চিঠি দুটি দেখে সর্বাঙ্গে বৈদ্যুতিক কিছু একটা ছড়িয়ে পড়ে,শরীর কাঁপিয়ে দিল। মাটি যেন দুই পা টেনে ধরল। হেমলতা প্রথম লাইন পড়ে বেশ অবাক হোন। পদ্মজার দিকে একবার চকিতে তাকান। এরপর এক নিঃশ্বাসে দুটো চিঠি পড়ে শেষ করেন। পড়া শেষে থম মেরে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। ভয়ে পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেমলতা ধীর পায়ে হেঁটে আসেন পদ্মজার কাছে। দু ভ্রূ প্রসারিত করে, শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন,' এসব কবে হয়েছে? আমাকে জানাসনি কেন?'

পদ্মজা প্যাচপ্যাচ করে কেঁদে বলল,'যখন উনারা শুটিং করতে আসেন।' পদ্মজার মনে হচ্ছে এখুনি সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না। মনে মনে প্রার্থনা করছে,যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারে সে। তাহলে এই লজ্জা থেকে বাঁচা যাবে। হেমলতা পদ্মজাকে পরখ করে নেন। পদ্মজা অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। বার বার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরছে। পদ্মজা হেমলতাকে চুপ থাকতে দেখে বলল,'তুমি যা বলবা তাই হবে আম্মা। আমার উপর রেগে যেও না।'

#পদ্মজা

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট-২০

আজ যেন শুধু মোড়ল বাড়ির মাথার উপরেই সূর্যটা উঠেছে। সকাল থেকে আত্মীয় আপ্যায়নের প্রস্তুতির তোড়জোড় চলছে। সবাই ঘেমে একাকার। বাড়ির প্রতিটি মানুষ ব্যস্ত। মোর্শেদ হিমেল ও প্রান্তকে নিয়ে বাজার করে ফিরেছেন সূর্য উঠার মাথায়। লাহাড়ি ঘরের পাশে বড় উনুন করা হয়েছে। সাধারণ চালের পরিবর্তে সুগন্ধি (কাটারিভোগ)সিদ্ধ চালের ভাত রান্না করা হয়েছে। ফিরনি, রাজ হাঁসের মাংস রান্না হচ্ছে। বাড়িজুড়ে রমরমা ব্যাপার। একদিন আগের

ঘটনা ধামাচাপা পড়েছে ৯৫ ভাগ। ছোট ছোট দরিদ্র ছেলেমেয়েরা খাবারের ঘ্রাণ পেয়ে ছুটে এসেছে মোড়ল বাড়ি। সবার মধ্যেই নতুন উত্তেজনা,নতুন অনুভূতি। শুধু পূর্ণা এখনো সেদিনের ঘটনা থেকে বেরোতে পারছে না। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ঘরে। পদ্মজা মনজুরা আর শিউলির মাকে কাজে সাহায্য করছিল। হেমলতা ধমকে ঘরে পাঠিয়ে দেন। পদ্মজা ঘামে ভেজা কপাল মুছতে মুছতে ঘরে প্রবেশ করে। পূর্ণার দুচোখ জলে নদী! পদ্মজা বিছানার উপর পা তুলে বসল। পূর্ণা পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে, হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। পদ্মজা কণ্ঠ খাঁদে নামিয়ে বলল,'চোখের জল কী শেষ হয় না?'

পূর্ণা নিরুত্তর। পদ্মজা অভিজ্ঞ স্বরে বলল,'দেখ পূর্ণা, এসব মনে রাখলে তোরই ক্ষতি। দেখছিস না,আমি একদিনের ব্যবধানে সব ভুলে হবু শ্বশুরবাড়ির মানুষদের জন্য রান্নাবান্না করছি। তুইও ভুলে যা। তোর বন্ধুরা আসছে। তুই নাকি তাদের ধমকে দিয়েছিস? এটা কিন্তু ঠিক না।'

পূর্ণা পদ্মজার দিকে তাকাল। দৃষ্টি ভীষণ শীতল। পদ্মজাকে বলল,'সত্যি ভুলতে পেরেছো আপা?'

পদ্মজা সঙ্গে,সঙ্গে উত্তর দিল,'ভুলিনি। কিন্তু সহ্য করতে পেরেছি। তোর মতো চোখের জল অপাত্রে ঢালছি না।'

পূর্ণা উঠে বসে,একটা বালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে দায়সারাভাবে বলল,'তুমি অনেক শক্ত আপা। আমি খুব দূর্বল। আমি ভুলতে পারছি না।'

পদ্মজা আর এই বিষয়ে কথা বাড়াল না। পূর্ণার গাঁ ঘেঁষে বসে,ফিসফিসিয়ে বলল,'গতকাল রাতে কী হয়েছে জানিস?'

'কি হয়েছে?'

পদ্মজা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলে,'তোর নায়ক ভাইয়ের চিঠি আম্মার হাতে পড়েছে।'

পূর্ণা আঁতকে উঠে বলল,'সেকী! কখন? কীভাবে?'

'আর বলিস না! সেদিন তুই নানাবাড়ি ছিলি। তখন চিঠি দুইটা বের করেছিলাম। বারান্দার ঘরে বালিশের নিচে রেখে দেই। আর মনে নেই। এরপরেই অঘটন ঘটে। এরপরদিন বিচার বসল। চিঠির কথা ভুলেই গেলাম। বারান্দার ঘরে ছিলাম রাতে,তবুও মনে পড়েনি। আর আম্মা পেয়ে গেল।'

উত্তেজনা, ভয়ে পূর্ণার গলা শুকিয়ে গেছে। প্রশ্ন করল,'আম্মা কী বলছে?'

পদ্মজা ঠোঁট দুটি উল্টিয়ে কী যেন ভাবে। এরপর ব্যথিত স্বরে বলল,'তেমন কিছুই না। এজন্যই আরো ভয় হচ্ছে।'

'কিছুই না?'

'কখন হলো এসব জিজ্ঞাসা করেছে। আমি বললাম,তুমি যা বলবে তাই হবে। এরপর আম্মা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।'

'তারপর?'

'বলল, ঘুমা গিয়ে। শেষ।'

দুই বোন একসাথে চিন্তায় পড়ে গেল। কপাল ভাঁজ করে কিছু ভাবতে শুরু করে। পূর্ণা বলল,'আম্মা তোমার মুখ দেখে বুঝে গেছে তুমি লিখন ভাইকে ভালোবাসো না।'

পদ্মজা অন্যমনস্ক হয়ে বলল,'মনে হয়।'

পূর্ণা খুব বিরক্তি নিয়ে বলল,'লিখন ভাই এতো সুন্দর, তোমাকে এতো ভালোবাসে তবুও কেন ভালবাসোনি আপা? লিখন ভাইয়ের চিঠি তো ঠিকই সময় করে করে পড়তে। বিয়ে করতে কী সমস্যা?'

'আম্মা দিলে তো করবই। সমস্যা নেই।'

'তোমার এই ন্যাকার কথা আমার ভাল লাগে না আপা।'

পদ্মজা হেসে ফেলল। পূর্ণার রেগে কথা বলা দেখে। পদ্মজা পূর্ণার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,'গতকাল রাতে আম্মা আব্বার প্রতি ভালোবাসাটা আমাকে বলছে। প্রথম দেখেই নাকি আপন,আপন লেগেছিল। আব্বার জন্য আম্মা দিনকে রাত,রাতকে দিন মানতেও রাজি ছিলেন। এতোটা ভালোবাসতেন। আমার তেমন কোনো অনুভূতি হয়নি তোর নায়ক ভাইয়ের জন্য। প্রথম প্রথম কোনো পুরুষের চিঠি পেয়েছিলাম, সবকিছু নতুন ছিল। তাই একটা ঘোরে গিয়ে নতুন অনুভূতির সাক্ষাৎ পাচ্ছিলাম। আম্মার ভালবাসার কথা শোনার পর থেকে মনে হচ্ছে আমি উনাকে ভালোবাসিনি। সবটা মোহ ছিল। দূরে যেতেই উবে গেছে। তবে, উনি খুব অসাধারণ একজন মানুষ। আম্মা উনার হাতে তুলে দিলে আমাকে, কোনো ভুল হবে না। কিন্তু এটা এখন কল্পনাতীত। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

পদ্মজার এতো কথা উপেক্ষা করে পূর্ণা কটমট করে বলল,'তোমার কী কালাচাঁদরে দেখলে আপন আপন লাগে?'

পদ্মজা চোখ ছোট ছোট করে জিজ্ঞাসা করল,'কালাচাঁদ কে?'

পূর্ণা মিনমিনিয়ে বলল,'তোমার হবু জামাই।'

তারপরই গলা উঁচিয়ে বলল,'আমিও কালা জানি। কিন্তু আপা,তোমার জন্য লিখন ভাইয়ের মতো সুন্দর জামাই দরকার।'

পদ্মজা এক হাতে কপাল চাপড়ে বলল,'এখনও লিখন ভাই! যা তোর সাথে তোর নায়কের বিয়ে দিয়ে দেব। এখন আয়,ঘর থেকে বের হ। মুক্তা,সোনামণি,রোজিনা আসছে। তোর সাথে কথা বলবে। আয় বলছি...আয়।'

পূর্ণাকে টেনে নিয়ে বের হলো পদ্মজা।

____

সূর্য মামার রাগ কমেছে। মোড়ল বাড়ির মাথার উপর থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সদর ঘর ভর্তি মানুষ। হাওলাদার বাড়ির বউদের গ্রামবাসী শেষবার তাদের বিয়েতেই দেখেছে। আবার দেখার সুযোগ হওয়াতে দল বেঁধে মানুষ এসেছে। লোকমুখে শোনা যায়, হাওলাদার বাড়ির মেয়ে-বউদের সারা অঙ্গে সোনার অলংকার ঝলমল করে। মগা-মদন সহ আরো দুজন ভৃত্য মোড়ল বাড়ির গেইটে দাঁড়িয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। পদ্মজাকে শাড়ি পরাচ্ছেন হেমলতা। পদ্মজা এর আগে কখনো শাড়ি পরেনি। পূর্ণা, প্রেমা ছোট হয়েও পরেছে। পদ্মজার কখনো ইচ্ছে করেনি।তাই সে হেমলতাকে বলল, 'প্রথম শাড়ি তুমি পরাবে আম্মা।'

শাড়ি পরানো শেষে, চোখে কাজল এঁকে দেন। ঠোঁটে লিপিস্টিক দিতে গিয়েও,দিলেন না। মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি করে চুল খোঁপা করতেই,পূর্ণা ছুটে আসে। হাতে শিউলি ফুলের মালা। হেমলতা মৃদু ধমকের স্বরে বলেন,'এতক্ষণ লাগল!'

হেমলতার কথা বোধহয় পূর্ণার কানে গেল না। পূর্ণা চাপা উত্তেজনা নিয়ে বলল,'আল্লাহ! আপারে কী সুন্দর লাগছে!'

পদ্মজা লজ্জায় মিইয়ে গেল। চোখে মুখে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে। হেমলতা পদ্মজার খোঁপায় ফুলের মালা লাগিয়ে দিয়ে বললেন,'শুধু রূপে চারিদিক আলোকিত করলে হবে না,গুণেও তেমন হতে হবে।'

পদ্মজা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। তখন হুড়মুড়িয়ে সেখানে উপস্থিত হলো লাবণ্য। দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জাপটে ধরে। এক নিঃশ্বাসে বলেও ফেলল,'আল্লাহ, পদ্ম তুই আমার ভাবি হবি। আমার বিশ্বাসই হইতাছে না। মনে হইতাছে স্বপ্ন দেখতাছি। ইয়া...মাবূদ। শাড়িতে তোরে পরী লাগতাছে। বাড়ির সবাই ফিট খাইয়া যাইব। দেহিস।'

পদ্মজা কি বলবে ভেবে পেল না। শুধু হাসল। হেমলতা পদ্মজার মাথার ঘোমটা টেনে দেন। লাবণ্যকে বলেন,'তোমার সইকে নিয়ে যাও।'

পদ্মজা হেমলতার হাতে হাত রেখে অনুরোধ করে বলল,'আম্মা,তুমি আসো।'

হেমলতা হাসেন। পদ্মজার মাথায় এক হাত রেখে বলেন,'কয়দিন পর থেকে এরাই তোর আপন। মা পাশে থাকবে না।'

পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। ছলছল চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। পদ্মজাকে নতুন বউ রূপে দেখে হেমলতার বুকে ঝড় বইছে। মেয়েটা কয়দিন পর আলাদা হয়ে যাবে। দুই মাস আগে হলে তিনি সাত রাজার ধনের বিনিময়েও মেয়ের বিয়ে দিতেন না।

'আমি আসছি। লাবণ্য যাও তো নিয়ে যাও। পূর্ণা তুইও যা।'

লাবণ্য পদ্মজাকে নিয়ে যায়। পদ্মজার বুক ধড়ফড় করছে। মায়ের যেন কী হয়েছে! সে পিছন ফিরে তাকায়। সাথে সাথে হেমলতা অন্য দিকে ঘুরে তাকান। চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি দ্রুত তা মুছেন।

সদর ঘর কোলাহলময় ছিল। পদ্মজা ঢুকতেই সব চুপ হয়ে গেল। লাবণ্য পদ্মজাকে ছেড়ে ভারী আনন্দ নিয়ে বলল,'আম্মা,কাকিম্মা,ভাবি,আপারা এইযে পদ্মজা। আমার নতুন ভাবি।'

পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। অলংকারে জ্বলজ্বল করা পাঁচ জন নারীকে দেখে যেন চোখ ঝলসে গেল তার। সবাই তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা চোখ নামিয়ে ফেলল। তখন কোথা থেকে আবির্ভাব হলো আমিরের। সদর দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল পদ্মজা। পদ্মজাকে দেখে থমকে গেল সে। পদ্মজার পরনে খয়েরি রংয়ের জামদানি শাড়ি। শাড়িতে কোনো মেয়েকে এতো সুন্দর মনে হতে পারে এর আগে অনুভব করেনি আমির। আমিরের লজ্জা খুব কম। সে উপস্থিত গুরুজনদের উপেক্ষা করে পদ্মজাকে বলল,'মাশাআল্লাহ। দিনের বেলা চাঁদ উঠে গেছে।'

লজ্জায় পদ্মজার রগে রগে কাঁপন ধরে। এতো লজ্জাহীন মানুষ কী করে হয়! আমিরের মা ফরিনা ধমকের স্বরে বলেন,'বাবু,এইনে বয় আইসসা।'

আমির পদ্মজাতে দৃষ্টি স্থির রেখে মায়ের পাশে গিয়ে বসল। হেমলতা সদর ঘরে প্রবেশ করতেই আমির ধড়ফড়িয়ে উঠল। ছুটে এসে হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করল। হবু শ্বাশুড়ির প্রতি আমিরের এতো দরদ দেখে ফরিনা খুব বিরক্ত হলেন। পাশ থেকে ফরিনার জা আমিনা ফিসফিসিয়ে বললেন,'মেয়ের রূপ আগুনের হুল্কা। বাবু এইবার হাত ছাড়া হইলো বলে।'

আমিনার মন্ত্র ফরিনার মগজ ধোলাই করতে পারল না। পদ্মজার রূপে তিনি মুগ্ধ। আমির কালো বলে তিনি ছোট থেকেই আমিরকে বলতেন,'বাবু তোর জন্যি চান্দের লাকান বউ আনাম।' আর সেই কথা রক্ষার পথে। তিনি শুধু

পছন্দ করছেন না শ্বাশুড়ির প্রতি আমিরের এতো দরদ! কী দরকার ঝাঁপিয়ে পড়ে পায়ে ধরে সালাম করার। আমির হেমলতাকে ভক্তির সাথে প্রশ্ন করল,'ভালো আছেন?'

হেমলতা মিষ্টি করে হেসে বলেন,'ভালো আছি। যাও গিয়ে বসো।'

আমির বাধ্যের মতো মায়ের পাশে গিয়ে বসল। মজিদ মাতব্বর, মোর্শেদের সাথে বাইরে আলোচনা করছেন। আর কোনো পুরুষ আসেনি বাড়িতে। তারা বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত। মুহূর্তে পদ্মজার সারা অঙ্গ সোনার অলংকারে পূর্ণ হয়ে উঠল। রূপ বেড়ে গেল লক্ষ গুণ। যার কোনো সীমা নেই। যার সাথেই পদ্মজা কথা বলেছে, সেই এগিয়ে এসে বালা নয়তো হার পরিয়ে দিয়েছে। কি অবাক কান্ড!

সবাই আড্ডা দিচ্ছে। পদ্মজা চুপ করে বসে আছে। কেউ কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছে। লাবণ্য একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল,'রানি আপা,বাড়ির পিছনে যাইবা?'

রানি খুশিতে গদগদ হয়ে বলল,'যাব।'

তার খুশির কারণ লাবণ্য কিছুটা ধরতে পেরেছে। রানির একজন প্রেমিক আছে। তাই শুধু সুযোগ খুঁজে দেখা করার। যেখানেই দাওয়াত পড়ে সেখানেই তার প্রেমিক উপস্থিত হয়। লাবণ্য সবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পদ্মজা,পূর্ণা,রানিকে নিয়ে বাড়ির পিছনে আসে। রানি বাড়ির পিছনে এসেই ঘাটের দিকে ছুটে যায়। একটা নৌকা এসে ভীরে। নৌকায় কে ছিল দেখা যায় না। রানি নৌকায় উঠে পড়ে। কারো সাথে বিরতিহীন ভাবে কথা বলছে শোনা যায়। পূর্ণা লাবণ্যকে প্রশ্ন করল,'লাবণ্য আপা? রানি আপা কার সাথে কথা বলে?'

'আবদুল ভাইয়ের সাথে।'

'কোন আবদুল?'

'যার কথা ভাবছিস।' কথা শেষ করে লাবণ্য চোখ টিপল। পূর্ণা অবাক হয়ে বলল,'মাস্টারের সাথে!'

লাবণ্য হাসে। রানি এগিয়ে আসে। লাবণ্য বলে,'কথা শেষ?'

'হ চইলা গেছে।'

রানি পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বলল,'মাশাআল্লাহ, তুমি এতো সুন্দর। আমার কোলে নিয়া আদর করতে মন চাইতাছে।'

পদ্মজা মুচকি হেসে বলল,'আপনি খুব শুকনা। আমাকে কোলে নিতে পারবেন না।'

'শুকনা হইতে পারি। শক্তি আছে।'

রানির কথা বলার ঢংয়ে সবাই হেসে উঠল। পূর্ণা আমিরকে দেখে পদ্মজার কানে কানে বলল,'আপা তোমার কালাচাঁদ আসছে।'

পদ্মজা পূর্ণাকে চোখ রাঙিয়ে বলল,'কীসব কথা! উনার বোনরা আছে।'

'লাবণ্য,রানি যা এখান থেকে।' আমিরের আদেশ শুনে রানি,লাবণ্য খুব বিরক্ত হলো। রানি কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল,'দাভাই,থাকি না।'

আমির চোখ রাঙিয়ে তাকাল। ধমকের স্বরে বলল,'যেতে বলছি যা।'

লাবণ্য বিরক্তিতে, ইশশ! বলে পদ্মজাকে বলল,'আয় অন্যখানো যাই।'

'পদ্মজা থাকুক। তোরা যা।' আমিরের কথা শুনে বেশি চমকাল পদ্মজা। লাবণ্য ফোঁসফোঁস করতে করতে বলল,'কেন? কেন?'

পদ্মজা, পূর্ণা অন্যদিকে ফিরে আছে। আমির দৃষ্টি কঠোর করতেই লাবণ্য,রানি চলে গেল। পূর্ণা চলে যেতে চাইলে পদ্মজা পূর্ণার হাত চেপে ধরে। পূর্ণা পদ্মজার হাত ছাড়িয়ে, ধীরকণ্ঠে বলল,'একা থেকে তোমার কালাচাঁদের ভালোবাসা খাও।'

'ছিঃ।'

পূর্ণা ছুটে চলে গেল। আমির পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াতেই পদ্মজা বলল,'বিয়ের আগে গুরুজনদের না জানিয়ে এভাবে একা কথা বলা ঠিক নয়।'

'কী হবে?'

পদ্মজা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল,'কলঙ্ক লাগবে।'

'আর কী বাকি আছে?'

'পরিমাণ না বাড়ানোই ভাল।'

পদ্মজার কথা বলতে একটুও গলা কাঁপেনি। বাড়ির ভেতর চলে আসার জন্য পা বাড়াতে আমির পদ্মজার এক হাত থাবা দিয়ে ধরে,আবার ছেড়ে দিল। পদ্মজা ছিটকে দূরে সরে গেল। আমির বলল,'তুমি সত্যি একটা পদ্ম ফুল পদ্মবতী। এজন্যই লিখন শাহর মতো সুদর্শন যুবক তোমার প্রেমে পড়েছে।'

দেখা হওয়ার পর এই প্রথম পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল। পরপরই চোখের দৃষ্টি সরিয়ে ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল। আমির অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এবার আত্মীয় বিদায়ের পালা। যাওয়ার পূর্বে লাবণ্য একটা কাগজ পদ্মজার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল,'দাভাই দিছে।'

ঘুমাবার আগে পদ্মজা কাঁপা হাতে কাগজটির ভাঁজটি খুলল। কাগজটিতে যত্ন করে লেখা-

সারা অঙ্গ কলঙ্কে ঝলসে যাক

তুই বন্ধু শুধু আমার থাক।

#পদ্মজা

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট- ২১

সারা বাড়ির সব কাজ শেষ করে, হেমলতা ক্লান্ত পায়ে হেঁটে ঘরে আসেন। মোর্শেদ সবেমাত্র শুয়েছেন। হেমলতা বিছানার এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করেন। মোর্শেদ হেমলতার দিকে ফিরে ধীরকণ্ঠে বলেন,'ধানের মিলটা পাইয়া যাইতাছি।'

মোর্শেদের গলা দূর্বল হলেও খুশিতে চোখ চকচক করছে। হেমলতা মৃদু হেসে বলেন,'মাতব্বর কী যৌতুক দিচ্ছেন?'

মোর্শেদ হেসে বলেন,' সে কইতে পারো। সে আমারে কী কইছে জানো?'

'কী?'

'কইলো, শুনো মোর্শেদ...আইচ্ছা আগে শুনো আমি কিন্তু শহুরে ভাষায় কইতে পারুম না। আমি আমার গ্রামের ভাষায় কইতাছি।'

হেমলতা মোর্শেদের কথা বলার ভঙ্গি দেখে আওয়াজ করেই হাসলেন। বললেন,'আচ্ছা,যেভাবে ইচ্ছে বলো।'

মোর্শেদ খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করে বললেন,'কইলো,শুনো মোর্শেদ তোমার এই মোড়ল বাড়ি হইতাছে একটা বিল। যে বিলে একটাই পদ্ম ফুল আছে। এই পদ্ম ফুলডার জন্যই এই বিলটা এতো সুন্দর। আর আমি সেই পদ্ম ফুলডারে তুইললা নিয়া যাইতাছি। এই বিলে পদ্ম ফুলডার চেয়ে দামি সুন্দর আর কিছু নাই। তাই আমার আর কিছু লাগব না। বিনিময়ে আমি এই খালি বিলডারে ধানের মিল দিয়ে দিলাম। বুঝলা লতা? মাতব্বর মানুষটা সাক্ষাৎ ফেরেশতা। মন দয়ার সাগর।'

'হুম।' হেমলতা বললেন,ছোট করে। পুনরায় বললেন,'একটা কথা।'

মোর্শেদ জিজ্ঞাসু ইশারা করেন ভ্রু উঁচিয়ে। হেমলতা উঠে বসেন। বলেন,'লিখনকে মনে আছে? সে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল তোমাকে?'

মোর্শেদ লেশমাত্র অবাক হলেন না। দায়সারাভাবে বললেন,'এতদিনে জানলা? আমি মনে করছি কবেই জাইননা ফালাইছো।'

'আমি তো আর সবজান্তা নই। আমাকে বলোনি কেন?'

'বইললা কি হইতো? ছেড়ি বিয়া দিতা? আর ছেড়াডা নায়ক। কত ছেড়ির লগে ঘষাঘষি করে। ছেড়িগুলাও নষ্টা। নষ্টাদের সাথে চলে এই ছেড়ায়।'

'মুখ খারাপ করো না। ছেলেটার মধ্যে আমি তেমন কিছু দেখিনি। তুমি আমাকে জানাতে পারতে। নিশ্চিন্তে ছেলেটা সুপাত্র। বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, সে মা বাবা নিয়ে আসলে আমি ফিরিয়ে দিতাম না। থাক...এসব কথা। এখন বলেও লাভ নেই। পদ্মজার মন স্থির আছে। পরিস্থিতি, ভাগ্য সেখানে নিয়ে যাচ্ছে,সেখানেই গা ভাসিয়ে চলুক। ঘুমাও এখন। ভোরে উঠে গোলাপ ভাইয়ের বাড়িতে যাবা। কত কাজ বাকি! বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে কী সামান্য কথা!'

হেমলতা একা কথা বলতে বলতে অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে পড়েন। কিছু সময়ের ব্যবধানে ঘুমিয়েও পড়লেন।

সকাল থেকে পূর্ণার দেখা নেই। পদ্মজা পূর্ণাকে খুঁজে বাড়ির পিছনে আসে। পূর্ণা সিঁড়িঘাটে বসে উদাস হয়ে কী যেন ভাবছে। পদ্মজা পা টিপে হেঁটে আসে। পূর্ণা বোনের উপস্থিতি টের পায়নি। পদ্মজা পূর্ণার পাশে বসে। তবুও পূর্ণা টের পেল না। পদ্মজা পূর্ণাকে ধাক্কা দিল। পূর্ণা চমকে তাকাল। বুকে ফুঁ দিয়ে বলল,'ভয় পাইছি।'

'উদাস হয়ে কী ভাবছিস?'

'কিছু না।'

'আবার ওইসব ভাবছিস! কতবার না করলে শুনবি বল তো?'

পূর্ণা নতজানু হয়ে রইল। ক্ষণকাল পার হওয়ার পর ভেজা কণ্ঠে বলল,'নিজের ইচ্ছায় মনে করে কষ্ট পেতে আমার ইচ্ছে করে না আপা। মনে পড়ে যায়।'

'চেষ্টা তো করবি। আর ভুলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। এছাড়া অমানুষগুলো তাদের শাস্তি তো পেয়েছেই।'

পূর্ণা চোখের জল মুছে আগ্রহ নিয়ে বলল,'আম্মা তিন জনকে কী করে মারল আপা?'

'জানি না।'

'জিজ্ঞাসা করবা আম্মাকে?'

পদ্মজা ভাবল। এরপর বলল,'করব। আজ না অন্য একদিন।'

'বিয়ে করে তো চলেই যাবা।''

পদ্মজা অভিমানী হয়ে তাকাল পূর্ণার দিকে। বলল,'আর কী আসব না? ফিরে যাত্রা আছে। আবার এমনিতেও আসব। কয়দিন পর পর।'

'তাহলে কালাচাঁদের সাথে বিয়েটা সত্যিই হচ্ছে?'

'তুই কী মিথ্যে ভাবছিস?'

পূর্ণা বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে ফেলল। বলল,'লিখন ভাইয়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে।'

লিখন নামটা শুনে পদ্মজা অপ্রতিভ হয়ে উঠল। নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হয়। তাই সে প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল,'উনাকে পছন্দ না তাই কালা বলিস, ঠিক আছে। কিন্তু চাঁদ কেন বলিস বুঝলাম না।'

পূর্ণা আড়চোখে পদ্মজার দিকে তাকায়। এরপর যান্ত্রিক স্বরে বলল,'পাতিলের তলার মতো কালা হয়ে আমার চাঁদের মতো সুন্দর বোনকে বিয়ে করতেছে বলেই কালাচাঁদ ডাকি। নয়তো কালা পাতিল ডাকতাম। আবার দরদ দেখিয়ে বলিও না,উনি তো এতো কালা না। শ্যামলা।' কথা শেষ করে পূর্ণা ঠোঁট বাঁকাল।

পদ্মজা শব্দ করে হাসতে শুরু করল। কিছুতেই হাসি থামছে না। পূর্ণা পদ্মজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল,'তুমি খুব কঠিন আপা। খুব ধৈর্য্য তোমার,ঠিক আম্মার মতো।'

পদ্মজা হাসি থামিয়ে পূর্ণার দিকে তাকাল। সময়টা শুধু দুই বোনের। পদ্মজা মায়াবী স্বরে বলল,'আর তুই ঠিক আম্মার বাহ্যিক রূপের জোড়া পর্ব।'

প্রান্ত,প্রেমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে নদীর ঘাটে। পদ্মজার উদ্দেশ্যে বলে,'বড় আপা দুলাভাই আসছে।'

আমির আসার খবর শুনেই বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পদ্মজা নিজের ঘরে চলে গেল। এই লোকটা এতো বেহায়া আর নির্লজ্জ! গতকাল সকাল-বিকাল বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করেছে। সেই খবর পদ্মজা পেয়েছে। আজ একেবারে বাড়িতে! বিয়ের তো আর মাত্র তিন দিন বাকি। এতোটুকু সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রন করা কী সম্ভব নয়? পদ্মজা কপাল চাপড়ে বিড়বিড় করে,'এ কার সাথে বিয়ে হচ্ছে আল্লাহ।'

উঠানে হেমলতা ছিলেন। আমির বাড়ির ভেতর ঢুকেই হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করল। এরপর নতজানু হয়ে বলল,'কেমন আছেন আম্মা?'

হেমলতার চক্ষু চড়কগাছ! আমিরের সাথে মগা এসেছে। মগার হাতে মাছের ব্যাগ, মাথায় ঝুড়ি। তাতে মশলাপাতি সাথে শাকসবজি। বিয়ের আগে এতো বাজার আবার আম্মাও ডাকা হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার স্যাপার! হেমলতা ঢোক গিলে ব্যাপারটা হজম করে নেন। ধীরেসুস্থে বলেন,'ভালো আছি। তুমি ভালো আছো? বাড়ির সবাই ভালো আছে?'

'জি,জি। সবাই ভালো।'

আমির মগাকে ইশারা করল। মগা বারান্দায় মাছের ব্যাগ, মাথার ঝুড়ি রাখল। হেমলতা আমিরকে বললেন,'এতসব বিয়ের আগে আনার কী দরকার ছিল? পাগল ছেলে।'

আমির হেসে ইতস্ততভাবে নতজানু অবস্থায় বলল,'এমনি।'

'যাও ঘরে গিয়ে বসো।'

'আম্মা...'

হেমলতা চলে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়েন। আমির বলল,'আম্মা, ক্ষমা করবেন। সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'কোনো দরকার কী ছিল?'

'আ..আসলে আম্মা। পদ্মজার সাথে একটু কথা ছিল।'

আমির উসখুস করছে। খুব অস্থির। হাত,পা এদিকওদিক নাড়াচ্ছে। কিন্তু চোখ মাটিতে স্থির। হেমলতা আমিরকে ভাল করে পরখ করে নিয়ে বললেন,'ঘরে আছে নয়তো ঘাটে।'

অনুমতি পেয়ে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে গেল আমির। হেমলতা আমিরের যাওয়ার পানে চেয়ে থেকে ভাবেন,ছেলেটার সাথে এখনও চোখাচোখি হয়নি। সবসময় মাথা নত করে রাখে। কিন্তু কথাবার্তায় মনে হলো,লাজুক নয় এই ছেলে। হয়তো গুরুজনদের সামনে মাথা নিচু করে রাখা ছোটবেলার স্বভাব। হেমলতা মুচকি হেসে লাহাড়ি ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

পদ্মজার ঘরের শেষ প্রান্তে বারান্দা আছে। বারান্দা পেরোলেই বাড়ির পিছনের দরজা। আমির আসছে শুনে ঘর আর বারান্দার মাঝ বরাবর দরজায় পর্দা টানিয়ে দিল পদ্মজা। আমির ঘরের পাশে দাঁড়াল। পদ্মজা বারান্দার দিকে। পর্দার কাপড় পাতলা,মসৃণ। আমির স্পষ্ট পদ্মজার অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। তিরতির করে বাতাস বইছে। সেই বাতাসে পদ্মজার কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলো উড়ছে অবাধ্য হয়ে। আমির ডাকল,'পদ্মজা?'

'হু?'

'কেমন আছো?'

'ভালো। আপনি?'

'ভালো।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা! পদ্মজা বলল,'কী বলবেন বলুন।'

'মায়াভরা চোখগুলো দেখার সৌভাগ্য কী হবে?'

আমিরের কণ্ঠে আকুতি! তৃষ্ণা! পদ্মজার অস্বস্তি হচ্ছে। বেহায়া মানুষ বড়ই বিপদজনক। সে পালানোর জন্য পা বাড়াতেই আমির হই হই করে উঠল,'কসম লাগে পালাবে না।'

পদ্মজা মাথার ওড়না টেনে নিয়ে বলল,'দরকারি কথা থাকলে বলে চলে যান।'

'তাড়িয়ে দিচ্ছো?'

'ছিঃ না।'

'তোমায় না দেখলে আজ আর প্রাণে বাঁচবো না। রাতেই ইন্না লিল্লাহ...'

'রসিকতা করবেন না। কাউকে না দেখে কেউ মরে না।'

'পদ্মবতীর রূপ যে পুরুষ একবার দেখেছে সে যদি বার বার না দেখার আগ্রহ দেখায় তাহলে সে কোনো জাতেরই পুরুষ না। একবার দেখা দাও। কসম লাগে...'

'বার বার কসম দিয়ে ঠিক করছেন না।'

'আচ্ছা,কসম আর কসম দেব না। একবার দেখা দাও।'

পদ্মজার দুই ঠোঁট হা হয়ে গেল। কী বলে মানুষটা! কসম করেই বলছে আর কসম দিবে না। আমির ধৈর্য্যহারা হয়ে বলল,'পদ্মবতী অনুরোধ রাখো...'

'এভাবে বলবেন না। নিজেকে ছোট লাগে।'

'পর্দা সরাব?'

পদ্মজা ঘামছে। বাতাসে অস্বস্তি। নিঃশ্বাসে অস্বস্তি। তবুও সায় দিল। আমির পর্দা সরিয়ে খুব কাছে পদ্মজাকে দেখতে পেল। কালো রঙের সালোয়ার কামিজ পরা পদ্মবতী। কপাল অবধি টেনে রাখা ঘোমটা। পদ্মজা চোখ তুলে তাকাতেই আমির বলল,'জীবন ধন্য।'

পদ্মজা হাসি সামলাতে পারল না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসল। আমির বলল,'এ মুখ প্রতিদিন ভোরে দেখব। আর প্রতিদিনই জীবন ধন্য হবে। এমন কপাল কয়জনের হয়।'

পদ্মজা কিছু বলল না। আমির আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল,'আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার হাতে খুন হয়ে যাই।'

পদ্মজা চমকে উঠল। আশ্চর্য হয়ে বলল,'আপনি পাগল।'

আমির কণ্ঠ খাদে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,'তোমার উপস্থিতি আমার নিঃশ্বাসের তীব্রতা কতটা বাড়িয়ে দিয়েছে টের পাচ্ছো?'

পদ্মজা দূরে সরে গেল। মনে মনে বলল,'উফ! আল্লাহ আমি পাগল হয়ে যাব। এ কার পাল্লায় পড়লাম। জ্ঞানবুদ্ধি,লাজলজ্জা কিছু নেই।'

আর মুখে আমিরকে বলল,'পেয়েছি। এবার আসি।'

আমিরকে কিছু বলতে না দিয়ে পদ্মজা বারান্দা ছাড়ল। বাড়ির পিছনে মগাকে পেল।মগার পথ আটকে বলল,'মগা ভাই।'

মগা সবগুলো দাঁত বের করে হাসল। বলল,'জ্বে ভাবিজান।'

মগার মুখে ভাবি ডাক শুনে পদ্মজা বিরক্ত হলো। কিন্তু প্রকাশ করল না। বিরক্তি লুকিয়ে বলল,'লিখন শাহর কথা আপনি উনাকে বলেছেন?'

'উনিটা কে?'

'আপনার আমির ভাই।'

'জ্বে ভাবিজান।'

মগার অকপট স্বীকারোক্তি! পদ্মজা এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না। মগাকে পাশ কেটে চলে গেল। মগা দৌড়ে এসে পদ্মজার পথ রোধ করে দাঁড়াল। ফিসফিসিয়ে গোপন তথ্য দিল। আগামী দুই দিনের মধ্যে লিখন শাহ আসছে। তার বাবা মাকে নিয়ে। খবরটা মগা গত সপ্তাহ পেয়েছে। পদ্মজার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। ঢোক গিলে নিজেকে আশ্বস্ত করে নিল। সে তো কথা দেয়নি বিয়ে করার। আর না কখনো চিঠি দিয়েছে। লিখন শাহ নিরাশ হলে এটা তার দোষ নয়,লিখন শাহর ভাগ্য। তবুও পদ্মজার খারাপ লাগছে। অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। জীবনে আবার কী কিছু ঘটতে চলেছে? বুক ধড়ফড়,ধড়ফড় করছে। পদ্মজা ঘাটের সিঁড়িতে বসে রইল ঝিম মেরে।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট -২২

মোড়ল বাড়ির আনাচেকানাচে আত্মীয়স্বজনদের কোলাহল। পদ্মজা বিছানার এক কোণে চুপটি করে বসে আছে। ঘরে দুষ্টু রমণী আছে কয়েকজন। নিজেদের মধ্যে রসিকতা করছে। উচ্চস্বরে হাসছে। অথচ এরাই বিপদের সময় পাশে ছিল না। ভীষণ গরম পড়েছে। পদ্মজার পরনে সুতার কাজ করা সুতি শাড়ি। গরমে শুধু ঘামছে না। বমি পাচ্ছে। প্রেমা পদ্মজার পাশে বসে ছিল। পদ্মজা প্রেমাকে ফিসফিসিয়ে বলল,'এই বনু? আম্মাকে গিয়ে বলবি লেবুর শরবত দিতে?'

প্রেমা মাথা নাড়িয়ে চলে গেল শরবত আনতে। হেমলতা রান্নাঘরে ছিলেন। প্রেমা লেবুর শরবতের কথা বললে তিনি বললেন,'তুই যা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

লেবু গাছ থেকে সবেমাত্র ছিঁড়ে আনা পাকা লেবুর শরবত বানিয়ে পদ্মজার ঘরের দিকে এগোলেন তিনি। গিয়ে দেখলেন পদ্মজা বিছানার এক পাশে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। উসখুস করছে। ঘরভর্তি অন্যান্য মানুষে।তিনি সবার উদ্দেশ্যে বলেন,'সবাই অন্য ঘরে যাও। পদ্মজাকে একা ছাড়ো।'

হেমলতার এমন আদেশে অনেকের রাগ হলেও বেরিয়ে গেল। তিনি দরজা বন্ধ করে শরবতের গ্লাস পদ্মজার হাতে তুলে দিয়ে বলেন,'সব সময় মুখ বন্ধ রাখা ভালো না। যারা বিপদে পাশে থাকে না তাদের জন্য বিন্দুমাত্র অসুবিধার মুখোমুখি হবি না। গরমে তো শেষ হয়ে যাচ্ছিস। জানালার পাশটাও অন্যরা ভরাট করে রেখেছিল। ভালো করেই সরতে বলতি।'

পদ্মজা মায়ের কথার জবাব না দিয়ে এক নিঃশ্বাসে লেবুর শরবত শেষ করল। এবার একটু আরাম লাগছে। আলনার কাপড় গুলো অগোছালো। সকালেই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় মেয়েগুলির কাজ। হেমলতা আলনার কাপড় ঠিক করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন ,'কী নিয়ে এত চিন্তা করছিস?'

পদ্মজা কিছু না বলে বিছানায় আঙ্গুল দিয়ে আঁকিবুঁকি করতে থাকল। পদ্মজার অস্বাভাবিকতা দেখে হেমলতা কপাল কুঁচকালেন।

'বলবি তো?'

পদ্মজা বিচলিত হয়ে বলল,'আম্মা উনি বোধহয় আজ আসবেন।'

'উনি? উনি কে? আমির?'

'না আম্মা। লিখন শাহ যে,উনি।'

হেমলতা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,'কপালে যা আছে তাই তো হবে। ভাবিস না। আমি আছি,সব সামলে নেব। লিখনকে আমি বুঝাব।'

হেমলতার কথা শেষ হতেই,পদ্মজা ভেজা কণ্ঠে বলল,'উনি খুব কষ্ট পাবেন আম্মা।'

হেমলতা অবাক হয়ে তাকান পদ্মজার দিকে। পদ্মজা এতো ব্যকুল কেন হচ্ছে? তিনি কী পদ্মজার অনুভূতি চিনতে ভুল করছেন?নাকি শুধুমাত্র কারো মন ভাঙবে ভেবে,পদ্মজার এতো ব্যাকুলতা!হেমলতা দোটানায় পড়ে যান।

পদ্মজার জীবনে এ কেমন টানাপোড়ন! এই মুহূর্তে পদ্মজাকে বুঝে উঠতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। ওদিকে হানি ডাকছে। হেমলতার বড় বোন হানি,গতকাল ঢাকা থেকে গ্রামে এসেছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছে। হেমলতা দরজার দিকে পা বাড়ান। তার আগে বলে গেলেন,'আমার নোংরা অতীত শুনাব আজ। বাকি সিদ্ধান্ত তোর। যা চাইবি তাই হবে। মনে রাখিস,যা চাইবি তাই পাবি।'

পদ্মজা কিছু বলার আগে হেমলতা চলে গেলেন। পদ্মজার বুকের ভেতর অপ্রতিরোধ্য তুফান শুরু হয়। মায়ের অতীত জানার জন্য কত অপেক্ষা করেছে সে। আজ যখন সেই সুযোগ এলো,তার ভয় হচ্ছে খুব। কেন হচ্ছে জানে না। কিন্তু হচ্ছে। হাত,পায়ের রগে রগে শিরশির অনুভূতি।

ভ্যানগাড়িতে চড়ে অলন্দপুরের আটপাড়ায় ঢুকল লিখন শাহ। সাথে বাবা-মা এবং বোন। বাবা শব্দর আলী, মা ফাতিমা বেগম। বোন লিলি। শব্দর আলী চশমার গ্লাস দিয়ে গ্রামের ক্ষেত দেখছেন। আর বার বার বলছেন,'এই তো আমার দেশ। এই তো আমার বাংলাদেশ।'

ফাতিমা ভীষণ বিরক্ত ভ্যানে চড়ে। উনার ইচ্ছে ছিল কোনো মন্ত্রীর মেয়েকে ঘরের বউ করে আনবেন। আর ছেলের নাকি মেয়ে পছন্দ হয়েছে গ্রামে। ছেলের জেদের কাছে হেরে আসতেই হলো।

লিখনের পরনে ছাইরঙা শার্ট। চোখে সানগ্লাস। উত্তেজনায় তার হাত পা কাঁপছে রীতিমতো। এমন একটা দিন নেই, যেদিন পদ্মজার কথা ভেবে শুরু হয়নি। এমন একটা রাত নেই, যে রাতে পদ্মজাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা হয়নি। মাঝের সময়ের ব্যবধানে পদ্মজাকে খুব বেশি ভালবেসে ফেলেছে সে। স্বপ্নে কোমরে আঁচল গুঁজে ঘরের কাজ করা পদ্মজাকে দেখতে পায়। কখনো বা অপরূপ সুন্দরী পদ্মজাকে ঘুমের ঘোরে ঠিক বিছানার পাশে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখতে পায়।

কল্পনার পদ্মজাকে নিয়ে সে সংসার পেতেছে। এবার হয়তো সত্যি হতে চলেছে। লিখন আনমনে হেসে উঠল। মনে পড়ে যায় পদ্মজাকে প্রথম দেখার কথা। সঙ্গে,সঙ্গে বুকের মধ্যে অদ্ভুত ঝড় শুরু হয়। কী মায়াবী, কি স্নিগ্ধ একটা মুখ। তার চেয়েও সুন্দর পদ্মজার ভয় পাওয়া। লজ্জায় পালানোর চেষ্টা। পর পুরুষের ভয়ে আতঙ্কে থাকা। লিখন

আওয়াজ করে হেসে উঠল। ফাতিমা,শব্দর অবাক হয়ে তাকালেন। লিলির এসবে খেয়াল নেই। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। লিখন মা-বাবাকে এভাবে থাকাতে দেখে,খুক খুক করে কাশল। এরপর বলল,'সুন্দর না গ্রামটা? বুঝছো আব্বু, এই গ্রামটাই এতো সুন্দর যে আবার আরেকটা সিনেমার জন্য আসতে হবে আগামী বছর।'

শব্দর আলী প্রবল আনন্দের সাথে বলেন,'সে ঠিক বলেছিস। মন জুড়িয়ে যাচ্ছে দেখে। চারিদিকে গাছপালা,নদী। রাস্তাঘাটও খুব সুন্দর। এখানে একটা বাড়ি বানালে কেমন হয়?'

লিখন গোপনে দীর্ঘশ্বাস লুকালো। তার বাবা যখন যেখানে যায় সেখানেই বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু বানানো আর হয় না।

ফাতিমা বিরক্ত গলায় বললেন,'তা আমরা উঠছি কার বাড়ি? তোর পছন্দ করা মেয়ের বাড়ি নাকি অন্য কোথাও?'

মায়ের চোখেমুখে বিরক্তি দেখে লিখনের হাসি পেল। বলল,'তোমাকে রাগলে এতো ভালো লাগে আম্মু।'

ফাতিমা আড়চোখে ছেলের দিকে তাকান। প্রশংসা শুনতে তিনি বেশ পছন্দ করেন। লিখনের মুখে প্রশংসা শুনে একটু নিভলেন।

'হয়েছে, আর কতক্ষণ? '

'পাঁচ মিনিট। অলন্দপুরের মাতব্বর বড় মনের মানুষ। আমাকে নিজের সন্তানের দৃষ্টিতে দেখেন। যতদিন ছিলাম প্রতিদিন খোঁজ নিয়েছেন। নিজের একজন লোককে আমার সহায়ক হিসেবেও দিয়েছিলেন! উনার বাড়িতেই উঠব।'

লিলি চোখমুখ বিকৃত করে বলল,'অন্যের বাড়িতে উঠব! উফ।'

'মারব ধরে। অন্যের বাড়ি তোর কাছে,আমার কাছে না। মজিদ চাচার বউ ফরিনা চাচি এতো ভাল রাঁধেন। আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন। উনার একটাই ছেলে। ঢাকায় পড়ছে,ব্যবসা সামলাচ্ছে। তার সাথে অবশ্য সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু ফরিনা চাচি সারাক্ষণ ছেলে,ছেলে করতেন। আমাকে পেয়ে ছেলের সব ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। তাই ওই বাড়ি আমার কাছে আপন না লাগুক,পরও লাগে না। আর বিশাল বাড়ি। উনারা বিব্রত হবেন না। তিন-চার দিনেরই তো ব্যাপার।'

লিখনের এতো বড় বক্তব্যের পাছে কেউ কিছু বলার মতো পেল না।

হাওলাদার বাড়ির সামনে এসে ভ্যান থামে। বাড়ির চারপাশ সাজানো দেখে লিখন বেশ অবাক হলো। লিলি চারপাশ দেখতে দেখতে বলল,'দাদাভাই, তুমি বিয়ে করতে এসেছো এই খবর উনারা পেয়েছেন বোধহয়। তাই এতো আয়োজন।'

লিখন লিলির মাথায় গাট্টা মেরে বলল,'বাড়িতে দুটো মেয়ে আছে। তাদের কারো বিয়ে হবে হয়তো। চল।'

ইটের বড় প্রাচীর চারদিকে। মাঝে বড় গেইট। প্রাচীরের উচ্চতা ১৫ ফুট। আর গেইটের উচ্চতা বারো ফুট। গেইটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন লোক। দুজনই লিখনকে চিনে। তাই লিখনকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিল। গেইট পার হলেই খোলা জায়গায়। প্রচুর গাছপালা। বেশি সুপারি গাছ এবং তালগাছ। সবকিছু সুন্দর! দুই মিনিট হাঁটার পর রঙ করা টিনের একটা বড় ঘর। তার সামনে সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'পাশে সিমেন্টের তৈরি বসার বেঞ্চি। এই ঘরটাকে গ্রামে আলগ ঘর বলা হয়,কেউ কেউ আলগা ঘর বলে থাকে। অতিথিরা এসে বিশ্রাম করে। রাত্রিযাপন করে।ভেতরে ইট সিমেন্টের তৈরি দু'তালা অন্দরমহল। আলগ ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন মজিদ মাতব্বর,ফরিনা, রিদওয়ান। লিখনকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে উনারা অবাক হোন। সেই সাথে খুশিও। শহরের চারজন মানুষ হেঁটে আসছে। সর্বাঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া। দেখতেও ভালো লাগে। লিখন বারান্দায় পা রাখতেই মজিদ মাতব্বর হেসে বলেন,'আজকের দিনটা সত্যি খুব সুন্দর।'

লিখন হাসল। ফরিনা এবং মজিদ মাতব্বরকে সালাম করে বলল,'এই হচ্ছেন আমার বাবা- মা আর বোন। আর আম্মু,আব্বু উনি হচ্ছেন মজিদ চাচা। আর ইনি ফরিনা চাচি। আর ওইযে বড় বড় গোঁফদাড়িওয়ালা উনি হচ্ছেন রিদওয়ান ভাইয়া। এই বাড়িরই আরেক ছেলে।'

মজিদ মাতব্বর একজনকে ডেকে বলেন,চেয়ার দিয়ে যেতে। আর অন্দরমহলে খবর পাঠাতে মেহমান এসেছে। তাৎক্ষণিক চেয়ার ও ঠান্ডা শরবত চলে আসে। পরিচিয় পর্ব শেষ হতেই লিখন প্রশ্ন করল,'বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান চলছে নাকি?'

'সে চলছে। আমার ছেলেটার বিয়ে। একমাত্র ছেলে।'

লিখন হাসে। চোখ পড়ে আলগ ঘরের ডান পাশে। কয়েকটা মেয়ে উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে। লিখন আনমনে হেসে উঠল। কোনো মেয়ে যখন তাকে দেখে খুব তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি হয়। নায়ক কী এমনি এমনি হওয়া। শব্দর আলী জিজ্ঞাসা করলেন,'তাই নাকি? তাহলে তো ঠিক সময়েই এসেছি। আমরাও একমাত্র ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়েই এই গ্রামে এসেছি।'

মজিদ মাতব্বর আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন,'মেয়ে কে? কার মেয়ে? আমাকে বলুন। এখুনি বিয়ে করতে চাইলে এখুনি হবে।'

শব্দর আলী লিখনকে প্রশ্ন করেন,'মেয়ের পরিচয় বল।'

লিখন কথা বলার পূর্বেই ফরিনা গেইটের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,'এই তো আমার ছেড়ায় আইয়া পড়ছে। আমির এইহানে আয়। দেইখা যা কারা আইছে।'

ফরিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই পিছনে তাকাল। আমির চুল ঠিক করতে করতে এগিয়ে আসছে। হাঁটার গতিতে বোঝা যাচ্ছে,বেশ চঞ্চল একটা ছেলে। আমির ঘেমে একাকার। কয়েক ফুটের দূরত্ব থাকা অবস্থায় লিখনকে দেখেই আমির চিনে ফেলল। মগার কাছে লিখনের বর্ণনা শুনেছে। এছাড়া লিখন একজন নামকরা অভিনেতা। তার

অভিনীত ছায়াছবি সে দেখেছে। আমির হাঁটার গতি কমিয়ে এগিয়ে এলো। লিখন উঠে দাঁড়াল। হেসে আমিরের সাথে করমর্দন করল। এরপর বলল,'আমি লিখন শাহ।'

আমির বলল,'আমির হাওলাদার। বসুন আপনি।'

লিখন নিজ স্থানে বসল। আমির একটু দূরত্ব রেখে দূরে বসল। মজিদ মাতব্বর আমিরকে লক্ষ্য করে বললেন,'কোথায় থাকিস সারাদিন। বলেছিলাম না,লিখন শাহ এসেছিল? এইযে ইনি।'

আমির শুষ্কমুখে বলল,'চিনি আমি। উনার অনেক কাজ(ছবি) আমার দেখা।'

শব্দর আলী,ফাতিমা,লিলি,লিখন সবাই হাসল। কেউ চিনে বললে আনন্দ হবারই কথা। রিদওয়ান আমিরকে বলল,' জানিস আমির,লিখন বিয়ে করতে গ্রামে আসছে।'

আমির কিছু বলল না। ফরিনা জানতে চান,'পাত্রী কে? কইলা না তো?'

লিখন বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে বলল,'পদ্মজা। মোড়ল বাড়ির বড় মেয়ে।'

লিখনের কথা শুনে মুহূর্তে হাওলাদার বাড়ির সব মানুষের মুখ কালো হয়ে গেল।আলগ ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলির কোলাহল থেমে গেল। চারিদিক স্তব্ধ, শান্ত। লিখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কী হলো সবার! লিখন মা-বাবার সাথে চাওয়াচাওয়ি করল। মজিদ মাতব্বর শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,'তার সাথে তোমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল?'

মজিদ মাতব্বরের কথা বলার ধরণ পাল্টে যাওয়াতে লিখন আহত হলো। বলল,'না। এখন প্রস্তাব দিতে চাই।'

'পদ্মজার সাথেই পরশু আমিরের বিয়ে।'

লিখন চকিতে চোখ তুলে তাকাল। বুক পোড়ার মতো অসহনীয় যন্ত্রনা কামড়ে ধরে সর্বাঙ্গে। হাড়ে হাড়ে বরফের ন্যায় ঠান্ডা কিছু ছুটতে থাকে। এখুনি যেন সব রগ ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট -২৩

ফাতিমা করুণ চোখে লিখনের দিকে তাকান। চোখে চোখ পড়তেই লিখন হাসার চেষ্টা করল। তার দৃষ্টি এলোমেলো।   কী বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'আব্বা আসছি' বলে জায়গা ত্যাগ করে। শব্দর আলী মজিদ মাতব্বরকে প্রশ্ন করলেন,'মজা করছেন?'

মজিদ মাতব্বর শব্দর আলীর চোখের দিকে সরাসরি চোখ রেখে জবাব দিলেন,'প্রথম পরিচয়ে মজা করার মতো মানুষ আমি নই ভাইসাহেব।'

লিলি এক হাত লিখনের পিঠের উপর রাখল।ডাকল,'ভাইয়া।'

লিখন লিলির হাতটা মুঠোয় নিয়ে ঢোক গিলল। বলল,'বিয়ে হবে না তো কী? বলেছি যখন দেখাবোই।'

'ভাইয়া তোর চোখে জল।'

লিখন দ্রুত হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। পরিবেশ থম মেরে গেছে। কেউ কিছু বলার মতো খুঁজে পাচ্ছে না। লিলি অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার ভাইয়ার দিকে। পদ্মজা নামের মেয়েটাকে নিয়ে কত গল্প শুনেছে সে। মেয়েটা তার বয়সী শুনে লিলি খুব হেসেছিল। তার ভাইয়া এতো ছোট মেয়ের প্রেমে পড়েছে! দিনগুলো কত যে সুন্দর ছিল! মেট্রিক পরীক্ষার সময় বার বার খোঁজ নিয়েছে কবে শেষ হবে পরীক্ষা। যেদিন শেষ হলো সেদিন

থেকেই শুটিং শুরু হলো। কথা ছিল এক সপ্তাহ পর থেকে শুরু হবে। কিছু জরুরি কারণে আগে শুরু হয়ে গেল। তাই আসতে কয়েকদিন দেরি হলো। মজিদ মাতব্বর স্তব্ধতা কাটিয়ে বললেন,'বিয়েটা একটা দূর্ঘটনার জন্য খুব দ্রুত ঠিক হয়েছে।'

লিখন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,'কী দূর্ঘটনা?'

ফরিনা সন্দিহান গলায় বললেন,'তার আগে তুমি কও তো, পদ্মজার লগে কী তোমার প্রেম-ট্রেম আছিল?'

লিখন ফরিনার প্রশ্নে বিব্রতবোধ করল। ধীরকণ্ঠে জবাব দিল,'না। শুধু আমার পক্ষ থেকেই।'

লিখনের উত্তরে ফরিনা সন্তুষ্ট হলেন। শব্দর আলী কী দূর্ঘটনা ঘটেছিল জানতে চাইলেন। মজিদ মাতব্বর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সব বলেন। সব শুনে লিখন আশার আলো দেখতে পায়। ভাবে, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে তাই অন্য কেউ পদ্মজাকে বিয়ে করবে না। এমনটা ভেবেই হয়তো পদ্মজার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সে যদি এখুনি বিয়ে করতে রাজি থাকে। তাকে ফিরিয়ে না দিতেও পারে। আর পদ্মজা কী বিন্দুমাত্র ভালোবাসে না তাকে? বাসে, নিশ্চয় বাসে। লিখন নিজেকে নিজে স্বান্তনা দেয়। শব্দর আলী আফসোস নিয়ে বললেন,'কী আর করার! পরিস্থিতি হাতের বাইরে।'

'আপনারা কিন্তু বিয়ে শেষ করে তবেই যাবেন।' বললেন মজিদ মাতব্বর।

ফাতিমা মতামত জানালেন দৃঢ়ভাবে,'না, না আজই চলে যাব। এই গ্রামে আর এক মুহূর্ত না।'

শব্দর আলী মৃদু করে ধমকে বললেন,'কী বলছো? কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা। এখন ট্রেন পাবে কোথায়? কাল ভোরে নাহয় চলে যাব।'

রিদওয়ান অনুরোধ করে বলল,'বিয়েটা শেষ হওয়া অবধি থেকে যান। দেখুন, মেহমান হয়ে এসেই অপ্রত্যাশিত খবর শুনলেন। এজন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু কিছু তো করার নেই। মেয়েটা জলে ভাসবে বিয়েটা না হলে।'

লিখন সঙ্গে,সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল,'পদ্মজাকে ফেলনা ভাবছেন কেন? কেউ অপবাদ দিলেই কী সে পঁচে যায়?'

রিদওয়ান কিছু বলতে গেলে মজিদ মাতব্বর কড়া চোখে তাকিয়ে থামতে বললেন। এরপর শিখাকে ডেকে বলেন,'উনাদের ঘরে নিয়ে যাও। আর আপনারা না করবেন না। আমি আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি। বিয়ে অবধি না থাকুন। রাতটা থেকে যান।'

বাধ্য হয়ে ফাতিমা থাকতে রাজি হলেন। তিনি রাগে ফোঁসফোঁস করছেন। সব রাগ পড়েছে হাওলাদার বাড়ির উপর। মনে মনে এই বাড়ির বিনাশ চাইছেন তিনি। মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। লিখন তার চোখের মণি। নয়তো কী গ্রামের মেয়ে নিতে আসতেন! আর সেই ছেলের মন এভাবে ভাঙল! ঘরে ঢুকেই চোখের চশমা ছুঁড়ে ফেলেন বিছানায়। কটমট করে শব্দর আলীকে বললেন,'তোমার না এক বন্ধু আছে মেজর। তাকে কল করে বলো মেয়েটাকে তুলে এনে লিখনের সাথে বিয়ে দিতে। আমার ছেলেকে হারতে দেখতে পারব না।'

'আহ! চুপ করো তো। সব জায়গায় ক্ষমতা চলে না। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করো।'

'কিসের পরিস্থিতি? তুমি জানো, তোমার ছেলের ব্যাক্তিগত ডায়রিতে আগে শুধু আমার নাম ছিল। সেখানে এখন বেশিরভাগ পদ্মজা নামটা লিখা। কতটা পাগল এই মেয়ের জন্য। এখন মেয়েটাকে ছেড়ে শহরে চলে গেলে,ছেলের দেবদাস রূপ দেখতে হবে। আর আমি তা পারব না।'

শব্দর আলী পায়ের মোজা খুলতে খুলতে বিরক্তি নিয়ে বললেন,'তোমার যা ইচ্ছে করো। আমি পারব না। ক্লান্ত আমি। শান্তি দাও।'

ফাতিমা কড়া কিছু কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। লিলি ঘরে ঢুকেছে। লিখন আসেনি। আমেনা লিলিকে বললেন,'লিখন কোথায়?'

'কী জানি! ভাইয়া ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

রোদের কঠিন রূপ শীতল হয়ে এসেছে। মৃদু বাতাস বইছে। তবুও লিখন ঘামছে। সে পদ্মজাদের বাড়ি যাচ্ছে। আতঙ্কে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। মাথায় শুধু কয়টা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে,'আমি কী পাগলামি করছি? এতো আয়োজন ভেঙ্গে কী আমার হাতে তুলে দিবেন পদ্মজাকে? পদ্মজা আমাকে দেখলে কী কাঁদবে? ভালোবাসেনি একটুও? মায়া নিশ্চয় জমেছে?' লিখন আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে,'আল্লাহ, সব যেন ভালো হয়।'

পূর্ণা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসে আছে। বাড়ির পিছনে গীত গাইছে অনেকে। সাথে তাল মিলিয়ে দুই বুড়ি নাচ করছে। পুরো বাড়ি সাজানো হচ্ছে রঙিন কাগজ দিয়ে। উঠানের এক কোণে লাল বড় গরু বাঁধা। বিয়ে উপলক্ষে জবাই করা হবে। চারিদিকের এতো আনন্দ পূর্ণার মন ছুঁতে পারছে না। প্রথমত, সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত! কিছুতেই স্থির হতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, পদ্মজার জন্য লিখন শাহ ছাড়া অন্য কাউকে তার পছন্দ হচ্ছে না। সব মিলিয়ে সে বিরক্ত। চোখ ছোট করে বাচ্চাদের খেলা দেখছে। হুট করে চোখে ভাসে লিখনকে। পূর্ণা দ্রুত চোখ কচলে আবার তাকাল। সত্যি তাই। খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে সে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় পদ্মজার ঘরে। পদ্মজার কানে কান গিয়ে বলে,'লিখন ভাই আসছে। তুমি কিন্তু পালিয়ে যাবে আপা। এই বিয়ে কিছুতেই করবে না।'

কথা শেষ করে খুশিতে আবার ছুটে যায় বারান্দায়। এমন দিনে লিখনের উপস্থিতি পদ্মজাকে অপ্রস্তুত করে তুলে। গলা শুকিয়ে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। লিখন বাড়িতে ঢুকে অবাক হয়ে সব দেখে। কত আয়োজন! কত মানুষ! তার স্বপ্নের রানি পদ্মজার বিয়ে। কিন্তু তার সাথে না। ভাবতেই, লিখনের বুক ছ্যাঁত করে উঠল। মেয়েরা খুব আগ্রহ নিয়ে সুদর্শন লিখনকে দেখছে। লিখন পূর্ণাকে বারান্দায় দেখে এগিয়ে আসল। প্রশ্ন করল,'কেমন আছো পূর্ণা?'

পূর্ণা খুশিতে উচ্চকণ্ঠে জবাব দেয়,'ভালো,খুব ভালো। ভাইয়া আপনি...'

পূর্ণা থেমে গেল। অনেকে তার উচ্চ গলার স্বর শুনে তাকিয়ে আছে। তাই পূর্ণা চুপসে গেল। আস্তে আস্তে বলল,'এতো দেরিতে আসলেন কেন? আপার তো বিয়ে। আপনি আপাকে নিয়ে পালিয়ে যান।'

পূর্ণার এহেন কথায় লিখন হাসে। আদুরে কণ্ঠে জানতে চাইল,'আন্টি কোথায়?'

পূর্ণা ঝটপট করে বলল,'আপনি আসুন ঘরে। আমি আম্মাকে নিয়ে আসছি।'

লিখনকে সদর ঘরে বসিয়ে পূর্ণা ছুটে গেল রান্নাঘরে। হেমলতা রান্না করছিলেন। পাশে অনেকে আছে। পূর্ণা ইশারায় বাইরে আসতে বলে। হেমলতা হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসেন। পূর্ণা ফিসফিসিয়ে বলে,'লিখন ভাই আসছে।'

'কোথায়? বসতে দিয়েছিস?'

'হ্যাঁ, দিছি। তুমি আসো।'

হেমলতা ব্যস্ত পায়ে হেঁটে সদর ঘরে আসেন। এসে দেখেন দুজন বয়স্ক মহিলা অনবরত লিখনকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। সে কই থেকে এসেছে? এই বাড়ির কী হয়? পদ্মজার মতো চোখ কেন? পদ্মজার আসল বাপের ছেলে নাকি। এমন আরো যুক্তিহীন কথাবার্তা। হেমলতা সবাইকে উপেক্ষা করে লিখনকে বললেন,'লিখন তুমি আমার সাথে আমার ঘরে আসো।'

লিখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। হেমলতার পিছু পিছু চলে যায়। অনেকের নজরে তা আসে। একজন আরেকজনকের সাথে আলোচনা করতে থাকে লিখন শাহকে নিয়ে। সবাই ভেবে নিয়েছে পদ্মজা যার সন্তান এই ছেলেও তার সন্তান। এজন্যই সবার মাঝ থেকে তুলে নিয়েছে। নয়তো তো কথায় কথায় ধরা পড়ে যাবে। লিখনকে মোড়ায় বসতে দিলেন হেমলতা। লিখন কীভাবে কী শুরু করবে বুঝে উঠতে পারছে না। হেমলতা শুরু করলেন,'আমি জানি তুমি কী বলবে। তোমার দুইটা চিঠি আমি পড়েছি।'

লিখন চমকে তাকাল। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। হেমলতা বলেন,'দেখো লিখন,পরিস্থিতি আর হাতে নেই। অন্য সময় হলে আমি পদ্মজাকে তোমার হাতে তুলে দিতাম। তুমি নম্র-ভদ্র বুদ্ধিমান ছেলে। কমতি নেই কিছুতেই। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। তবুও পদ্মজা তোমাকে নিজের মুখে যদি চায় আমি তাৎক্ষণিক তাকে তোমার হাতে তুলে

দেব। কিন্তু সে চাইবে না। কারণ,সে তোমাকে ভালোবাসে না। আমার কথাগুলো শুনে কষ্ট পেয়ো না। আমি সরাসরি কথা বলি। পদ্মজার দৃষ্টি,অনুভূতি আমার চেনা। সে তোমাকে ভালোবাসেনি কখনো। তোমার মন ভাঙবে ভেবে মায়া হচ্ছে। কষ্ট পাচ্ছে। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কষ্ট হবে ভেবেই বলছি ফিরে যাও।'

লিখন কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকে। চোখের দৃষ্টি রাখা মাটিতে। বলল,'আন্টি মেয়ের ভালোবাসা দেখছেন, অন্যের সন্তানেরটা দেখবেন না?'

'অন্যের অনেক সন্তানই আমার মেয়েকে ভালবাসে। সবার কথা ভাবা কী সম্ভব?'

হেমলতার কথায় ভীষণ আহত হয় লিখন। তার মনে হচ্ছে সে কঠিন পাথরের সাথে কথা বলছে। দুই চোখ জ্বলছে ভীষণ। এখুনি কান্নারা ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসবে। ছেলে হয়ে কাঁদা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। লিখন নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। হেমলতা কঠিন স্বরে বললেন,'তুমি পদ্মজার রূপের প্রেমে পড়েছো লিখন।'

লিখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকায়। বলে,'আন্টি ক্ষমা করবেন কিছু কথা বলি। পৃথিবীতে যে কয়টা সফল প্রেমের গল্প আছে তার মধ্যে ৯৯ ভাগ সৌন্দর্যের টান দিয়ে শুরু হয়। এরপর আস্তে আস্তে ভালোবাসা গভীর হয়। মানুষটাকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে,মানুষটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে গিয়ে ভালোবাসাটা আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। সময়ের ব্যবধানে সে মানুষটা শিরা উপশিরায় বিরাজ শুরু করে। তখন তার অন্যান্য গুণ চোখে ভাসে। ভালবাসা আরো বাড়ে। কারো কারো তো দোষও ভালো লেগে যায়। তখন অবস্থা এরকম হয় যে, রূপ নষ্ট হয়ে গেলেও মানুষটাকে আমার চাই। এজন্যই বুড়ো বয়সেও কুঁচকে যাওয়া মানুষটাকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। অথচ শুরুটা হয় সৌন্দর্য দিয়ে। আন্টি,আমি পদ্মজার রূপে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম এটা সত্যি। কিন্তু গত কয়েক মাসে সারাক্ষণ পদ্মজাকে ভাবতে গিয়ে আমি সত্যি সত্যি পদ্মজাকে ভালোবেসে ফেলেছি। পদ্মজার রূপ আগুনে ঝলসে গেলেও এমন করেই বাসবো। প্লীজ আন্টি কথাগুলো শুটিংয়ের ডায়লগ ভেবে উড়িয়ে দিবেন না। বাস্তব জীবনে মুখস্থ ডায়লগ আমি আওড়াই না।'

লিখনের কণ্ঠ গম্ভীর কিন্তু চোখে জল ছলছল করছে। হেমলতা স্তব্ধ হয়ে যান। কী জবাব দিবেন? ভালোবাসার বিরুদ্ধে কোন শক্তি কাজে লাগে? আদৌ কী ভালবাসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়? তিনি সময় নেন। এরপর

বলেন,'আমার পদ্মজা তোমার কাছে খুব ভাল থাকতো লিখন। কিন্তু কিছু সমস্যা সমাজে আছে। যার মুখোমুখি আমি হয়েছি। জেনেশুনে আমার মেয়েকে সেসবের মুখোমুখি কি করে হতে দেই?'

লিখন হাতজোড় করে বলল,'প্লীজ আন্টি!'

হেমলতা একদৃষ্টে লিখনের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। এমন তো কখনো হয় না। পদ্মজার জন্মের পর সিদ্ধান্তহীনতায় তিনি কখনো ভুগেননি। যেকোনো একটাই বেছে নিয়েছেন। আর তাতেই মঙ্গল হয়েছে। এবার কেন এমন হচ্ছে? কেন তিনি নিজের অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছেন। পদ্মজার জীবন নিয়ে তিনি যেন মাঝ নদীতে ভেসে আছেন। চারদিকে স্রোত। মাঝি নেই,বৈঠা নেই। আমির না লিখন? কার কাছে ভাল থাকবে পদ্মজা? হেমলতার শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। তিনি দূর্বল কণ্ঠে বলেন,'এতো বুঝো যখন নিজেকেও সামলাতে পারবে। বাড়ি ফিরে যাও।'

'আন্টি,আমার বেঁচে থাকতে কষ্ট হবে।'

'পদ্মজার সাথে যা হয়েছে তবুও সে বেঁচে আছে। আর তুমি এইটুকু মানিয়ে নিতে পারবে না?'

লিখন আর কথা খুঁজে পেল না। আহত মন নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেমলতা দাঁড়াতে বললেন। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, তবুও হেঁটে এগিয়ে আসেন। লিখনের সামনে এসে দাঁড়ান। বললেন,'নিজেকে শক্ত রেখো। অনেক দূর চলা বাকি। কারো জন্য কারো জীবন থেমে থাকে না। ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়। সব যেহেতু আয়োজন হয়ে গেছে আর ভেবে লাভ নেই। তবে, কবুল বলার আগেও যদি পদ্মজা বলে, তার তোমাকেই চাই। আমি সব ভেঙেচুরে পদ্মজাকে নিয়ে ছুটে যাব তোমার বাড়ি। আমি আমার মেয়েটাকে ভীষণ ভালোবাসি বাবা। এই মেয়েটার সুখের জন্য আমি স্বার্থপর হয়েছি। অন্যের সন্তানের কষ্ট চোখে ভেসেও, ভাসছে না। আমাকে ক্ষমা করে দিও।'

হেমলতার চোখে জলের ভীর। লিখন ভীষণ অবাক হয়ে দেখে এই কঠিন মানুষটাকে। হেমলতা নিজের দূর্বলতা, নিজের কান্না কেন দেখাল লিখনকে? লিখন জবাব খুঁজে পেল না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারল হেমলতার কাছে জীবন মানে পদ্মজা। লিখন ভাঙা গলায় 'আসি' বলে চলে গেল। হেমলতা সব কাজ ভুলে গুটিসুটি মেরে বিছানায়

শুয়ে পড়েন। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল বেরিয়ে আসে। মনের শক্তি কমে গেছে। দূর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। নিজের উপর বিশ্বাস, আস্থা পাচ্ছেন না। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা খুঁজে পাচ্ছেন না।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট- ২৪

বারান্দার গ্রিলে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে পদ্মজা।

তার পরনে শাড়ি রয়ে গেছে। আকাশের বুকে থালার মতো একখান চাঁদ। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝিকমিক করছে। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। খুব সুন্দর দৃশ্য।

'পদ্ম...'

পদ্মজা কেঁপে উঠে,পিছনে ফিরে তাকাল। মোর্শেদকে দেখতে পেয়ে গোপনে হাঁফ ছাড়ল । মোর্শেদ বললেন,'তোর মায়ে কী আর উঠে নাই?'

'না,আব্বা।'

মোর্শেদ চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছু ভাবলেন। তারপর বলেন,'তুই হজাগ ক্যান? যা ঘরে গিয়া ঘুমা। আমি ঘাটে যাইতাছি।'

'আচ্ছা,আব্বা।'

মোর্শেদের যাওয়ার পানে পদ্মজা তাকিয়ে রইল। সে কী যেন ভাবছে কিন্তু কী ভাবছে ধরতে পারছে না। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে উদাসীনতা কেটে গেল। শাড়ির আঁচল টেনে সাবধানে হেঁটে সদর ঘরে ঢুকল। সদর ঘরে পাটি বিছিয়ে দূর দূরান্ত থেকে আসা আত্মীয়রা ঘুমাচ্ছে। তাদের ডিঙিয়ে পদ্মজা হেমলতার ঘরে আসে। হেমলতা ঘুমাচ্ছেন বেঘোরে। শুনেছিল,লিখন শাহ কে নিয়ে তার মা নিজ ঘরে এসেছিলেন। এরপর কী হলো কে জানে! সন্ধ্যার পর পূর্ণা গিয়ে জানাল,আম্মা ঘুমাচ্ছে। হেমলতা কখনো সন্ধ্যা সময় ঘুমান না। তাই পদ্মজা ঘোমটা টেনে

হেমলতার ঘরে ছুটে আসে। হেমলতাকে এত শান্তিতে ঘুমাতে কখনো দেখেনি পদ্মজা। তাই আর ডাকেনি। কেউ ডাকতে আসলে, তাড়িয়ে দিয়েছে। ঘুমাচ্ছে যখন ঘুমাক না। এখন মধ্য রাত। পদ্মজা হেমলতার মুখের সামনে মাটিতে বসে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। গলা কাঁপছে তার। শ্বশুর বাড়ি কীভাবে থাকবে সে! মাকে ছাড়া দুইদিন থাকতে গিয়ে এতো বড় ঝড় বয়ে গেল। আর এখন সারাজীবনের জন্য মায়ের ছায়া ছেড়ে দিতে হবে। এই মুখটা না দেখলে তার দিন কাটে না। এই মানুষটার আদুরে,শাসন ছাড়া দিন সম্পূর্ণ হয় না। পদ্মজা বিছানায় মাথা ঠুকে ফুঁপিয়ে উঠল। অস্ফুট করে ডাকল,'আম্মা।'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা চোখ খুলেন। পদ্মজা খেয়াল করল না। সে কাঁদতে কাঁদতে চাপা স্বরে বলছে,'তোমাকে ছাড়া কেমনে থাকব আম্মা! বিয়ে করাটা কী খুব দরকার ছিল।'

'ছিল।'

পদ্মজা চমকে উঠে মাথা তুলল। গলার স্বর আগের অবস্থানে রেখে বলল,'কেন আম্মা?'

'সব জানতে নেই মা।'

পদ্মজা মাথা নত করে নাক টানে। হেমলতা বললেন,'বিয়ে হতেই হবে। বর বদল হলে সমস্যা নেই। তোর কী আর কাউকে পছন্দ?'

হেমলতার প্রশ্নে পদ্মজা বিব্রত হয়ে উঠল। হেমলতাও প্রশ্নটা করতে গিয়ে অস্বস্থি বোধ করেন। পদ্মজা মাথা দুই পাশে নাড়িয়ে জানাল, তার আলাদা করে কাউকে পছন্দ নেই। হেমলতা উঠে বসেন। চুল খোঁপা করতে করতে প্রশ্ন করেন,'রাত কী খুব হয়েছে? মানুষের সাড়া নেই।'

'মাঝ রাত।'

'আর তুই জেগে থেকে কাঁদছিস?' হেমলতা বললেন। মৃদু ধমকের স্বরে।

পদ্মজা নিরুত্তর। হেমলতা জানালার বাইরে চেয়ে দেখলেন,চাঁদের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল। চাঁদের আলো গলে ঘরের মেঝেতে পড়ছে। জ্যোৎস্না রাত। তিনি বিছানা থেকে নামতে নামতে পদ্মজাকে তাড়া দেন,'শাড়ি পাল্টে সালোয়ার-কামিজ পরে নে।'

'কেন আম্মা?'

'যা বলছি কর।'

পদ্মজা ঘরে গিয়ে শাড়ি পাল্টে নিল। উঠানে এসে দেখে,হেমলতার হাতে বৈঠা। পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,'আম্মা,তুমি নৌকা চালাবা?'

'পূর্ণারে নেব? নেওয়া উচিত। যা ওকে ডেকে নিয়ে আয়। প্রান্ত,প্রেমা যেন টের না পায়।'

পদ্মজা অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। হেমলতা তাড়া দেন,'যাবি তো।'

পদ্মজা হন্তদন্ত হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে পূর্ণাকে নিয়ে ফিরল। পূর্ণা ঘুমে ঢুলছে। হেমলতা ঘাটে এসে দেখেন মোর্শেদ নৌকায় বসে বিড়ি ফুঁকছেন।

'নৌকা ছাড়ো।'

মোর্শেদ দুই মেয়ে আর বউকে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে হেমলতা যেভাবে বললেন,নৌকা ছাড়ো, আরো ভড়কে গেলেন। চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন,'ক্যান? কিতা অইছে?'

মোর্শেদের জবাব না দিয়ে পদ্মজা,পূর্ণাকে নিয়ে হেমলতা নৌকায় উঠে পড়েন। স্থির হয়ে বসেন। বৈঠা মোর্শেদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলেন,'জ্যোৎস্না রাতের নৌকা ভ্রমণে বের হয়েছি আমরা। তুমি এখন আমাদের মাঝি।'

হেমলতা থামেন। এরপর আঞ্চলিক ভাষায় বললেন,'লও মাঝি বৈঠা লও। ছাড়ো তোমার নৌকা। যত সিকি চাইবা তুমি ততই পাইবা।'

একসাথে চারটা দুঃখী মানুষ হেসে উঠে। মোর্শেদ বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকা ছাড়েন। হুট করেই যেন অনুভব করছেন, যুবক কালের রক্ত শরীরে টগবগ করছে। এইতো তার সংসার, এইতো তার আনন্দ।

রাতের নির্মল বাতাস। মাদিনী নদীর স্বচ্ছ জলে চাঁদের প্রতিচ্ছবি। কচুরিপানারা ভেসে যাচ্ছে। সবকিছু সুন্দর মুগ্ধকর। পূর্ণার বুকের ভারটা খুব হালকা লাগছে। পদ্মজা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। রগে রগে শান্তি ঢুকে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যে যেকোনো দুঃখী মানুষকে সুখী অনুভব করানোর মন্ত্র ঢেলে দিয়েছেন।

'মোর্শেদ নাকি গো?'

হিন্দুপাড়া থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে ডাকল। মোর্শেদ এক হাত তুলে জবাব দিলেন,'হ দাদা আমি।'

'রাইতের বেলা যাইতাছ কই?'

'মেয়ে-বউ লইয়া জ্যোৎস্না পোহাইতে বাইর হইছি দাদা।'

'তোমাদেরই দিন মিয়া।'

মোর্শেদ আর কিছু বললেন না। হাসলেন। ওপাশ থেকেও আর কারো কথা শোনা গেল না। নৌকা আটপাড়া ছেড়ে হাওড়ে ঢুকে পড়েছে। সাঁ,সাঁ করে বাতাস বইছে। গায়ের কাপড় উড়ছে। হেমলতা দুই মেয়ের মাঝে এসে বসেন। তিনি চাদর নিয়ে এসেছেন। দুই মেয়েকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে চাদরে ঢেকে দেন। বাতাসে চাদর উড়ে আরো আওয়াজ তুলছে। চাঁদটা একদম মাথার উপর। তাদের সাথে সাথে ঘুরছে! মোর্শেদ মনের সুখে গান ধরেন-

লোকে বলে বলেরে

ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার

কি ঘর বানাইমু আমি শূণ্যেরও মাঝার।।

ভালা কইরা ঘর বানাইয়া

কয়দিন থাকমু আর

আমি কয়দিন থাকমু আর

আয়না দিয়া চাইয়া দেখি

আয়না দিয়া চাইয়া দেখি

পাকনা চুল আমার।

লোকে বলে ও বলেরে

ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।।

পাকনা চুল আমার বলতেই পূর্ণা ফিক করে হেসে ফেলল। পদ্মজাকে ফিসফিসিয়ে বলল,'আব্বা বোধহয় এখনো জোয়ান থাকতে চায়।'

পদ্মজা হেসে চাপা স্বরে বলে,'চুপ থাক। আব্বা কী সুন্দর গায়।'

মোর্শেদ গেয়ে যাচ্ছেন-

এ ভাবিয়া হাসন রাজা

হায়রে,ঘর-দুয়ার না বান্ধে

কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়

কোথায় নিয়া রাখব আল্লায়

তাই ভাবিয়া কান্দে।।

লোকে বলে ও বলেরে

ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।।

জানত যদি হাসন রাজা

হায়রে,বাঁচব কতদিন

বানাইত দালান-কোঠা

করিয়া রঙিন।।

লোকে বলে ও বলেরে

ঘর-বাড়ি ভালা নাই আমার।।

মোর্শেদ থামেন। তিন মা-মেয়ে একসাথে হাতের তালি দিল। হাতের তালিতে চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠল। এতো সুন্দর সময়! এতো সুন্দর রাত বার বার ফিরে আসুক। মোর্শেদ হা করে তাকিয়ে থাকেন সামনে থাকা তিনটা মানুষের দিকে। তাদের চোখেমুখে খুশি ঝিলিক মারছে। অথচ,তিনি জানেন একেকজন কতোটা দুঃখী। মোর্শেদ ঢোক গিলে লুকায়িত এক সত্যের কষ্ট লুকিয়ে যান। হেমলতা আর তিনি ছাড়া এই কলিজা ছেঁড়া কষ্ট কেউ জানে না। মোর্শেদ হেসে বললেন,

'এই অভাগা মাঝিরে কী আপনারা আপনাদের মাঝে জায়গা দিবেন?'

মোর্শেদের কণ্ঠে শুদ্ধ ভাষায় মিষ্টি আবদার শুনে পদ্মজা পুলকিত হয়ে উঠল। ইশ! আজ সব কিছু কত সুন্দর! পূর্ণা বলে,'দেব। এক শর্তে, নৌকা চালানোর বিনিময়ে সিকি যদি না নেন।'

মোর্শেদ মেয়ের রসিকতা দেখে হা হা করে হাসেন। সেই হাসি বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে কানে। তিনি বৈঠা রেখে এগিয়ে আসেন। হেমলতার সামনে বসেন। নৌকা নিজের মতো যেদিকে ইচ্ছে ছুটে চলছে। মোর্শেদ হেমলতাকে বলেন,'দুইডা ছেড়িরে খালি তুমি ধইরা রাখবা? ছাড়তো এইবার। আয়রে তোরা আমারে ধারে আইয়া ব।'

পদ্মজা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকায়। হেমলতা যেতে বলেন। পদ্মজা মোর্শেদের ডান পাশে বসে,আর পূর্ণা বাম পাশে। মোর্শেদ পূর্ণাকে এক হাতে, পদ্মজাকে আরেক হাতে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে উঠেন। অপরাধী স্বরে বলেন,'আমি বাপ হইয়া পারি নাই আমার ছেড়িদের বেইজ্জতির হাত থাইকা রক্ষা করতে। আমারে মাফ কইরা দিস তোরা।'

মোর্শেদ কখনো এতো আদর করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরেননি। এই প্রথম ধরেছেন। আবার কাঁদছেন। পদ্মজার কোমল,নরম মন ব্যথিত হয়ে চোখ বেয়ে জল রূপে বেরিয়ে আসে। হেমলতা মোর্শেদের পায়ের কাছে বসেন। মোর্শেদের হাঁটুতে মাথা রেখে, দুই মেয়ের হাত চেপে ধরে রাখেন। কেটে যায় অনেক মুহূর্ত। নৌকা হাওড়ের পানির স্রোতে একবার এদিক তো আরেকবার ওদিক যাচ্ছে। বাতাসে চার জনের চোখের জল শুকিয়ে ত্বকের সাথে মিশে গেছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে পদ্মজা বলল,'জানো আম্মা, আজ আমি বুঝলাম, জীবনে সুখ বা দুঃখ কোনোটাই চিরস্থায়ী নয়। দুঃখে মর্মাহত না হয়ে সুখের সময়টা তৈরি করে নিতে হয়। তাহলেই জীবনে সুখকর মুহূর্ত আসে। আবার সুখ সর্বক্ষণ সাথে থাকে না। দুনিয়ার লীলাখেলার শর্তে দুঃখ বার বার ফিরে আসে।'

হেমলতা পদ্মজার দিকে না তাকিয়ে,পদ্মজার ডান হাতে চুমু দেন। চাঁদটা অর্ধেক হয়ে এসেছে। খুব তাড়াতাড়ি আকাশে মিলিয়ে যাবে।

#পদ্মজা

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট- ২৫

হাওরে বিশাল জলরাশি। কখনো ঢেউয়ে উথাল-পাতাল, আবার কখনো মৃদু বাতাসে জলের ওপর চাঁদের প্রতিচ্ছবির খেলা। নৌকা বাজারের দিকে যাওয়ার পথ ধরেছে। তাই মোর্শেদ নিস্তব্ধ বৈঠক ভেঙে বৈঠা নিয়ে বসেন। নৌকা নিয়ন্ত্রণে এনে রাধাপুর হাওড়ের দিকে যেতে থাকেন। ওড়নার ঘোমটার আড়ালে কখন খোঁপা খুলে গেছে পদ্মজা খেয়াল করেনি। হেমলতা খেয়াল করেন পদ্মজার চুল হাওড়ের জলে ডুবে আছে। তিনি মৃদু স্বরে পদ্মজাকে বললেন,'চুল ভিজে যাচ্ছে পদ্ম।'

পদ্মজা দ্রুত সামলে নিল। খোঁপা করে ঘোমটা টেনে নিয়ে বলল,'কখন খুলে গেছে খেয়াল করিনি।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। হেমলতা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন এক মনে। পদ্মজা ডাকল,'আম্মা?'

হেমলতা অশ্রুভরা চোখে তাকালেন। পদ্মজা কিছু বলার আগে তিনি বললেন,'পূর্ণা গল্প শুনবি?'

পূর্ণা গল্প বলতে পাগল। সে গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। খুশিতে বাকবাকুম হয়ে বলল,'শুনব।'

'কষ্টের গল্প কিন্তু।'

'গল্প হলেই হলো।'

হেমলতা হাসেন। পদ্মজা নড়েচড়ে বসে। সে আন্দাজ করতে পারছে তার মা কোন গল্প বলবে। হেমলতা দু'হাতে জল নিয়ে মুখ ধুয়ে নেন। এরপর একবার মোর্শেদের দিকে তাকিয়ে হাসেন। পিছন ঘুরে বসে প্রশ্ন করেন,'মুখ না দেখে গল্প শুনতে ভাল লাগবে?'

পূর্ণা মুখ গোমড়া করে না বলতে যাচ্ছিল। পদ্মজা এক হাতে খপ করে ধরে আটকে দিল। মাকে বলল,'সমস্যা নেই আম্মা। যেভাবে ইচ্ছে বলো।'

হেমলতা বড় করে দম নিয়ে বলা শুরু করলেন,'আব্বার প্রথম স্ত্রী মারা যায় অল্প বয়সে। আব্বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। একজন বুদ্ধিমান, উদার মনের মানুষ ছিলেন। আম্মাকে যৌতুকের জন্য ধাক্কা মেরে বের করে দিল তার প্রথম স্বামী। মুখে তালাক দিল। বাপের সংসারে এসে সমাজের তোপে পড়তে হয় আম্মাকে। আব্বার উদার মন অবলা,অসহায় আম্মাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।তিনি আমার নানার কাছে প্রস্তাব রাখেন। নানা সানন্দে রাজি হয়ে যান। রাজি হবেনই না কেন? স্বামীর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া বিবাহিত নারীকে কে ই বা বিয়ে করতে চায়? আম্মা,আব্বার বিয়ের বছর দেড়েক হতেই হানি আপার আগমন। তার দুই বছরের মাথায় আমার আগমন ঘটে।'

'সেদিন নিশ্চয় গাছে গাছে ফুল ফুটেছে।' পদ্মজা বলল,পুলকিত হয়ে।

হেমলতা ম্লান হাসেন। বলেন,'শুনেছি আমার গায়ের রং দেখে আম্মা নাক কুঁচকেছিলেন। আমার বয়স যখন তিন মাস আম্মার আগের স্বামী আম্মাকে ফিরিয়ে নিতে আসে। আব্বার তখন আর্থিক সমস্যা বেশি ছিল। দিনে দুই বেলা খাওয়া সম্ভব ছিল না। বিপদে পাশে থাকা আমার আব্বাকে ছেড়ে,দুই বছরের এক মেয়ে আর তিন মাসের এক মেয়েকে ছেড়ে স্বার্থপর মা পালিয়ে গেল প্রথম স্বামীর কাছে। আব্বা ছোট ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে মাঝ নদীতে পড়েন। কিন্তু আল্লাহ সহায় ছিলেন। আব্বার ফুফু চলে আসেন আমাদের কাছে। আপা আর আমার দায়িত্ব নেন। হুট করেই আব্বার আর্থিক অবস্থা উন্নত হতে থাকে। গৃহস্থিতে রহমত ঝরে পড়ে। পাঁচ বছর পর আম্মা ফিরে আসেন। বিধ্বস্ত অবস্থা। ফর্সা মুখ মারের চোটে দাগে দাগে বিশ্রি হয়ে গেছে। শুধু একা আসেনি। দুই বছরের এক ছেলে নিয়ে ফিরেন। তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরের বদলে বিশাল বাড়ি হয়েছে। আব্বা প্রথম মানেননি। আম্মা আব্বার পায়ে পড়ে কাঁদেন। ক্ষমা চান। আব্বা আবার আগের ভুল করেন। মেনে নেন আম্মাকে। আম্মার ছেলের নাম বিনোধ ছিল, আব্বা নতুন নাম দেন হানিফ। আম্মা আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। আব্বার চোখের মণি ছিলাম। আব্বার আড়ালে আম্মার দ্বারা নির্যাতিত হতে থাকি। ছয় বছর হতেই স্কুলে ভর্তি করে দেন আব্বা। হানি আপা তখন স্কুলে পড়ে। আমি..."

'থামলে কেন আম্মা?' বলল পদ্মজা,অধৈর্য্য হয়ে।

হেমলতা ভ্রুকুটি করে বলেন,'আর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আম্মার ব্যাপারে। আম্মা অনুতপ্ত এখন। আফসোস করেন। কাঁদেন। বলতে ভাল লাগছে না।'

শীতল বাতাসে সবার শরীর কাঁটা দিচ্ছে। চাঁদটা ছোট হয়ে গেছে অনেক। মোর্শেদ এক ধ্যানে বৈঠা দিয়ে জল ঠেলে দিচ্ছেন দূরে নৌকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে। হেমলতা আবার বলতে শুরু করেন,'মেট্রিক দেয়ার পর আম্মা পড়াতে চাইছিল না। আব্বার জন্য ঢাকার কলেজে পড়ার সুযোগ পাই। হোটেলে উঠি। আব্বা নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। জানিস পদ্ম, কলেজে আমি সবার ছোট ছিলাম। সবাই হা করে তাকিয়ে থাকতো। শাড়ি পরতাম বলে

একটু বড় লাগতো অবশ্য। সবসময় সুতি শাড়ি পরে বেণী বেঁধে রাখতাম। কারো সাথে মিশতাম না। ভয় পেতাম খুব। ভীষণ ভীতু ছিলাম। রিমঝিম নামে খ্রিষ্টান এক মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়। মেয়েটা এতো সুন্দর ছিল দেখতে। ঠিক পদ্মজার মতো সুন্দর। চোখের মণি ছিল ঘোলা। তার নাকি শ্যামলা মানুষ ভাল লাগে তাই নিজে যেচে আমার সাথে বন্ধুত্ব করে। কয়েকদিনের ব্যবধানে আমরা খুব ঘণিষ্ঠ হয়ে পড়ি। ইংলিশে যাকে বলে,বেস্ট ফ্রেন্ড। রিমঝিমের সাথে মাঝে মাঝে ওর বড় ভাই আসতো। নাম ছিল যিশু। যিশু একদম রিমঝিমের আরেক রূপ।চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ছিল দুই ভাই-বোনের। যিশু ভাইয়া বলে ডাকতাম তাকে। যিশু ভাইয়া মজা করে বলতেন,'ধর্ম এক হলে হেমলতাকেই বিয়ে করতাম।' পূর্ণা,পদ্মজা খারাপ লাগছে শুনতে?'

'না আম্মা।' এক স্বরে বলল দুজন। পদ্মজা বলল,'পরে কী হয়েছে আম্মা?'

'তখন অলন্দপুর থেকে দুই সপ্তাহ লাগতো রাজধানীতে চিঠি পৌঁছাতে। কলেজ ছুটির পথে হানি আপার চিঠি পাই। পাশে রিমঝিম ছিল। যিশু ভাইয়া সবেমাত্র এসেছেন রিমঝিমকে নিয়ে যেতে। চিঠি পড়ে জানতে পারি,আব্বা হাওড়ে গিয়েছিলেন মাছ ধরতে। আব্বার পাশের নৌকায় সুজন নামে এক ছেলে ছিল। আব্বার নৌকায় চেয়ে কয়েক হাত দূরে। তখন ভারী বর্ষণ হচ্ছিল। বজ্রপাত হচ্ছিল একটার পর একটা। একটা বজ্রপাত সুজনের উপর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সুজন ঝলসে যায়। আব্বা ছিটকে পড়েন জলে। দূর থেকে এক দল জেলে ঘটনাটি দেখতে পায়। তারা আব্বাকে তুলে নিয়ে যায় বাড়িতে। এরপর থেকেই আব্বা কানে শুনতে পায় না। ঠিক করে হাঁটতে পারে না। মস্তিষ্ক অচল হয়ে পড়ে। এই খবর শোনার পর হাউমাউ করে কান্না শুরু করি। যিশু ভাই সব শুনে,আমার কান্না দেখে বলেন,বিকেলের ট্রেনে অলন্দপুর নিয়ে যাবেন। আমি তখনও কাঁদছিলাম। একবার শুধু অলন্দপুর যেতে চাই। আব্বাকে দেখতে চাই। যদিও জানতাম,অনেকদিন হয়ে গেছে এই দূর্ঘটনার।

আটপাড়া পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যায়। বাড়ি এসে দেখি সদর ঘরের দরজায় তালা মারা। কেউ নেই বাড়িতে। মুরগি আর গরু-ছাগল ছাড়া। বারান্দার ঘরে দরজা ছিল না। ঘরও বলা যায় না। শুধু একটা চৌকি ছিল। বড্ড ক্লান্ত ছিলাম। চৌকিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে আম্মার চেঁচামেচিতে। যিশু ভাই নিজের অজান্তে আমার পাশে কখন ঘুমিয়ে পড়েন বুঝেননি। তিনি আমার মতোই ক্লান্ত ছিলেন। আমার জন্মদাত্রী মা গ্রামবাসী ডেকে চেঁচাতে থাকেন। হাতেনাতে ধরার মতো অবস্থা ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে ভড়কে যাই। কিছু বলতে পারিনি। যিশু ভাই সবাইকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করে, কেউ বুঝেনি। তখন নিয়ম খুব কঠিন ছিল। যিশু ভাই খ্রিষ্টান শুনে সবাই আরো ক্ষেপে যায়। আব্বার সামনে আমাদের দুজনের মাথা ন্যাড়া করে দিল গ্রামবাসী। কোমর সমান চুল ছিল আমার। মাথা ন্যাড়া করতে গিয়ে মাথার চামড়া ছিঁড়ে ফেলে। রক্ত আসে গলগল করে। আম্মার তখন হুঁশ

আসে। আমাকে বাঁচাতে আসে,পারেনি। গায়ের রং কালো তার উপর রক্তাক্ত ন্যাড়া মাথা। কী যে বিশ্রি রূপ হয়েছিল। আমি আমার একমাত্র ভরসা আব্বাকে চিৎকার করে ডেকে কেঁদেছি। আব্বা শুনেনি। আমার দিকে হা করে শুধু তাকিয়েছিল। যিশু ভাইয়াকে অনেক মারধর করে। সেদিন রাতেই আহত যিশু ভাইয়াকে ছুঁড়ে ফেলে আসে নদীর পাড়ে। গরুর ঘরে গোবরের উপর বেঁধে রাখে আমাকে। দূরদূরান্তরের মানুষ দেখতে আসে। আমি তখন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নিজের মৃত্যু কামনা করেছি। একবার বাঁধনছাড়া হলে আত্মহত্যা করব ভাবি। হাত বাঁধা ছিল। দাঁত দিয়ে নিজের হাঁটুতে বোকার মতো কামড় দিতে থাকি একটার পর একটা, যাতে মরে যাই। যে ই দেখতে আসতো সেই বিশ্রি গালি দিয়ে যেত। কেউ কেউ লাথি দিয়েছে। রাধাপুরের হারুন রশীদ আছে না? উনার আব্বা তখন অলন্দপুরের মাতব্বর ছিলেন। উনার গোয়ালঘরেই বন্দি ছিলাম।।দুই দিন পর আমাকে ছাড়ে। ছাড়া পেয়েই ইচ্ছে হচ্ছিল, গলায় কলসি বেঁধে ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেই। কিন্তু পারিনি। শরীরে একটুও শক্তি ছিল না। দৌড়ে পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি গোয়ালঘরের বাইরে। ধারালো কিছু একটা ছিল মাটিতে। মাটিতে পড়তেই হাতের বাহু ছিঁড়ে গলগল রক্তের ধারা নামে। এই যে আমার বাহুর দাগটা। এটা সেদিনই হয়েছে।'

হেমলতা মেয়েদের দাগটা দেখানোর জন্য ঘুরে তাকান। দেখেন তার দুই মেয়ে মুখে হাত চেপে কাঁদছে। হেমলতা হাসার চেষ্টা করে বললেন,'তোরা মরাকান্না শুরু করেছিস কেন?'

হেমলতার কথা শেষ হতেই ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুই মেয়ে ছুটে আসে তার দিকে। নৌকা দুলে উঠে। হেমলতা চমকে গিয়ে দ্রুত নৌকা ধরেন। চিৎকার করে উঠেন,'আরে...'

কথা শেষ করতে পারেননি। তার পূর্বেই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই মেয়ে। জড়িয়ে ধরেই আম্মা আম্মা বলে কাঁদতে থাকে। দুই মেয়ে এতো শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে যে,হেমলতার মনে হচ্ছে এখুনি দম বেরিয়ে যাবে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। হেমলতা দুজনের পিঠে হাত বুলিয়ে স্বান্তনা দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তারা কেঁদে চলেছে। হেমলতা মোর্শেদের উদ্দেশ্যে বলেন,'নৌকা ঘুরাও। এদের আর কিছু বলব না। আর ঘুরব না।'

পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকে বলল,'আর কাঁদব না। পূর্ণা আর কাঁদিস না। কিন্তু তোমাকে জড়িয়ে রাখব।'

হেমলতা পদ্মজার মাথায় চুমু দিয়ে বললেন,'আমাদের এক ঘরে করে দেওয়া হলো। বাজারে ভেষজ উপায়ে আব্বার চিকিৎসা চলছিল। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আমার পরিবারের মুখও দেখতে চায় না। দেখলেই এটা ওটা ছুঁড়ে দিত। বলা হয়নি,সেদিন রাতে আব্বা,আম্মা,হানিফ মামার বাড়ি ছিল। মামার বাড়ির পাশের বাড়িতে ডাক্তার ছিল একজন। আব্বাকে দেখাতে গিয়েছিল। হানি আপার বিয়ে দেয়ার জন্য আম্মা উঠেপড়ে লাগে। তখন হিমেল আম্মার পেটে। সাত মাস চলে। আমার উপর আম্মার মার প্রতিদিন চলতেই থাকে। আমার জন্য পরিবারের এতো ক্ষতি হলো। হানিফ স্কুলে যেতে পারে না। সবাই দূর দূর করে। হানি আপার বিয়ে হয় না। আব্বার চিকিৎসা হয় না। বিপদ-আপদে কেউ পাশে আসে না। ওদিকে হিমেল আসার সময় ঘনিয়ে আসছে। কোনো দাত্রী আসেনি। আম্মা একা যুদ্ধ করে হিমেলকে জন্ম দিল। সব মিলিয়ে জীবনটা নরক হয়ে উঠে আমার। বছর দুয়েকের মধ্যে আব্বা কিছুটা সুস্থ হয় আল্লাহর রহমতে। হাঁটাচলা করতে পারেন। আগের মতো সবকিছু না বুঝলেও মোটামুটি বুঝতেন। হানি আপার বিয়ে ঠিক হলো। বনেদি ঘর থেকে প্রস্তাব আসে। শর্ত পাঁচ বিঘা জমি দিতে হবে। আমাদের জমি ছিল সাড়ে পাঁচ বিঘা। আম্মা পাঁচ বিঘা জমি দিয়েই হানি আপার বিয়ে দিলেন। সবকিছু স্বাভাবিক হয়। যদিও মাঝে মাঝে অনেকে কথা শুনিয়েছে। একসময় আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে। তোদের আব্বার সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে জানতে পারি তোদের আব্বার দ্বিতীয় স্ত্রী আমি।'

শেষ কথাটা হেমলতা মোর্শেদের দিকে তাকিয়ে বলেন। মোর্শেদ চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নত হন। পূর্ণা খুব অবাক হয়ে মোর্শেদের দিকে তাকাল। হেমলতা পূর্ণাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলেন,'আব্বাকে ভুল বুঝিস না মা। ভালোবাসার উপর কিছু নেই। ভালোবেসে লুকিয়ে বিয়ে করেছিল। কিন্তু আমাকে জানতে দেয়নি। একসময় বিরক্ত হয়ে অনেক মারধোর করে। ভীষণ বদমেজাজি আর জেদি ছিল তোদের আব্বা। জোর করে তোদের দাদা বিয়ে করিয়েছেন। তাই রাগ মেটাতো আমার উপর। আচ্ছা বাদ সেসব কথা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। জান বাঁচানোর তাগিদে মানুষ পালাতে থাকে। অলন্দপুরে পাকিস্তানি ক্যাম্প তৈরি হয়। শহর থেকে একটা দল আসে যারা যুদ্ধ করতে চায় তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে। তোদের আব্বা তার প্রথম স্ত্রীর কাছে বেশি থাকতো। আর তোর দুই চাচা যুদ্ধে চলে যায়। আমি একা ছিলাম খালি বাড়িতে। চারিদিকে অত্যাচার, জুলুম। ইচ্ছে করে দেশের জন্য কিছু করতে। মনে সাহস নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি কমান্ডার আবুল কালামের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। প্রধান শিক্ষক গোপনে গ্রামের যুবক-যুবতীদের অনুপ্রেরণা দিতেন যুদ্ধের জন্য। এ খবর একসময় পাকিস্তানিরা পেয়ে গেল। তিনি শহিদ হলেন। ট্রেনিং-এ জয়েন করি। হয়ে উঠি একজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রথম অপারেশনে আমরা সফল হই। অলন্দপুরের ক্যাম্প উড়িয়ে দেই। এরপর চলে যাই আরেক এলাকায়। হাতে রাইফেল নিয়ে পরবর্তী অপারেশনে নামি। তখন ধরা পড়ে যাই পাকিস্তানিদের হাতে। বন্দি করে কারাগারে। স্বচক্ষে দেখি ধর্ষণ,শারিরীক অত্যাচার। কী বর্বরতা তাদের! রড দিয়ে পিটিয়েছে। পিঠের দাগগুলো এখনো আছে। আরো কয়দিন থাকলে হয়তো আমিও ধর্ষণ হতাম। তার আগেই আবুল কালামের বুদ্ধির কাছে

হেরে গেল তারা। ফেরার আগে চোখ বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে দুইজনকে ছুরি দিয়ে মৃত্যুর দোয়ারে পাঠিয়ে আসি। দেশ স্বাধীন হয়। চারিদিকে স্বাধীনতার উল্লাস। হাসপাতালে তখন ভর্তি আমি। আরো অনেকে ছিল। সেই হাসপাতালেই ভর্তি ছিল যিশু। সেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। রিমঝিমের সাথে ফের দেখা হলো। এক মাস লাগলো সুস্থ হতে। ফেরার সময় সাথে আসে রিমঝিম আর যিশু ভাইয়া। পথে বার বার করে বলি, তোমাদের মতো দেখতে যেন আমার একটা মেয়ে হয়। অলন্দপুরের বাজারে নামিয়ে দিয়ে ওরা আর আসেনি। ফের যদি গ্রামের লোক দেখে ফেলে। কিন্তু আশঙ্কাই ঠিক হলো। অনেকে যিশু ভাইয়ের সাথে আমাকে দেখে ফেলে। বাড়িতে ফিরে তোর আব্বাকে দেখি। তিন মাস পর জানতে পারি আমার পদ্ম আমার পেটে। মনে প্রাণে একটা সুন্দর মেয়ে চাইতে থাকি আল্লাহর কাছে। ঘুমালে স্বপ্ন দেখি রিমঝিমকে। আমার মন খুব চাইতো রিমঝিমের মতো সুন্দর মেয়ে। ঠিক তাই হলো। কিন্তু বদনাম রটে গেল। অনেকে বলে তারা যিশুর সাথে আমাকে দেখেছে। এতদিন যিশুর কাছে ছিলাম।।তারই সন্তান পদ্মজা। এজন্যই এত সুন্দর। আর এতো মিল। তোদের আব্বাও বিশ্বাস করল। আল্লাহ চাইলে সব পারে কেউ বিশ্বাস করল না। কিন্তু জানিস পদ্ম? তুই জন্মের পর থেকেই আমি অলৌকিক ভাবে খুব শক্ত আর কঠিন হয়ে পড়ি। কেউ কিছু বললে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দেই। তোর সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে আসলে দা নিয়ে তেড়ে যাই। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। তার মধ্যে কমান্ডার আবুল কালাম আসেন অলন্দপুরে। গ্রামের অনেকে যুদ্ধে গিয়েছিল। আমি ছাড়া আর একজন ফিরেছিল। বদর উদ্দিন নাম। বদর উদ্দিন এবং আবুল কালামের কাছ থেকে গ্রামবাসী জানতে পারে আমিও যুদ্ধ করেছি। হেমলতা একজন মুক্তিযোদ্ধা। এ খবর শোনার পর থেকে সবাই মোটামুটি সমীহ করে চলতে থাকে। একটা শক্ত জায়গা দখল করে বাঁচতে থাকি। প্রতিটি ঘটনা আমাকে ভেতরে ভেতরে শক্ত করেছে। তুই জন্মের পর বুঝেছি, আমি অনেক কিছু পারি। একা চলতে পারি। '

কথা শেষ করে হেমলতা হাঁফ ছাড়েন। চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ আগে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফজরের আযান পড়বে। পদ্মজা,পূর্ণা স্তব্ধ।

'এই দুনিয়ায় বাঁচার দুটি পথ- চুপ থাকো, নয় প্রতিবাদ করো। কিন্তু আমার নিয়ম বলে, সামনে চুপ থেকে আড়ালে আবর্জনাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। যাতে এই আবর্জনার প্রভাবে আর কিছু না পঁচে।'

কী জানি কেন হেমলতার শেষ কথাগুলো পদ্মজার রগে রগে শিহরণ জাগায়। সে দূরে চোখ রেখে কিছু ভাবতে থাকে। মানুষের জীবনে কত গল্প! কত যন্ত্রনা! হেমলতা নৌকা ঘুরাতে বলেন। মোর্শেদ নৌকা ঘুরায়। বাড়ি ফিরতে

হবে। আজ পদ্মজার গায়ে হলুদ। নৌকা চলছে ঢেউয়ের তালে তালে। আগের উত্তেজনাটা আর কাজ করছে না। একটা ইঞ্জিন ট্রলারের শব্দ পাওয়া যায়। চার জন চকিতে সেদিকে তাকায়। ট্রলারে একজন লোক। আরেকজন ট্রলারের ভেতর থেকে সাদা কাপড়ে মোড়ানো কিছু একটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। আবছা আলোয় সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি দেখে পূর্ণার পিলে চমকে উঠল। মানুষ মরার পর সাদা কাপড়ে যেভাবে মোড়ানো হয়,ঠিক তেমন। পর পরই লোক দুটি মোড়ানো বস্তুটি ছুঁড়ে ফেলে পানিতে। মোর্শেদ চেঁচিয়ে উঠেন,'কে রে?'

লোক দুটি তাকায় বোধহয়। এরপর দ্রুত ট্রলারের ভেতর চলে যায়। মোর্শেদ বৈঠা দ্রুত চালিয়েও ধরতে পারল না। ট্রলারটি চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি ফেলা হয়েছে,সেখানে মোর্শেদের নৌকাটি পৌঁছাতেই হুট করে পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে। হেমলতা আকস্মিক ঘটনায় চমকে যান। আতঙ্ক নিয়ে ডাকেন,'পদ্ম..."

পদ্মজার দেখা নেই। তিনি নৌকা থেকে ঝাঁপ দিতে যাবেন তখনি পদ্মজা ভেসে উঠে। হাতে সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি। পদ্মজা মুখ তুলেই হেমলতাকে বলল,'আম্মা,আমি ঠিক ভেবেছি। এটা লাশ।'

পূর্ণা লাশ শুনেই কাঁপতে থাকে। অথচ পদ্মজা স্থির,ঠান্ডা।এই শেষ রাত্রিরে নদীর জলে ভেসে আছে দু'হাতে মৃত মানুষ জড়িয়ে ধরে!

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট - ২৬

লাশটি নৌকায় তুলতেই পূর্ণা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। মোর্শেদের পাশ ঘেঁষে বসে। তার মনে হচ্ছে চারিদিক থেকে প্রেতাত্মারা তাকিয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঘাড় মটকে দেবে। ঘাড় মটকানোর কথা ভাবতেই পূর্ণার ঘাড় শিরশির করে উঠল। 'ভূত,ভূত' বলে চেঁচিয়ে উঠে। হঠাৎ পূর্ণার চিৎকার শুনে মোর্শেদ ভয় পেয়ে যান। এমনিতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে লাশ দেখে। তিনি পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন,'কোনহানে ভূত? ডরাইস না।'

মাথার কাছে বাঁধা দড়িটা খুলে কাপড় সরাতেই একটা মৃত মেয়ের মুখ ভেসে উঠে। হেমলতা,পদ্মজা দুজনই ভেতরে ভেতরে চমকে যায়। কিন্তু প্রকাশ করল না। হেমলতা এদিক-ওদিক তাকিয়ে মানুষের উপস্থিতি দেখেন। এরপর কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলেন,'চিনি না তো। তুই চিনিস?'

পদ্মজা মাথা নাড়িয়ে জানাল, সে চিনে না। পরপরই মোর্শেদকে ডাকল পদ্মজা,'আব্বা,দেখো তো তুমি চিনো নাকি?'

মোর্শেদ উঠে আসতে চাইলে পূর্ণা ধরে রাখে। মোর্শেদ পূর্ণাকে নিয়েই এগিয়ে আসেন। মৃত মেয়েটার মুখ দেখে বলেন,'না,চিনি না।'

হেমলতা চিন্তায় পড়ে যান। শরীরের পশম কাঁটা দিচ্ছে। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা। হীমশীতল বাতাস। আর সামনে সাদা কাপড়ে মোড়ানো এক মেয়ের লাশ। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন,'কোন মায়ের বুক খালি হলো কে জানে!'

পদ্মজা বিড়বিড় করে,'আমার এক জনকে চেনা লাগছে আম্মা।

হেমলতা ধৈর্য্যহারা হয়ে প্রশ্ন করেন,'কে? চিনেছিস? নাম কী? জানিস?'

পদ্মজা ভাবছে। গভীর ভাবনায় ডুবে কিছু ভাবছে। হেমলতার প্রশ্নের জবাবে বলে,'নাম জানি না আম্মা। দাঁড়াও আমি বলি লোকটা কেমন!'

পদ্মজা চোখ বুজে। কিছুক্ষণ আগের মুহূর্তে ফিরে যায়। চোখ বুজা অবস্থায় রেখে বলে,'আব্বা যখন বললো, কে রে? তখন একটা লোক আমাদের দিকে তাকায়। লোকটার চোখগুলো ভীষণ লাল। অনেক মোটা, খুব কালো। মাথার চুল ঝুটি বাঁধা ছিল। এমন একজন লোক আমি স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেকবার দেখেছি।'

কথা শেষ করেই পদ্মজা চোখ খুলে। খুশিতে গদগদ হয়ে বলল,'লোকটার দেখা পেলে আমি ঠিক চিনে ফেলব আম্মা।'

'চিনে কী হবে? প্রমাণ তো নেই। আর মেয়েটা মারা গেছে নাকি খুন সেটা তো জানি না।'

'প্রমাণ নেই তা ঠিক। কিন্তু মেয়েটা খুন হইছে আম্মা। এই দেখো, মেয়েটার গলায় কত দাগ। আর পেটের কাছে দেখো রক্তের দাগ। নদীর পানি পুরোটা রক্ত মুছে দিতে পারেনি।'

হেমলতা অবাক হয়ে পদ্মজার কথামতো খেয়াল করে দেখেন। সত্যি তো! তিনি বিস্ময় নিয়ে বলেন,'একটার পর একটা খুন! হানিফের পর প্রান্তর বাপ এরপর এই মেয়ে। আমি বুঝে উঠতে পারছি না কে বা কারা এমন করছে।'

'ওই লোকটার দেখা যদি আরেকবার পাই,আমি ঠিক এর রহস্য বের করবই আম্মা।' বলল পদ্মজা।

মৃত মেয়েটার মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল পদ্মজা। এরপর দড়ি দিয়ে আগের মতো বেঁধে, মোর্শেদকে বলল,'আব্বা কলাপাড়ার দিকে যাও।'

'ওখানে কী?' হেমলতা বললেন।

পদ্মজা শান্ত কণ্ঠে বলল,'কলা গাছের ভেলা বানিয়ে লাশ ভাসিয়ে দেব আম্মা। পানিতে ফেললে কেউ পাবে না। ভাসিয়ে দিলে কেউ না কেউ পাবে। মেয়েটার পরিবার খুঁজে পাবে। আমাদের বাড়িতে এখন লাশ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। অনেক মানুষ আছে। সবাই ভয় পাবে। বিয়ের আমেজটা চলে যাবে। এক সপ্তাহও হয়নি ওই ঘটনাটা পার হওয়ার। আম্মা বুঝছো আমি কী বলতে চাইছি?'

হেমলতা কিছু মুহূর্তকাল পদ্মজার চোখে চোখ রেখে বসে রইলেন। পদ্মজার কথার উত্তর না দিয়ে, মোর্শেদকে বললেন,'কলাপাড়ার দিকে যাও।'

সকাল সকাল গায়ে হলুদ করার কথা ছিল। কিন্তু বউ এখনো ঘুমে। বাড়ি ভর্তি মানুষ। কলাগাছের ছাদ বানিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে। হেমলতা কিছুতেই পদ্মজাকে ডাকতে দিচ্ছেন না। দুপুরের আযান পড়তেই পদ্মজা ধড়ফড়িয়ে উঠে। মনে পড়ে,আজ তার গায়ে হলুদ। সেই কাকডাকা ভোরে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়েছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। বালিশের পাশে হলুদ শাড়ি রাখা। পদ্মজা দ্রুত শাড়িটা পরে নেয়। এরপর পূর্ণাকে ডাকে।

বাহিরের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। পদ্মজা দরজা খুলতেই, নয় বছর বয়সী একটা মেয়ে চেঁচিয়ে বাইরে খবর দিল,'পদ্ম আপার ঘুম ভাঙছে।'

হানি উঠান থেকে পদ্মজার ঘরের সামনে আসেন। হেমলতা রান্নাঘরের সামনে বসে মুরগি কাটছিলেন। হানি হেমলতাকে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলেন,'এবার নিয়ে যেতে পারি তোর চাঁদরে?'

'যাও।' বললেন হেমলতা।

হানি,মনজুরা,সম্পর্কে ভাবি হয় এমন আরো দুজন পদ্মজাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। গায়ে হলুদের স্থান বাড়ির পিছনে। মোর্শেদ এসে পথ আটকান। গামছা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বলেন,'আমার ছেড়িরে আমি লইয়া যামু ছাদনাতলায়।'

কথা শেষ করে মোর্শেদ পদ্মজাকে পাজাকোলে তুলে নেন। হানি চেঁচিয়ে উঠে বলেন,'আরে মিয়া করেন কি? দুলাভাইরা কোলে নেয় তো।'

'বাপ নিলে বিয়া অশুদ্ধ হইয়া যাইব না।'

মোর্শেদ বাইরে পা রাখেন। পদ্মজা লজ্জায় শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। অজানা অনুভূতিতে হাত পা কাঁপছে। মানুষের উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে যায়। প্রেমা,প্রান্ত খুশিতে লাফাচ্ছে। একজন আরেকজনকে রঙ দিয়ে মাখিয়ে দিচ্ছে। কলা গাছের ছাদের নিচে খাটের ছোট চৌকিতে পদ্মজাকে দাঁড় করিয়ে দেন মোর্শেদ। সামনে সাতটা বদনা,দশটা কলসি ভর্তি পানি। একটা খোলায় দূর্বা,ধান,হলুদ বাটা,হলুদ শাড়ি, ব্লাউজ, তোয়ালে,সাবান,। কাছে কোথাও একদল নেচে নেচে গীত গাইছে। ছেলেমেয়েরা একজন আরেকজনকে জোর করে ধরে হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছে। পদ্মজার জন্য রাখা হলুদ অনেকেই নিতে চাইছে। হানির জন্য পারছে না। হানি পাহারাদার হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হানির ছেলে অনন্ত এসে হলুদ চাইলে,হানি মার দিবে বলে তাড়িয়ে দিলেন। হেমলতা এসে ভীর কমিয়ে দেন। চারিদিকে পর্দা দিয়ে ঘিরে দেন। এরপর ৬-৭ জন মহিলাকে নিয়ে হলুদের গোসল শেষ করেন। এজন্য অনেকে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। গায়ে হলুদ করতে হয় সবাইকে নিয়ে,সবার সামনে। আনন্দ করতে করতে। হেমলতা কেন শুধুমাত্র ৬-৭ জন নিয়ে করছেন। হেমলতা তার জবাব দিলেন না। অবুঝদের সাথে তর্ক করে লাভ নেই। গোসল শেষ করে মসলিন কাপড়ের হলুদ শাড়ি পরানো হয় পদ্মজাকে। কানের কাছে মনজুরা গুনগুন করে কাঁদছেন। পদ্মজার শুনতে ভাল লাগছে না। বিয়ে হলে নাকি এক সপ্তাহ আগে থেকে কান্নাকাটি শুরু হয়। গায়ে হলুদের দিন আত্মীয়রা কাঁদায় গড়াগড়ি করে কাঁদে। অথচ, পদ্মজা,হেমলতা শান্ত!

পদ্মজাকে গায়ে হলুদের খাবার দেয়া হয়। বিশাল এক থালা। তাতে কয়েক রকমের পিঠা,আস্তো একটা মুরগি,পোলাও,শাক।পদ্মজা খাওয়ার আগে অন্যরা কেড়ে নিয়ে যায় সব। ভীর কমতেই হেমলতা আলাদা করে প্লেটে করে ভাত আর হাঁসের মাংস নিয়ে আসেন। নিজ হাতে খাইয়ে দেন। খাওয়ার মাঝে পদ্মজার মনে পড়ে মনজুরা তখন বলেছিলেন,'বিয়ের পর মেয়েরা পর হয়ে যায়। মা-বাবা পর হয়ে যায়। স্বামী আর স্বামীর বাড়িই সব। মা-বাপের সাথে দেখা করতেও তাদের অনুমতি লাগবে।'

পদ্মজা হেমলতার দিকে তাকিয়ে ভাত চিবোয়। হেমলতা খেয়াল করেন পদ্মজা তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। চোখের পলকই ফেলছে না। চোখে জল চিকচিক করছে। তিনি পদ্মজাকে বলেন, 'খাওয়ার সময় কাঁদতে নেই।'

পদ্মজা ফোঁপাতে থাকল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে খাবার শেষ করে। চোখের জলে বুক ভিজে একাকার। হেমলতা ঘরের বাইরে এসে হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছেন। কী যে যন্ত্রনা হচ্ছে বুকে! কাঁদতে পারলে বোধহয় ভালো হতো। কিন্তু কাঁদার সময় কোথায়? সবার সামনে যে তিনি আর কাঁদতে পারেন না। ভীর কমলে কাঁদবেন। অনেক কাঁদবেন। জীবনে শেষ বারের মতো কাঁদবেন। এরপর আর কখনো কাঁদবেন না। কোনোদিনও না।

পদ্মজার দু'হাতে গাছের মেহেদী লাগানো হচ্ছে। উঠানে বড় চৌকি রেখে চারিদিকে রঙিন পর্দা টাঙানো হয়েছে। কাগজের ফুল মাথার উপর ঝুলানো। চারিদিকে ঘিরে মেয়েরা। সামনের খালি জায়গায় চলছে নাচ। তখন উপস্থিত হয় হাওলাদার পরিবার। লাবণ্য,রানী এবং তাদের আত্মীয়। সাথে নিয়ে এসেছে বউয়ের বেনারসি,গহনা। হানি ছুটে এসে সবার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। শেষে বাড়িতে ঢুকে আমির। বিয়ের আগের দিন রাতে বরের আগমন সবাইকে খুব হাসালো। কেউ কেউ বলল,এতো সুন্দর বউ দূরে রাখার আর তর সইছে না। তাই চলে এসেছে। আমির সেসব পাত্তা দিলো না।সোজা হেমলতার কাছে গেল। গিয়ে বলল,'আম্মা,পদ্মজার সাথে একটু কথা বলতে চাই।'

আমিরের অকপট অনুরোধ। হেমলতা ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন আমিরের দিকে। এমন ছেলে তিনি দুটো দেখেননি। আমির আবার বলল,'বেশিক্ষণ না,একটু সময়।'

আমিরের কণ্ঠ পরিষ্কার। অথচ মাথা নিচু। পরিবারের ভাল শিক্ষাই পেয়েছে। তবে লাজলজ্জা একদমই নেই। হেমলতা মৃদু হেসে বলেন,' ঘরে গিয়ে বসো। পদ্ম আসছে।'

আমির হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করে পদ্মজার ঘরের দিকে চলে গেল। হেমলতা পদ্মজাকে ডেকে নিয়ে আসেন। বলেন,আমির কথা বলতে চায়। ব্যাপারটা লোকচক্ষুর। কিন্তু না তো করা যায় না। কোনো বিশেষ দরকার হয়তো। পদ্মজা ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে তাকায়। হেমলতা ইশারায় যেতে বলেন। পদ্মজা ঘরে ঢুকে ডাগর ডাগর চোখ মেলে আমিরের দিকে তাকায়। আমিরকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু নিয়ে খুব চিন্তিত। আমির পদ্মজাকে দেখেই হাসল। বলল,'বসো।'

পদ্মজা বিছানার এক পাশে বসে। অন্য পাশে বসে আমির। প্রশ্ন করে,'পদ্মজা যা প্রশ্ন করি সত্যি বলবে।'

পদ্মজা দৃঢ়কণ্ঠে বলল,'আমি মিথ্যে বলি না।'

আমির অসহায়ের মতো বলল,'তুমি এই বিয়েতে মন থেকে রাজি তো পদ্ম?'

পদ্মজা চকিতে তাকাল। আবার চোখ সরিয়ে নিল।বলল,'আম্মা যখন যা করেছেন তাই আমি মন থেকে মেনে নিতে পেরেছি।'

আমির আবার প্রশ্ন করল,'লিখন শাহ তো তোমাকে পছন্দ করে।'

'জানি। আর আপনিও জানেন সেটাও জানি।'

'আমি আমাদের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর জেনেছি। তুমি...মনে কিছু নিও না, বলতে চাইছি যদি তোমার আমাকে অপছন্দ হয় আর লিখন শাহকে পছন্দ করে থাকো বলতে পারো। আমি বিয়ে ভেঙে দেব।'

পদ্মজা অপমানে থমথম হয়ে উঠল। গম্ভীর স্বরে বলল,'অবিশ্বাস থাকলে বিয়ে না হওয়াই ভাল। আপনি ভেঙে দিতে পারেন।'

আমিরের চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। পদ্মজা এত কথা বলতে পারে ভাবতেও পারেনি। আমির ইতস্তত করে বলল,'আমার কোনো অবিশ্বাস নেই। তোমার মনে কেউ না থাকলে বিয়ে আমার সাথেই হবে। আর কারোর সাথে হতে দেব না।'

পদ্মজা কিছু বলল না। উঠে যেতে চাইলে আমির বলল,'একবার হাত ধরা যাবে?'

'আগামীকাল থেকে হাত ধরে দিনরাত বসে থাকিয়েন।' বলল পদ্মজা। সাথে হাসলও। আমির তা খেয়াল করে বলল,'সুবহানআল্লাহ।'___________

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। পদ্মজা বধূ সেজে বসে আছে। দুই পাশে বসে আছে পূর্ণা ও প্রেমা। কাজী বিয়ে পড়াচ্ছেন। অনেকক্ষণ ধরে পদ্মজাকে কবুল বলতে বলছেন। পদ্মজা কিছুতেই বলছে না। সে নিজ মনে হেমলতাকে খুঁজছে। বউ কবুল বলছে না শুনে অনেকে ভীড় জমিয়েছে। হেমলতা ভীড় ভেঙে ঘরে ঢুকেন। হেমলতাকে দেখে পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটে। ছলছল চোখ নিয়ে তিনবার কবুল বলে। হেমলতার দুই চোখে পানি। কিন্তু ঠোঁটে হাসি। পদ্মজাকে বধূ সাজাবার পর মাত্র দেখলেন তিনি। লাল বেনারসিতে পদ্মজার রূপ যেন গলে পড়ছে। পাশের ঘরে কে যেন কাঁদছে! হেমলতা দেখতে যান।

আয়না দেখানো পর্ব শুরু হয়। আয়নায় তাকাতেই আমির চোখ টিপল। পদ্মজা লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিল। আমির সবার চোখের আড়ালে পদ্মজার এক হাত খপ করে ধরে ফেলে। পদ্মজা কেঁপে উঠে ভয়ে। আমির ফিসফিস করে বলল,'এইযে ধরলাম মৃত্যুর আগে ছাড়ছি না।'

বিয়ে বাড়ির ভীড় কমে গেছে। বিদায়ের পালা চলছে। করুণ কান্নার স্বরে চারিদিক হাহাকার করছে। মনজুরা, হানি কেঁদে কুল পাচ্ছে না। মোর্শেদ নদীর ঘাটে বসে গোপনে চোখের জল ফেলছেন। পূর্ণা পদ্মজার গলা জড়িয়ে সেই যে কান্না শুরু করেছে থামছেই না। প্রেমা,প্রান্ত কাঁদছে। কাঁদছে আরো মানুষ। একটা মেয়ের বিয়ের বিদায় পর্ব কতটা কষ্টের তা শুধু সেই মেয়ে আর তার পরিবার জানে। পদ্মজা কাঁদছে। পূর্ণার মাথায়,পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে

বার বার বলছে,'বোন,বোন আমার। মন খারাপ করে থাকবি না কিন্তু। একদম কাঁদবি না। আমি আসব। তুইও যাবি। আমার খুব কষ্ট হবে রে বোন। আর কাঁদিস না। এভাবে কাঁদলে অসুস্থ হয়ে যাবি।'

রিদওয়ান তাড়া দেয়,'সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করুন।'

পদ্মজা আকুল হয়ে কেঁদে ডাকে,'আম্মা কই? আমার আম্মা কই? আম্মা,ও আম্মা।'

হেমলতা লাহাড়ি ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পদ্মজার ডাকে হেঁটে আসেন। একেকটা পা মাটিতে ফেলছেন আর বুক ব্যথায় চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তবুও হাসার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না। যে মেয়ের জন্য তিনি নতুন করে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছিলেন সেই মেয়ের আজ বিদায়। সারাজীবনের জন্য অন্যের ঘরে চলে যাবে। হেমলতাকে দেখেই পদ্মজা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হেমলতা দ্রুত চোখের জল মুছে, পদ্মজাকে আদুরে কণ্ঠে বললেন,'এভাবে কাঁদতে নেই মা। বিয়ে তো হবারই কথা ছিল।'

'আম্মা,আমি তোমাকে ছাড়া থাকব কেমন করে?'

'সবাইকেই থাকতে হয়। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে মা।'

হেমলতা পদ্মজার কপালে চুমু খান। পদ্মজার দুই চোখের জল মুছে দিয়ে বলেন,' শ্বশুর বাড়ির সবার সাথে মিলেমিশে থাকবি। নিজের খেয়াল রাখবি।'

পদ্মজা হেমলতাকে জোরে চেপে ধরে বলে,'আম্মা,আমি যাব না। আম্মা যাব না আমি।'

হেমলতা পদ্মজার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না। ভাঙা গলায় আমিরকে ডেকে বলেন,'নিয়ে যাও আমার মেয়েকে। খেয়াল রেখো। ওর আব্বা ঘাটে বসে আছে। ডাকতে হবে না, একা থাকুক। তোমরা পদ্মকে নিয়ে যাও। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে।'

আর কিছু বলতে পারলেন না। চোখ বেয়ে টুপটুপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে মাটিতে,পদ্মজার বেনারসিতে।

আমির পদ্মজাকে পাঁজাকোলা করে নেয়। পদ্মজা আকুতিভরা কণ্ঠে হেমলতাকে ডেকে অনুরোধ করে,তাকে জড়িয়ে ধরে রাখতে। হেমলতা রাখেননি। মুখ ঘুরিয়ে নেন। পূর্ণা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। পদ্মজাকে পালকিতে বসিয়ে দেয় আমির। এরপর দু'হাত পদ্মজার গালে রেখে বলল,'একদিন পরই আসব আমরা।'

পদ্মজা দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠে। সব কিছু শূন্য লাগছে। মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে গেছে। পালকি ছুটে চলছে শ্বশুরবাড়ি। পূর্ণা হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে বলে,'আম্মা,কেন বিয়ে দিলা আপার। তোমার কী কষ্ট হচ্ছে না?'

হেমলতা হাঁটুভেঙে মাটিতে বসে পড়েন। পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে গগণ কাঁপিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেন। উপস্থিত সবার কান্না থেমে যায়। হেমলতা পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,'আমি যদি পারতাম আমার পদ্মকে বিয়ে দিতাম না পূর্ণা। ও যে আমার সাত রাজার ধনের চেয়েও বেশি কিছু।'

হানি বরাবরই কাঁদুক স্বভাবের। হেমলতা কখনো কাঁদে না। সেই হেমলতাকে এভাবে কাঁদতে দেখে কান্না লুকিয়ে রাখতে পারল না। হেমলতার মাথা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল,'এটাই তো নিয়ম। কেঁদে আর কী হবে।'

হেমলতা মুহূর্তে ছোট বাচ্চা হয়ে যায়। হানিকে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে।বলে,'আপা,আপা ওরা আমার মেয়ে নেয়নি। আমার কলিজা ছিঁড়ে নিছে। আপা,কেন বিয়ে হলো আমার পদ্মের।'

মনজুরা হেমলতার মাথায় হাত রেখে স্বান্তনা দেন,'দেখিস পদ্ম খুব ভালো থাকবে। ও খুব ভালো মেয়ে।'

হেমলতা হানিকে ছেড়ে মনজুরাকে জড়িয়ে ধরেন। হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,'আম্মা, আম্মা তুমি কখনো আমাকে কিছু দেওনি। এইবার আমার এই মরণ কষ্টটা কমিয়ে দাও। আম্মা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বিশ্বাস করো আম্মা। আম্মা,আমার পদ্মকে ছাড়া আমি কেমনে থাকব।'

মনজুরার বুক ধুকপুক করছে। জন্মের পর হেমলতা কী কখনো এভাবে কেঁদেছে? মনে পড়ছে না। তিনি পারেননি হেমলতার এই কষ্ট কমাতে। শুধু বুকের সাথে চেপে ধরে রাখলেন। এভাবে যদি ছোট থেকে আগলে রাখতেন,হেমলতার জীবনটা এত কষ্টের হতো না।

পদ্মজা ছটফট করছে। কিছু ভাল লাগছে না। ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে যেতে মায়ের কাছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। এখুনি মারা যাবে হয়তো। পদ্মজা হঠাৎ চিৎকার করে উঠে,'থামো তোমরা,থামো। আল্লাহর দোহাই লাগে থামো।'

পালকি থেমে যায়। পদ্মজা পালকি থেকে মাটিতে পা রেখেই মোড়ল বাড়ির দিকে ছুটতে থাকল। কেউ আটকে রাখতে পারেনি। সবাইকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে ছুটে চলেছে সে মায়ের বুকে। আমির শুধু চেয়ে রইল। সন্ধ্যা নামার পূর্ব মুহূর্তে একটা লাল বেনারসি পরা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ছুটছে। দেখতেও ভাল লাগছে।

#পদ্মজা

চলবে...

পুনশ্চঃ দাদুর কাছ থেকে তখনকার গ্রামের গায়ে হলুদ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে লিখেছি। নেত্রকোনার নিয়মে।#আমিপদ্মজা পার্ট- ২৭

পদ্মজার কণ্ঠে আম্মা ডাকটি হেমলতার অস্তিত্ব মাড়িয়ে দিয়ে গেল। হেমলতা থমকে গিয়ে তাকান। উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত হতেই পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে হেমলতার বুকে। হেমলতা টাল সামলাতে না পেরে আবার মাটিতে বসে পড়েন। পদ্মজা নিরবচ্ছিন্ন কাঁদতে থাকল। হেমলতা সীমাহীন আশ্চর্য হয়ে,কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। নির্বাক,স্তব্ধ থেকে পদ্মজার কান্না অনুভব করেন। কান্নার দমকে পদ্মজার শরীর ঝাঁকি দিচ্ছে বারংবার। পূর্ণা পদ্মজাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল,'আর যাবা না আপা।'

পদ্মজা অনুরোধ স্বরে হেমলতাকে বলল,'আম্মা,আমি যাব না।'

হেমলতার দুই চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। প্রতি ফোঁটা জল পদ্মজার বুকে সাইক্লোন, টর্নেডো,ঘূর্ণিঝড়,ভূমিকম্প সহ সব ধরণের দূর্যোগ বইয়ে দিচ্ছে। হেমলতা শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন পদ্মজাকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন,'কোথাও যেতে হবে না তোর।'

হেমলতার এহেন কথা শুনে হানি,মনজুরার মাথায় বাজ পড়ল। সেকী কথা! হেমলতা একবার যখন বলেছে তাহলে সত্যি যেতে দিবে না। তাহলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কী দরকার ছিল! হানি শক্ত কিছু কথা শোনানোর জন্য প্রস্তুত হয়। তখনই হেমলতা পদ্মজাকে সরিয়ে দেন নিজের কাছ থেকে। চোখে মুখ শক্ত করে কাঠ কাঠ কণ্ঠে বলেন,'এটা ঠিক হয়নি পদ্ম! এভাবে চলে আসা মোটেও ভদ্রতা নয়। আবেগকে এতো প্রশ্রয় দিতে নেই। বিয়ে দিয়েছি এবার শ্বশুর বাড়ি যেতেই হবে। ওইতো আমির এসেছে।'

হেমলতা হাত ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে দাঁড়ান। পদ্মজা হা করে তাকিয়ে আছে হেমলতার দিকে। চোখের পলকে কী রকম রূপ পাল্টে ফেলল। এইতো মাত্রই কাঁদছিল!

পদ্মজা নিজের চুলে আঙ্গুল পেঁচাতে পেঁচাতে হাসছে। তুষার রয়ে সয়ে প্রশ্ন করল,'হাসছেন কেন?'

পদ্মজা নাটকীয়ভাবে ব্যথিত স্বরে বলল,'আপনি কাঁদছেন তাই।'

তুষার দ্রুত চোখের জল মুছল। মৃদু হেসে বলল,'কাঁদছি নাকি!'

পদ্মজা হঠাৎ গুনগুনিয়ে কাঁদতে শুরু করল। তুষার জানতে চাইল,'আপনি কাঁদছেন কেন?'

মুহূর্তে পদ্মজা দাত কেলিয়ে হেসে উঠে। চোখে জল ঠোঁটে হাসি নিয়ে বলে,'মনে চাইলো। আম্মা বলতেন,যখন যা ইচ্ছে হয় করে ফেলতে। তাতে কারো ক্ষতি বা নিজের কোনো ক্ষতি না হলেই হলো।'

'আপনার মায়ের খবরটা গতকাল শুনলাম। জানেন,সারারাত ঘুমাতে পারিনি।'

'আপনার মনটা খুব নরম স্যার। কিন্তু কঠিন ভাব নিয়ে থাকেন,আমার আম্মার মতো।'

'তারপর কী হলো?'

পদ্মজা চেয়ার ছেড়ে ফ্লোরে বসে বলল,'আর তো বলব না।'

তুষার শ্বাসরূদ্ধকর কণ্ঠে বলল,'কেন?'

পদ্মজা ঘাড়ে এক হাত রেখে ক্লান্তভঙ্গিতে বলল,'এমনি।'

'হেয়ালি করবেন না পদ্মজা। আপনি ছাড়া এই রহস্যের কিনারা অসম্ভব। আপনার পুরো গ্রাম আপনার বিপক্ষে। খুনের কারণ ও কেউ বলতে পারছে না। আমরা তদন্ত করেও কুল পাচ্ছি না।'

পদ্মজা চোখ গরম করে তাকায়। কটমট করে বলল,'বলব না মানে বলব না।'

তুষার দ্বিগুণ গলা উঁচিয়ে বলল,'তাহলে এতটুকু কেন বললেন?'

'আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই।'

'আপনার ইচ্ছায় সব হবে না।'

'যা খুশি করে নিতে পারেন।'

পরিস্থিতি বিগড়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি সামলাতে তুষার দুই হাতে মুখ ঢেকে রাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর ধীরেসুস্থে বলে,'দেখুন আপনি যদি সব খুলে না বলেন আমি আপনাকে আইনের হাত থেকে বাঁচাতে পারব না। নির্দোষ প্রমাণ করতে পারব না। আর আমার মন বলছে,আপনি দোষ করতে পারেন না।'

'সবসময় মন সঠিক কথা বলে না।' বলল পদ্মজা, করুণ স্বরে।

'তাহলে বলছেন,আপনি নির্দোষ না?'

পদ্মজা চোখ সরিয়ে নিল। হাসল। কী যন্ত্রনা! কত কষ্ট সেই হাসিতে! চোখ ভর্তি জল নিয়ে আবার তাকাল তুষারের দিকে। বলল,'আমি খুন করেছি। একই রাতে,একই প্রহরে,একই জায়গায় একসাথে পাঁচ জনকে। আপনার আইন যা শাস্তি দেয় আমি মাথা পেতে নেব।'

তুষার অধৈর্য্য হয়ে বলে,' আপনার ফাঁসির রায় হবে পদ্মজা। আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার আপনাকে বাঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'ওপারে যাওয়া আমার জরুরি। আমি সব রায় মেনে নেব।'

'আমি মানতে পারব না।' তুষারের অকপট কথা। কথাটা মুখ থেকে বের হওয়ার পর তুষার বুঝলো সে অচেনা এবং ভয়ংকর অনুভূতি নিয়ে খেলছে। পদ্মজার দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। পদ্মজা তুষারকে পরখ করে নিয়ে হাসে। শান্ত ভঙ্গিতে বলল,'এতো ব্যকুল কেন হচ্ছেন?'

বেশ অনেকক্ষণ তুষার গাঁট হয়ে বসে রইল। উপর থেকে অর্ডার এসেছে,আসামী পদ্মজা কেন এতোগুলি খুন করেছে তার রহস্য উদঘটন করতে। না পারলে চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরি চলে যাক সমস্যা নেই,নিজের শান্তির জন্য আত্মতৃপ্তির জন্য হলেও পদ্মজার পেছনের ছয়টি বছরের গল্প জানতেই হবে। এই কেস হাতে পাওয়ার পর থেকে তার ঘুম হচ্ছে না রাতে। সারাক্ষণ মস্তিষ্ক কিলবিল করে। এতো জটিল কেস কখনো ফেস করতে হয়নি। অলন্দপুর পুরোটা ঘেঁটেও কিছু জানা যায়নি। যারা খুন হয়েছে তারা আর পদ্মজা ছাড়া হয়তো কেউ জানেও না। তুষার আবার বলল,'আপনার বিরুদ্ধে সব প্রমাণ। আপনার বিরুদ্ধে সবাই সাক্ষী দিচ্ছে। আপনি কী..."

কথার মাঝপথে তুষারকে থামিয়ে দিয়ে পদ্মজা বলল,'খুনগুলো তো সত্যি আমি করেছি। তাহলে প্রমাণ আমার বিরুদ্ধেই তো থাকবে।'

তুষারের মন বিরক্তে তেঁতো হয়ে পড়ে। পদ্মজার সামনে কয়েকবার পায়চারি করে বেরিয়ে যায়। সিগারেট ফুঁকে মাথা ঠান্ডা করে। ফাহিমা চা নিয়ে আসে। তুষার বলল,'মেয়েটাকে তোমার অপরাধী মনে হয়?'

'আমি কিছু ভাবতে পারছি না স্যার। মেয়েটাকে দেখলে আমার হাত পা অবশ হয়ে পড়ে। এতো মেরেছি শুরুতে। কিছুতেই টু শব্দও করেনি। এরপর থেকে আমি রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখি।'

'পৃথিবীটা রহস্যে ঘেরা ফাহিমা। একজন নারী পাঁচ জনকে কীভাবে খুন করতে পারে? আবার একসাথে? সেই সাহস কী করে পেল?'

'সেটা আমিও ভাবছি স্যার। কীভাবে খুন করেছে সেটা ধারণা করা যাচ্ছে। কিন্তু এতো সাহস,ধৈর্য্য কীভাবে কোনো নারীর থাকতে পারে!'

'নারীরা চাইলে সব পারে। কথাটা শুনে এসেছি। এবার স্বচক্ষে দেখছি।'

'জি স্যার।'

'কত আসামী পায়ে পড়ে জীবন ভিক্ষা চেয়েছে। কিছুতেই মন গলেনি। মন কাঁদেনি। এই মেয়েটা জীবন চায় না,তবুও আমার ইচ্ছে হচ্ছে জীবন দিতে,নির্দোষ প্রমাণ করে বাঁচাতে।'

ফাহিমা চকিতে তাকাল তুষারের দিকে। তুষার সবসময় হু,হ্যাঁ এর বাইরে কিছু বলে না। খুব কঠিন,কাঠখোট্টা একটা মানুষ। অনুভূতি বলতে নেই। তার মুখে এত কথাবার্তা শুনে অবাক হচ্ছে ফাহিমা।

'পরিস্থিতি হাতের বাইরে স্যার। পদ্মজার ফাঁসি দেখার জন্য দেশ উতলা হয়ে আছে।'

'কেন এমন হচ্ছে ফাহিমা?'

'আজ যদি হেমলতা উপস্থিত থাকতেন গল্পটা অন্যরকম হতো স্যার।'

তুষার আবার ফিরে আসে। পদ্মজার সামনে চেয়ারে বসে। ধীরকণ্ঠে বলে,'আজই শেষ দিন। এরপর আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না।'

পদ্মজা চকিতে তাকাল। দ্রুত তুষারের পায়ের কাছে এসে বসল। বলল,'আপনার আম্মা আপনাকে বিয়ে করতে চাপ দেয় তাই না?'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'সেদিন দেখলাম ফোনে কাউকে আম্মা ডেকে রেগে বলছিলেন,বিয়ে করব না।'

'আমি তো অনেক দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। আপনার শ্রবণ শক্তি তো প্রখর।' তুষার বলল। এরপর থামল। লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলল,'আপনার মা বিশ্বাসঘাতকতা কী কথা লুকিয়ে করেছেন?'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'কিছু তথ্য পেয়েছি গতকাল। এইটুকুর জন্য বিশ্বাসঘাতক অপবাদ দিতে পারেন না। উনি আপনার ভালোর জন্যই..."

পদ্মজা চুপ থেকে হুট করে ফোঁস করে জ্বলে উঠে বলল,'আপনি বুঝবেন না আমার কষ্ট। আমার না পাওয়া দামী সময়টাকে আমি কতবার মনে করে বুক ভাসিয়ে কেঁদেছি। বুঝবেন না আপনি।'

পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে বলল। পরপরই হেসে আবার করুণস্বরে কান্না শুরু করল। গা কাঁপিয়ে তোলার মতো কান্না। মনে হয় কোনো অশরীরী কাঁদছে। কী বিশ্রি,ভয়ংকর সেই কান্নার ছন্দ। তুষারের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে।

চিন্তায় মাথার রগ দপদপ করছে। আগামীকাল ভোরে পদ্মজাকে কোর্টে তোলা হবে,রায় হবে। পদ্মজার ফাঁসি চাই বলে,রাস্তায় রাস্তায় আন্দোলন। রেডিওতে আন্দোলন। কিন্তু তুষারের মন যে কিছুতেই মানতে পারছে না এই আন্দোলন। এমন নিষ্পাপ মনের, অপরূপ সুন্দরীর বিরুদ্ধে পুরো পৃথিবী! কী আশ্চর্য তাই না!

বাঁকা রাস্তা পেরিয়ে পালকি চলছে ধীরে ধীরে। সন্ধ্যার আযান পড়েছে কিছুক্ষণ আগে। দিনের আলো কিছুটা এখনও রয়ে গেছে। দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে আসছে হাওয়া। শীতল, নির্মল পরিবেশ। পদ্মজার বুক ধুকপুক করছে। নতুন মানুষ নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারবে তো! একবার সে হাওলাদার বাড়ি গিয়েছিল। অন্দরমহল নামে এক বিশাল বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে মেয়েরা,বউরা থাকে। এখন কী সেও থাকবে? পদ্মজা পর্দার ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরে চোখ মেলে তাকায়। আমির হাতে পাগড়ী নিয়ে তার বড় ভাইয়ের সাথে কী যেন আলোচনা করছে। চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ছে। পদ্মজা চোখ সরিয়ে নিল। মায়ের কথা,পূর্ণার কথা খুব মনে পড়ছে।

পালকি থামে। আমির থামিয়ে দিল। অন্দরমহলে মেয়েরা অপেক্ষা করছে নতুন বউয়ের জন্য। আর আমির গেইটের সামনেই পালকি থামিয়ে দিল। জাফর বিরক্তিতে 'চ' এর মতো শব্দ করে বলল,'এইখানে আবার থামালি কেন?'

আমির পাগড়ী রিদওয়ানের হাতে দিয়ে বলল,'আমার বউ আমার কোলে চড়ে অন্দরমহলে যাবে।'

পদ্মজা কথাটা শুনেই কাচুমাচু হয়ে গেল। আমির পালকির পর্দা সরিয়ে হাত বাড়িয়ে পদ্মজাকে নামতে ইশারা করে। পদ্মজার নাক অবধি টানানো ঘোমটা। আমির সরাতে গিয়েও সরাল না। মুখে বলল,'কী হলো? নেমে আসো।'

পদ্মজা লজ্জায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। সে গাঁট হয়ে বসে থাকে। আমির হেসে এক হাতে নিজের কপাল চাপড়াল। এরপর নিজেই টেনে নামাল পদ্মজাকে। তখনো পদ্মজার নাক অবধি ঘোমটা। আমির চট করে পদ্মজাকে পাঁজাকোলা করে নেয়। পদ্মজা কুঁকড়ে যায়। ভয়ে দুই হাতে আমিরের গলা জড়িয়ে ধরে। আমির যত এগোচ্ছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তার গায়ের উষ্ণতা পদ্মজার শাড়ি ভেদ করে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। অচেনা,অজানা অনুভূতি চারিদিকে যেন জেঁকে বসেছে। মরণ প্রেমের সূত্রপাত হয়তো এখান থেকেই শুরু হয়!

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পাট-২৮

অন্দরমহলের সদর দরজায় গ্রামের মেয়েদের ভীড়। তারা সবাই নতুন বউ দেখতে এসেছে। আমিরের কোলে পদ্মজাকে দেখে মিটিমিটি হাসছে। ফিসফিসিয়ে একজন আরেকজনকে কিছু বলছে। ফরিনা ধমক দিয়ে কোলাহল থামিয়ে দেন। আমির দরজার সামনে উপস্থিত হতেই আনিসা বলল,'এইবার বউকে নামান ছোট ভাই। বড় আম্মার পা ছুঁয়ে সালাম করে,এরপর ঘরে ঢুকেন।'

আনিসা আমিরের চাচাতো ভাইয়ের বউ। জাফরের স্ত্রী। দেশের বাইরে থাকে। ঢাকার প্রফেসরের মেয়ে আনিসা। বিয়ের পরপরই স্বামী নিয়ে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমায়। দুই সপ্তাহ আগে ছুটি কাটাতে শ্বশুরবাড়ি আসে। আনিসার কথামতো আমির পদ্মজাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। এরপর দুজন নত হয়ে ফরিনাকে সালাম করল। ফরিনা হেসে ছেলে এবং ছেলের বউকে চুমু খান। আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন,'সুখী হ বাবা। বউয়ের খেদমতে ভালা থাক জীবনভর। আমার কইলাম বছরের মধ্যেই নাতি চাই।'

লাবণ্য মাঝে ফোঁড়ন কাটল,'পদ্ম আমার লগে শহরে যাইব আম্মা। আমরা একলগে কলেজে পড়বাম। নাতি-টাতি পরে পাইবা।'

ফরিনা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো তেড়ে এসে লাবণ্যর গালে চড় বসিয়ে দেন। উঁচু কণ্ঠে বললেন,'আমার কথার পিছে কথা কওনের সাহস দেখাবি না।'

আকস্মিক ঘটনায় সবাই হকচকিয়ে যায়। পদ্মজা অবাক চোখে তাকায়। সামান্য কথার জন্য কোনো মা এতো মানুষের সামনে যুবতী মেয়েকে মারে? লাবণ্য লজ্জায়, অপমানে কাঁপতে থাকে। চোখে টলমল জল নিয়ে স্থান ত্যাগ করে। একরকম পালিয়েই গেল। ফরিনার চোখেমুখে কাঠিন্যতা ফুটে আছে। পদ্মজা ভয়ে চোখের দৃষ্টি মাটিতে রাখে। ফরিনা পদ্মজার হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে যান।যেতে যেতে বলেন,'মুখে মুখে কথা কইবা না কুনুদিন। যা কই মাইন্যা চলবা। শ্বশুর বাড়ির সব মানুষ হইতাছে গিয়া দেবতার লাহান। তাগোরে সেবা করলেই জান্নাত পাওন যাইবো। নইলে কুনুদিন জান্নাতে পাও দিতে পারবা না। হুনছি তো,তুমি হইছো গিয়া অনেক বাধ্য ছেড়ি। কামে কাজেও দেখাইবা। মনে রাখবা আমার কথা গুলান।'

পদ্মজা মাথা নাড়ায়। মুসলমানদের দেবতার সাথে তুলনা করাটা পদ্মজার ভালো লাগেনি। কিছু কথা গলায় এসে আটকে গেছে। বলার সাহস পাচ্ছে না। ফরিনা আবার বলেন,'হুনো বউ, স্বামীর উপরে কিচ্ছু নাই। স্বামীরেই দুনিয়া ভাববা। মা-বাপ,ভাই-বোন হইছে গিয়া পর। স্বামী আপন। স্বামীর বাইরে কিছু ভাববা না। স্বামী যা কয় তাই মানবা। স্বামীর পা ধুইয়া দিবা নিজের হাতে। স্বামী বইতে কইলে বইবা,উঠতে কইলে উঠবা। হুত্তে কইলে হুইবা। স্বামী যহন কাছে ডাকব না করবা না। আল্লাহ বেজার হইবো। ফেরেশতারা অভিশাপ দিব। দুনিয়াত স্বামীর আদরের থাইকা মধুর আর কিছু নাই। মনে রাখবা।'

পদ্মজা অপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। লজ্জায়,আড়ষ্টতায় সারা শরীর তীব্র গরমে ঘামছে। আনিসা ফরিনাকে ফিসফিসিয়ে বলল,'বড় আম্মা, মানুষ আছে তো অনেক। পরেও বলতে পারতেন।'

আনিসার কথা পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন ফরিনা। তিনি পদ্মজাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আবার বলতে শুরু করলেন,'খালি স্বামী লইয়াও পইড়া থাহন যাইব না। তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি জীবিত আছে। তাগোর সেবা করবা। যহন যা করতে কই করবা। না পারলে কইবা শিখাইয়া দিমু। প্রত্তিদিন ভোরে উঠবা। নামায পইড়া রান্ধাঘরে যাইবা। তহন বাকিসব ভুইলা রান্ধনে মন দিবা।'

আমির কপালের চামড়া কুঁচকে মায়ের কথা শুনছিল। এবার সে ধৈর্য্যহারা হয়ে বলল,'রান্নাবান্না করার জন্য অনেক মানুষ আছে আম্মা। পদ্মজার রাঁধতে হবে না। আর আমার এতো সেবাও লাগবে না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। ভীড় কমাও। আর নিয়মনীতি শেষ করো। এরপর আমার বউ আমার ঘরে ছেড়ে দেও।'

আমিরের কথা শেষ হতেই হাসির রোল পড়ে যায়। পদ্মজা ঠোঁট টিপে হাসল। ফরিনা কিছু কঠিন কথা বলতে প্রস্তুত হোন। আনিসা আমিরকে রসিকতা করে বলল,'আজ তো একসাথে থাকা যাবে না। আরো একদিন ধৈর্য্য ধরেন।'

আমির প্রবল বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করে,'কেন? বিয়ে তো হয়ে গেছে।'

কেউ আমিরের জবাব দিল না। উল্টা সবাই হাসতে থাকল।

'আইজ কাইলরাত্রিরে হতচ্ছাড়া!' বলল শাহানা। জাফরের বড় বোন। আমিরের বিয়ে উপলক্ষে বাপের বাড়ি এসেছে। সাথে নিয়ে এসেছে পুরো শ্বশুরবাড়ি। আমির শাহানাকে প্রশ্ন করল,'কালরাত্রি তো হিন্দুদের নিয়ম। আমি মানি না। আমার বউ আমার ঘরে দিয়ে আসা হোক।'

'সবসময় ত্যাড়ামি করিস কেন? আমরাও তো নিয়ম মেনেছি।' বলল জাফর। কণ্ঠে তার গম্ভীর্যতা। তাতেও লাভ হলো না। আমির কিছুতেই এই নিয়ম মানবে না। ফরিনা,শাহানা,শিরিন,আনিসা,আমিনাসহ অনেকে আমিরকে

মানানোর চেষ্টা করল। কারো কথা আমিরের কর্ণগোচর হলো না। তার মধ্যে রিদওয়ান আমিরের সাথে তাল দিল। বলল,' কালরাত্রি-টাত্রি বাদ। এসব নিয়ম মেনে লাভটা হবে কী? যার বউ তাকে তার বউ দিয়ে দেও।'

'তুই চুপ থাক। আগুনে ঘি ঢালবি না।' বললেন আমিনা।

রিদওয়ান চুপসে গেল। থামলো না শুধু আমির। ফরিনাও জেদ ধরে বসে আছেন। তিনি আমির-পদ্মজাকে আজ কিছুতেই একসাথে থাকতে দিবেন না। যেমন মা তেমন তার ছেলে। মজিদ হাওলাদার অনেকক্ষণ যাবৎ এসব দেখছেন। চেঁচামিচি আর নেয়া যাচ্ছে না। তিনি উপর থেকে নেমে আসেন। অন্দরমহল তিন তলার। তৃতীয় তলায় কেউ থাকে না। শুধু ছাদ আছে। ঘর বানানো হয়নি। অসমাপ্ত ইটের পুরনো বাড়ি। চিন্তাভাবনা চলছে,তৃতীয় তলাটা থাকার জন্য উপযুক্ত করার। মজিদকে দেখে সবাই থেমে গেল। তিনি পদ্মজার পাশে চেয়ার নিয়ে বসেন। পদ্মজা একটু নড়েচড়ে বসে। মজিদ পদ্মজাকে জিজ্ঞাসা করলেন,'তুকি কী চাও মা? আজ শ্বাশুড়ির সাথে থাকবে? নাকি আমার পাগল ছেলের সাথে? ভেবে বলো। তুমি যা বলবে তাই হবে।'

পদ্মজা উসখুস করতে করতে বলল,'জি, আম..আম্মার সাথে থাকব।'

ফরিনার ঠোঁটে বিশ্বজয়ের হাসি ফুটে উঠে। তিনি আমিরের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে হাসেন। পরপরই পদ্মজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। চুমুতে পদ্মজা গাল ভরিয়ে দেন। একবার আড়চোখে আমিরকে দেখল পদ্মজা। আমির তাকিয়েই ছিল। পদ্মজা তাকাতেই আমির চোখ রাঙানি দিল। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মজা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। বিয়ের বাকি সব নিয়ম শুরু হয়। উপর থেকে নেমে আসেন নূরজাহান। তিনি এই বাড়ির প্রধান কর্তী। মজিদ হাওলাদারের জন্মদাত্রী।

'কইরে...কইরে আমার নাত বউডা কই?' বলতে বলতে ছুটে আসেন তিনি। উপস্থিত সবাই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নূরজাহানের দিকে তাকাল। নূরজাহান পদ্মজার সামনে এসে বসেন। পদ্মজার মুখখানা দুই হাতে ধরে দেখেন। এরপর মুগ্ধ হয়ে বললেন,' বাবু দেহি চাঁদ লইয়া আইছে! এই ছেড়ি তোর জন্যি আমার জামাই তো এহন আমার দিকে চাইবোই না।'

নূরজাহান কেন এ কথা বললেন,পদ্মজা ঠাওর করতে পারল না। আমির যখন হেসে বলল,'আরে বুড়ি,তুমি তো আমার প্রথম বউ। ভুলি কীভাবে?' তখন পদ্মজা নূরজাহানের কথার মানে বুঝল। বুঝতে পেরে ঠোঁট চেপে হাসল। নূরজাহান আমিরের থুতুনিতে চিমটির মতো ধরে বললেন,'আমার চান্দের টুকরা। বউরে আদর কইরো ভাই। বকাঝকা কইরো না। ছেড়িডা জন্ম ঘর ছাইড়া আইছে। তুমি এখন সব। তুমি যেমনে রাখবা তেমনেই থাকব। স্বামী হাত ছাইড়া দিলে শ্বশুরবাড়ির আর কেউই বউদের আপন হয় না। বুঝছো ভাই?'

আমির নূরজাহানের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলল,'বুঝছি জান।'

নূরজাহান মন খারাপের নাটক করে বললেন,'এইডা ঠিক না ভাই।'

'কোনটা?'

'এহন থাইকা জান ডাকবা বউরে। আমি হইলাম দুধভাত।'

আমির একটু জোরেই হাসল। সাথে আরো অনেকে হাসল। পদ্মজা নত হয় নূরজাহানের পা ছুঁয়ে সালাম করার জন্য। নূরজাহান দ্রুত আটকালেন পদ্মজাকে। জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন,'রূপে যেমন গুণেও তেমন থাইকো বইন।'

'রাইত বাড়তাছে। সব নিয়ম তো শেষ। যাও যের ঘরে যাও। এই তোরা বাড়িত যাইতে পারবি? রাইতের বেলা আইছিলি কেন? বউতো কাইলও দেহন যাইতো। জাফর ছেড়িগুলারে দিয়া আইতে পারবি? মদন কই? মগা কই? কামের বেলা দুইডারে পাওন যায় না।' কথাগুলো একনাগাড়ে বললেন ফরিনা বেগম। তিনি নূরজাহানের উপস্থিতি যেন উপেক্ষা করতে চাইছেন। মদন ছুটে আসে বাইরে থেকে। মাথা নত করে ফরিনাকে বলল,'আইছি খালাম্মা।'

'থাহস কই? যা এদের দিয়া আয়। আমরার বাড়িত যহন আইছে এরা এহন আমরার দায়িত্বে। সুন্দর কইরা বাড়িত দিয়া আইবি।'

'আচ্ছা খালাম্মা। আপারা চলেন!'

মেয়েগুলো সারাক্ষণ হাসছিল। যাওয়ার সময়ও হাসতে হাসতে গেল। মেয়েগুলোর উদ্দেশ্যে রানি ঠোঁট বাঁকায়। তা খেয়াল করল রিদওয়ান। সে রানির মাথায় গাট্টা মেরে বলল,'সারাক্ষণ মুখ মুরাস কেন? একদিন দেখবি আর মুখ সোজা হচ্ছে না। বিয়েও হবে না।'

'না হলে নাই। ছেড়িগুলারে দেখছো বড় ভাই? কেমনে হে হে কইরা হাসতাছিল।'

'তাতে তোর কী?'

নূরজাহান পদ্মজাকে বললেন,'হ মেলা রাইত হইছে। আইয়ো বনু আমার ঘরে আইয়ো। আইজ আমার লগে থাকবা।'

'আপনার লগে ক্যান? পদ্মজায় আমার লগে আমার ঘরে থাকব। হেইডাই তো কথা হইছে। পদ্মজায়ও এইডাই চায়।'

'দেহো বউ, তর্ক কইরো না। নাত বউ আমার পছন্দ হইছে। আমি আমার লগে রাখুম।'

'এই পদ্মজা তুমি কার লগে থাকবা?' ফরিনা কিঞ্চিৎ রাগান্বিত স্বরে প্রশ্ন করেন। পদ্মজার অবস্থা দরজার চাপায় পড়ার মতো। এ কোন জগতে এসে পড়লো সে! পদ্মজা গোপনে ঢোক গিলল। নূরজাহান আমিরকে আদেশ করলেন,'খাড়ায়া রইছস কেন? বউরে কোলে লইয়া আমার ঘরে দিয়া যা।'

আমির পদ্মজাকে কোলে তুলতে গেলে ফরিনা বললেন,'বাবু, আমি তোর মা। তোরে জন্ম দিছি আমি। আমার কথাই শেষ কথা মানবি। আমার ছেড়ার বউ আমার ঘরে থাকব। আমার কথা অমান্য করলে জান্নাত পাইবি না।'

নূরজাহান পদ্মজাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন,'দেখছোনি বনু? এমন কইলজা বড় বউ কেউ ঘরে রাহে? আমি মানুষ ভালা বইলা এই বউরে বাইর কইরা দেই নাই। সহ্য কইরা কইরা এহন মরার পথে আছি।'

'তোমাদের কারোর সাথে থাকতে হবে না। আমার বউ আমার ঘরেই চলুক।' বলল আমির। কণ্ঠে তার খুশির মেলা। সুযোগ বুঝে নিজের জিনিষ নিজে বুঝে নিতে চাইছে। ফরিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমিরের দিকে তাকান। নূরজাহানকে বললেন,'আপনার ঘরেই লইয়া যান।'

ফরিনার কথা শুনে আমিরের মুখটা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। নূরজাহান হাসলেন। এই হাসি বিজয়ের হাসি।

'ভাই, বউরে কোলে লও। লইয়া আও আমার ঘরে।' নূরজাহান বললেন।

'আমি হেঁটে যেতে পারব। একটু হাঁটা দরকার।' মিনমিনিয়ে বলল পদ্মজা।

'আইচ্ছা তাইলে হাঁটো। ধরো আমার হাত ধরো।' নূরজাহান হাত বাড়িয়ে দেন। পদ্মজা নূরজাহানের হাত শক্ত করে ধরে মৃদু করে হাসলো। নূরজাহান এবং পদ্মজার সাথে আমির আসে। সে দাদীর ঘর অবধি যাবে। পদ্মজাকে তার মোটেও ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

নূরজাহানের ঘরে যাওয়ার পথে পদ্মজা কান্নার সুর শুনতে পায়। কে যেন কাঁদছে। কী করুণ সেই কান্নার স্বর! এদিক-ওদিক দৃষ্টি মেলে তাকাল পদ্মজা। আরেকটু এগোতেই খুব কাছে জোরে একটা আওয়াজ হয়। পদ্মজা কেঁপে উঠে। দ্রুত সেদিকে তাকায়। তার চেয়ে দুই হাত দূরে একটা দরজা। ভেতর থেকে কেউ দরজায় ধাক্কাচ্ছে আর কাঁদছে। পদ্মজাকে ভয় পেতে দেখে আমির বলল,'ভয় পাচ্ছো?'

'কে ওখানে? এভাবে কাঁদছে কেন? দরজা খুলে দিন না!'

পদ্মজা ভয় এবং ব্যথিত কণ্ঠে বললো। তার কথায় আমির বা নূরজাহান কারো কোনো ভাবান্তর হলো না। পদ্মজাকে নিয়ে পাশ কেটে চলে গেল।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ২৯

নূরজাহান শক্ত করে পদ্মজার হাত ধরেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন,'ঘরে আহো,পরে কইতাছি।'

কান্নার শব্দ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। নূরজাহান পদ্মজাকে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকেন। আমির চেয়ার টেনে বসার জন্য প্রস্তুত হতেই নূরজাহান হইহই করে উঠলেন,'তুই বইতাছস ক্যান?'

আমির হকচকিয়ে গিয়ে বলল,'মানে?'

'বউয়ের ধারে আর থাহন যাইবো না। আইজ কাইলরাত্রি।'

'মুসলমানদের কালরাত্রি পালন করতে নেই। গুনাহগার হবেন।' বলল পদ্মজা। তার মাথা নত। প্রথম দিন এসেই কথা বলা ঠিক হলো নাকি ভাবছে।

মুখের উপর কথা শুনে নূরজাহান কড়া চোখে তাকান। পদ্মজা দেখার পূর্বে সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে চোখের দৃষ্টি শীতল রূপে নিয়ে আসেন। তিনি পদ্মজাকে প্রশ্ন করলেন, 'গেরামের রেওয়াজ ফালাইয়া দেওন যাইব?'

নূরজাহানের কণ্ঠ স্বাভাবিক। পদ্মজা নির্ভয়ে চোখ তুলে তাকাল। বলল,'যা পাপ তা করতে নেই দাদু। জেনেশুনে ভুল রেওয়াজ সারাজীবন টেনে নেওয়া উচিত না। আমার কথা শুনে রাগ করবেন না।'

'তুমি কী আইজ জামাইয়ের লগে থাকতে চাইতাছো?' নূরজাহানের কণ্ঠ গম্ভীর। এমন প্রশ্নে পদ্মজা ভয় পেয়ে যায় এবং লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠে। আমতা আমতা করে বলল,'ন...ন...না! তে...তেমন কিছু না।'

পদ্মজা আড়চোখে আমিরকে দেখে আবার চোখের দৃষ্টি নত করে ফেলল। আমির নূরজাহানকে জড়িয়ে ধরে বলল,'আমি যাচ্ছি বুড়ি।' এরপর পদ্মজার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে কোমল কণ্ঠে বিদায় জানাল, 'আল্লাহ হাফেজ পদ্মবতী।'

পদ্মজা নতজানু অবস্থায় মাথা নাড়াল। আমির ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে নূরজাহানকে দেখে। ঢোক গিলে বলে,'রাগ করেছেন দাদু?'

নূরজাহান হাসলেন। পদ্মজার এক হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে যান। বললেন,'আমার বইনে তো ঠিক কথাই কইছে। গুসা করতাম কেরে?'

পদ্মজা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। নূরজাহান বললেন,'তুমি বও। আমি জোসনার মারে ভাত দেওনের কথা কইয়া আইতাছি।'

'আমি খেয়েছি দাদু। তখন খাওয়ালেন আম্মা।'

'ব্যাগডা কই? শাড়িডা খুইলা আরেকটা পরো। সিঁদুর রঙেরডা পরবা।' বলতে বলতে নূরজাহান ব্যাগ থেকে সিঁদুর রঙের শাড়ি বের করলেন। পদ্মজার দিকে এগিয়ে দিলেন। পদ্মজা হাত বাড়িয়ে শাড়ি নিলো। জানতে চাইল,'কোথায় পাল্টাব?'

'খাড়াও দরজা লাগায়া দেই। ঘরেই পাল্ডাও। আমারে শরমাইয়ো না বইন। তোমার যা আমারও তা।'

পদ্মজা শাড়ি হাতে নিয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে শাড়ি পাল্টানোর মতো উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকে। পালঙ্কের পিছনে চোখ পড়ে। পদ্মজা সেদিকে গিয়ে শাড়ি পাল্টে নিল। এরপর নূরজাহানের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল,'দাদু,তখন কাঁদছিল কে?'

নূরজাহান বিছানায় বসতে বসতে জবাব দেন,'আমার খলিলের বড় ছেড়ার বউ।'

পদ্মজা দুই কদম এগিয়ে আসে। আগ্রহভরে জানতে চায়,'কেন কাঁদছিল? উনাকে কি ঘরে আটকে রাখা হয়েছে?'

'বও। আমার ধারে বও।'

পদ্মজা নূরজাহানের সামনে ঝুঁকে বসে। নূরজাহান বললেন,' তোমার চাচা হউরের(শ্বশুর) বড় ছেড়ার বউ রুম্পার গত বৈশাখো মাথা খারাপ হইয়া যায়। এরে ওরে মারতে আসে। কেউরে চিনে না। নিজের সোয়ামিরেও চিনে না। আলমগীর তো এহন ঢাহাত থাহে। আমির তো গেরামে আইছে অনেকদিন হইলো। আলমগীর শহরে আমিরের কামডা করতাছে। এর লাইগগাই তো আলমগীর বিয়াতে আছিল না। রুম্পা তোমার হউরিরে দা নিয়া মারতে গেছিল।'

'এজন্য আপনারা ঘরে আটকে রাখেন উনাকে? হুট করে কেন এমন হলেন?' পদ্মজা আঁতকে উঠে জিজ্ঞাসা করল।

নূরজাহান এদিকওদিক তাকিয়ে কী যেন দেখলেন! এরপর সতর্কতার সাথে ফিসফিসিয়ে বললেন,'বাড়ির পিছে বড় জঙ্গলা আছে। দোষী জায়গা। ভুলেও ওইহানে যাইয়ো না। রুম্পা শনিবার ভরদুপুরে গেছিল। এর পরেরদিন জ্বর উডে। আর এমন পাগল হইয়া যায়। এগুলো তেনাদের কাজ! রাতে নাম লওন নাই। তুমি মাশাল্লাহ চান্দের টুকরা। ভুলেও ওইদিকে যাইয়ো না। ক্ষতি হইব।'

নূরজাহানের কথা শুনে পদ্মজার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে, অবিশ্বাস্য! ভয় পেয়ে কারো মাথা খারাপ হয়ে যায়?

পদ্মজা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,'উনাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে?'

'হ। দেহানো হইছে তো। শহরে দুইবার লইয়া গেছে। কবিরাজ আইলো। কেউই ভালা কইরা দিতে পারে নাই। আইচ্ছা এসব কথা বাদ দেও এহন। এই বাড়িত যহন বউ হইয়া আইছো সবই জানবা। খালি বাইরে কইয়ো না এই খবর। গেরামের কেউ জানে না। রাইত অইছে ঘুমাও।'

নূরজাহান শুতে শুতে বললেন,'হুনো জামাইয়ের কাছে কইলাম যাইবা না।'

'না,না...যাব না।'

'বুঝলা বইন,তোমার দাদা হউরে বিয়ার প্রত্তম রাইতে লুকাইয়া আমারে তুইলা নিজের ঘরে লইয়া গেছিল। আদর-সোহাগ কইরা ভোর রাইতে পাডাইয়া দিছিল। আমি ছুডু আছিলাম। তাই ডরে কইলজা শুকায়া গেছিল।'

বলতে বলতে নূরজাহান জোরে হেসে উঠেন। পদ্মজা মৃদু করে হাসে। নূরজাহান ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়েন। পদ্মজা ধীরে ধীরে এক কোণে কাচুমাচু হয়ে শুয়ে পড়ে। কী অদ্ভুত সব! সাধারণত বিয়ের রাতে নতুন বউরা ঘুমানোর সুযোগ পায় না। জামাইয়ের বাড়ির মানুষেরা সারাক্ষণ ভীড় করে ঘেঁষে থাকে। পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। হারিকেনের আগুন নিভু নিভু করে জ্বলছে। নিভে যাবে যেকোনো মুহূর্তে। কেটে যায় অনেকক্ষণ। ঘুম আসছে না। দেহ অচেনা অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছে। আচমকা পদ্মজা ভ্রু কুঁচকে ফেলে। কান খাড়া করে ভাল করে শোনার চেষ্টা করে। আবার কাঁদছে! রুম্পা মিনমিনিয়ে কাঁদছে। পদ্মজা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। সাথে সাথে নূরজাহান পদ্মজার দিকে ফিরেন। জানতে চান,'ডরাইতাছো?'

'উনি আবার কাঁদছেন।'

'সারাবেলাই কান্দে। এইসবে কান দিও না। ঘুমাইয়া পড়ো।'

পদ্মজা উসখুস করতে করতে শুয়ে পড়ে। হারিকেন নিভে যায়। নূরজাহান ঘুমে তলিয়ে যান। নাক ডাকছেন তিনি। নাক ডাকার তীব্রতা অনেক। যা পদ্মজাকে বিরক্ত করে তুলে। পদ্মজা ঘুমানোর চেষ্টা করে। হাজার ভাবনার ভীড়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। শেষ রাতে ঘুমের ঘোরে অনুভব করে, হাঁটুতে কারো হাতের ছোঁয়া। পদ্মজা চোখ খুলে। মুখের সামনে কেউ ঝুঁকে রয়েছে। পদ্মজা ধড়ফড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল,'কে?'

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ অবয়বটি ছুটে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা কাঁপতে থাকল। শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। ভয়ে ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। সে নূরজাহানকে ভয়ার্ত স্বরে ডাকে,'দাদু...দাদু।'

নূরজাহান একটু নড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পদ্মজা আর ডাকল না। সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে। তার চোখের দৃষ্টি দরজার বাইরে। মস্তিষ্ক ভাবছে, দরজা তো লাগানো ছিল। বাইরে থেকে কেউ কীভাবে ঢুকলো? নাকি এর মাঝে দাদু টয়লেটে গিয়েছিলেন? পদ্মজার বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে। সে জিহ্বা দিয়ে শুকনা ঠোঁট ভিজিয়ে নিলো। একটু ভয় ভয় করছে। কে এসেছিল! এভাবে গায়ে হাত দিচ্ছিলো কেন? পদ্মজা চোখ খিঁচে ছিঃ বলে আগন্তুকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। বাকি রাতটুকু আর ঘুম হলো না তার। ভয়টা কমেছে। এই জায়গায় পূর্ণা থাকলে হয়তো পুরো বাড়ি চেঁচিয়ে মাথায় তুলে ফেলতো। পদ্মজা মনে মনে

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে,এরকম ঘটনা পূর্ণার জীবনে যেন না আসে। একদম গুড়িয়ে যাবে। উঠে দাঁড়াতে পারবে না। পূর্ণার কথা মনে পড়তেই পদ্মজার বুকটা হু হু করে উঠল। কান্না পায়। অন্যদিন পাশে পূর্ণা থাকে। আজ নেই!

ফজরের আযান পড়তেই নূরজাহান চোখ খুলেন। বিছানা থেকে নেমে দেখেন,পদ্মজা জায়নামাজে দাঁড়াল মাত্র। তিনি প্রশ্ন করলেন,'ওযু করলা কই?'

'জি, কলপাড়ে।'

'চিনছো কেমনে?'

পদ্মজা হাসলো। বলল,'খুঁজে বের করেছি।'

নূরজাহান চোখমুখ শক্ত করে বলেন,'নতুন বউ রাইতের বেলা একলা ঘুরাঘুরি কইরা কল খোঁজার কী দরকার আছিল? আমারে ডাকতে পারতা।'

পদ্মজার মাথা নত করে অপরাধী স্বরে বলল,'ক্ষমা করবেন দাদু।'

'কি কাল আইলো। আইচ্ছা,পড়ো এহন। নামায পড়ো।'

নূরজাহান অসন্তুষ্ট ভাব নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

পদ্মজার দুই চোখ ছলছল করে উঠে। যখন টের পেল এখুনি সে কেঁদে দিবে,দ্রুত ডান হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছে। এরপর নামাযে মন দিল।

পদ্মজাকে কাতান শাড়ি পরানো হয়েছে। বউভাতের অনুষ্ঠান চলছে। সে এক বিশাল আয়োজন। বিয়ের চেয়েও বড় করে বউভাতের অনুষ্ঠান হচ্ছে। অলন্দপুরের বাইরে থেকেও মানুষ আসছে পদ্মজাকে দেখার জন্য। আটপাড়ার প্রতিটি ঘরের মানুষ তো আছেই। পদ্মজার চারপাশে মানুষের গিজগিজ। রাতে ঘুম হয়নি। পরনে ভারী শাড়ি,গহনা। এতো মানুষ চারিদিকে। সব মিলিয়ে পদ্মজার নাজেহাল অবস্থা। মাথা নত করে বসে আছে সে।

'আপা।'

পূর্ণার কণ্ঠ শুনে মুহূর্তে পদ্মজার ক্লান্তি উড়ে যায়। চকিতে চোখ তুলে তাকায়। পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মজার উপর। পূর্ণা আওয়াজ করে কেঁদে উঠে বলল,'রাতে আমার ঘুম হয়নি আপা।'

পদ্মজার গলা জ্বলছে। প্রেমা,পূর্ণা,প্রান্তকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে। চাপা কণ্ঠে বলে,'আমারো ঘুম হয়নি বোন।'

'আপা চল,বাড়ি চল।'

'কাইল যাইব। আইজ না। এহন পদ্মজা আমরার বাড়ির ছেড়ি।' লাবণ্য বলল। সে সবেমাত্রই এই ঘরে ঢুকল। পদ্মজার জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। পূর্ণা রাগ নিয়ে বলে,'আমার বোন আমি নিয়ে যাবো।'

'আমাদের আপা আমরা নিয়ে যেতে এসেছি।' বলল প্রান্ত।

রানি প্রান্তর কান টেনে ধরে বলল,'পেকে গেছিস তাই না?'

'উ! ছাড়ো রানী আপা। ব্যথা পাচ্ছি।'

'ওরেম্মা! তুই শুদ্ধ ভাষাও শিইখা লাইছস?' রানি অবাক হয়ে জানতে চাইল। প্রান্ত অভিজ্ঞদের মতো হেসে বলল,'ইয়েস।'

যারা যারা প্রান্তকে চিনে সবার চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। প্রান্ত একটি ইংরেজি শব্দ বলেনি যেন মাত্রই এখানে বজ্রপাত ঘটাল। রানি চোখেমুখে বিস্ময়ভাব রেখে বলল,'এইটা মুন্না না অন্য কেউ।'

'আমি মুন্না না আমি প্রান্ত। প্রান্ত মোড়ল।' প্রান্তের বলার ভঙ্গী দেখে সবাই হেসে উঠল। পদ্মজা হাসতে হাসতে রানিকে বলল,'প্রান্ত অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ শিখেছে।'

'বউ মানুষ কেমনে দাঁত বাইর কইরা হাসতাছে দেখছো? বেহায়া বউছেড়া।' কথাটি দরজার পাশ থেকে কেউ বলল। অন্য কেউ শুনতে না পেলেও পদ্মজা শুনতে পেল। সে সেদিকে তাকাল।

অল্প বয়সী দুজন মহিলা এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন পদ্মজাকে চোখ দিয়ে গিলে খাবে। পদ্মজা তাদের উদ্দেশ্যে হাসে। পদ্মজার হাসি দেখে মহিলা দুজন থতমত খেয়ে গেল। দুজন চাওয়াচাওয়ি করে আবার পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজা ততক্ষণে চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

অতিথি আপ্যায়ন চলছে ধুমধামে। রমিজ আলী,কামরুল,রজব সবাই উপস্থিত রয়েছে। খাওয়া শেষে তারা আড্ডা শুরু করে।

রমিজ বললেন,'মনজুর ছেড়া,জলিল,ছইদ এরা কী আইছে?'

কামরুল দাঁতের ফাঁক থেকে যত্ন করে গরু মাংস বের করেন। এরপর উত্তর দেন,'না আহে নাই। হেদিন ছইদের বাপে আমার কাছে গেছিল।'

'কেরে গেছিল?'

'ছইদরে যাতে মাতব্বরের হাত থাইকা বাঁচায়া দেই।'

'হেরা এহন কই আছে?'

'আছে কোনহানে। কয়দিন পর পরই তো উধাও হইয়া যায়। এহনের ছেড়াদের দায়-দায়িত্ব নাই বুঝলা। আমার যহন দশ বছর তহন ক্ষেতে কাজ করতে যাইতাম।'

কামরুলের কথা উপেক্ষা করে রমিজ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন,'ক্ষমতা যার বেশি হের সুখ বেশি। আমার মাইয়াডা নির্দোষ আছিল। তবুও কেমনডা করছিল সবাই? আইজ মাতব্বরের ছেড়া বলে কিচ্ছুই হইল না। বদলা আমরা বিয়া খাইতে আইছি।'

রমিজের অসহায় মুখখানা দেখে কামরুল,রজব,মালেক হো হো করে হেসে উঠলেন। রমিজের দৃষ্টি অস্থির। পেট ভরে খাওয়ার লোভে এখানে এসেছেন তিনি। নয়তো এখানে আসার এক ফোঁটাও ইচ্ছে ছিল না।

পদ্মজা কিছুতেই খেতে পারছে না। অথচ ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। চোখের সামনে এতো মানুষ থাকলে কী খাওয়া যায়। পূর্ণা ব্যাপারটা ধরতে পেরে লাবণ্যকে বলল। লাবণ্য সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলে। কেউ শুনে না। তাই সে ফরিনা বেগমকে নিয়ে আসে। ফরিনা বেগম সবাইকে বের করে, দরজা ভিজিয়ে দিয়ে যান। ঘরে শুধু রানি,লাবণ্য,পদ্মজা,প্রেমা,পূর্ণা এবং প্রান্ত। পদ্মজা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। পূর্ণা বলে,'আপা আমি তোমাকে খাইয়ে দেই?'

পদ্মজা অবাক হয়ে তাকাল। ঠোঁটে ফুটে মিষ্টি হাসি। পূর্ণা অনুমতির অপেক্ষা না করে এক লোকমা ভাত বাড়িয়ে দিল। পদ্মজার দুই চোখ ছলছল করে উঠে। পূর্ণা কখনো খাইয়ে দেয়নি। এই প্রথম খাওয়াতে চাইছে। পদ্মজা হা করে। লাবণ্য হেসে বলল,'আমার এমন একটা বইন যদি থাকতো।'

'আমি তোর বইন না?' বলল রানি।

লাবণ্য চোখমুখ শক্ত করে বলল,'জীবনে খাইয়ে দিছস? আবার বইন কইতে আইছস যে।'

'তুই খাইয়ে দিছস? পূর্ণা তো ছুটু। তুইও তো ছুটু।'

'আগে পদ্মজা খাওয়াইছে। এরপর পূর্ণা।'

'আইচ্ছা ভাত লইয়া আয়। খাওয়াই দিমু।' রানি বলল।

'এহন পেট ভরা।'

'হ,এহন তো তোর পেট,নাক,মাথা সবই ভরা থাকব।'

দুই বোনের ঝগড়া দেখে পূর্ণা,পদ্মজা হাসে। কী মিষ্টি দুজন। ঝগড়াতেও যেন ভালোবাসা রয়েছে। লাবণ্যের চেয়ে রানি বেশি সুন্দর। তবে,লাবণ্যকে দেখলে বেশি মায়া লাগে। লাবণ্য যে রাগী দেখলেই বোঝা যায়। গতকাল কি রাগটাই না দেখাল! ঘরে ঢুকল আমির। আমিরকে দেখেই পদ্মজা সংকুচিত হয়ে গেল। রানি প্রশ্ন করল,'এইহানে কী দাভাই?'

'পদ্মজাকে নিয়ে যেতে হবে। ওহ খাচ্ছে। আচ্ছা,খাওয়া শেষ হলে নিয়ে যাবো।' বলতে বলতে আমির পদ্মজার সামনে বসল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল,'কই নিয়ে যাবা?'

'আম্মার ঘরে।'

'কেন?'

'আম্মা বলছে নিয়ে যেতে।'

'আম্মা একটু আগেই দেইখা গেল।'

আমির হকচকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল,'ওহ তাই নাকি?'

রানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিরকে পরখ করে নিয়ে বলল,'দাভাই,মিথ্যে বলছো কেন?'

'মি...মিথ্যে আমি? অসম্ভব। আম্মা না দাদু বলছে নিয়ে যেতে। এই তোরা যা তো। তোদের বান্ধবিরা আসছে। যা। হুদাই ঘেনঘেন শুরু করেছিস।'

লাবণ্য কথা বাড়াতে চাচ্ছিল। রানি টেনে নিয়ে যায়। প্রেমা,প্রেমাও বেরিয়ে যায়। তারা বাড়ি থেকে পরিকল্পনা করে এসেছে, একসাথে পুরো হাওলাদার বাড়ি ঘুরে দেখবে। পূর্ণা খাইয়ে দিচ্ছে। পদ্মজা আমিরের উপস্থিতিতে বিব্রত হয়ে উঠেছে। খাবার চিবোতে পারছে না। আমির পদ্মজাকে বলল,'বড় ভাবি বলল,রাতে নাকি ঘুমাওনি।'

'না। হ্যাঁ। আসলে ঘুম আসেনি।'

'ঘুমাবে এখন?'

'না,না। কী বলছেন? বাড়ি ভর্তি মানুষ।' পদ্মজা দ্রুত বলল। আমিরের চোখের দিকে তাকিয়ে। কথা শেষ হতেই চোখ নামিয়ে নিল।

আমির বলল,'আচ্ছা,খাও। আমি আসছি।'

'আপনি কী রাতে দাদুর ঘরে এসেছিলেন?'

আমির চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল। এই কথা শুনে চমকে তাকাল। পদ্মজার দিকে ঝুঁকে জানতে চাইলো,'কেন? কেউ কী এসেছিল তোমার ঘরে?'

আমিরের এমন ছটফটানি দেখে পদ্মজা খুব অবাক হলো। সে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল,'হ্যাঁ, এসেছিল। শেষ রাত্রিরে।'

'আচ্ছা।' বলেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল আমির। পদ্মজা পিছনে ডাকল, শুনল না আমির। হুট করে আমিরের পরিবর্তন পদ্মজাকে ভাবাতে লাগল।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

(ভুলত্রুটি এড়িয়ে যাবেন। তাড়াহুড়োতে লিখেছি।)#আমিপদ্মজা পাট - ৩০

পদ্মজাকে নতুন করে আবার সাজানো হয়েছে। বাসর রাত নিয়েও হাওলাদার বাড়ির হাজারটা রীতি। সেসব পালন হচ্ছে। পদ্মজা নিয়ম-রীতি পূরণ করছে ঠিকই,তবে মন অন্য জায়গায়। বিকেলে সে দেখেছে, আমির রিদওয়ানের পাঞ্জাবির কলার দুই হাতে ধরে কিছু বলছে। খুব রেগে ছিল। তবে কী রিদওয়ানই এসেছিল রাতে?

'ও বউ উডো। এহন ঘরে গিয়া খালি দুইজনে মিললা দুই রাকাত নফল নামায পইড়া লইবা। আনিসা যাও লইয়া যাও। দিয়া আও ঘরে।' বললেন ফরিনা। পদ্মজা কল্পনার জগত থেকে বেরিয়ে বাস্তবে ফিরে আসে। খলিল হাওলাদারের দুই মেয়ে শাহানা,শিরিন এবং আনিসা পদ্মজাকে নিয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠে। আমিরের ঘরে ঢুকতে আর কয়েক কদম বাকি। পদ্মজা ঘোমটার আড়াল থেকে চোখ তুলে তাকায়। দরজা গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো। টকটকে লাল গোলাপ। হাওলাদার বাড়ির গোলাপ বাগান অলন্দপুরে খুবই জনপ্রিয়। পদ্মজার শুভ্র, শীতল অনুভূতি হয়। কত সুন্দর দেখাচ্ছে! ঘরে ঢুকতেই তাজা গোলাপ ফুলের ঘ্রাণে শরীর-মন অবশ হয়ে আসে। শুধু বিছানা নয়,পুরো ঘর লাল গোলাপ দিয়ে সাজানো।

শাহানা পদ্মজাকে বিছানায় বসিয়ে দিল। এরপর বলল,'ডরাইবা না। রাইতটা উপভোগ করবা। এমন রাইত জীবনে একবারই আসে।'

পদ্মজার লজ্জায় মরিমরি অবস্থা! সারা দেহ থেকে যেন গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। আনিসা সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখছে। একসময় বলল,'আমার বাসর রাতটাও হুবুহু এই রকম ছিল। চারিদিকে গোলাপের ঘ্রাণ। ফুলের ঘ্রাণে ভালোবাসা আরো জমে উঠেছিল।'

'এই বাড়ির বউদেরই কপাল। আমরা এই বাড়ির ছেড়ি হইয়াও জামাইর বাড়িতে বাসর রাইতের ঘর কাগজের ফুল দিয়ে সাজানি দেখতে হইছে।' বলল শিরিন। আনিসা কণ্ঠে অহংকার ভাব নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলল,'এসব পেতে যোগ্যতা লাগে। যোগ্যতা ছাড়া ভালো কিছু পাওয়া যায় না। আমি উচ্চশিক্ষিত এবং সুন্দরী ছিলাম। ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য ছিলাম তাই পেয়েছি। আর পদ্মজা যথেষ্ট সুন্দরী, গ্রামে থেকেও পড়ালেখায় খুব ভালো। তাই সেও যোগ্য। তোমাদের না আছে পড়াশোনা না আছে কোনো ভাল গুণ। গায়ের রঙও ময়লা। কাগজের ফুলই তোমাদের জন্য ঠিক ছিল।'

আনিসার কথাগুলো শুনতে পদ্মজার খুব খারাপ লাগে। কোনো মানুষকে এভাবে বলা ঠিক না। শিরিন হইহই করে উঠল,'এই রূপ বেশিদিন থাকব না ভাবি। এতো দেমাগ ভালা না। বিয়ার এতদিন হইছে একটাও বাচ্চা দিতে পারছো? পারো নাই। তাইলে এই গরিমা (অহংকার) দিয়া কী হইবো? সন্তান ছাড়া নারীর শোভা নাই।'

আনিসা রেগেমেগে ফুঁসে উঠে। গলা উঁচু করে বলে,'সমস্যা আমার নাকি তোমাদের পেয়ারের ভাইয়ের সেটা খোঁজ নাও আগে। আমি এখুনি জাফরকে সব বলছি। এতদিন পর বাড়িতে এসেছি এসব নোংরা কথা সহ্য করতে? অপমান সহ্য করতে? কালই চলে যাব আমি।'

আনিসা রাগে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা হতবাক।শাহানা শিরিনকে ধাক্কা দিয়ে বলল,'এত কিছু কেন কইতে গেলি? জানস না,এই ছেড়ি কেমন? আমি হের বড় হইয়াও হেরে কিছু কই না। এহন আরেক ভেজাল হইবো।'

'যা হওয়ার হইয়া যাক। আমরারে কেমনে পায়ে ঠেলতাছিল দেহো নাই? এইডা তো আমরার বাপের বাড়ি। এতো কথা কেন হুনতে হইবো?' শিরিনের কণ্ঠ কঠিন। সে আজ এর শেষ দেখেই ছাড়বে।

'নতুন বউডার সামনে এমনডা না করলেও হইতো। ও পদ্ম তুমি বেজার হইয়ো না। এরা সবসময় এমনেই লাইগা থাহে।'

পদ্মজা হাসার চেষ্টা করে। শাহানা দরজার বাইরে থাকিয়ে দেখে আমির আসছে নাকি। রাত তো কম হলো না। শাহানা আরো অনেকক্ষণ সময় নিয়ে পদ্মজাকে বুঝালো। কী কী করতে হবে, কীভাবে স্বামীকে আঁচলে বেঁধে রাখতে হয়। পদ্মজা সব মনোযোগ সহকারে শুনে।

আমির ঘরে ঢুকতেই শাহানা,শিরিন বেরিয়ে গেল। আমির দরজা লাগিয়ে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়ায়। পদ্মজা পালঙ্ক থেকে নেমে আমিরের পা ছুঁয়ে সালাম করে। আমির দুই হাতে পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড় করায়। অনুভব করে পদ্মজা কাঁপছে। প্রচন্ড শীতে মানুষ যেভাবে কাঁপে,ঠিক তেমন। আমির দ্রুত ছেড়ে দেয়। বলে,'পানি খাবে?'

পদ্মজা মাথা নাড়িয়ে জানায়, সে পানি খাবে। আমির এক গ্লাস পানি এগিয়ে দেয়। পদ্মজা এক নিঃশ্বাসে ঢকঢক করে পানি শেষ করে। সারা শরীর কাঁপছে। শাহানা,শিরিন বের হতেই বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়। ঘরে চারটা হারিকেন জ্বালানো। যেদিকে চোখ যায় সেখানেই গোলাপ ফুল। ফুলের ঘ্রাণে চারিদিক মৌ মৌ করছে। এমন পরিবেশে বিয়ের প্রথম রাতে পর পুরুষকে স্বামী রূপে দেখা কোনো সহজ অনুভূতি নয়। আমির গ্লাস নিতে এগিয়ে আসলে পদ্মজা আঁতকে উঠে,এক কদম পিছিয়ে যায়। আমির একটু শব্দ করেই হাসে। পদ্মজা ভীতু ভীতু চোখে তাকায়। আমির বলে,'হাতে গ্লাস নিয়ে সারারাত কাটাবে নাকি? দাও আমার কাছে।'

আমির গ্লাস টেবিলের উপর রেখে আসে। পদ্মজা পালঙ্কের এক কোণে চুপটি করে বসে আছে। তার ডান পা অনবরত কাঁপছে। মনে মনে দোয়া করছে, মাটি যেন ফাঁক হয়ে যায়। আর সে তার ভেতর ঝাঁপ দিয়ে পাতালে

হারিয়ে যেতে চায়। নয়তো লজ্জা,আড়ষ্টতায় প্রাণ এখুনি গেল বুঝি! আমির দূরত্ব রেখে পদ্মজার সোজাসুজি বসে। পদ্মজার এক পা যে কাঁপছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার দৃষ্টি অস্থির। এদিকওদিক তাকাচ্ছে। আমির মজা করে জানতে চাইল,'পালানোর পথ খুঁজছো নাকি?'

'না..না তো।' বলল পদ্মজা।

'তাহলে কী খুঁজছো?'

পদ্মজা নিরুত্তর রইল। আমির পদ্মজার আরো কাছে এসে বসে। এক হাতে পদ্মজার এক হাত ছুঁতেই পদ্মজা,' ও মাগো!' বলে চিৎকার করে উঠে। আমির পদ্মজার আকস্মিক চিৎকারে থতমত হয়ে গেল। পদ্মজা ভয়ে ঢোক গিলে। সময়টা যেন যাচ্ছেই না। সে যদি পারতো পালিয়ে যেতো। ভয়ংকর অনুভূতিদের খেলা চারিদিকে! আমির হা করে পদ্মজার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। এরপর দূরে গিয়ে বসে,পদ্মজাকে বলল,'আমার সাথে সহজ হওয়ার চেষ্টা করো। আমার দিকে ফিরে বসো। গল্প করি।'

পদ্মজা আমিরের দিকে ফিরে বসে। তবে দৃষ্টি বিছানার চাদরে নিবদ্ধ। আমির প্রশ্ন করে,'আমার সম্পর্কে কতটুকু জানো?'

'খুব কম।' মিনমিনিয়ে বলল পদ্মজা।

'আমি তোমার চেয়ে বারো বছরের বড়। জানো?'

'এখন জানলাম। তবে আপনার আচরণ ছোটদের মতো।' পদ্মজা মৃদু হেসে আমিরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল। আমির বলল,' আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আরো আছে।'

'বুঝতে পেরেছি। আপনার কথাবার্তা এখন বড়দের মতো মনে হচ্ছে।'

'ঢাকা আমার ব্যবসা আছে।'

'শুনেছি।'

'আমার সাথে তোমাকেও ঢাকা যেতে হবে।'

'আচ্ছা।'

'এই বাড়ির চেয়েও বিশাল বড় বাড়িতে আমি একা থাকি। যতক্ষণ বাইরে থাকব তোমাকে একা থাকতে হবে। ভয় পাওয়া যাবে না।'

'আমি ভয় পাই না।'

'আমাকে তো ভয় পাচ্ছো।' আমির হেসে বলল। পদ্মজা নিরুত্তর।

'কথা বলো।'

'কী বলব?'

'আচ্ছা, আসো একটা মজার খেলা খেলি।'

পদ্মজা উৎসুক হয়ে তাকাল। আমির বলল,'দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকব। যার চোখের পলক আগে পড়বে সে হেরে যাবে।'

পদ্মজা খেলতে রাজি হয়। এই খেলাটা সে পূর্ণার সাথেও খেলেছে। পদ্মজা অনেকক্ষণ এক ধ্যাণে তাকিয়ে থাকতে পারে। তাই তার আত্মবিশ্বাস আছে, সেই জিতবে। বরাবরই জিতে এসেছে। আমির এক,দুই, তিন বলে খেলা শুরু করে। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকে একধ্যাণে। পদ্মজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমিরকে পরখ করে। আমিরের চুল খাড়া করে উল্টা দিকে ফিরানো। থুতুনির নিচে কাটা দাগ। গালে হালকা দাঁড়ি। শ্যামলা গায়ের রঙ। ঘন ভ্রু,চোখের পাঁপড়ি। পরেছে সাদা পাঞ্জাবি। এতো বেশি ভালো লাগছে দেখতে। আমির পদ্মজার রূপে আগে থেকেই দিওয়ানা। তার উপর এতক্ষণ তাকিয়ে থেকে অনুভূতির দফারফা অবস্থা। সে মুগ্ধ হওয়া কণ্ঠে বলল,'পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নারী আমার বউ। কী ভাগ্য আমার!'

'আপনিও সুন্দর।' কথাটা মুখ ফসকে বলে উঠল পদ্মজা। যখন বুঝতে পারল লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল। আমির খুশিতে বাকবাকুম হয়ে বলল,'তোমার পলক পড়েছে। আমি জিতে গেছি।'

পদ্মজা লজ্জায় নখ খুঁটতে থাকে। আমির নিজের চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,'আমি জানি আমি কতোটা সুন্দর! রঙটা একটু কালো হতে পারে। তবে আমি সুন্দর। তোমার মুখে শোনার পর থেকে ধরে নিলাম,পৃথিবীর সেরা সুন্দর পুরুষের নাম আমির হাওলাদার।'

পদ্মজার দুই ঠোঁট নিজেদের শক্তিতে আলগা হয়ে গেল। সে আমিরের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, মানুষ নিজের প্রশংসা নিজে কীভাবে করতে পারে। আমিরের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে সত্যিই পৃথিবীর সেরা সুন্দর পুরুষ। পদ্মজা ফিক করে হেসে দিল। আমির তাকাল। বলল,'হাসছো কেন?'

পদ্মজা হাসি চেপে বলল,'কই না তো। আপনার আম্মা বলেছিলেন, দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতে।'

'আমার আম্মা তোমার আম্মা না?'

'হুম।'

'এখন থেকে আপনার আম্মা না শুধু আম্মা বলবে। গয়নাগাটি নিয়েই নামায পড়বে? অস্বস্তি হবে না? খুলো এবার।'

পদ্মজা অবাক হয়ে জানতে চাইল,'শিরিন আপা বললেন, গয়নাগাটি নাকি স্বামি খুলে দেয়। তাহলে?'

আমির তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে বলল,'তাই নাকি? দাও খুলে দেই।'

পদ্মজা দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল। আমতাআমতা করে বলল,'এ..এটা বোধহয় নিয়ম না। তাই আপনি জানতেন না। আমি...আমি পারব।'

দুই রাকাত নফল নামাযের সাথে তাহাজ্জুদের নামাযটাও পড়েছে দুজন। আমির তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ম জানে না। পদ্মজা হাতে কলমে শিখিয়েছে। আমিরও মন দিয়ে শিখেছে এবং নামায পড়েছে। এরপর পদ্মজা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার সামনে বিশাল বড় জঙ্গল। সে আমিরকে প্রশ্ন করল,'এই জঙ্গলে নাকি কী আছে?'

আমির পদ্মজার প্রশ্ন শুনেনি। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পদ্মজার দিকে। গায়ে কোনো অলংকার নেই। খোলা চুল কোমর অবধি এসে থেমেছে। মধ্য রাতের বাতাসে তার চুল মৃদু দুলছে। আমির অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয়। পদ্মজার কোমর পিছন থেকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে,পদ্মজার কেঁপে উঠে বড় করে নিঃশ্বাস নেয়া অনুভব করে গভীরভাবে। পদ্মজার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। পায়ের তলার মাটি শিরশির করে উঠে। তবে,অদ্ভুত বিষয় শুরুর মতো আমিরের স্পর্শ অস্বস্তি দিচ্ছে না তাকে। বরং ধারালো কোনো অজানা অনুভূতিতে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমির পদ্মজার ঘাড়ে থুতুনি রেখে বলল,'প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিনই মনে মনে পণ করি তোমাকেই বিয়ে করব। তবে ভাবিনি প্রথম দিনই আমার কারণে এতোটা অপদস্থ হতে হবে তোমাকে। অনেক চেষ্টা করেছি সব আটকানোর, পারিনি। সেদিনই বাড়ি ফিরে আব্বাকে বলি,আমি বিয়ে করতে চাই পদ্মজাকে। প্রথম প্রথম কেউ রাজি হচ্ছিল না। পরে রাজি হয়ে যায়। মনে হচ্ছে,চোখের পলকে তোমাকে পেয়ে গেছি।'

পদ্মজা নিশ্চুপ। সে অবাধ্য, অজানা অনুভূতিদের সাথে যুদ্ধ করবে নাকি সখ্যতা করবে ভাবছে। আমির পদ্মজাকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে ফেরায়। পদ্মজা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। আমির বলল,'তোমায় আমি পদ্ম ফুল দিয়ে একদিন সাজাব। নিজের হাতে সাজাব।'

'কথা বলো। আল্লাহ,আবার কাঁপছো! আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো, স্থির হতে পারবে। এই কী হলো?'

পদ্মজা শরীরের ভার ছেড়ে দিয়েছে আমিরের উপর। আমির দুই হাতে শক্ত করে ধরে রাখে। সেদিন রাতে জান্নাতের সুবাস এসেছিল ঘরে। পদ্মজা নিজের অস্তিত্বের পুরো অংশ জুড়ে স্বামীরূপে একজন পুরুষকে অনুভব করে। ভালোবাসাটা শুরু হয় সেখান থেকেই। মন মাতানো ছন্দ এবং সুর দিয়ে শুরু হয় জীবনের প্রথম প্রেম,প্রথম ভালবাসা।

#পদ্মজা

চলবে...#আমিপদ্মজা পাট - ৩১

সকাল থেকে বাতাস বইছে। কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে এমন আমেজ সেই বাতাসে। একটু শীতেল চারপাশ। গরু গাড়ি চড়ে পদ্মজা যাচ্ছে বাপের বাড়ি। পাশে আছে আমির এবং লাবণ্য। পদ্মজার পরনে সবুজ

শাড়ি। ভারী সুতার কাজ। গা ভর্তি গহনা। এসব পরে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু ফরিনা বেগমের কড়া নিষেধ, কিছুতেই গহনা খোলা যাবে না। আমির পদ্মজার এক হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। ছেড়ে দিলেই যেন হারিয়ে যাবে। আমিরের এহেন পাগলামি পদ্মজাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে। সে চাপা স্বরে বলল, 'কোথাও চলে যাচ্ছি না,আস্তে ধরুন।'

আমির চটপট করে নরম স্পর্শে পদ্মজার হাত ধরল। পদ্মজা বলল, 'মনে আছে তো কি বলেছিলাম?'

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে পদ্মজা হায় হায় করে উঠল, 'ওমনি ভুলে গেছেন?'

আমির শূন্যে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করল। সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখল, পদ্মজা নতুন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমির মিষ্টি করে হেসে ডাকল, 'এদিকে আসো।'

পদ্মজা ছোট ছোট করে পা ফেলে আমিরের পাশে দাঁড়ায়। আমির খপ করে পদ্মজার হাত ধরে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'কখন উঠেছো?'

'যেভাবে টান দিলেন। ভয় পেয়েছি তো।'

'এতো ভীতু?'

'কখনোই না।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'উঠুন। আম্মা আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কেন? জরুরি দরকার নাকি?'

'আমি জানি না। উঠুন আপনি।'

'এই তুমি তো কম লজ্জা পাচ্ছো ।'

পদ্মজার মুখ লাল হয়ে উঠে। সে বিছানা থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। মাথা নত করে বলল, ' আপনি লজ্জা দিতে খুব ভালোবাসেন।'

আমির হাসতে হাসতে বিছানা থেকে নামল। বলল, ' তোমার চেয়ে কম ভালোবাসি। আচ্ছা, তুমি কবে ভালোবাসবে বলো তো?'

পদ্মজা পূর্ণ-দৃষ্টিতে আমিরকে দেখল। আমির আবার হাসল। তারপর পদ্মজার দিকে এগিয়ে এসে বলল, ' যেদিন মনে হবে তুমিও আমাকে ভালোবাসো,বলবে কিন্তু। সেদিনটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হবে।'

পদ্মজা তখনও এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমির হাত নাড়িয়ে পদ্মজার পলক অস্থির করে বলল, ' কী ভাবছো?'

'কিছু না।'

'কিছু বলবে?'

'আজ ওই বাড়ি যাব আমরা।'

'এটাই তো নিয়ম।'

'আপনি একটু বেশরম।'

আমির চকিতে তাকাল। পদ্মজা ঠোঁট টিপে হেসে চোখ সরিয়ে নিল। আমির আমতাআমতা করে বলল, 'তা..তাতে কী হয়েছে?'

'কিছু না।'

'কি বলতে চাও, বলো তো।'

'বড়দের সামনে আমাকে নিয়ে এতো কথা বলবেন না। মানুষ কানাকানি করে। আপনাকে বেলাজা,বেশরম বলে।'

'আমার বউ নিয়ে আমি কী করব, আমার ব্যাপার।'

'কিন্তু আমাকে অস্বস্তি দেয়।' পদ্মজা করুণ স্বরে বলল।

আমির নিভল, ' আচ্ছা,ঠিক আছে। নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করব।'

'সত্যি? আমার আম্মার সামনে ভুলেও পদ্মজা, পদ্মজা করবেন না।'

'ইশারা দিতেই চলে আসবে। তাহলে ডাকাডাকি করব না।'

পদ্মজা হাসল। আমির ইষৎ হতচকিত। বলল, 'হাসছো কেন?'

'এমনি। মনে রাখবেন কিন্তু।'

'তুমিও মনে রাখবে।'

সকালের দৃশ্য থেকে বেরিয়ে আসে আমির। পদ্মজাকে বলল, 'মনে আছে। তোমার অস্বস্তি হয় এমন কিছুই করব না।'

আমিরের কথায় পদ্মজা সন্তুষ্ট হয়। নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে। উত্তেজনায় কাঁপছেও। মা-বাবাকে দেখবে দুই দিন পর। দুই দিনে কী কিছু পাল্টেছে? পদ্মজা মনে মনে ভাবছে, 'আম্মা বোধহর শুকিয়েছে। আমাকে ছাড়া আম্মা নিশ্চয় ভালো নেই।'

পদ্মজার খারাপ লাগা কাজ করতে থাকে। ছটফটানি মুহূর্তে বেড়ে গেল। আমির জানতে চাইল, 'পদ্মজা, শরীর খারাপ করছে?'

'না।'

'অস্বাভাবিক লাগছে।'

'আম্মাকে অনেকদিন পর দেখব।'

'অনেকদিন কোথায়? দুই দিন মাত্র।'

'অনেকদিন মনে হচ্ছে।'

'এইতো চলে এসেছি। ওইযে দেখো, তোমাদের বাড়ির পথ।'

আমির আঙ্গুলে ইশারা করে। আমিরের ইশারা অনুসরণ করে পদ্মজা সেদিকে তাকাল। ওই তো তাদের বাড়ির সামনের পুকুর দেখা যাচ্ছে। আর কিছু সময়,এরপরই সে তার মাকে দেখবে। পদ্মজা অনুভব করে তার নিঃশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। সে আমিরের এক হাত শক্ত করে ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

হেমলতা নদীর ঘাটে মোর্শেদের সাথে কথা বলছেন। তিনি মোর্শেদকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন। মোর্শেদ কিছু জিনিষ ভুলক্রমে আনেননি। তা নিয়েই আলোচনা চলছে। ঠিক আলোচনা নয়। হেমলতা বকছেন,মোর্শেদ নৌকায় বসে শুনছেন। তিনি কথা বলার সুযোগই পাচ্ছেন না। হেমলতা নিঃশ্বাস নিতে চুপ করেন। তখনি মোর্শেদ বললেন,'অহনি যাইতাছি। সব লইয়া হেরপর আইয়াম।'

'এখন গিয়ে হবেটা কী বলো তো? হঠাৎ ওরা চলে আসবে।'

'আমি যাইয়াম আর আইয়াম।' বলতে বলতে মোর্শেদ নৌকা ভাসিয়ে দূরে চলে যান। হেমলতা ক্লান্তি ভরা দৃষ্টি নিয়ে স্বচ্ছ জলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পূর্ণার চিৎকার ভেসে আসে কানে। তিনি চমকে ঘুরে তাকান। পূর্ণা, আপা আপা বলে চেঁচাচ্ছে বাড়িতে। হেমলতা বিড়বিড় করেন, 'এসে গেছে আমার পদ্ম।'

তিনি ব্যস্ত পায়ে হেঁটে বাড়ির উঠোনে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটা হামলে পড়ে বুকের উপর। আম্মা,আম্মা বলে জান ছেড়ে দেয়। হেমলতার এতো বেশি আনন্দ হচ্ছে যে, হাত দুটো তোলার শক্তি পাচ্ছেন না। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি দুই হাতে শক্ত করে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরেন। শূন্য বুকটা চোখের পলকে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। পদ্মজা নিশ্চয় বুঝে যাবে, দুই রাত তার আম্মা ঘুমায়নি। চোখদ্বয় নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারেনি। বুঝতেই হবে পদ্মজাকে। পদ্মজা ঘন ঘন লম্বা করে নিঃশ্বাস টানছে। স্পষ্ট একটা ঘ্রাণ পাচ্ছে সে। মায়ের শরীরের ঘ্রাণ। পারলে যেন পুরো মাকেই এক নিঃশ্বাসে নিজের মধ্যে নিয়ে যেত সে।

হেমলতা পদ্মজার মাথায় আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে বললেন, 'আর কাঁদিস না। এই তো,আম্মা আছি তো।'

'তোমাকে খুব মনে পড়েছে আম্মা।'

'আমারও মনে পড়েছে।' হেমলতার চোখের জল ঠোঁট গড়িয়ে গলা অবধি পৌঁছেছে। তিনি অশ্রুমিশ্রিত ঠোঁটে পদ্মজার কপালে চুমু দেন। আমির হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করতে নেয়। হেমলতা ধরে ফেলেন। আমিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'লাগবে না বাবা।'

আমির বিনীত কণ্ঠে বলল, ' ভালো আছেন আম্মা?'

'ভালো আছি। তুমি ভালো আছো তো? আমার মেয়েটা কান্নাকাটি করে জ্বালিয়েছে খুব?'

'ভালো আছি আম্মা। একটু-আধটু তো জ্বালিয়েছেই।' কথা শেষ করে আমির আড়চোখে পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজা ফোঁপাচ্ছে। হেমলতা অনেকক্ষণ চেষ্টা করে পদ্মজাকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। বাড়িতে মনজুরা,হানি সহ হানির শ্বশুরবাড়ির অনেকেই ছিল। তারা আগামীকাল ঢাকা ফিরবে। জামাই স্বাগতমের বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। পূর্ণা পদ্মজা, লাবণ্যকে টেনে নিয়ে যায় ঘরে। হানির স্বামী আমিরকে নিয়ে গল্পের আসর জমান।আমির আসার সময় গরু গাড়ি ভরে বাজার করে নিয়ে এসেছে। হেমলতা সেসব গুছাচ্ছেন। তিনি বার বার করে মজিদ মাতব্বরকে বলে দিয়েছিলেন, ফের যাত্রায় বাজার না পাঠাতে। তবুও পাঠিয়েছেন। ফেলে তো দেওয়া যায় না।

রাতের খাবার শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। পূর্ণাকে আমির ছোট আপা ডাকে। শালির চোখে একদমই দেখছে না। তেমন রসিকতাও করছে না। আমিরের ব্যবহারে পূর্ণা ধীরে ধীরে আমিরকে বোন জামাই হিসেবে পছন্দ করছে। না হোক নায়কের মতো সুন্দর। মন তো ভালো। হানির বড় ছেলে,লাবণ্য,আমির আর পূর্ণা লুডু খেলছে। পদ্মজা কিছুক্ষণ খেলে উঠে চলে এসেছে। হেমলতা,মোর্শেদ বারান্দার বেঞ্চিতে বসে ছিলেন। পদ্মজা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। মোর্শেদ দেখতে পেয়ে ডাকলেন, ' কী রে মা? আয়।'

পদ্মজাকে দুজনের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, ' হউরবাড়ির মানুষেরা ভালা তো?'

পদ্মজা নতজানু হয়ে জবাব দিল, 'সবাই ভালো।'

'একটু আধটু সমস্যা থাকবেই,মানিয়ে নিস। জয় করে নিস। সব কিছুই অর্জন করে নিতে হয়।' বললেন হেমলতা। পদ্মজা হেমলতার দিকে তাকিতে মৃদু করে হাসলো। হেমলতা আবার বলেন, 'তোর শ্বাশুড়ি একটু কঠিন তাই না? চিন্তা করিস না। যা বলে করবি। পছন্দ-অপছন্দ জানবি। সেই মতো কাজ করবি। দেখবি, ঠিক মাথায় তুলে রেখেছে।'

'আচ্ছা, আম্মা।' বলল পদ্মজা।

'সব শ্বাশুড়ি ভালো হয় না লতা। আমার শ্বাশুড়িরে আজীবন তেল দিলাম। কোনো পরিবর্তন হয়েছে? হয়নি।' বললেন হানি। তিনি ঘর থেকে সব শুনছিলেন। কথা না বলে পারলেন না।

হেমলতা এক হাতে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর হানির উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার পদ্মর কপাল এতো খারাপ নিশ্চয় হবে না।'

'পদ্মর অবস্থা আমার মতো হয়েছে যদি শুনি,পদ্মকে তুলে নিয়ে যাব আমার কাছে। তুই মিলিয়ে নিস।'

'আহ! থামো তো আপা। আমির, লাবণ্য শুনবে। কী ভাববে?'

হানি আর কিছু বললেন না। চারজন মানুষ নিশ্চুপ বসে রইল অনেকক্ষণ। একসময় হেমলতা রান্নাঘরের দিকে যান। রান্নাঘর গুছানো হয়নি। মোর্শেদ নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান। সারাদিন অনেক ধকল গেছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। হানি পদ্মজার পাশে বসেন। বললেন, 'শোন মা, শ্বাশুড়িরে বেশি তেল দিতে গিয়ে নিজের জীবন নষ্ট করবি না। তোর মায়ের অনেক জ্ঞান,অভিজ্ঞতা মানি। কিন্তু লতার শ্বাশুড়ি নিয়ে সংসার করতে হয়নি। তাই সে জানে না। আমি জানি শ্বাশুড়িরা কেমন কালসাপ হয়। এরা সেবা নিবে দিনরাত। বেলাশেষে ভুলে যাবে। নিজের কথা আগে ভাববি। শ্বাশুড়ি ভুল বললে জবাব দিবি সাথে সাথে। নিজের জায়গাটা বুঝে নিবি। পড়াশোনা থামাবি না। পড়বি আর আরামে থাকবি। আমরা বান্দি পাঠাইনি। সাক্ষাৎ পরী পাঠাইছি। শুনছি, আমিরের টাকাপয়সা, জমিজমা অনেক আছে। তাহলে তোর আর চিন্তা কীসের? জামাই হাতে রাখবি। তাহলে পুরো সংসার তোর হাতে। আমার কপালে এসব ঠেকেনি। বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির মানুষের মন রাখতে রাখতে কখন বুড়ি হয়ে গেছি বুঝিনি। বুঝছিস তো?'

পদ্মজা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল, ' মেজো আপা আসে নাই কেন? বিয়ে কবে আপার?'

'ওর তো পরীক্ষা সামনে। পড়াশোনা শেষ করুক। এরপর বিয়ে দেব।'

'বিয়ে না ঠিক হওয়ার কথা ছিল। হয়নি?'

'কবে?' বললেন হানি। পদ্মজা হানির প্রশ্নে খুব বেশি অবাক হলো। কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, ' আম্মা না কয়দিন আগে তোমাদের বাড়ি গেল। বড় আপার বিয়ে ঠিক করতে।'

হানি হা হয়ে তাকিয়ে রইলেন পদ্মজার দিকে। তিনি কিছুই বুঝছেন না। তার মেয়ের বিয়ে আবার কবে ঠিক হওয়ার কথা ছিল? পদ্মজা বিয়ে করে কী আবোলতাবোল বকছে! তিনি বললেন, 'কী বলিস?'

হানির সহজ সরল মুখখানার দিকে পদ্মজা একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে ভাবছে, 'আম্মা রাজধানীতে তাহলে কেন গিয়েছিল? মিথ্যে কেন বলেছে? সেদিন রাজধানীতে গিয়েছিল বলেই, এতো বড় অঘটন ঘটেছিল। না! অঘটন ভাগ্যেই লেখা ছিল। কিন্তু মিথ্যে কেন বলল আম্মা?'

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ৩২

মাদিনী নদীর বুকে কুন্দ ফুলের মতো জোনাকি ফুটে রয়েছে। পদ্মজা তা এক মনে চেয়ে দেখছে। রাত অনেকটা। আমির ঘুমাচ্ছে। তিন দিনে আমিরের সাথে পূর্ণা-প্রেমার খুব ভাব হয়েছে। সারাক্ষণ আড্ডা,লুডু খেলা। পদ্মজা যত দেখছে তত আমিরের প্রেমে পড়ছে। আমিরের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পদ্মজার মনে পড়ল, আগামীকাল ফিরে যেতে হবে শ্বশুরবাড়ি। মা-বাবা,ভাই-বোন সবাইকে ছেড়ে আবার চলে যেতে হবে। ভাবতেই মন খারাপ হয়ে আসে। মন ভালো করতে চলে আসে নদীর ঘাটে। জোনাকিদের কুরুক্ষেত্র দেখতে দেখতে কেটে যায় অনেকক্ষণ। আঁধার ভেদ করে একটা আলোর ছোঁয়া লাগে চারপাশে। এসময় কে এলো? পদ্মজা ঘাড় ঘুরে তাকাল। মাকে দেখে একগাল হাসল। হেমলতা হারিকেন হাতে নিয়ে এগিয়ে আসেন। কিঞ্চিৎ রাগ নিয়ে বললেন, 'এতো রাতে একা ঘাটে এসেছিস কেন? মার খাসনি অনেকদিন। বিয়ে হয়েছে বলে আমি মারব না নাকি?'

হেমলতার ধমকে পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে থতমত হয়ে দাঁড়াল। মা শেষ কবে মেরেছেন পদ্মজা মনে করতে পারছে না। তিনি যেভাবে বললেন মনে হলো, না জানি কত মেরেছেন। তাই সে ও ভয় পাওয়ার ভান ধরল।

'যাচ্ছি ঘরে।' পদ্মজার গলা।

'কী জন্য এসেছিলি? ঘুম আসছে না?' হেমলতার কণ্ঠটা নরম শুনাল।

'কাল চলে যেতে হবে,তাই মন খারাপ হচ্ছিল।'

হেমলতা হারিকেন মাটিতে রাখেন। তারপর দুহাতে পদ্মজাকে বুকে টেনে নেন। পদ্মজার কান্নারা বাঁধন ছেঁড়া হলো। মায়ের বুকে মুখ চেপে পিঠটা বারংবার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ এভাবেই পার হলো।

'এতো সহজে কাঁদিস কেন? মা-বাবার কাছে সারাজীবন মেয়েরা থাকে না মা।'

'তুমি সাথে চলো।'

'পাগল মেয়ে! বলে কী! কান্না থেমেছে?'

পদ্মজা দুহাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, 'হু।'

'আমির তো ঘুমে। তুইও ঘুমিয়ে পর গিয়ে।'

পদ্মজা মাথা নাড়াল। দুই কদম এগিয়ে আবার চটজলদি পিছিয়ে আসে। মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি ঘুমাবে না আম্মা?'

'ঘুমাব, চল।'

'আম্মা?'

হেমলতা হারিকেন হাতে নিয়ে পদ্মজার চোখের দিকে তাকালেন। পদ্মজা বলল, ' তোমার জীবনের সবটা আমাকে বলেছো। কিছু আড়ালে থাকলে সেটাও বলো আম্মা।'

'কেন মনে হলো, আরো কিছু আছে?' হেমলতার কণ্ঠটা অন্যরকম শুনাল।

'মনে হয়নি। এমনি বলে রাখলাম।'

পদ্মজা নতজানু হয়ে নিজের নখ খুঁটাচ্ছে। হেমলতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেটে যায় অনেকটা সময়। তিনি ঢোক গিলে গলা ভেজান। তারপর বললেন, 'তাই হবে।'

পদ্মজা খুশিতে তাকাল। নিশ্চয় এখন সব বলবেন আম্মা। হানি খালামনির বাড়ির কথা বলে সেদিন কোথায় গিয়েছিলেন? এখনই জানা যাবে। হেমলতা আশায় পানি ঢেলে দিলেন,'এখন ঘুমাতে যা। অনেক রাত হয়েছে।'

পদ্মজার চোখমুখের উজ্জ্বলতা নিভে গেল। মা কাঙ্ক্ষিত প্রসঙ্গটি কেন এড়িয়ে যাচ্ছেন? পদ্মজা সরাসরি জিজ্ঞাসা করার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারছে না। জড়তা ঘিরে রেখেছে তাকে। মা সবসময় নিজ থেকে সব বলেন। নিশ্চয় কোনো কারণে এই বিষয়ে চুপ আছেন। পদ্মজা মনে মনে নিজেকে স্বান্তনা দিল, 'একদিন আম্মা বলবে। অবশ্যই বলবে।'

কালো মেঘে ঢাকা আকাশ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। লাহাড়ি ঘরের বারান্দায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন হেমলতা। সন্ধ্যার আযান পড়বে। চারপাশে এক মায়াবী ঘনছায়া। মন বিষাদময়। পদ্মজা দুপুরে মোড়ল বাড়ি ছেড়েছে। বিদায় মুহূর্তটা একটুও স্বস্তির ছিল না। মেয়েটা এতো কাঁদতে পারে! তবে হেমলতার চোখ শুকনো ছিল। মায়ের চোখ শুকনো দেখে কি পদ্মজা কষ্ট পেয়েছিল? কে জানে! হেমলতা বারান্দা ছেড়ে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন শক্তির অবস্থান শূন্যে। তিনি আবার বসে পড়েন। হেসে ফেললেন। পদ্মজা ছাড়া এতো দূর্বল তিনি! এটা ভাবতে অবশ্য ভালো লাগে। হেমলতা আকাশের দিকে তাকান। চোখ দুটি জ্বলছে। জলভরা চোখ নিয়ে আবার হাসলেন। কী যন্ত্রণাময় সেই হাসি! মাটিতে হাতের ভর ফেলে উঠে দাঁড়ান তিনি। এলোমেলো পায়ে লাহাড়ি ঘর ছাড়েন। উঠোনে এসে থমকে দাঁড়ান। বাড়ির গেইট খোলা ছিল।পাতলা অন্ধকার ভেদ করে একটি নারী অবয়ব এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। হেমলতা নারী ছায়াটির স্পষ্ট মুখ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকেন। গেইটের কাছাকাছি আসতেই হেমলতা আন্দাজ করতে পারেন কে এই নারী! তিনি মৃদু হেসে এগিয়ে যান।

'অনেক দেরি করলেন আসতে।'

বাসন্তী উঠোনে পা রেখে বললেন, ' আপনি আমাকে চিনেন?'

হেমলতা জবাব না দিয়ে বাসন্তীর ব্যাগ নিতে হাত বাড়ালেন। বাসন্তী ব্যাগ আড়াল করে ফেললেন। তিনি খুব অবাক হচ্ছেন। মনে যত সাহস নিয়ে এসেছিলেন সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। হেমলতা বললেন, 'আপনি এই বাড়িতে নির্দ্বিধায় থাকতে পারেন। আমি বা আমার সন্তানদের পক্ষ থেকে আপত্তি নেই।'

'আ...আপনি আমাকে চিনলেন কীভাবে?'

'সে যেভাবেই চিনি। জেনে কী লাভ আছে? আপনি প্রথম দিনই একা আসতে পারতেন। লোকজন না নিয়ে।'

বাসন্তীর এবার ভয় করছে। শরীর দিয়ে ঘাম ছুটছে। একটা মানুষ সতিন দেখে এতো স্বাভাবিক কী করে হতে পারে? তিনি তো ভেবেছিলেন যুদ্ধ করে স্বামীর বাড়িতে বাঁচতে হবে। বাসন্তীর ধবধবে সাদা চামড়া লাল বর্ণ ধারণ করে। হেমলতার কথা,দৃষ্টি এতো ধারালো মনে হচ্ছে তার! হেমলতা বাসন্তীকে চুপ দেখে বললেন, 'আপনি বিব্রত হবেন না। এটা আপনারও সংসার। আসুন।'

হেমলতা আগে আগে এগিয়ে যান। বারান্দা অবধি এসে পিছনে ফিরে দেখেন, বাসন্তী ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। হেমলতা কথা বলার জন্য প্রস্তুত হোন,তখনই একটা পুরুষালি হুংকার ভেসে এলো, 'তুমি এইহানে আইছো কেন?'

মোর্শেদের কণ্ঠ শুনে বাসন্তী কেঁপে উঠলেন। মোর্শেদকে এড়িয়ে একজন বনেদি লোকের প্রতি ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এরপর থেকেই মোর্শেদ এবং তার সম্পর্কে ফাটল ধরে। মোর্শেদ ত্যাগ করে তাকে। কিন্তু তিনি এক সময় বুঝতে পারেন, কোনটা ভুল কোনটা সঠিক। সংসারের প্রতি টান অনুভব করে,ফিরে আসতে চান। মোর্শেদ জায়গা দিলেন না। ততদিনে মোর্শেদ দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা উপলব্ধি করে ফেলন। মোহ ছেড়ে ফিরে আসেন হেমলতার কাছে। নিজের সন্তানদের কাছে।

'বাইর হইয়া যাও কইতাছি। বাইর হও আমার বাড়ি থাইকা।'

মোর্শেদ বাসন্তীকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলেন। বাসন্তী হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন। চোখ গরম করে মোর্শেদের দিকে তাকান। বললেন, 'এইটা আমারও ছংছার। আমি যাব না।'

'বাসন্তী ভালাই ভালাই কইতাছি,যাও এন থাইকা। নইলে তোমার লাশ ফালায়া দিয়াম আমি।'

বাসন্তী কিছু কঠিন কথা শোনাতে গিয়েও শুনালেন না। হেমলতা উঠোনে নেমে আসেন, 'যখন বিয়ে করেছো তখন হুঁশ ছিল না। এখন সংসার দিতে আপত্তি?'

'তুমি জানো না লতা,এই মহিলা কত্তডা খারাপ। এই মহিলা লোভী। লোভখোরের বাচ্চা। মাদারির বাচ্চা।'

'কী সব বলছো? মুখ সামলাও।'

মোর্শেদের কপালের রগ দপদপ করছে। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এসেছে। বাসন্তীকে পিটাতে হাত নিশপিশ করছে। তবুও হেমলতার কথায় তিনি থামেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন বাসন্তীর দিকে। হেমলতা বললেন, 'আপনি ঘরে যান। এই ঘর আপনারও। উনার কথা মনে নিবেন না।'

'আমার ঘরে এই মহিলায় ঢুকলে খারাপি হইয়া যাইবো।'

হেমলতা মোর্শেদের চোখের দিকে তাকান। ইশারায় কিছু একটা বলেন। এরপর বাসন্তীকে বললেন,' আপনি যান। সদর ঘরের ভেতরের দরজার বাম দিকে যে ঘরটা সেখানেই যান। দেখিয়ে দিতে হবে?'

বাসন্তী কিছু না বলে গটগট আওয়াজ তুলে বারান্দা পেরিয়ে সদর ঘরে ঢুকেন। হাত-পা কাঁপছে তার। হেমলতার ব্যবহার স্বাভাবিক হলেও অস্বাভাবিক ঠেকছে। সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে ফেরার জন্য জ্বরে বিছানায় পড়েন। গত কয়দিন জ্বরে এতোই নেতিয়ে গিয়েছিলেন যে,উঠার শক্তিও ছিল না। শরীরটা একটু চাঙ্গা হতেই আবার আসেন। এতো সহজে সব পেয়ে যাবেন জানলে, জ্বর নিয়েই চলে আসতেন। মোর্শেদ অসহায় চোখে তাকালেন হেমলতার দিকে। বললেন, 'কেন এমনডা করলা? আমি এর সাথে থাকতে পারবাম না।'

'ঠান্ডা হও তুমি। তুমি কিছুই জানো না, যেদিন আমরা ঢাকা থেকে ফিরি সেদিন উনি এসেছিলেন। লোকজন নিয়ে এসেছিলেন। এরপরই আমার মেয়েদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। পরিস্থিতি হাতের নাগালে চলে যাওয়াতে উনি সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন। বিয়ের দিন বেয়াই সব বললেন। বেয়াইয়ের কাছে কামরুল মিয়া অভিযোগ করেন। বেয়াই কামরুল ভাইকে বলেন, ব্যাপারটা এখন ছড়াছড়ি না করতে। এতে উনার সম্মান নষ্ট হবে। যে বাড়িতে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন সেই বাড়ির কর্তার প্রথম বউ আছে,বউ আবার একজন পরনারীর মেয়ে। অধিকার নিতে লোকজন নিয়ে বৈঠক বসাবে এসব সত্যিই অসম্মানজনক। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন, ব্যাপারটা যেন নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেই। আর বাসন্তী আপার তো দোষ নেই। সবচেয়ে বড় কথা,আমার সংসারের হাল ধরার জন্য একজন দরকার। খুব দরকার।' হেমলতার শেষ কথাগুলো করুণ শুনাল। মোর্শেদ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। বাসন্তী এতো কিছু করেছে ভাবতে পারছেন না। মোর্শেদ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললেন, 'তারে আমি মানতে পারতাছি না। বুঝায়া শুনায়া বাইর কইরা দেও।'

'তুমি আমার কথাগুলো শুনো, থাকতে দাও উনাকে। ক্ষমা করে দাও। আমি জানি না সে কী করেছে। যাই করুক,ক্ষমা করে দাও।'

মোর্শেদের মাথায় খুন চেপেছে। তিনি কী করবেন, কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ক্রোধে-আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বাড়ির পিছনে চলে যান। নৌকা নিয়ে বের হবেন। রাতে বোধহয় ফিরবেন না আজ। আযান পড়ছে। বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। হেমলতা ব্যস্ত পায়ে হেঁটে আসেন বারান্দায়। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বুক মুচড়ে একটা কান্না ছিটকে এলো গলায়,সেইসঙ্গে চোখ ছাপিয়ে জল। কোন নারী সতিন মানতে পারে? বাধ্য হয়ে মানতে হচ্ছে। ভাগ্য বাধ্য করছে। নয়তো তিনি এতো উদার নন। কখনোই অন্যকে নিজের সংসারের ভাগ দিতেন না। সেই প্রথম থেকে মনে পুষে রেখেছেন, কখনো মোর্শেদের স্ত্রী এই সংসার চাইলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবেন। যার জন্য তিনি একাকীত্বে ধুঁকেছেন,যার জন্য মোর্শেদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন,যার জন্য মোর্শেদের মার খেয়েছেন তাকে কখনোই এতো সহজে সুখ দিতেন না। কখনোই না। হেমলতার শরীরে কাঁটা ফুটছে। তিনি কোনমতে কান্নাটাকে গিলতে চাইলেন। বাসন্তীর গলা কানে এলো, 'আপনি কাঁদতাছেন? '

হেমলতা চমকে তাকান। লজ্জায় চোখের জল মুছার সাহস পাননি। চোখে জল নিয়েই হাসলেন। বাসন্তী হতবাক! কী অসাধারণ নারী! কত অদ্ভুত সে। বাসন্তী প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলেন, ' ছেলেমেয়েরা কই?'

'বড় মেয়েটার বিয়ে হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে আছে। আজই ফের যাত্রা শেষ করে শ্বশুর বাড়ি গেল। মেজো,আর ছোটটা তাদের নানাবাড়ি গেছে। বড়টার জন্য কান্নাকাটি করছিল তাই আম্মা নিয়ে গেছে।'

'ঘরে একটা ছোটু ছেড়া ঘুমাচ্ছে। কে ছে?'

'প্রান্ত। আমারই ছেলে।'

'ছুনছিলাম তিন মেয়ে ছুধু।'

হেমলতা আর কথা বাড়ালেন না। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন,'আপনি কলপাড়ে যান। কাপড় পাল্টে নেন। আমি খাবার বাড়ছি।'

পদ্মজা মুখ ভার করে বসে আছে। রাতের খাবারের সময় ফরিনা বেগম খুব কথা শুনিয়েছেন। কঠিন স্বরে বলেছেন, 'বাপের বাড়ির আহ্লাদ মিটায়া আইছোনি তে? আর কোনোদিন যাইতে কইবা না। এইডাই তোমার বাপের বাড়ি,স্বামীর বাড়ি। আর তোমার ভাই বইনদের কইবা সবসময় আনাগোনা না করতে। বাড়ির কাছে বইলা সবসময় আইতে হইবো এইডা কথা না। চোক্ষে লাগে।'

পদ্মজা বুঝতে পারছে না, তার ভাই বোন তো শুধু বৌভাতের দিন এসেছে। দাওয়াতের আমন্ত্রণ রক্ষার্থে। এজন্য এভাবে কেন বলতে হবে। কান্না পাচ্ছে খুব। আম্মার কথা মনে পড়ছে। পূর্ণা কী করছে? আসতে তো নিষেধ দিয়ে দিল। তাহলে কীভাবে দেখা হবে? আমির ঘরে ঢুকতেই পদ্মজা দ্রুত চোখের জল মুছল। পদ্মজার ফ্যাকাসে মুখ দেখে আমির প্রশ্ন করল, 'আম্মা কিছু বলছে?'

'না,না।'

'তাহলে কাঁদছো কেন?'

'আম্মার কথা মনে পড়ছে।'

'যেতে চাও? চলো।'

'ওমা কী কথা! এতো রাতে। আর দুপুরেই না আসলাম।'

'তাহলে মন খারাপ করো না। আমরা আবার যাব। কয়দিনের মধ্যে।'

বাইরে অনেক হাওয়া বইছে। পদ্মজা জানালা লাগাতে গেল। তখন একটা চিৎকার শুনতে পেল। আমির তা লক্ষ করে বলল, 'বড় ভাবির চিৎকার। রুম্পা ভাবি। পাগলের মতো আচরণ তার। পাগলই বলে সবাই।'

পদ্মজা কৌতূহল নিয়ে আমিরের সামনে এসে দাঁড়াল,'আপনার মনে হয় কেউ ভয় পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারে?'

'অসম্ভবের কী আছে?'

'আমার কাছে খটকা লাগছে। উনার সাথে অন্য কিছু হয়েছে?'

'আমিতো এতটুকুই জানি।' আমির চিন্তিত হয়ে বলল।

পদ্মজা বলল, 'আপনি উনার সাথে দেখা করাবেন আমার?'

'আঘাত করবে তোমাকে।'

'বাঁধাই তো থাকে। অনুরোধ করছি।'

পদ্মজাকে হাতজোড় করে অনুরোধ করতে দেখে আমির সায় দিল, 'আচ্ছা ভোরে নিয়ে যাব। তখন সবাই ঘুমে থাকে।'

'জানেন, আপনাদের এই বাড়িটা রহস্যজনক। কোনো গোলমাল আছে।'

'সত্যি নাকি? আমার তেমন কিছু মনে হয় না।'

'আপনি কয়দিনের জন্য আসেন গ্রামে। আর এসব সবাই বুঝে না।'

'ওরে আমার বুঝদার। তবে জিন আছে শুনেছি। আমার এক ফুফু বাড়ির পিছনের পুকুরে ডুবে মরেছিলেন।' আর চাচীরে মাঝে মাঝেই জিনে ধরে।'

'সেকী!'

'তবে আমি বিশ্বাস করি না এসব। তুমি বিশ্বাস করো?'

'না। আচ্ছা...'

পদ্মজা কথা শেষ করতে পারল না। আমির পদ্মজাকে টেনে বিছানায় নিয়ে আসে। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বলল,'আর কথা না। ঘুমাও।'

''আমি ভর্তা হয়ে যাচ্ছি।'

'এইযে আস্তে ধরলাম।'

'শুনুন না?'

'কী?'

'আমি পড়তে চাই।'

'পড়বে।'

'আম্মাকে অসন্তুষ্ট রেখে জোর করে পড়তে মন মানবে না।'

'আম্মাকে রাজি করাবো।'

পদ্মজা খুশিতে গদগদ হয়ে উঠল। সে ও আমিরকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট -৩৩

ফজরের আযান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই পদ্মজা চোখ খুলে। বিছানা থেকে নামার জন্য উঠার চেষ্টা করল,পারল না। আমির দুই হাতে জাপটে ধরে রেখেছে। পদ্মজা আমিরকে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'এইযে, শুনছেন?'

আমির সাড়া দিল না। আবার ডাকল পদ্মজা। আমির ঘুমের ঘোরে কিছু একটা বিড়বিড় করে আবার ঘুমে তলিয়ে যায়। এবার পদ্মজা উঁচু স্বরে ডাকল, 'আরে উঠুন না। ফজরের নামায পড়বেন। এই যে...'

আমির পিটপিট করে তাকায়। দুই হাতের বাঁধন আগলা করে দেয়। পদ্মজা আমিরকে ঠেলে দ্রুত উঠে বসে। বিছানা থেকে নামতে নামতে বলে,'অজু করতে আসুন। আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন আজ থেকে নামায পড়বেন।'

পদ্মজা কলপাড় থেকে অজু করে আসে। এসে দেখে আমির বালিশ জড়িয়ে ধরে আয়েশ করে ঘুমাচ্ছে। মৃদু হেসে কপাল চাপড়াল পদ্মজা। এরপর আমিরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমিরের চুলে বিলি কেটে দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল, 'উঠুন না। নামায পড়ে আবার ঘুমাবেন। মসজিদে যেতে হবে না। আমার সাথেই পড়ুন। এই যে, শুনছেন? এইযে, বাবু..."

পদ্মজা দ্রুত জিভ কাটল। মুখ ফসকে আমিরের ডাক নাম ধরে সে ডেকেছে। পদ্মজা সাবধানে পরখ করে দেখল,আমির শুনলো নাকি। না শুনেনি। পদ্মজা মনে মনে বলল,' উফ! বাঁচা গেল।'

আরো এক দফা ডাকার পর আমির উঠে বসে। কাঁদোকাঁদো হয়ে বার বার অনুরোধ করে,'কাল থেকে পড়ব। আজ ঘুমাতে দাও।'

পদ্মজা শুনলো না। তার অনুনয়ের কাছে আমির হেরে গেল। বউ যদি সুন্দরী হয় তার অনুরোধ কী ফেলা যায়? আমির কলপাড় থেকে অজু করে আসে। দুজন পাশাপাশি দুই জায়নামাযে নামায সম্পন্ন করে।

নামায শেষ হতেই পদ্মজা বলল,'এবার চলুন।'

আমির টুপি বিছানার উপর রেখে জানতে চাইল,'কোথায়?'

'এমনভাবে বলছেন,যেন জানেন না।' একটু অভিনয় করেই বলল পদ্মজা।

আমিরের সত্যি কিছু মনে পড়ছে না। এখনো চোখে ঘুম ঘুম ভাব বলেই হয়তো। সে মনে করার চেষ্টা করল। মনে পড়তেই বলল, 'ওহ! দাঁড়াও। চাবি নিয়ে আসছি।'

আমির বেরিয়ে গেল। পদ্মজা অপেক্ষা করতে থাকল। জানালার পাশে দাঁড়াতেই ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে সর্বাঙ্গ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বাইরে সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। পদ্মজা চমৎকার চাহনিতে দেখছে বাড়ির পিছনের জঙ্গল। কী সুন্দর সবকিছু! এতো এতো গাছ। অযত্নে গড়ে উঠা বন-জঙ্গল যেন একটু বেশি আকর্ষণীয় হয়।

প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে আচমকা চোখে পড়ল রানিকে। রানির পরনে আকাশি রঙের সালোয়ার-কামিজ। সে জঙ্গলের ভেতরে যাচ্ছে। চোর চুরি করার সময় যেভাবে চারপাশ দেখে রানিও ঠিক সেভাবেই চারপাশ দেখে দেখে এগোচ্ছে। পদ্মজা নিঃশ্বাস বন্ধ করে পুরো দৃশ্যটা দেখল। রানি গভীর জঙ্গলের আড়ালে চলে যায়। তখনি আমির আসে,'পদ্মবতী? '

আমিরের ডাকে পদ্মজা মৃদু কেঁপে উঠল। আমির কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কিছু কী হয়েছে?'

'না,কী হবে। চলুন আমরা যাই।'

পদ্মজা যে কোনো কথা এড়িয়ে গেছে তা বেশ বুঝতে পারল আমির। তবে প্রশ্ন করল না। পদ্মজা আমিরকে রানির কথা বলতে গিয়েও পারল না। সে ভাবছে, 'আগে রানি আপাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এখনি বলা ঠিক হবে না। উনি কী ভাবেন আবার।'

রুম্পার ঘরের দরজা খুলতেই ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ হয়। পদ্মজা ঘরে ঢুকে আগে জানালা খুলে দেয়। তারপর পালঙ্কের দিকে তাকাল। পালঙ্ক শূন্য। পদ্মজা আমিরের দিকে জিজ্ঞাসু হয়ে তাকায়। আমির ইশারা করে পালঙ্কের

নিচে দেখতে। পদ্মজা ঝুঁকে পালঙ্কের নিচে তাকাল। কেউ একজন শুয়ে আছে। চুল দিয়ে মুখ ঢাকা। হাতে পায়ে বেড়ি বাঁধা।

আমির পদ্মজার পাশে বসে বলল,'উনিই রুম্পা ভাবি।'

'উনাকে ডাকবেন একটু?'

'রেগে যায় যদি?'

'তবুও ডাকুন না।'

আমির লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে ডাকল, 'ভাবি? ভাবি? শুনছেন ভাবি?''

রুম্পা নড়েচড়ে চোখ তুলে তাকায়। দুই হাত দূরে একটা ছেলে ও মেয়ে বসে আছে। তাদের মুখ স্পষ্ট নয়। আলো ভালো করে ঘরে ঢুকেনি। রুম্পা শান্ত চোখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। পদ্মজা হাত বাড়িয়ে বলল,'আমার হাতে ধরে বেরিয়ে আসুন।'

রুম্পা বাঁধা দুই হাতে পদ্মজার হাত ধরার চেষ্টা করে,পারল না। পদ্মজা আরেকটু এগিয়ে যায়। রুম্পার দুই হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। রুম্পা কাছে আসতেই দুর্গন্ধে পদ্মজার বমি চলে আসে। গলা অবধি এসে বমি আটকে গেছে। না জানি কতদিন গোসল করেনি রুম্পা! দাত মাজেনি। এই বাড়ির কেউ কী একটু পরিষ্কার করে রাখতে পারে না রুম্পাকে? পস্রাবের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘরেই পস্রাব-পায়খানা করে।

রুম্পা মলিন মুখে চেয়ে থাকে পদ্মজার দিকে। শান্ত,স্থির দৃষ্টি। আমির গর্ব করে রুম্পাকে বলল,'আমার বউ। বলছিলাম না, সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা আমার বউ হবে। দেখিয়ে দিলাম তো?'

রুম্পা হাসে। ময়লাটে মলিন মুখের হাসি বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর হাসি। অনেকদিন গোসল না করার কারণে চেহারা, হাত,পা ময়লাটে হয়ে গেছে। নখগুলো বড় বড়। নখের ভেতর ময়লার স্তূপ যেন। ঠোঁট ফেটে

চৌচির। টলমল করা চোখ। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি চোখ দিয়ে বর্ষণ বইবে। রুম্পা পদ্মজাকে শান্ত কণ্ঠে বলল,'এ তো ম্যালা সুন্দর ছেড়ি। তোমার নাম কিতা?'

পদ্মজা খুশিতে জবাব দিল,'উম্মে পদ্মজা।'

'ছুডু ভাই,এতো সুন্দর ছেড়ি কই পাইলেন? এ...এ যে চান্দের লাকান মুখ।'

রুম্পার আরো কাছে এসে বসল পদ্মজা। দুর্গন্ধটা আর নাকে লাগছে না। মানুষটাকে তার বেশ লাগছে। রুম্পার চুল লম্বা। মাটিতে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি চুল লুটিয়ে আছে। কুচকুচে কালো চুল। অনেকদিন চুল না ধোয়ার কারণে চুলগুলো জট লেগে আছে কিন্তু সৌন্দর্য এখনো রয়ে গেছে। যখন সুস্থ ছিল নিশ্চয় অনেক বেশি সুন্দর চুলের অধিকারিণী ছিল।

পদ্মজা বলল, 'আমি আপনাকে তুমি বলি?'

রুম্পা দাঁত বের করে হেসে মাথা নাড়াল। পদ্মজা হেসে বলল,'কিছু বলবেন?'

রুম্পা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে পদ্মজার দিকে। কোনো জবাব দেয় না। সেকেন্ড কয়েক পর রুম্পার চোখের দৃষ্টি এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। হাসি মিলিয়ে মুখ মলিন হয়ে আসে। পদ্মজা অবাক হয়ে রুম্পার পরিবর্তন দেখে। আকস্মিক পদ্মজাকে আক্রমণ করে বসল রুম্পা। খামচে ধরে পদ্মজার পা। আমির লাফিয়ে উঠে। রুম্পার হাত থেকে পদ্মজাকে ছুটাতে চেষ্টা করে। রুম্পা পা ছেড়ে পদ্মজার শাড়ি কামড়ে ধরে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে থাকে। আমির ধমকে বলে,'ভাবি ছাড়ো বলছি। পদ্মজা তোমার ক্ষতি করতে আসেনি। ভাবি ছাড়ো।'

পদ্মজা স্তব্ধ হয়ে দেখছে। তার চোখেমুখে কোনো ভয়ভীতি নেই। কী যেন খুঁজছে রুম্পার মধ্যে। খুঁজে কূলকিনারা পাচ্ছে না। রুম্পা শাড়ি ছেড়ে দিতেই পদ্মজা একটু পিছিয়ে যায়। দরজায় চোখ পড়ে। দেখতে পায়, কেউ একজন সরে গিয়েছে। কী আশ্চর্য! হুট করেই পদ্মজার বুক কাঁপতে থাকে। নূরজাহান নিজ ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। এসেই বলেন, 'তালা খুলছে কেডায়? বাবু, নতুন বউরে নিয়া এইহানে আইছোস কেন?'

আমির দ্রুত রুম্পার কাছ থেকে সরে আসে। নূরজাহানকে কৈফিয়ত দেয়, 'ভাবলাম, বাড়ির সবাইকে পদ্মজা দেখেছে। রুম্পা ভাবিকেও দেখুক। ভাবতে পারিনি ভাবি এমন কাজ করবে। ভাবি তো এখন আরো বেশি বিগড়ে গেছে দাদু।'

'তুই আমারে কইয়া আইবি না? তোর চিল্লানি হুইননা আমার কইলজাডা উইড়া গেছিলো। বউ তোমারে দুঃখ দিছে এই ছেড়ি?'

পদ্মজা বলল, 'না,না। কিছু করেনি আমার।'

আমির চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বলছো? কিছু করেনি মানে? হাত দেখি?'

আমির পদ্মজার দুই হাত টেনে নিয়ে দেখে। বাম হাতে নখের জখম। আমির ব্যথিত স্বরে বলল, 'ইশ! কতোটা আঘাত পেয়েছো। ঘরে চলো। দাদু এই নাও চাবি। তালা মেরে দিও।'

আমির পদ্মজাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বেরোবার আগ মুহূর্তে পদ্মজা রুম্পার দিকে তাকাল। দেখতে পেল, রুম্পা আড়চোখে তাকে দেখছে। সে চোখে স্নেহমমতা! একটু হাসিও লেগে ছিল। পদ্মজার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল।

ঘরে এসে আমিরকে বলল, 'উনার যত্ন কেউ নেয় না কেন?'

'দেখোনি কী রকম করল? এই ভয়েই কেউ যায় না। শুরুতে তোমাকে দেখে যদি রেগে যেতো তখনি তোমাকে নিয়ে চলে আসতাম। সবাইকে ভাবি তুই করে বলে। তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করতে দেখে ভাবলাম, বোধহয় তোমাকে পছন্দ হয়েছে। তাই আঘাতও করবে না। কিন্তু ধারণা ভুল হলো।'

'আপনি অকারণে চাপ নিচ্ছেন। নখের দাগ বসেছে শুধু।'

'রক্ত চলে এসেছে।'

'এইটুকু ব্যাপার না।'

আমির তুলা দিয়ে পদ্মজার হাতের রক্ত মুছে দিল। তারপর বলল, 'আর ওইদিকে পা দিবে না।'

'আম্মার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।'

'লাবণ্যকে ঘুম থেকে তুলছে। লাবণ্য ফজরে উঠতেই চায় না।' আমির হেসে বলল।

'আমি যাই।'

'কোথায়?'

'আম্মা,সকাল সকাল রান্নাঘরে যেতে বলেছিলেন।'

'তুমি রান্না করবে কেন?'

'অনুরোধ এমন করবেন না, আমি আমার বাড়িতেও রান্না করেছি। টুকটাক কাজ করেছি। এখন না গেলে,আম্মা রেগে যাবেন। রাগানো ঠিক হবে না।'

'এসব ভালো লাগে না পদ্মজা।'

'আমি আসছি।'

পদ্মজা ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যায়। আমিরকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে।

#পদ্মজা

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ৩৪

বাইরে বিকেলের সোনালি রোদ, মন মাতানো বাতাস। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে নূরজাহানের ঘরের দিকে যাচ্ছে পদ্মজা। বাতাসের দমকায় সামনের কিছু চুল অবাধ্য হয়ে উড়ছে। এতে সে খুব বিরক্ত বোধ করছে। এক হাতে দই অন্য হাতে পিঠা। চুল সরাতেও পারছে না। তখন কোথেকে উড়ে আসে আমির। এক আঙুলে উড়ন্ত চুলগুলো পদ্মজার কানে গুঁজে দিয়ে আবার উড়ে চলে যায়। পদ্মজা চমৎকার করে হাসে। আমিরের যাওয়া দেখে,মনে মনে বলল, 'চমৎকার মানুষ।'

নূরজাহানের ঘরের সামনে এসে দেখল দরজা ভিজানো। পদ্মজা অনুমতি না নিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। তার চক্ষু চড়কগাছ। পালঙ্কে ভুরি ভুরি সোনার অলংকার। জ্বলজ্বল করছে। চোখ ধাঁধানো দৃশ্য। পদ্মজাকে দেখে নূরজাহান অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

তা পদ্মজার চোখে পড়েছে। নূরজাহান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, 'তুমি এই নে কেরে আইছো? আমি কইছি আইতে?'

নূরজাহানের ধমকে থতমত খেয়ে গেল পদ্মজা। দইয়ের মগ ও পিঠার থালা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'আম্মা বললেন দই,পিঠা দিয়ে যেতে।'

'তোমার হউরি কইলেই হইবো? আমি কইছি? আমারে না কইয়া আমার ঘরে আওন মানা হেইডা তোমার হউরি জানে না?'

'মাফ করবেন।' মাথা নত করে বলল পদ্মজা।

'যাও। বাড়াইয়া যাও।'

পদ্মজা বেরিয়ে গেল। দরজার বাইরে এসে থমকে দাঁড়ায়। ছোট কারণে এতো ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া কেন দেখালেন তিনি? পদ্মজার মাথায় ঢুকছে না। পদ্মজা আনমনে হেঁটে নিজের ঘরে চলে আসে। সে ভাবছে। এই বাড়িতে আসার পর থেকে কী কী হয়েছে সব ভাবছে। প্রথম রাতে কেউ একজন তার ঘরে এসেছিল। নোংরা স্পর্শ করেছে। সেটা যে আমির নয় সে শত ভাগ নিশ্চিত। এরপর ভোরে রানিকে দেখল চোরের মতো বাড়ির পিছনের জঙ্গলে ঢুকতে। তারপর রুম্পা ভাবির সাথে দেখা হয়। তিনি শুরুতে স্বাভাবিক ছিলেন। শেষে গিয়ে পাগলামি শুরু করেন। দরজার ওপাশে কেউ ছিল। পদ্মজা ভ্রুকুটি করে মুখে 'চ' কারান্ত শব্দ করল। সব ঝাপসা।

ফরিনা বলেছিলেন, দই,পিঠা দিয়েই রান্নাঘরে যেতে। পদ্মজা বেমালুম সে কথা ভুলে গিয়েছে। যখন মনে পড়ল অনেক সময় কেটে গিয়েছে। সে দ্রুত আঁচল টেনে মাথা ঘুরে ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে। এসে দেখে ফরিনা এবং আমিনা মাছ কাটছেন। পদ্মজা পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকে। ভয়ে বুক কাঁপছে। কখন না কঠিন কথা শোনানো শুরু করে দেন।

'অহন আওনের সময় হইছে তোমার? আছিলা কই?' বললেন ফরিনা।

'ঘরে।' নতজানু হয়ে বলল পদ্মজা।

'আমির তো বাইরে বাড়াইয়া গেছে অনেকক্ষণ হইলো। তুমি ঘরে কি করতাছিলা? স্বামী বাড়িত থাকলে ঘরে থাহন লাগে। নাইলে বউদের শোভা পায় খালি রান্ধাঘরে।'

চুলার চেয়ে কিছুটা দূরত্বে কয়েকটা বেগুন রাখা। এখানে আসার পর থেকে সে দেখছে প্রতিদিন বেগুন ভাজা করা হয়। পদ্মজা দা নিয়ে বসে বেগুন হাতে নিল। ফরিনা বলেন, 'বেগুন লইছো কেরে?'

'আজ ভাজবেন না?'

'জাফর আর হের বউ তো গেলোই গা। এহন কার লাইগা করাম? আর কেউ খায় না বেগুন।'

পদ্মজা বেগুন রেখে দিল। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, 'কী করব?'

ফরিনা চোখমুখ কুঁচকে মাছ কাটছেন। যেন পদ্মজার উপস্থিতি তিনি নিতে পারছেন না। পদ্মজার প্রশ্নের জবাব অনেকক্ষণ পর কাঠ কাঠ গলায় দিলেন, 'ঘরে গিয়া বইয়া থাহো।'

পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। ঢোক গিলে বলল, 'আর হবে না।'

'তোমারে কইছে না এইহান থাইকা যাইতে? যাও না কেরে? যতদিন আমরা আছি তোমরা বউরা রান্ধাঘরের দায়িত্ব লইতে আইবা না।'' আমিনার কণ্ঠে বিদ্রুপ।

পদ্মজা আমিনার কথায় অবাক হয়ে গেল। সে কখন দায়িত্ব নিতে এলো? ফরিনা আমিনার কথা শুনে চোখ গরম করে তাকালেন। বললেন, 'আমার ছেড়ার বউরে আমি মারব,কাটব,বকব। তোমরা কোনোদিন হের লগে উঁচু গলায় কথা কইবা না। বউ তুমি ঘরে যাও।'

পদ্মজার সামনে এভাবে অপমানিত হয়ে আমিনা স্তব্ধ হয়ে যান। তিনি সেই শুরু থেকে ফরিনাকে ভয় পান। তাই আর টুঁ শব্দ করলেন না। পদ্মজা ফরিনার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। কী যেন দেখতে পেল। মনে হচ্ছে এই মানুষটারও দুই রূপ আছে। এই বাড়ির প্রায় সবাইকে তার মুখোশধারী মনে হচ্ছে। কেউ ভালো কিন্তু খারাপের অভিনয় করে। আর কেউ আসলে শয়তান কিন্তু ভালোর অভিনয় করে। কিন্তু কেন? কীসের এতো ছলনা!

'খাড়াইয়া আছো কেন? যাও ঘরে যাও।'

'গিয়ে কী করব? কোনো সাহায্য লাগলে বলুন না আম্মা।'

'তোমারে যাইতে কইছি। যাও তুমি।'

পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। ধীর পায়ে জায়গা ত্যাগ করল। এদিক-ওদিক হেঁটে ভাবতে থাকে,কার ঘরে যাবে। লাবণ্যের কথা মনে হতেই লাবণ্যের ঘরের দিকে এগোল সে। লাবণ্য বিকেলে টিভি দেখে। নিশ্চয়ই এখন টিভি দেখছে। লাবণ্যের ঘরে ঢুকেই লিখন শাহর কণ্ঠ শুনতে পেল পদ্মজা। টিভির দিকে তাকাল। দেখল,ছায়াছবি চলছে। লিখন শাহর ছায়াছবি। পদ্মজা ঘুরে দাঁড়ায় চলে যেতে। লাবণ্য ডাকল, 'ওই ছেমড়ি যাস কই? এইদিকে আয়।'

পদ্মজা ঘরে ঢুকে, লাবণ্যর পাশে পালঙ্কে বসল। লাবণ্য দুই হাতে পদ্মজার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'সারাদিন দাভাইয়ের সাথে থাকস কেন? আমার ঘরে একবার উঁকি দিতে পারস না?'

'তোর দাভাই আমাকে না ছাড়লে আমি কী করব?'

'ঘুষি মেরে সরাইয়া দিবি।'

'হ্যাঁ, এরপর আমাকে তুলে আছাড় মারবে।'

'দাভাইকে ডরাস?'

'একটুও না।'

'সত্যি?'

'মিথ্যে বলব কেন?'

'একদিন রাগ দেখলে এরপর ঠিকই ডরাইবি।'

'আমি রাগতেই দেব না।'

লাবণ্য হাসে। এরপর টিভির দিকে তাকিয়ে বলল, 'লিখন শাহর মতো মানুষরে ফিরাইয়া দেওনের সাহস খালি তোরই আছে। আমার জীবনেও হইতো না।'

পদ্মজা কিছু বলল না। লাবণ্যই বলে যাচ্ছে, 'এই ছবিটা আমি এহন নিয়া ছয়বার দেখছি। লিখন শাহ তার নায়িকারে অনেক পছন্দ করে। কিন্তু নায়িকা পছন্দ করে অন্য জনরে। অন্য জনরে বিয়া করে। বিয়ার অনেক বছর পর লিখন শাহর প্রেমে পড়ে নায়িকা। ততদিনে দেরি হয়ে যায়। লিখন শাহ মরে যায়। এই হইলো কাহিনি। আইচ্ছা পদ্মজা, যদি এমন তোর সাথেও হয়?'

পদ্মজা আঁতকে উঠে বলল, 'যাহ কী বলছিস! বিয়ের আগে ভাবতাম যার সাথে বিয়ে হবে তাকেই মানব। কিন্তু এখন আমার তোর ভাইকেই দরকার।'

'ওরেএ! লাইলি হয়ে যাইতাছস। যাহ,আমিও মজা করছি। আমি কেন চাইব আমার ভাইয়ের বউ অন্যজনরে পছন্দ করুক। লিখন শাহ আমার। শয়নে স্বপনে তার লগে আমি সংসার পাতি। '

পদ্মজা হাসল। লাবণ্যর পিঠ চাপড়ে বলল, 'আব্বারে বল,লিখন শাহকে ধরে এনে তোর গলায় ঝুলিয়ে দিবে।'

'বিয়া এমনেও দিয়া দিব। কয়দিন পর মেট্রিকের ফল দিব। আমি তো ফেইল করামই। দেহিস।'

'কিছু হবে না। পাশ করবি। রানি আপা কই?'

'কী জানি কই বইয়া রইছে। চুপ থাক এহন। টিভি দেখ। দেখ, কেমনে কানতাছে লিখন শাহ। এই জায়গাটা আমি যতবার দেহি আমার কাঁনদন আইসা পরে।' বলতে বলতে লাবণ্য কেঁদে দিল। ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল।

পদ্মজা টিভির দিকে মনোযোগ সহকারে তাকাল। দৃশ্যে চলছে, লিখন শাহ ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে। ঘোলা চোখ দুটি আরো ঘোলা হয়ে উঠেছে। ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করছে। তার মা,বোন,ছোট ভাই ভয়ে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। এক টুকরো কাচ ঢুকে পড়ে লিখন শাহর পায়ে। আর্তনাদ করে ফ্লোরে বসে পড়ে। তার মা দৌড়ে আসে। পাগলামি থামাতে বলে। লিখন শাহ আর্তনাদ করে শুধু বলছে, 'তুলির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আম্মা। আমি কী নিয়ে বাঁচব। কেন তুলি আমাকে ভালোবাসলো না। আমি তো সত্যি ভালোবেসে ছিলাম।'

পদ্মজা বাকিটা শুনল না। মনোযোগ সরিয়ে নিল। তার কানে বাজছে, 'পদ্মজার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আম্মা। আমি কী নিয়ে বাঁচব? কেন পদ্মজা আমাকে ভালোবাসলো না। আমি তো সত্যি ভালোবেসেছিলাম।'

পদ্মজার চোখের কার্নিশে অশ্রু জমে। সে অশ্রু আড়াল করে লাবণ্যকে বলল, 'তুই দেখ। আমি যাই।'

লাবণ্যের কানে পদ্মজার কথা ঢুকল না। সে টিভি দেখছে আর ঠোঁট ভেঙে কাঁদছে। পদ্মজা আর কিছু বলল না। উঠে দাঁড়ায় চলে যেতে। দরজার সামনে আমিরকে দেখতে পেল। তার বুক ধক করে উঠল। পরে মনে হলো, সে তো কোনো অপরাধ করেনি। তাহলে এতো আশ্চর্য হওয়ার কী আছে। আমির কাগজে মোড়ানো কিছু একটা এগিয়ে দিল। বলল, 'ঘরেও পেলাম না। রান্নাঘরেও না। তাই মনে হলো লাবণ্যর ঘরেই আছো। টিভি দেখছিলে নাকি?'

#পদ্মজা

চলবে...

@ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ৩৫

বাসন্তী গাঢ় করে ঠোঁটে লিপস্টিক দিচ্ছেন। প্রেমা,প্রান্ত বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখছে। তারা দুজন বাসন্তীকে মেনে নিয়েছে। বাসন্তীর কথাবার্তা, চালচলন আলাদা। যা ছোট দুটি মনকে আনন্দ দেয়। আগ্রহভরে বাসন্তীর কথা শুনে তারা। লিপস্টিক লাগানো শেষ হলে বাসন্তী প্রেমাকে বলল, 'তুমি লাগাইবা?'

প্রেমা হেসে মাথা নাড়ায়। বাসন্তীর আরো কাছে ঘেঁষে বসে। বাসন্তী প্রেমার ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক গাঢ় করে ঘষে দিল। এরপর প্রান্তকে বলল, 'তুমিও লাগাইবা আব্বা?'

'জি।' বলল প্রান্ত। প্রেমাকে লিপস্টিকে সুন্দর লাগছে। তাই তারও ইচ্ছে হচ্ছে।

বাসন্তী প্রান্তর ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়ার জন্য উঁবু হোন। পূর্ণা বেশ অনেকক্ষণ ধরে এসব নাটক দেখছে। এই মহিলাকে সে একটুও সহ্য করতে পারে না। এক তো সৎ মা। বাপের আরেক বউ। তার উপর এই বয়সে এসে এতো সাজগোজ করে। প্রান্তকে লিপস্টিক দিচ্ছে দেখে তার গা পিত্তি জ্বলে উঠল। ঘর থেকে দপদপ করে পা ফেলে ছুটে আসে। প্রান্তকে টেনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'হিজরা সাজার ইচ্ছে হচ্ছে কেন তোর? কতবার বলছি এই বজ্জাত মহিলার সাথে না ঘেঁষতে?'

বাসন্তী ভয় পান পূর্ণাকে। মেয়েটা খিটখিটে, বদমেজাজি। হেমলতা বলেছেন, সেদিনের দূর্ঘটনার পর থেকে পূর্ণা এমন হয়ে গেছে। হুটহাট রেগে যায়। কথা শুনে না। পদ্মজা যাওয়ার পর থেকে আরো বিগড়ে গেছে। এজন্য যথাসম্ভব পূর্ণাকে এড়িয়ে চলেন। তবুও এসে আক্রমণ করে বসে। গত দুই সপ্তাহে মেয়েটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে জীবন। তিনি কাটা কাটা গলায় পূর্ণাকে বললেন, 'এই ছিক্ষা পাইছো তুমি? গুরুজনদের সাথে এমনে কথা কও।'

'আপনি চুপ থাকেন। খারাপ মহিলা। বুড়া হয়ে গেছে এখনও রঙ-ঢঙ করে।'

পূর্ণার কথা মাটিতে পড়ার আগে তীব্র থাপ্পড়ে সে মাটিতে উল্টে পড়ল। চোখের দৃষ্টি গরম করে ফিরে তাকায় সে, দেখার জন্য, কে মেরেছে তাকে! দেখল হেমলতাকে। হেমলতা অগ্নি চোখে তাকিয়ে আছেন। যেন চোখের দৃষ্টি দিয়ে পূর্ণাকে পুড়িয়ে ফেলবেন। পূর্ণার চোখ শিথিল হয়ে আসে। সে চোখ সরিয়ে নেয়। হেমলতা বললেন, "নিজেকে সংশোধন কর। এখনও সময় আছে।'

পূর্ণা নতজানু অবস্থায় বলল, 'আমি এই মহিলাকে সহ্য করতে পারি না আম্মা।'

'করতে হবে। উনার অধিকার আছে এই বাড়িতে।'

'আমি খুন করব এই মহিলাকে।' পূর্ণার রাগে শরীর কাঁপছে।

পূর্ণার অবস্থা দেখে হেমলতার দৃষ্টি গেল থমকে। পূর্ণা কেন এমন হলো? তিনি কী এক মেয়ের শূন্যতার শোক কাটাতে গিয়ে আরেক মেয়েকে সময় দিচ্ছেন না। বুঝিয়ে, শুনিয়ে পূর্ণাকে আবার আগের মতো করতে হবে। তিনি কণ্ঠ খাদে নামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এরপর পূর্ণা যা বলল তিনি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। পূর্ণা বাসন্তীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বেশ্যার মেয়ে বেশ্যাই হয়। আর বেশ্যার সাথে এক বাড়িতে থাকতে ঘৃণা করে আমার।'

হেমলতা ছুটে যান বাইরে। বাঁশের কঞ্চি নিয়ে ফিরে আসেন। বাসন্তী দ্রুত আগলে ধরেন পূর্ণাকে। হেমলতাকে অনুরোধ করেন, 'এত বড় ছেড়িডারে মাইরো না। ছোট মানুছ। বুঝে না।'

'আপা, আপনি সরেন। ও খুব বেড়ে গেছে।'

বাসন্তীর স্পর্শ পূর্ণার ভালো লাগছে না। সে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পূর্ণার পিঠে বারি মারলেন। পূর্ণা আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ে। হেমলতা আবার মারার জন্য প্রস্তুত হোন, বাসন্তী পূর্ণাকে আগলে বসেন। অনুরোধ করেন, 'যুবতি ছেড়িদের এমনে মারতে নাই। আর মাইরো না।'

প্রেমা,প্রান্ত ভয়ে গুটিয়ে গেছে। হেমলতার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। তিনি বাঁশের কঞ্চি ফেলে লাহাড়ি ঘরের দিকে যান। বারান্দায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। মনে মনে মোর্শেদের উপর ভীষণভাবে ক্ষেপে যান। মোর্শেদ চিৎকার করে করে বাসন্তীর সম্পর্কে সব বলেছে বলেই তো পূর্ণা জেনেছে। আর তাই এখন পূর্ণা কারো অতীত নিয়ে আঘাত করার সুযোগ পাচ্ছে। মোড়ল বাড়ির ছোট সংসারটা কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে। হেমলতা আকাশের দিকে তাকিয়ে হা করে নিঃশ্বাস নেন। সব কষ্ট,যন্ত্রণা যদি উড়ে যেত। সব যদি আগের মতো হয়ে যেত। সব কঠিন মানুষেরাই কী জীবনের এক অংশে এসে এমন দূর্বল হয়ে পড়ে? কোনো দিশা খুঁজে পায় না?

আমির বিছানায় বসে উপন্যাসের বই পড়ছে। ছয়দিন পর পদ্মজার মেট্রিকের ফলাফল। এরপরই ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হবে। যদিও ফরিনা বেগম রাজি নন। কিন্তু আমির মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে পদ্মজাকে রাজধানীতে নিবেই। পদ্মজার কথা মনে হতেই আমির বই রেখে গোসলখানার দরজার দিকে তাকাল। তার ঘরের সাথে আগে গোসলখানা ছিল না। পদ্মজার জন্য করা হয়েছে। সে বই রেখে সেদিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। তখনি পদ্মজা চিৎকার করে উঠল। তাই দ্রুত দৌড়ে গেল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। পদ্মজা শাড়ি দিয়ে শরীর ঢেকে রেখেছে। কিছুটা কাঁপছে। আমির দ্রুত কাছে এসে বলল, 'কী হয়েছে?'

'ওখানে,ওখানে কে ছিল। আ...আমাকে দেখছিল।'

পদ্মজার ইঙ্গিত অনুসরণ করে আমির সেদিকে তাকাল। গোসলখানার ডান দেয়ালের একটা ইট সরানো। সকালে তো সরানো ছিল না! পদ্মজা কাঁদতে থাকল। কাপড় পাল্টাতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ে দেয়ালে। আর তখনই দুটি

চোখ দেখতে পায়। সে তাকাতেই চোখ দুটি দ্রুত সরে যায়। পদ্মজার পিল চমকে উঠে। আমির পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'শুকনো কাপড় পরে আসো। কেঁদো না।'

কথা শেষ করেই সে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার তাড়া দেখে মনে হলো, অজ্ঞাত আগন্তুককে আমির চিনে। পদ্মজা দ্রুত কাপড় পরে নিল। এরপর আমিরকে খুঁজতে থাকল। আমির সোজা রিদওয়ানের ঘরের দিকে যায়। রিদওয়ান পানি পান করছিল। আমির গিয়ে রিদওয়ানের বুকের শার্ট খামচে ধরে। চিৎকার করে বলল, 'তোকে সাবধান করেছিলাম। দ্বিতীয় সুযোগ দিয়েছিলাম।'

'শার্ট ছাড়।'

'ছাড়ব না। কী করবি? তুই আমার বউয়ের দিকে কু-নজর দিবি আর আমি ছেড়ে দেব?'

'প্রমাণ আছে তোর কাছে?'

'কুত্তার বাচ্চা,প্রমাণ লাগবে? আমি জানি না?'

'আমির মুখ সামলা। গালাগালি করবি না।'

'করব। কী করবি তুই?'

'আবার বলছি,শার্ট ছাড়।'

আমির ঘুষি মারে রিদওয়ানের নাকে। রিদওয়ান টাল সামলাতে না পেরে পালঙ্কের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চিৎকার, চেঁচামিচি শুনে বাড়ির সবাই রিদওয়ানের ঘরে ছুটে আসে।

#পদ্মজা

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট -৩৬

পদ্মজা ঘরের চৌকাঠে পা দিল মাত্র। আমির রিদওয়ানকে টেনে হিঁচড়ে তুলে বলল, 'তোকে না করেছিলাম। বার বার না করেছি। তবুও শুনলি না।'

রিদওয়ান শক্ত দুই হাতে আমিরকে ধাক্কা মেরে ছুঁড়ে ফেলে দূরে। আমির আলমারির সাথে ধাক্কা খেয়ে আরো হিংস্র হয়ে উঠে। রিদওয়ানের দিকে তেড়ে আসে। নূরজাহান দৌড়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ান। চিৎকার করে বললেন, 'কী অইছে তোদের? তোরা এমন করতাছস কেন?'

'দাদু, সরে যাও। মাদা** বাচ্চারে আমি মেরে ফেলবো।'

'তুই কী ভালা মানুষের বাচ্চা?' তেজ নিয়ে বলল রিদওয়ান।

আমির নূরজাহানকে ডিঙিয়ে রিদওয়ানকে আঘাত করতে প্রস্তুত হলো। তখন মজিদ হাওলাদারের কর্কশ কণ্ঠ ভেসে আসে,'যে যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

আমির মজিদ হাওলাদারকে এক নজর দেখে শান্ত হওয়ার চেষ্টা করল। পরেই জ্বলে উঠে বলল, 'আব্বা,আপনি জানেন না ও কী করছে? পদ্মজা গোসল করছিল,ও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল।' আমিরের কণ্ঠ থেকে যেন অগ্নি ঝরছে।

ফরিনা,আমিনা,রানি সহ হাওলাদার বাড়িতে কাজ করা দুজন মহিলা ছিঃ ছিঃ করে উঠল। রিদওয়ান সাবধানে প্রশ্ন করল,'তোর কাছে কী প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ লাগবে? আমি জানি এটা তুই ছিলি। বিয়ের রাতেও তুই পদ্মজার কাছে গিয়েছিলি।'

'অপবাদ দিবি না।'

'তুই ভালো করেই জানিস আমি অপবাদ দিচ্ছি না।'

'তুমি কী করে শত ভাগ নিশ্চিত হতে পারছো ছেলেটা রিদওয়ানই ছিল?পদ্মজা দেখেছে? নাকি তুমি? ' বললেন মজিদ।

'আব্বা, কেউ দেখেনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত ওই চরিত্রহীনটা রিদু। কারণ, আমার আগে থেকে ও পদ্মজাকে পছন্দ করতো।'

পদ্মজা বিস্ময়ে তাকাল। কী হচ্ছে,কী সব শুনছে? ফরিনার দুই ঠোঁট হা হয়ে গেল। মুখে হাত দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। আমিনা বললেন, 'আপা,আমি আগেই কইছিলাম এই ছেড়ি বিনাশিনী। এই ছেড়ির রূপ আগুনের লাকান। এই ছেড়ির জন্যে এখন বাড়ির ছেড়াদের ভেজাল হইতাছে।'

আমির আমিনার কথা শুনেও না শোনার ভান করল। মজিদকে বলল, 'আব্বা,আপনি এর বিচার করবেন? না আমি ওরে মেরে ফেলব? আর আম্মা, এরপরও বলবা এই বাড়িতে রেখে যেতে পদ্মজাকে। আমাকে তো ফিরতেই হবে ঢাকা। পদ্মজাকে রেখে আমি কিছুতেই যাব না। মনে রেখো। আব্বা তুমিও কথাটা মনে রেখো, আমি তোমার ব্যবসায় আর নেই। যদি পদ্মজা আমার সাথে ঢাকায় না যায়।'

'তুমি যেখাবে যাবা তোমার বউতো সেখানেই যাবে। বউ রেখে যাবা কেন? আর রিদওয়ান তুমি আমার সাথে আসো। তোমার সাথে আমার বোঝাপড়া আছে।'

মজিদ হাওলাদার বেরিয়ে যান। আমির পদ্মজার হাতে ধরে পদ্মজাকে বলল, 'আর কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে না।'

খুশিতে পদ্মজার চোখের তারায় অশ্রু জ্বলজ্বল করে উঠে। সে আমিরের এক হাত শক্ত করে ধরে বোঝায়, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি। বিশ্বাস করি।'

সন্ধ্যার ঠিক আগ মুহূর্ত। এমন সময় হাওলাদার বাড়ির রাতের রান্না করা হয়। মগা এক ব্যাগ মাছ দিয়ে গেছে। লতিফা মাছ কাটছে। লতিফা এই বাড়ির কাজের মেয়ে। সবাই ছোট করে লুতু ডাকে। ফরিনা ভাত বসিয়েছেন। আর অনবরত বলে চলেছেন, 'আমি এই বাড়ির বড় বান্দি। দাসী আমি। বাবুর বাপ দাসী পুষে রাখছে। দাসী পালে। সারাদিন কাম করি। অন্যরা হাওয়া লাগাইয়া ঘুরে। মরণ হয় না আমার। মরণই আমার একমাত্র শান্তি।'

পদ্মজা গুনগুন করে গান গাচ্ছে আর রান্নাঘরের আশেপাশে ঘুরছে। ফরিনার সব কথাই তার কানে আসছে। তার গায়ে লাগছে না। বরং হাসি পাচ্ছে। সে বহুবার রান্নাঘরে গিয়েছে কাজ করার জন্য। ফরিনা তাড়িয়ে দিয়েছেন। কাজ করতে হবে না বলেছেন। আর এখন বলছেন,কেউ সাহায্য করে না। পদ্মজা পা টিপে টিপে রান্না ঘরে ঢুকল। বলল, 'আম্মা, আমি সাহায্য করি?'

'এই ছেড়ি তুমি এতো বেয়াদব কেরে? কতবার কইছি তোমার সাহায্য করতে হইব না।'

'না...মানে আপনি বলছিলেন, কেউ সাহায্য করে না।'

'তোমারে তো বলি নাই। তোমার গায়ে লাগে কেন?'

'মেঝে ঝাড়ু দিয়ে দেই?'

'তোমারে কইছি আমি? তুমি যাও এন থাইকা। যাও কইতাছি।'

পদ্মজা বেরিয়ে আসে। বাসায় লাবণ্য নেই,আমির নেই। কার কাছে যাবে? রানি আছে! রানির কথা মনে হতেই পদ্মজা রানির ঘরের দিকে এগোল। যাওয়ার পথে সন্ধ্যার আযান ভেসে আসে কানে। তাই আর সেদিকে এগুলো না। নিজের ঘরের দিকে হেঁটে গেলো। নামায পড়তে হবে।

নামায পড়ে, সূরা ইয়াসিন একবার পড়ল। এরপর জানালা লাগাতে গিয়ে রানিকে দেখতে পেল। সেদিনের মতো জঙ্গলের ভেতর ঢুকছে। আর কিছু মুহূর্ত পার হলে চারিদিক রাতের গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। এমন সময় কী করতে যাচ্ছে ওখানে? এতো সাহসই কী করে হয়? পদ্মজা হুড়মুড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়। আজ সে এর শেষ দেখে ছাড়বে। লাবণ্য সবে মাত্র সদর ঘরে ঢুকেছে। পদ্মজাকে তাড়াহুড়ো করে কোথাও যেতে দেখে বলল, 'কী রে, কই যাস?'

পদ্মজা চমকে উঠল। এরপর বলল, 'এইতো...এইখানেই। কই ছিলি? আচ্ছা, পরে কথা বলব আসি এখন।'

লাবণ্য ঠোঁট উল্টে পদ্মজার যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকে। এরপর মনে মনে ভেবে নিল, দুই তলা থেকে হয়তো দেখেছে দাভাই আসছে। তাই এগিয়ে আনতে যাচ্ছে। সে নিজ ঘরের দিকে চলে গেল। পদ্মজা কখনো বাড়ির পিছনের দিকে যায়নি। এই প্রথম যাচ্ছে। বাড়ির ডান পাশে বিশাল পুকুর। কালো জল। অথচ,বাড়ির সামনের পুকুরের জল স্বচ্ছ।

দুই মিনিট লাগে শাক-সবজির ক্ষেত পার হতে। বাড়ির পিছনে এরকম শাক-সবজির বাগান আছে সে জানতো না। এরপর পৌঁছালো জঙ্গলের সামনে। সেখান থেকে অন্দরমহলের দিকে তাকাল। ওইতো তাদের ঘরের জানালা দেখা যাচ্ছে। আরেকটা জানালাও দেখা যাচ্ছে। পদ্মজা কপাল কুঁচকে খেয়াল করল, সেই জানালার গ্রিল ধরে কেউ তাকিয়ে আছে। পদ্মজা ঠাওর করার চেষ্টা করল এটা কার ঘর। মনে হতে বেশি সময় লাগল না। এটা রূম্পা ভাবির ঘর। তবে কী তিনিই তাকিয়ে আছেন? পদ্মজা আবার তাকাল। রূম্পা জানালার পর্দা সরিয়ে হাত নাড়ায়। পদ্মজা মৃদু হেসে হাত নাড়াল। দূর থেকে রুম্পার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে,সে কিছু বলতে চায় পদ্মজাকে। তার ভেতর লুকানো আছে কোনো এক রহস্যময় গল্প।

'ভাবি এইনে কী করেন রাইতের বেলা?'

ভূমিকম্পে ভূমি যেভাবে কেঁপে উঠে,পদ্মজা ঠিক সেভাবেই কেঁপে উঠল। তাকিয়ে দেখল, মদনকে। সে জঙ্গলের ভেতর থেকেই এসেছে। পদ্মজা আমতাআমতা করে বলল, 'হা...হাঁটতে এসেছিলাম।'

'এই রাইতের বেলা?'

'বিকেল থেকেই। এখন ফিরে যাচ্ছিলাম।'

'চলেন এক সাথে যাই। জায়গাডা ভালা না ভাবি। আপনি হইছেন সুন্দরী মানুষ। জ্বিন,ভূতের আছর পড়ব।'

'আপনি যান। আমি আসছি।'

'আর কী করবেন এইহানে?'

পদ্মজা জঙ্গলের দিকে তাকাল। অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়! সব জঙ্গল অযত্নে বেড়ে উঠলেও এই জঙ্গল যেন যত্নে বেড়ে উঠা। সে অন্ধকারে খোঁজার চেষ্টা করল রানিকে। পেল না। এদিকে মদনের সাথে না গেলে সে বাড়িতে যদি

বলে দেয়। তাহলে অনেকের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আর একটার পর একটা মিথ্যে বলতে হবে। পদ্মজা মনে মনে পরিকল্পনা করে, মদনের সাথে বাড়ি অবধি গিয়ে আবার চলে আসবে।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট - ৩৭

মদন কিছুতেই যাচ্ছে না। আর পদ্মজা অন্দরমহলের ভেতর ঢুকতে চাইছে না। সে বার বার বলছে, 'আমি একটু হাঁটব এদিকে। আপনি যান।'

'রাইতের বেলা একলা থাকবেন। আমার কাম আপনারারে দেইখা রাখা।'

'এদিকে তো আলো জ্বলছে। উনিও আসবেন এখন। আপনি যান। আর আপনার পা তো কাদামাখা। বেশিক্ষণ এভাবে না থেকে ধুয়ে আসুন।'

মদন পায়ের দিকে তাকাল। লুঙ্গি হাঁটু অবধি তুলে বেঁধে রাখা। সে হেসে বলল, 'আইচ্ছা তাইলে আমি ধুইয়া আইতাছি। বেশিখন(বেশিক্ষণ) লাগব না।'

'আচ্ছা,আসুন।'

মদন চলে যেতেই পদ্মজা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। গলার মাঝে যেন কাঁটা বিঁধে ছিল। বাড়ির পিছনে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই দেখলে পেল আমিরকে। আমির আলগ ঘর পেরিয়ে এদিকেই আসছে। পদ্মজা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারল না। আলগ ঘরের দিকে চেয়ে রইল। আমির পদ্মজাকে দেখতে পেয়ে লম্বা করে হাসল। বলল, 'পদ্মবতী কী আমার জন্য অপেক্ষা করছে?'

'বোধহয় করছি।'

আমির ভ্রুকুটি করে বলল, 'বোধহয় কেন?'

'ঘরে একা ভালো লাগছিল না। তাই হাঁটতে বের হয়েছিলাম। আপনি নামায পরেছেন?'

'এইযে মাথায় টুপি। মসজিদ থেকে আসলাম।'

পদ্মজা আড়চোখে অন্দরমহলের ডান দিকে তাকায়। সেখানে কী সে যেতে পারবে না? পদ্মজা উসখুস করতে থাকল। আমির পদ্মজাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। আমিরের কাজে পদ্মজা হতভম্ব হয়ে গেল। দ্রুত এদিকওদিক তাকিয়ে দেখল,কেউ আছে নাকি। এরপর আমিরের হাতের বাঁধন ছুটানোর চেষ্টা করতে লাগল। আর বলল, 'ছাড়ুন,কেউ দেখবে। '

'কেউ দেখবে না। এদিকে কেউ নেই।' আমিরের কণ্ঠ মোহময়। সে পদ্মজার ঘাড়ে থুতুনি রাখল। এরপর ঠোঁটের ছোঁয়া লাগাতেই পদ্মজা কেঁপে উঠল। জোর করে আমিরের হাতের বাঁধন ছুটিয়ে সরে গেল। বলল, 'আপনি ঘরে যান।'

'আচ্ছা,চলো।'

'আপনি যান,আমি আসছি।'

'কেন? তুমি কোথায় যাবে?'

পদ্মজা নিচের ঠোঁট কামড়ে কিছু ভাবল। এরপর বলল, 'আলগ ঘরে যাব। আপনি ঘরে যান। নয়তো আম্মা আমাকে খুঁজবে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসব। এরপর সব বলব।'

'আরে, কী করবে বলবে তো।'

'আপনি যান না।'

পদ্মজা ঠেলে আমিরকে অন্দরমহলের দিকে পাঠাল। আমির অসহায় মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, 'আমিও থাকি?'

'আপনি ঘরে গিয়ে বসবেন আর আমি চলে আসব।'

পদ্মজার অনুরোধ ফেলা যাচ্ছে না। আমির না চাইতেও অন্দরমহলে চলে গেল। পদ্মজা এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে অন্দরমহলের ডান পাশে চলে আসে। সঙ্গে,সঙ্গে রানির মুখোমুখি হয়। রানি ও পদ্মজা একসাথে কেঁপে উঠল। দুজন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। রানিই আগে কথা বলল, 'রাইতের বেলা এমনে ছুটতাছো কেন?'

পদ্মজার মাথা থেকে ঘুমটা পরে গেছে সেই কখন। দৌড়ে আসাতে চুলের খোঁপাও খুলে গেছে। গাছ-গাছালির বাতাসে তিরতির করে চুল উড়ছে। তবুও সে ঘামছে। আমতাআমতা করে বলল, 'আ...আমি তো হাঁটতে বের হয়েছি। জোনাকি দেখলাম এদিকে। তাই নিতে এসেছি।'

'ওহ। কই জোনাকি। নাই তো।'

'একটু আগেই ছিল।'

'এহন তো নাই। রাইতের বেলা একলা থাকবা কেন। আসো ঘরে যাই।'

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে রানি আপা? সন্ধ্যার আযানের আগে তোমার ঘরে গেলাম। পেলাম না। এদিক দিয়ে কোথাও ছিলে? কিন্তু এদিকে তো ঝোপঝাড়,জঙ্গল।'

পদ্মজার প্রশ্নে রানির মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। কেমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠে মুখ। সে অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। কী বলবে খুঁজছে যে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পদ্মজা অপেক্ষা করছে,রানি কী বলে শোনার জন্য। পদ্মজা ডাকল, 'আপা?'

'আরে আমি ঔষধ খুঁজতে আসছিলাম।'

'কী ঔষধ?'

'তুমি চিনবা না। আসো বাড়িত যাই। মেলা রাইত হইয়া গেছে।'

রানি পদ্মজাকে রেখে এগোতে থাকল। এটাকে পালিয়ে যাওয়া বলে। পদ্মজা আর থেকে কী করবে! সেও রানির পিছু পিছু অন্দরমহলে চলে আসে। ঘরে ঢুকতেই আমির হামলা করে, 'এবার কাহিনি কী বলো তো।'

'বিশ্বাস করবেন?'

'তোমার কথা বিশ্বাস করব না, এ হয়?'

'রানি আপা প্রায় জঙ্গলের ভেতর যায়। আমি জানালা থেকে দেখি। উনি এমন ভাবে যান যেন চুরি করতে যাচ্ছেন।'

আমির শুনে অবাক হলো। সে চাপা স্বরে প্রশ্ন করল,'সত্যি! প্রায়ই যায়?'

'আমি সত্যি বলছি।'

আমির চিন্তিত হয়ে কিছু ভাবে। কপালের চামড়া কুঁচকে গেছে। গভীর ভাবনায় বিভোর সে। পদ্মজা বলল, 'আমি আজ অনুসরণ করে জঙ্গল অবধি গিয়েছিলাম। মদন ভাইয়ার জন্য ভেতরে ঢুকতে পারিনি। এরপর আপনি এলেন। পরে আবার যেতে চেয়েছি। কিন্তু ততক্ষণে রানি আপা চলে এসেছে। সরাসরি প্রশ্নও করেছি, কেন জঙ্গলে

গিয়েছিল। বলল, ঔষধ আনতে। মানে কোনো ঔষধি পাতা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি। প্রায়ই কেন কেউ ঔষধি পাতা আনতে যাবে? আবার ভোরে আর রাতে।''

পদ্মজা এক দমে কথা গুলো বলল। আমির বলল, 'আব্বাকে বলতে হবে।'

'আগে শুনুন?'

'বলো?'

'এখন কাউকে বলবেন না।'

'বলা উচিত। ব্যাপারটা জটিল মনে হচ্ছে।'

'আমরা আগে বের করি কী হয়েছে? কী করতে যায়। এরপর নিজেরা সমাধান করতে পারলে করব। নয়তো বড়দের বলব। যদিও আমরা নিশ্চিত না কোনো সমস্যা আছে।'

'অবশ্যই সমস্যা আছে। তুমি জানো, ওদিকে কোনো মহিলা ভুলেও যায় না। যেতে চায় না ভয়ে। সেখানে রানি যায়। বড় কোনো কারণ আছে।'

'আমরা বের করি সেটা?'

'কীভাবে?'

'আমার মনে হচ্ছে আবার যাবে। কাল-পরশুর মধ্যে। আমরা পিছুপিছু যাব।'

'খারাপ বলোনি।'

'কাউকে বলবেন না এখন, অনুরোধ।'

আমির হাসল। পদ্মজার কোমর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল,'বলব না।'

'আপনি কারণে-অকারণে ছোঁয়ার বাহানা খুঁজেন।'

'এতে পাপ তো নেই।'

'খাওয়ার সময় হয়েছে। চলুন। ঠিক সময়ে না গেলে আম্মা চিল্লাবেন।'

'আম্মারা চিল্লায়ই। তোমাকে খয়েরি রঙে বেশি সুন্দর লাগে।'

'আমি তো খয়েরি শাড়ি পরিনি।'

'পুরো কথা বলতে দাও।'

'আচ্ছা,বলুন।'

'আর, কালো রঙে আবেদনময়ী লাগে। আকর্ষণীয়।' আমির ফিসফিসিয়ে কথাটা বলল। পদ্মজার কানে,ঘাড়ে আমিরের নিঃশ্বাস ছিটকে পড়ে। সে ঘুরে আমিরের দিকে তাকায়। আবার চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি সবসময় আকর্ষণীয়।'

আমির হইহই করে উঠল,'সত্যি? কত,কত দিন পর একটু প্রশংসা করলে। আল্লাহ!'

পদ্মজা মৃদু আওয়াজ করে হাসল। বলল, 'প্রশংসা শুনতে খুব ভালোবাসেন?'

'অবশ্যই। তবে বউয়ের প্রশংসা করতে আরো বেশি ভালবাসি।' আমির আরো শক্ত করে পদ্মজার কোমর আঁকড়ে ধরে। পদ্মজা আমিরের দুই হাতে ধরে বলল, 'আপনি সবসময় এতো শক্ত করে কেন ধরুন? গায়ের জোর দেখান?'

'কেন? ভালো লাগে না?'

'মোটেও না। আদর করে ধরবেন।'

আমির হাতের বাঁধন কোমল করে দিয়ে বলল,'লজ্জার ছিটেফোঁটাও গিলে ফেলছো দেখছি।'

'বিয়ের এতদিন পরও কোন মানুষটা লজ্জা পায় আমাকে দেখাবেন। আমি অতো ভং ধরতে পারব না।'

'কী ঝাঁঝ কথায়।'

'এবার ছাড়ুন।'

'ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'আবার শক্ত করে ধরেছেন।'

'যদি দৌড়ে পালাও?'

'পালিয়ে আর যাব কতটুকু?'

আমির পদ্মজাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে এক হাতে কোমর চেপে ধরল। তখনই লতিফা হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে। পদ্মজা,আমির দুজন দুদিকে ছিটকে যায়। আমির ধমকে উঠল,'লুতু,কতবার বলছি না বলে ঘরে ঢুকবি না। আমাদের তো নতুন বিয়ে হয়েছে নাকি?'

পদ্মজা খেয়াল করে আমির কথাগুলো রাগে বলার চেষ্টা করলেও রাগের মতো হয়নি। পদ্মজার হাসি পেল। লতিফার মুখের অবস্থা দরজার চিপায় পড়ার মতো। সে আমিরকে ভীষণ ভয় পায়। কাচুমাচু হয়ে বলল,'খালাম্মা খাইতে যাইতে কইছে।'

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট - ৩৮

পদ্মজা নূরজাহানের পা টিপে দিচ্ছে। তার মূল উদ্দেশ্য রুম্পার ঘরে যাওয়া। সকাল থেকে বারংবার রুম্পার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছে। পারেনি। মদন কিছুতেই ঢুকতে দেয়নি। তার এক কথা, নূরজাহান না বললে ঢুকতে দিবে না। অগত্যা পদ্মজা নিরাশ হয়ে নূরজাহানের ঘরে এসে পা টিপা শুরু করে। যদি একটু পটানো যায়। ঘন্টাখানেক ধরে সে নূরজাহানের পা টিপছে। হাত ব্যাথায় টনটন করছে। নূরজাহান আয়েশ করে ঘুমাচ্ছেন। কখন যে ঘুম ভাঙবে! এভাবে কেটে যায় আরো অনেক সময়। নূরজাহান চোখ মেলে তাকান। পদ্মজাকে বললেন,'এহনো আছো?'

পদ্মজা মৃদু হাসলো। নূরজাহান বললেন,'অনেকক্ষণ হইছে। যাও, এহন ঘরে যাও।'

পদ্মজার চোখে মুখে আঁধার নেমে আসে। পরক্ষণেই মিষ্টি করে হেসে বলল, 'আপনার ভালো ঘুম হয়েছে?'

'সে হয়েছে।'

'দাদু একটা প্রশ্ন করি?'

'করো।'

'রুম্পা ভাবিকে যেদিন দেখেছিলাম অনেক নোংরা দেখাচ্ছিল। উনাকে পরিষ্কার রাখার জন্য একটা মেয়ে দরকার। কিন্তু সবসময় মদন ভাইয়া পাহারা দেন।'

'ষাড়ের লাকান শক্তি ওই ছেড়ির। হের লগে ছেড়িরা পারব না। সবাই ডরায়।

'তাই বলে,এভাবে অপরিষ্কার থাকবে সবসময়।'

'সবাই ডরায়। কেউ যাইব না সাফ কইরা দিতে। তুমি বেহুদা কথা বলতাছো।'

নূরজাহানের কঠিন কণ্ঠের সামনে পদ্মজার আসল কথাটাই মুখে আসছে না। সে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় আমি পারব। ভাবি আমাকে আঘাত করবে না। আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিতেন যদি।'

'পাগল হইছো ছেড়ি? কেমনে খামচাইয়া ধরছিল মনে নাই? আর কথা কইয়ো না। যাও এন থাইকা।'

পদ্মজা আর কিছু বলার সাহস পেল না। সে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। দুই তলার বারান্দা থেকে আলগ ঘরের সামনের খালি জায়গা দেখা যাচ্ছে। সেখানে গ্রামের মানুষের ভীড়। মজিদ হাওলাদার তার লোকজন নিয়ে গ্রামের মানুষদের সমস্যা শুনছেন। কাউকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছেন, কাউকে বা ধান দিয়ে। এই ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে। পদ্মজার খুব ভালো লাগে। গর্ব হয়।

পূর্ণা ঘাটে বসে আছে। মাদিনী নদীর জলের স্রোতে তার দৃষ্টি স্থির। প্রান্ত,প্রেমা স্কুলে গিয়েছে। সে যায়নি। ইদানীং সে স্কুলে যায় না একদমই। ভালো লাগে না। পদ্মজা যাওয়ার পর থেকে সব যেন থমকে গেছে। পদ্মজার শূন্য জায়গাটা কিছুতেই পূর্ণা মানতে পারছে না। বাড়ির প্রতিটি কোণে সে পদ্মজার স্মৃতি খুঁজে পায়। এইতো এই ঘাটে বসে দুজন কত সময় পার করতো। কত গল্প করতো। আজ পদ্মজার জায়গা শূন্য। পূর্ণা অনুভব করে,সে তার মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসে পদ্মজাকে। পদ্মজার প্রতিটি কথা কানে বাজে। এতদিন হয়ে গেল,তবুও এই শোক,এই শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে। পূর্ণার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। সে নিচের ঠোঁট কামড়ে দুইবার ডাকল,'আপা...আপারে।'

বাসন্তী দূর থেকে পূর্ণাকে দেখতে পেলেন। জুতা খুলে পা টিপে হেঁটে আসেন। পূর্ণার পাশে বসেন। পূর্ণা এক ঝলক বাসন্তীকে দেখে দ্রুত চোখের জল মুছল। এরপর বলল, 'আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে পূর্ণা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বাসন্তীর দিকে তাকাল। দেখতে পেল, বাসন্তীকে আজ অন্যরকম লাগছে। আরেকটু খেয়াল করে বুঝতে পারল অন্যরকম কেন লাগছে। আজ বাসন্তীর ঠোঁটে লিপস্টিক নেই,কপালে টিপ নেই,চোখে গাঢ় কাজল নেই। থুতুনির নিচে সবসময় কালো তিনটা ফোঁটা দিতেন সেটাও নেই। পূর্ণা বাসন্তীর হাতের দিকে তাকাল। হাতেও দুই-তিন ডজন চুড়ি নেই। দুই হাতে শুধু দুটো সোনার চিকন চুড়ি। পূর্বের প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করে পূর্ণা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি আজ সাজেননি?'

'না ছাজলে ভালো লাগে না?' বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন বাসন্তী।

পূর্ণা বাসন্তীর চোখেমুখে স্নিগ্ধতা খুঁজে পেল। মায়াবী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চকচকে গাল। চল্লিশের উপর বয়স মনেই হয় না। কিন্তু মুখে কিছু বলল না পূর্ণা। সে চোখ সরিয়ে নিল। বাসন্তী বললেন,'আমার সাথে গপ করবা?'

'আমার ঠেকা পড়েনি।' পূর্ণার ঝাঁঝালো স্বর।

বাসন্তী পূর্ণার পাশ ঘেঁষে বসেন। পূর্ণা বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল। কিছু কঠিন কথা শোনানোর জন্য প্রস্তুত হলো সবেমাত্র। তখন বাসন্তী বললেন,'আম্মা, আমি তোমার আব্বারে ভালোবাছছিলাম ছত্যি। তবুও ছেছ বয়ছে আইছছা একটা ভুল করে ফেলি। ভুল যখন বুঝতে পারি তোমার আব্বারে বলি। কিন্তু তোমার আব্বা মুখ ফিরাইয়া নিল। আমার তোমার আব্বা ছাড়া আর গতি ছিল না। তাই গ্রামের মানুছ নিয়া আছছিলাম। আমার এই কাজের জন্যে তোমাদের এতো বড় ক্ষতি হবে জানলে এমন করতাম না। যাক গে ছেছব কথা। তোমার আব্বা আমারে আজও মেনে নেয় নাই। তাতে আমার দুঃখ নাই। তোমার আম্মার মতো একটা ছোট বইন পাইছি। তোমার দুইডা ভাই বইনের মতো ছন্তান পাইছি। আমি নিঃছন্তান। আমার কোনো ছন্তান নেই। কখনো হবেও না। ছন্তানের ছূন্যতা আমাকে খুঁড়ে খুঁড়ে খায়। তোমাদের বাড়িতে আছার পর থেকে সেই দুঃখ ঘুচে গেছে। প্রান্ত,প্রেমা যখন আমারে বড় আম্মা কইয়া ডাকে,আমার খুছিতে কান্দন আইছছা পড়ে। ছুধু ভালো লাগে না তোমার গুমট মুখটা। বিছ্বাস করো আম্মা,তোমার মারে আমি তাড়াতে আছি নাই। ছে হইছে গিয়া হীরার টুকরা। তার মতো মানুছ হয় না। আমি

যা চেয়েছি তার চেয়েও বেছি পাইছি। ছেটা তোমার আম্মা দিছে। আমি চাই না আমার জন্যে তুমি কষ্ট পাও। আমি তোমারে বলব না আমারে আম্মা ডাকতে। আমি ছুধু চাই তুমি আমাকে মেনে নাও। ভালো থাকো। হাছিখুছি থাকো। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। তোমরা যেমনে বলবা আমি তেমনেই চলব। এইযে দেখো,তোমার ছাজগোজ পছন্দ না বলে আমি আজ ছাজি নাই। আর কোনোদিনও ছাজব না। আমি কী কম ছুন্দর নাকি যে ছাজতেই হবে।'

পূর্ণার মন ছুঁতে পেরেছে বাসন্তীর কথা। পূর্ণা বরাবরই কোমল মনের। তবুও শক্ত কণ্ঠেই বলল, 'আমি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আপনি আপনার মতো থাকুন প্রেমা,প্রান্তকে নিয়ে। আমি আমার মতো থাকব আমার মাকে নিয়ে। আমার আর কারোর বন্ধুত্বদরকার নেই।'

বাসন্তীর চোখ ছলছল করছে। তবুও তিনি হাসতে কার্পণ্য করলেন না। বললেন,'তোমার চুল অনেক ছুন্দর আর লম্বা। এখন তো ভরদুপুর। বাইন্ধা রাখো।'

পূর্ণা চুলগুলো হাত খোঁপা করে নিল। এরপর বলল, 'আম্মা এখনও ঘুমে?'

'হ।'

'আম্মার কী যে হয়েছে। কখনো একদমই ঘুমায় না। আর কখনো ঘুম ছেড়ে উঠতেই পারে না। '

'পদ্মজার জন্যে কান্ধে দেখি। ছরীর দূর্বল হয়ে পড়ছে। এজন্যই ঘুমাচ্ছে।'

পূর্ণা উঠে দাঁড়ায়। বাসন্তী বললেন,'আমি রানছি বলে ছকালে খাইলা না। এখন নিয়া আছি ভাত?'

'পরে খাব।' বলে পূর্ণা দ্রুত পায়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

হেমলতার ঘরে এসে দেখল,তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চুল ছড়িয়ে আছে বালিশে। কেমন শুকিয়ে গেছেন। এতক্ষণ না খেয়ে থাকলে তো আরো শুকাবে। ডাকা উচিত। পূর্ণা ডাকল, 'আম্মা....আম্মা।'

হেমলতা সাড়া দিলেন না। পূর্ণা ঝুঁকে হেমলতার গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, 'ও আম্মা। উঠো এবার। দুপুর হয়ে গেছে। আম্মা...ও আম্মা।'

হেমলতা চোখ খুলেন। চোখের মণি ফ্যাকাসে। তিনি উঠতে চাইলে হুট করে হাত কাঁপতে থাকল। পূর্ণা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল,'কী হয়েছে আম্মা?'

হেমলতা কিচ্ছুটি বললেন না। পূর্ণা হেমলতাকে ধরে উঠাল। হেমলতা পূর্ণার দিকে চেয়ে থেকে ক্ষীন স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কে তুমি?'

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ৩৯

হেমলতার এহেন প্রশ্নে পূর্ণা চমকে উঠল। চাপা স্বরে অবাক হয়ে উচ্চারণ করল, 'আম্মা!'

সেকেন্ড কয়েক পর পূর্ণার উপর থেকে হেমলতা চোখ সরিয়ে নিলেন। পূর্ণা বলল,'আমাকে চিনতে পারছো না?'

হেমলতা বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন, 'ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। তাই এমন হয়েছে। সবার খাওয়াদাওয়া হয়েছে?'

পূর্ণা তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। হেমলতা পূর্ণার দিকে তাকান। জিজ্ঞাসা করেন, 'কী রে? কিছু জিজ্ঞাসা করেছি না?'

'হয়েছে। দুপুরের আযান পড়বে।'

'এতক্ষণ ঘুমিয়েছি! আরো আগে ডাকতে পারলি না?'

'ঘুমাচ্ছিলে আরাম করে। তাই ডাকিনি।'

'ফজরের নামাযটা পড়া হলো না। এখন কাযা পড়তে হবে। তুই নামায পড়েছিলি তো?'

'পড়েছি।'

'খেয়েছিস?'

'না।'

'এরকম করে আর কতদিন চলবে? যা খেয়ে নে।'

পূর্ণা বাধ্য মেয়ের মতো হেঁটে চলে গেল রান্নাঘরে। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। কতক্ষণ না খেয়ে রাগ করে থাকা যায়? হেমলতা খোলা চুল হাত খোঁপা করে নেন। এরপর কলপাড়ের দিকে যান। অযু করে ঘরে ঢোকার সময় দেখেন,পূর্ণা খাচ্ছে। তিনি পূর্ণার উদ্দেশ্যে বললেন, 'খাওয়া শেষ করে ঘরে আসিস।'

পূর্ণা খেয়েদেয়ে থালা ধুয়ে গুছিয়ে রাখে। রান্নাঘর থেকে বের হয়ে দেখে, চারা গাছ লাগানোর জন্য বাসন্তী উঠানের এক কোণে বসে মাটি খুঁড়ছেন। পূর্ণা দৃষ্টি সরিয়ে হেমলতার ঘরে আসে। এসে দেখে হেমলতা জায়নামাজে অসম্ভব উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন। পূর্ণা ডাকল,' আম্মা?'

হেমলতা চমকে তাকান। পূর্ণা দ্বিতীয়বারের মতো অবাক হয়। চমকানোর কী এমন হলো? হেমলতা স্বাভাবিক হয়ে বসেন। জায়নামাজ ভাঁজ করেন ধীরেসুস্থে। এরপর পূর্ণাকে কাছে এসে বসতে বলেন। পূর্ণা পাশে এসে বসে। হেমলতা ভারী কণ্ঠে বললেন,'আপার(বাসন্তী) প্রতি তোর এতো রাগ কেন? আম্মাকে বল?'

'এখন রাগ নেই।'

'প্রেমা-প্রান্তের মতো মিলেমিশে থাকতে পারবি না? ওরা বড় আম্মা ডাকে। তুই শুধু খালাম্মা ডাকবি।'

'মাত্র উঠলে ঘুম থেকে। আগে খাও। এরপর কথা বলব।'

'আমি এখনই বলব। কথাগুলো বলব বলব করে বলা হয়নি। দেখ পূর্ণা, আপা অন্য পরিবেশে বড় হয়েছে,থেকেছে তাই একটু অন্যরকম। তাই বলে মানুষটা তো খারাপ না। আপা সত্যি একটা সংসার চায়। পরিবারের একজন সদস্য ভাবতে দোষ কোথায়? বাকি জীবনটা কাটাক না আমাদের সাথে। আমার কাজকর্মের একজন সঙ্গীও হলো। বয়স তো হচ্ছে,একা সব সামলানো যায়? আপারও বয়স হচ্ছে। কিন্তু দুজনে মিলে তো কাজ করতে পারব। কয়দিন পর তোর বিয়ে হবে,প্রেমার বিয়ে হবে। শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি। তখন আমার একজন সঙ্গী থাকলো। আর এমন নয় যে,আপার মনে বিষ আছে। আপারও ভালো সঙ্গ দরকার। ভালো পরিবেশ, ভালো সংসার। আমি দেখেছি, আপা কত সুখে আছে এখানে। প্রেমা-প্রান্তর জন্য জান দিয়ে দিতে প্রস্তুত। নিঃসন্তান বলেই হয়তো এমন। আপা কিন্তু এখন আমাদের ছাড়া অসহায়। উনার মা মারা গেছে। বাবা তো নেই। আত্মীয়-স্বজন নেই। এই বয়সে যাবে কই? আমরা একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিতে পারি না? সতিন হলেই সে খারাপ হবে,সৎ মা হলেই সে খারাপ হবে এমন কোনো বাণী আছে?'

পূর্ণা বেশ অনেকক্ষণ চুপ রইল। এরপর বলল,'কিন্তু উনি অনেক সাজগোজ করেন। যদিও আমাকে কিছুক্ষণ আগে বলেছেন,আর সাজবেন না। তবে,উনার কথার ধরণ আমার ভালো লাগে না। স কে ছ উচ্চারণ করেন। শুদ্ধ-অশুদ্ধ মিলিয়ে জগাখিচুড়ি বানিয়ে কথা বলেন।'

হেমলতা পূর্ণার কথায় হাসলেন। পূর্ণা ওড়নার আঁচল আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে এদিকওদিক তাকাচ্ছে। হেমলতা পূর্ণার মাথায় হাত রাখেন। বললেন, 'তোর আপা যদি প্রান্তকে শুদ্ধ ভাষা রপ্ত করিয়ে দিতে পারে। তুই তোর বাসন্তী খালাকে স উচ্চারণ শিখাতে পারবি না?'

'উনি শিখবেন?'

'বললে,অবশ্যই শিখবেন।

'সত্যি?'

'বলেই দেখ।'

'এখন যাব?'

'যা।'

'যাচ্ছি।'

পূর্ণা ছুটে বেরিয়ে গেল। হেমলতা মৃদু হেসে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন। সেলাই মেশিনের সামনে বসেন। অনেকগুলো কাপড় জমেছে। সব শেষ করতে হবে।

উঠানে বাসন্তীকে পেল না পূর্ণা। এদিকওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকল। বাসন্তী কলপাড় থেকে হাত পা ধুয়ে বেরিয়ে আসেন। পূর্ণা কথা বলতে গিয়ে দেখে জড়তা কাজ করছে। দুই তিনবার ঢোক গিলে ডাকল, 'শুনুন?'

বাসন্তী দাঁড়ালেন। পূর্ণাকে দেখে হাসলেন। পূর্ণা এগিয়ে এসে বলল, 'আপনাকে আমি পড়াব।'

'কী পড়াইবা?'

'লাহাড়ি ঘরের বারান্দায় আসেন আগে।'

বাসন্তী কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। তবুও পূর্ণার পিছু পিছু গেলেন। বারান্দার চৌকির উপর পূর্ণা বসল। পূর্ণার সামনে বাসন্তী বসেন উৎসুক হয়ে। পূর্ণা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে দন্ত-স উচ্চারণ শেখাব আমি।'

'দন্ত-ছ উচ্চারণ তো আমি পারি।'

'আপনি দন্ত-স না বলে দন্ত-ছ বলেন। শুনতে ভালো লাগে না। বলুন, দন্ত-স।'

বাসন্তী থতমত খেয়ে যান। চোখ ছোট ছোট করে বললেন, 'দন্ত-ছ।'

'হয়নি। বলুন, দন্ত-স।'

'দন্ত-ছ।'

'আবারও হয়নি। আচ্ছা বলুন, সংসার।'

'ছংছার।'

'স-ং-সা-র।'

'ছ...সওও-ং-চ..সার।'

সংসার উচ্চারণ করতে করতে পূর্ণার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়েন বাসন্তী। পূর্ণা বলল,'উপরে চলে আসছেন কেন? দূরে বসুন।'

বাসন্তী দ্রুত সোজা হয়ে বসেন। পূর্ণা বলল, 'এবার বলুন, সন্তান।'

'স..সন্তান।'

'ফাটাফাটি! হয়ে গেছে। এবার বলুন,আসছে।'

'আছছে।'

'আরে,আবার ছ উচ্চারণ করছেন কেন? বলুন, আসছে। আ-স-ছে।'

'আ-স-ছে।'

'হয়েছে। এবার বলুন, সাজগোজ।'

'সাজগোছ।'

হাওলাদার বাড়ির পুরুষেরা একসাথে বসেছে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য। আলমগীর, খলিল সবাই আজ উপস্থিত আছে। আমির দুই দিন পর শহরে ফিরবে। তাই আলমগীর চলে এসেছে। অতিরিক্ত গরম পড়েছে। বাড়ির চারপাশে এতো গাছপালা তবুও একটু বাতাসের দেখা নেই। আমিনা,লতিফা বাতাস করছে। পদ্মজা,ফরিনা,রিনু খাবার বেড়ে দিচ্ছে। পদ্মজা আমিরের থালায় মাংস দিতেই আমির বলল, 'তুমি কখন খাবে?'

পদ্মজা চোখ তুলে তাকায়। বলল, 'আম্মার সাথে।'

'এখন বসো না।'

'জেদ ধরবেন না। অনুরোধ। ' ফিসফিসিয়ে বলল পদ্মজা।

এরপর মাছের তরকারি আনার জন্য রান্না ঘরে যায়। বাটিতে করে মাছের ঝোল নিয়ে ফিরে আসে। আমিরের দিকে চোখ পড়তেই আমির চোখ টিপল। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে হাসে। আলমগীরের থালায় মাছের ঝোল দেওয়ার সময় খেয়াল করল, আলমগীর বেশ ফুর্তিতে আছে। বয়স পঁয়ত্রিশ হবে। এসে একবারও রুম্পার কথা জিজ্ঞাসা করল না। কী অদ্ভুত! বউয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া,ভালোবাসা নেই যে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

রানি,লাবণ্য ছুটে এসে বাপ-চাচার মাঝে বসে। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সবাই বিভিন্ন রকম আলোচনা করছে। রানির বিয়ে নিয়ে বেশি কথা হচ্ছে। খুব দ্রুত রানির বিয়ে দিতে চান তারা। আচমকা রানি গড়গড় করে বমি করতে আরম্ভ করল। সবাই বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল। প্রতিটি খাবারের থালা নষ্ট হয়ে যায়। আমিনা দ্রুত

রানিকে ধরে কলপাড়ে নিয়ে যান। লাবণ্য,পদ্মজা,নূরজাহান, ফরিনা ছুটে যান পিছু পিছু। বাড়ির পুরুষেরা হাত ধুয়ে উঠে পড়ে। মুহূর্তে একটা হইচই লেগে গেল।

রানি বমি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে কলপাড়ে বসে পড়ে। আমিনা হায় হুতাশ করে বিলাপ করছেন, 'আমার ছেড়িডার কী হইলো? কয়দিন ধইরা খালি বমি করতাছে। জ্বীনের আছড় লাগল নাকি। কতবার কইছি যহন তহন ঘর থাইকা বাইর না হইতে। '

লাবণ্য তথ্য দিল, 'আপা রাতেও ছটফট করে। ঘুমাতে পারে না।'

আমিনা কেঁদে কূল পাচ্ছেন না। রানির চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। তিনি রানিকে প্রশ্ন করলেন, 'আর কী কষ্ট হয় তোর? ও আম্মা কবিরাজ ডাকেন। আমার ছেড়িডার কী হইলো।'

রানি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'মাথাডা খালি চক্কর মারে।'

নূরজাহান চোখ দু'টি বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন, 'এই ছেড়ি তোর শরীর খারাপ শেষ কবে হইছে?'

'দুই মাস হবে।' কথাটা বলে রানি চমকে উঠল। সবাই কী ধারণা করছে? সে চোখ তুলে উপরে তাকায়। সবাই উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে। রানির শরীর কাঁপতে থাকে। আমিনা মেয়েকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এমন কিছু হয় নাই আম্মা। আপনি ভুল বুঝতাছেন। আমার ছেড়ি এমন না।'

'হেইডা কবিরাজ আইলে কওয়া যাইব। এই ছেড়ির জন্যে যদি এই বাড়ির কোনো অসম্মান হয় কাইট্টা গাঙে ভাসায়া দিয়াম। মনে রাইখো বউ।' নূরজাহান বললেন রাগী স্বরে। রানির গলা শুকিয়ে কাঠ! হৃৎপিণ্ড দ্রুত গতিতে চলছে। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। একসময় মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল আমিনার কাঁধে। আমিনা চিৎকার করে উঠলেন, 'ও রানি...'

#পদ্মজা

চলবে..

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট -৪০

রানির অবস্থা বেগতিক। খলিল হাওলাদার দরজা বন্ধ করে এলোপাথাড়ি মেরেছেন। কারো কথা শুনেননি। রিদওয়ান বাড়ির কাজের মানুষদের হুমকি দিয়েছে, রানি গর্ভবতী এই খবর বাইরে বের হলে সব কয়টাকে খুন করবে। মগা,মদন,লতিফা,রিনু ভয়ে আধমরা। তারা নিঃশ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছে। কেউ যদি বাইরে এই খবর বের

করে, নিশ্চিত সবাই তাদেরই ভুল বুঝবে। রানি মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সারা গায়ে মারের দাগ। ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। আমিনা রানিকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছেন। খলিল হাওলাদারকে বার বার পাষাণ বাপ বলে আখ্যায়িত করছেন। পদ্মজা পরিষ্কার কাপড়,পানি এনে ফরিনার হাতে দিল। ফরিনা রানির মুখে পানি ছিটিয়ে দেন। রানি কিছুতেই চোখ খুলছে না। লাবণ্য ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রানির সাথে তার সবসময় ঝগড়া হয় ঠিক। তবে ভালোও তো বাসে। দরজা বাইরে থেকে শুনেছে রানির চিৎকার। রানি চিৎকার করে ডাকছিল, 'আম্মা,দাভাই,লাবণ্য কই তোমরা? আব্বা মাইরা ফেলতাছে। বাঁচাও তোমরা আমারে। লাবণ্য কই তুই? আম্মা....।'

দরজায় সবাই মিলে অনেক ধাক্কা দিয়েছে,ডেকেছে, খলিল হাওলাদার সাড়া দেননি। এক নিঃশ্বাসে মেরে গেছেন। রানিকে মাটিতে ফেলে জোরে জোরে লাথি মেরেছেন। রাগের বশে রানির তলপেটে বেশি আঘাত করেছেন। আর রানি আকাশ কাঁপিয়ে কেঁদেছে। কেউ পারেনি ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে। পদ্মজা আমিরের পাঞ্জাবি দুই হাতে খামচে ধরে কান্নামাখা কণ্ঠে অনুরোধ করেছে, 'আল্লাহর দোহাই লাগে আপনি এসব থামান। চেষ্টা করুন।'

আমির অনেক চেষ্টা করেছে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করার। পারেনি। যখন করাত আনার জন্য প্রস্তুত হয় তখন খলিল হাওলাদার বেরিয়ে আসেন। রানির গলার স্বর থেমে যায়। আর শোনা যাচ্ছে না। সবাই ভেতরে প্রবেশ করে দেখে, রানি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। শরীর রক্তাক্ত। আমিনা 'রানি' বলে চিৎকার করে উঠেন। ছুটে আসেন রানির কাছে। মগাকে পাঠানো হয়েছে আবার কবিরাজকে নিয়ে আসতে। এতো কিছু হয়ে যাচ্ছে,নূরজাহান একবারও নিচে নেমে আসেননি। রানি গর্ভবতী শুনে সেই যে উপরে গিয়েছেন তো গিয়েছেনই! আর আসার নাম নেই। এতো চেঁচামিচি শুনেও কী আসতে ইচ্ছে হয়নি? এতোই কঠিন মন!

কবিরাজ আসার অনেকক্ষণ পর রানি চোখ খুলে। ফরিনা আমিনাকে বললেন, 'ছেড়ির বিয়া দিতে কইছিলাম। দিলি না। ছেড়ির কথা হুনছিলি তোরা। এহন তো মজা বুঝতেই হইবো। বিশ বছরের যুবতী ছেড়ি এখন বাপের ঘরে থাহে?'

আমিনা কিছু বলতে পারলেন না। আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছেন। মজিদ ঘরে প্রবেশ করেন। ফরিনাকে কিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েকে জিজ্ঞাসা করো,এই আকামের সাথী কে?'

পদ্মজা ধীরপায়ে পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়ায়। মাথায় ঘোমটা টানা। ফরিনা রানিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাচ্চার বাপ কেডায়?'

রানি কিছু বলছে না। ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে। চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। ফরিনা তেজ নিয়ে বললেন, 'কী রে ছেড়ি? এহন কথা আয় না কেন? বাচ্চার বাপের নাম কিতা? কইবি তো। বিয়া তো দেওন লাগব।'

তবুও রানি চুপ। তার কান্নার বেগ বেড়ে গেছে। মজিদ হাওলাদার লাবণ্যকে ডাক দিলেন, 'লাবণ্য?'

লাবণ্য কেঁপে উঠল। মজিদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর তো জানার কথা। একসাথে থাকিস। কার সাথে রানির সম্পর্ক ছিল?'

লাবণ্য মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। আড়চোখে রানিকে দেখে। রানি অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। লাবণ্য বুঝে উঠতে পারছে না,তার কী বলা উচিত? মজিদ ধমকে উঠলেন, 'লাবণ্য, সত্য বল। কিছু লুকানোর চেষ্টা করবি না। তাহলে তোরও এই দশা হবে।'

লাবণ্য ভয়ের চোটে গড়গড় করে বলতে থাকল, 'আপার সাথে আবদুল ভাইয়ের প্রেম আছে। দুইজনে প্রায়ই দেখা করে বাড়ির পিছনে। খালের পাড়ে। অনেক বছর হইছে প্রেমের।'

রানির কান্নার শব্দ বেড়ে যায়। ফরিনা ঝাঁঝালো কণ্ঠে রানিকে বলেন, 'এই ছেড়ি চুপ কর! এহন মেলাইতাছস কেরে? কুকাম করার সময় মনে আছিলো না? আমরারে কইতে পারলি না তোর আবদুলরে পছন্দ। আর আবদুলই কেমন ধাঁচের মানুষ? প্রস্তাব লইয়া আইতে পারে নাই? তোরে ডাইকা লইয়া কুকাম কইরা বেড়াইছে।'

'নিজের বাড়ি বানায়া প্রস্তাব লইয়া আইবো কইছিল।' রানি কাঁদতে কাঁদতে বলল। ফরিনা পাল্টা বললেন, 'কয়দিন তর সয় নাই? শরীর গরম হইয়া গেছিল বেশি? খারাপ ছেড়ি কোনহানের।'

আমির ঘরে ঢুকতেই মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আবদুলরে ধরে নিয়ে আয়।'

আমির অবাক হয়ে বলল,'আবদুল করছে এই কাজ? ও তো এমন না।'

'মুখ দেখে বোঝা যায় কে কেমন?'

আমির উত্তরে কিছু বলল না। রানি আহত দূর্বল শরীর নিয়ে দ্রুত বিছানা থেকে নামে। আমির ঘর থেকে বেরোনোর জন্য পা বাড়িয়েছে সবেমাত্র। রানি আমিরের পায়ে ধরে বসে পড়ে। আকুতি করে বলল, 'দাভাই, উনারে কিছু কইরো না। উনারে মাইরো না। আমি তোমার পায়ে পড়ি। ও কাকা,আমারে মারো। উনারে মাইরো না।'

'কী পাগলামি করছিস? পা ছাড়,রানি।'

'দাভাই, দোহাই লাগে।'

আমির রানিকে দুই হাতে তুলে দাঁড় করাল। এরপর কোমল কণ্ঠে বলল, 'কিছু করব না। শুধু নিয়ে আসব। বিয়ে পরিয়ে দেব।'

'সত্যি দাভাই?'

'সত্যি।'

রানি হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছে। আমির বেরিয়ে যায়। মজিদ চোখমুখ কঠিন অবস্থানে রেখে ঘর ছাড়েন। রানি মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যেতে নিলেই পদ্মজা ধরে ফেলে। আমিনা,ফরিনা এগিয়ে আসেন। তারপর রানিকে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বিয়ে হবে শুনে ভেতরে ভেতরে রানির খুব আনন্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগের সব মার, ব্যাথা তুচ্ছ মনে হচ্ছে। রানি আবদুলকে এতো বেশি ভালোবাসে যে,আবদুলের এক কথায় সে বিয়ের আগে ঘনিষ্ঠ হতে রাজি হয়। যখন যেখানে যেতে বলেছে,তখন সেখানেই গিয়েছে। দ্বিতীয়বার ভাবেনি। অন্ধভাবে ভালোবেসেছে। কতদিনের স্বপ্ন! কত আশা! পূরণ হবে অবশেষে। রানি নিজের অজান্তে বাঁকা হাসে। তৃপ্তিকর হাসি! কিছু পাওয়ার হাসি! উপস্থিত আর কেউ খেয়াল না করলেও, সেই হাসি পদ্মজা খেয়াল করে। এই হাসি বেশিক্ষণ থাকল না। বিকেলবেলা আমির দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরল। আবদুল খুন হয়েছে গত রাতে! মাদিনী নদীতে লাশ পাওয়া গেছে। আবদুলের বাড়িতে পুলিশের ভীড়! রানির কানে কথাটা আসতেই এক চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।জীবনের সুখের আলো নিভে যায়। নিভে যায় স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছের প্রদীপ।

পদ্মজা এই খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিটা মৃত দেহ নদীতেই কেন পাওয়া যায়? এতে কী প্রমাণ পানির সাথে ধুয়ে যায়? আগের খুন গুলোর খুনি কী এই আবদুলের খুনি? পদ্মজা চেয়ার টেনে বসে। মাথা ব্যাথা

করছে খুব। রগ দপদপ করে কাঁপছে। চোখ বন্ধ করে ভাবে, এই অলন্দপুরে পাপের সাম্রাজ্য কারা তৈরি করেছে? ভাবতে গেলে শরীর কেমন করে! শূন্য হাত নিয়ে ভাবনা থেকে বের হতে হয়। কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা পাট - ৪১

সূর্যমামার ঘুম ভাঙতে তখনো বাকি। তবে তার আগেই ডাকাডাকি করে সবার ঘুম ভাঙানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে পাখিরা। পদ্মজা স্বামীর বুকের ওম ঝেড়ে ফেলে অজু করে আসে। এসে দেখে তার সোহাগের স্বামী এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পদ্মজা ডেকে তুলে, একসাথে ফজরের নামায আদায় করে। নামায শেষ করেই আমির ঘুমিয়ে পড়ে। পদ্মজা রান্নাঘরে যায়। গিয়ে দেখে,ফরিনা বেগম এখনও আসেননি। আজ মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল। উত্তেজনায় পদ্মজার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। সে পায়চারি করতে করতে লাবণ্যর ঘরের সামনে আসে। দরজা খোলা। পদ্মজা বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, রানি মাটিতে বসে আছে। উদাস হয়ে কিছু ভাবছে। রাতে ঘুমায় না। নিজের মতো জগত করে নিয়েছে। খাবার রেখে যাওয়া হয়,যখন ইচ্ছে হয় খায়। পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এরপর জায়গা ত্যাগ করল। রানি অন্য কাউকে দেখলে খুব রেগে যায়। তাই এই ভোরবেলা তার সামনে না যাওয়াই মঙ্গল। পদ্মজা সদর ঘরে পায়চারি করতে থাকল। ফরিনা বেগম তাসবিহ পড়তে পড়তে সদর ঘরে প্রবেশ করেন। পদ্মজাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, 'উইট্টা পড়ছ তুমি! চুলায় আগুন ধরাইছো?'

পদ্মজা অপরাধীর মতো মাথা নত করে 'না' উচ্চারণ করল। ফরিনা এ নিয়ে কথা বাড়ালেন না। মৃদু কণ্ঠে আদেশ করলেন, 'লাবণ্যরে ডাইককা তুলো গিয়া। ছেড়িডা আইজও মানুষ হইলো না। ভোরের আলো ফুইটা গেছে। হে এহনও ঘুমায়।'

'আচ্ছা,আম্মা।'

পদ্মজা আবার লাবণ্যর ঘরের সামনে আসল। এবার আর বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে চলে যায়নি। ভেতরে ঢুকল। পদ্মজা আওয়াজ করে দরজা খুলে। তাও রানির ভাবান্তর হলো না। সে যেভাবে মাটিতে বসে জানালার বাইরে

তাকিয়ে ছিল,সেভাবেই রয়েছে। পদ্মজা রানির দিকে চেয়ে চেয়ে পালঙ্কের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এরপর লাবণ্যকে ডাকল, 'এই লাবণ্য। লাবণ্য?'

লাবণ্য আড়মোড়া ভেঙে ঘুমু ঘুমু চোখে পিটপিট করে তাকিয়ে বলল, 'উ?'

'আজ ফলাফল। আর তুই ঘুমাচ্ছিস।'

পদ্মজার কথা বুঝতে লাবণ্যর অনেক সময় লাগল। যখন বুঝতে পারল লাফিয়ে উঠে বসল। বুকে হাত রেখে, হাসঁফাঁস করতে করতে বলল, 'কী বললি এটা! দেখ কলিজাডা লাফাইতাছে। কী ভয়ানক কথা মনে করায়া দিলি, উফ!'

পদ্মজা হাসল। বলল, 'কলিজা লাফায় না,বুক ধুকপুক করে।'

'হ,ওইটাই...ওইটাই। আমি ফেইল করব। রানি আপার মতো মাইর খাব দেখিস। আমার শ্বাস কষ্ট হইতাছে।' লাবণ্য ভয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সে আতঙ্কে আছে। এই চিন্তায় রাতে ঘুম আসেনি। ঘুমাতে ঘুমাতে মাঝরাত হয়ে গেছে। পদ্মজা লাবণ্যর ছটফটানি দেখে ভয় পেয়ে যায়। স্বান্তনা দিয়ে বলল, 'এমন কিছুই হবে না, দেখিস। বেহুদা চিন্তা করছিস। সূর্য উঠে যাবে। নামায পড় জলদি। আল্লাহর কাছে দোয়া কর।'

লাবণ্য হুড়মুড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে,কলপাড়ে ছুটে যায়। এইবার পদ্মজা হেসে ফেলল। রানির দিকে চোখ পড়তেই হাসিটা মিলিয়ে যায়। রানি কাঁদছে। পদ্মজা দুই পা রানির দিকে এগিয়ে আবার পিছিয়ে যায়।

আবার এগিয়ে যায়। রানির পাশে বসে ডাকল, 'আপা?'

রানি চোখ ভর্তি অশ্রু নিয়ে তাকায়। পৃথিবীর সব কষ্টরা বুঝি এক জোট হয়ে রানির চোখে ভীড় জমিয়েছে। রানি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'প্রিয় মানুষ হারানোর কষ্ট এতোডা যন্ত্রনা কেন দেয় পদ্মজা? তুমি তো অনেক জ্ঞানী। সবাই তোমারে বুদ্ধিমতী কয়। তুমি একটা বুদ্ধি দেও না। এই কষ্টের পাহাড় কমানোর বুদ্ধি। আমারে দেখায়া দিবা শান্তির পথ?'

মানুষের কতটা কষ্ট হলে এভাবে শান্তি খুঁজে? পদ্মজার চোখ টলমটল করে উঠে। সে ঢোক গিলে বলল, 'পুরনো স্মৃতি মুছে সামনের কথা ভাবো। নামায পড়ো, হাদিস পড়ো,কোরআন পড়ো। একদিন ঠিক শান্তি খুঁজে পাবা।'

'আমার মতো পাপীরে আল্লাহ কবুল করব?'

'আল্লাহ তায়ালার মতো দয়াবান, উদার আর কেউ নেই। পাপ মুছার জন্য অনুতপ্ত হয়ে সেজদা দিয়েই দেখো না আপা। ক্ষমা চেয়ে দেখো। আল্লাহ ঠিক তোমার জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। সেদিন বুঝবে,আল্লাহ তোমার সেজদা কবুল করেছেন।'

রানি জানালার বাইরে তাকায়। আমগাছের ডালে চোখ রেখে বলল, 'কেন এমনডা হইলো আমার সাথে?'

"ব্যভিচার করেছো আপা। বিয়ের আগে এভাবে...! আপা এসব ভেবো না আর। যা হওয়ার হয়েছে।'

'দুনিয়াত আর চাওনের বা পাওনের কিচ্ছু নাই আমার।'

'আখিরাতের জন্য সম্পদ জমাও এবার।'

রানি অন্যরকম দৃষ্টি নিয়ে পদ্মজার দিকে তাকায়। পদ্মজা মাথায় সোজা সিঁথি করে সবসময়। এক অংশ সিঁথি দেখা যাচ্ছে। বাকিটুকু শাড়ির আঁচলে ঢাকা। মেয়েটা এত স্নিগ্ধ, এতো সুন্দর, এতো পবিত্র দেখতে! দেখলেই মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পদ্মজা বলল,'আখিরাতের সম্পদ এবাদত, খাঁটি এবাদত।'

'তুমি খুব ভালো পদ্মজা।' রানি মৃদু হেসে বলল। তার চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। বলল,'এখন নামায আদায় করতে পারবে? তাহলে পড়ে নেও।'

' ওইদিনডার পর আর গোসল করি নাই।'

'আজ করবে কিন্তু।'

'করব।'

'আসি?'

'আসো।'

পদ্মজা বেরিয়ে আসে। দরজার বাইরে পা রাখতেই রানির কান্নার স্বর কানে আসে। পদ্মজা থমকে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে একবার রানিকে দেখে। রানি হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। পদ্মজা মনে মনে প্রার্থনা করে, 'আল্লাহ,ক্ষমা করে দাও রানি আপাকে। শান্তির পথে ফিরে আসার রহমত দাও।'

____

বাড়ির সবাই মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমির সেই সকাল দশটায় বের হয়েছে। এখন বাজে,দুপুর তিনটা। লাবণ্য মিনিটে মিনিটে গ্লাস ভরে পানি খাচ্ছে। আর বার বার টয়লেটে যাচ্ছে। পদ্মজা ঝিম মেরে বসে আছে। হেমলতা সবসময় পদ্মজাকে বলতেন, মেট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়ার জন্য। পদ্মজার একবার মনে হচ্ছে সে ফার্স্ট ডিভিশন ফলাফল করবে। আরেকবার মনে হচ্ছে, সেকেন্ড ডিভিশনে চলে যাবে। সে এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের তালু চুলকাচ্ছে। এই মুহূর্তে মাকে খুব মনে পড়ছে। কতদিন হলো,দেখা হয় না। প্রথম প্রথম মায়ের জন্য প্রায় কাঁদতো সে। এখন অবশ্য মানিয়ে নিয়েছে। আছরের আযান পড়ছে। এখনও ফিরেনি আমির। পদ্মজা নামায পড়তে চলে যায়। নামায পড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এরপর যা দেখল, খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে সে। আমিরের সাথে হেমলতা, পূর্ণা এসেছে। দুজনের পরনে কালো বোরখা। তিনজন আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের দিকে আসছে। মাথার উপর কড়া রোদ নিয়ে মরুভূমিতে সারাদিন হাঁটার পর পথিক তৃষ্ণার্ত হয়ে পানির দেখা পেলে যেমন আনন্দ হয়,ঠিক তেমন আনন্দ হচ্ছে পদ্মজার। ইচ্ছে হচ্ছে দুই তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে যেতে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। পদ্মজা উন্মাদের মতো দৌড়াতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় উল্টে পড়ে যেতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। তবুও দৌড় থামল না। সদর ঘরের সবাইকে তোয়াক্কা না করে বাড়ির বউ ছুটে বেরিয়ে যায়। হেমলতা কিছু বুঝে উঠার আগেই তার নয়নের মণি ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে। পদ্মজার ছোঁয়ায় চারিদিকে যেন বসন্ত শুরু হয়। পূর্ণা পদ্মজাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে, ফোঁপাতে থাকল। পদ্মজা হেমলতার বুকে মাথা রেখে পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'এতদিনে আসতে মনে হয়েছে তোমাদের? এভাবে পর করে দিলে আম্মা? আর পূর্ণা,তুইতো আসতে পারিস। বোনকে মনে পড়ে না?'

শাড়ির আঁচল টেনে পদ্মজার মাথার চুল ঢেকে দিলেন হেমলতা। এরপর বললেন, 'মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আসা কী এতই সোজা?'

'তাহলে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর কী দরকার? যদি মা-বাবা সহজে না আসতে পারে।'

'আপা..আমার তোমাকে খুব মনে পড়ে।' পূর্ণা বাচ্চাদের মতো করে কাঁদছে। পদ্মজা পূর্ণার চোখের জল মুছে দিয়ে বলল, 'আমারও মনে পড়ে।'

হেমলতা পদ্মজার চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন, '৭৫০ মার্ক পেয়েছিস। স্টার মার্ক। ফার্স্ট ডিভিশন। এই খুশিতে আর কাঁদিস না।'

পদ্মজার চোখভর্তি জল। গাল,ঠোঁট চোখের জলে ভেজা। এমতাবস্থায় হাসল। তাকে মায়াবী ভোরের শিশিরের মতো দেখায়। হেমলতা অন্দরমহলের সদর দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন, হাওলাদার বাড়ির বাকিরা তাকিয়ে

আছে। তিনি পদ্মজাকে সরিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসেন। ফরিনা বেগমের মুখ দেখে পদ্মজার ভয় হচ্ছে। উনার মুখ আগে আগে ছুটে। আম্মাকে কিছু বলবেন না তো?

হেমলতা সবাইকে সালাম দিয়ে বললেন, 'আমির ধরে নিয়ে আসলো।'

মজিদ হাওলাদার বিনীত স্বরে বললেন, 'এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আজ আসবেন আগে জানলে, গরু জবাই করে রাখতাম।'

হেমলতা হাসলেন। বললেন, 'বলেছেন, এই অনেক।'

'বললেই হবে না। করতে হবে। কয়দিন কিন্তু থেকে যাবেন।'

'এটা বলবেন না। আজই ফিরতে হবে আমার। কিছুক্ষণ থেকেই চলে যাব।'

'প্রথম বার আসলেন আর কিছুক্ষণ থেকেই চলে যাবেন?'

'আবার আসব। অনেকদিন থেকে যাবো।'

'আজকের রাতটা থেকে যান।'

'আম্মা আজ থেকে যাও,আমার সাথে।' পদ্মজা অনুরোধ করে বলল।

হেমলতা হাসলেন। ফরিনা কিছু বলছেন না। ভ্রুকুটি করে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হেমলতাকে ভেতরে ভেতরে ভয় পান। কেমন ধারালো চোখের দৃষ্টি। যেন, একবার তাকিয়েই ভেতরের সব দেখে ফেলতে পারে। আর চোখমুখের ভাব দেখলে মনে হয়, কোন দেশের রাজরানি। তার উপর আমির দরদ দেখিয়ে শ্বাশুড়ি নিয়ে এসেছে। ফরিনা বিরক্ত হচ্ছেন। হেমলতা ফরিনার দিকে তাকাতেই ফরিনা চোখ সরিয়ে নেন। হেমলতা ফরিনাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপা,কথা বলছেন না যে? আমার উপস্থিতি বিরক্ত করেছে খুব?'

হেমলতার কথার ফরিনা সহ উপস্থিত সবাই অস্বস্তিতে পড়ে যায়। ফরিনা হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'কী বলছেন আপা? বিরক্ত হইতাম কেরে? এই পরথম আইছেন। খুশিই হইছি।'

'তাই বলুন।'

' দরজায় দাঁড়ায়া গপ আর কতক্ষণ হইবো। ঘরে আহেন।' ফরিনা দ্রুত সটকে পড়েন। সদর ঘরে আগে আগে হেঁটে আসেন। হাঁপাতে থাকেন। বিড়বিড় করেন, 'মহিলা এত্ত চালাক। সত্যি সত্যি সব বুইঝা ফেলে।'

হেমলতা সবার আড়ালে শাড়ির আঁচল মুখে চেপে সেকেন্ড দুয়েক হাসলেন। হেমলতাকে হাসতে দেখে, পদ্মজাও হাসল। সবাই সদর ঘরে এসে বসে। লাবণ্য ও পদ্মজার ফলাফল দেওয়ার উপলক্ষে শিরিন,শাহানাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তারা এখন হাওলাদার বাড়িতেই আছে। দুই বোন হেমলতা,পূর্ণার জন্য নাস্তা তৈরি করতে রান্নাঘরে গেল। লাবণ্য দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছে। আমির এখনও লাবণ্যর ফলাফল কাউকে বলেনি। সে সদর ঘর থেকে লাবণ্যকে ডাকল, 'লাবণ্য? এই লাবণ্য? শুনছিস? এদিকে আয়। আজ তোর খবর আছে।'

আমিরের কথা শুনে লাবণ্যর বুকের ধুকপুকানি থেমে যায়। এখুনি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে অবস্থা। নিশ্চিত ফেইল করেছে! লাবণ্য চিৎ হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে থাকে,কখন সে মারা যাবে। আমির আবার ডাকল, 'বেরিয়ে আয় বলছি। নয়তো দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকব। তখন কিন্তু গায়ে মার বেশি পড়বে।'

লাবণ্য তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে নামে। গায়ের ওড়না ঠিক করে দরজা খুলে। সদর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে নামাযের সব সূরা পড়তে থাকে।

আমির চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই লাবণ্য কেঁপে উঠে। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'আগামী বছর মেট্রিকে পাশ করাম, কসম!'

'এই বছরই তো পাশ করেছিস! তাহলে আগামী বছর আবার মেট্রিক দিবি কেন?'

লাবণ্য চকিতে তাকাল। তার মুখটা হা হয়ে যায়। লাবণ্যর মুখের ভঙ্গি দেখে সবাই হাসল। লাবণ্য খুশিতে কেঁদে দিল। আমির লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরে,মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,'আরেকটুর জন্য ফেইল করিসনি।'

লাবণ্য হাসতে হাসতে কাঁদছে। লাবণ্যর পাগলামি দেখে আমিরও হাসছে। তখন সদর ঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান হাওলাদার। হেমলতা রিদওয়ানের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকান। হেমলতার চোখে চোখ পড়তেই রিদওয়ান বিব্রত হয়ে উঠে। চোখ সরিয়ে নেয়। একটু পর আড়চোখে তাকিয়ে দেখে,হেমলতা তখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। রিদওয়ান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এ যেন সাপুড়ে ও সাপের খেলা।

#পদ্মজা

চলবে..

Next পাট এর লিংক কমেন্ট বক্সে😊

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট- ৪২

রাতের খাবার শেষ হয়েছে সবেমাত্র। এশার আযান পড়েছে অনেক আগে। পূর্ণা পদ্মজা ও লাবণ্যকে পেয়ে পুলকিত। আনন্দ বয়ে যাচ্ছে মনে। একটু পর পর উচ্চস্বরে হাসছে। হেমলতা একবার ভাবলেন নিষেধ করবেন,এতো জোরে হাসার জন্য। এরপর কী ভেবে আর নিষেধ করলেন না। তিনি বাড়ির বড়দের সাথে কথা বলছেন। আমির সবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য বলল, 'আমার একটা কথা ছিল।'

সবাই আমিরের দিকে তাকাল। আমির নির্দ্বিধায় বলল,'আগামীকাল ফিরব আমি।'

হেমলতা বললেন,

'ঢাকায়?'

'জি। পদ্মজাকে নিয়েই যাব। সাথে লাবণ্যও যাবে। দুজনকে কলেজে ভর্তি করে দেব।'

লাবণ্য পূর্ণার পাশ থেকে উঠে এসে,আমিরের পাশে দাঁড়াল। আবদার করে বলল, 'দাভাই,তুমি কইছিলা আমি পাশ করলে,আমারে দেশের বাইরে পড়তে পাঠাইবা।'

'ছেড়ি মানুষ বাইরে যাইতি কেন? কইলজাডা বড় হইয়া গেছে?' রেগে বললেন ফরিনা।

লাবণ্য মায়ের কথা অগ্রাহ্য করে আমিরকে বলল,'কথা রাখতে হইবো তোমার।'

আমিরে একবার মজিদকে দেখল। এরপর লাবণ্যকে বলল,'সত্যি যেতে চাস?'

'হ।'

লাবণ্যর মাথায় গাট্টা মারল আমির। এরপর বলল, 'আগে শুদ্ধ ভাষাটা শিখ। এরপর দেশের বাইরে পড়তে যাবি।'

লাবণ্য আহ্লাদিত হয়ে বলল, 'পদ্মজা শিখায়া দিব।এইডা কোনো ব্যাপার না দাভাই।'

'আপাতত ঢাকা চল। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে অভ্যস্ত হ। এরপর সত্যি পাঠাব।'

'তুই পাগল হইয়া গেছস বাবু? এই ছেড়িরে একা বাইরে পাডাইয়া দিবি?'

'জাফর ভাই আছে,ভাবি আছে। সমস্যা নেই আম্মা। একটাই তো বোন আমার। নিজের মতো পড়াশোনা করুক।'

ফরিনা বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন। মজিদ কথা বলছেন না। মানে তিনিও আমিরের দলে। তাহলে আর কথা বলে কী হবে? এই সংসারে এমনিতেও তার দাম নেই। কেউ কথা শুনে না। নিজের মতোই বকবক করেন। ফরিনা উঠে চলে যান। হেমলতা বললেন,'কালই চলে যেতে হবে? দুই-তিন দিন পর হবে না?'

আমির নম্র ভাবে বলল, 'না আম্মা। আমি আট বছর হলো ঢাকা গিয়েছি। এর মধ্যে এই প্রথম তিন মাসের উপর গ্রামে থেকেছি। ব্যবসা ফেলে এসেছি। আমার অনুপস্থিতিতে আলমগীর ভাইয়া সামলে ছিল। এখন তো ভাইয়াও চলে এসেছে। আর আমার ব্যবসা আমারই সামলানো উচিত। যত দ্রুত সম্ভব যেতে চাই। আপত্তি করবেন না।'

হেমলতা পদ্মজার দিকে চেয়ে বললেন,'তাহলে আগামীকালই যাচ্ছো?'

'জি। আব্বা,আম্মাকে তো অনেক আগেই বলেছি। পদ্মজাও জানে। কিন্তু পদ্ম ভাবেনি সত্যি সত্যি যাব। দেখুন, কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কাল চলে যাব বলেই আজ আপনাকে নিয়ে এসেছি। আজ রাতটা মেয়ের সাথে থাকেন। আবার কবে দেখা হয়!'

হেমলতা বেশ অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন। তারপর বললেন,'তোমাদের কীসের ব্যবসা আজও জানলাম না।'

মজিদ অবাক হয়ে বললেন,'আত্মীয় হলেন এতদিন এখনও জানেননি মেয়ের জামাই কীসের ব্যবসা করে! বাবু, এটাতো বলা উচিত ছিল?'

'আমিতো ভেবেছি জানেন। তাই বলিনি। আম্মা,আমাদের এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস। মানে মালামাল বিভিন্ন দেশে আমদানি -রপ্তানি করা হয়। এ কাজে আব্বা,রিদওয়ান, ভাইয়া,চাচা আছে। তাছাড়া, নিম্নমানের দেশগুলো থেকে কম দামে পণ্য এনে উন্নত দেশগুলোতে বেশি মূল্যে বিক্রি করি। সব পণ্য গোডাউনে রাখা হয়। আমাদের অফিসও আছে। গোডাউন আর অফিসের সব কাজ আমাকে সামলাতে হয়। বলতে পারেন, আমারই সব।'

'অনেক বড় ব্যাপার।' হেসে বললেন হেমলতা। তিনি জানতেন না আমির এতোটা বিত্তশালী। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস কম কথা নয়। এ সম্পর্কে মোটামুটি তিনি জানেন। কলেজ থাকাকালীন জেনেছেন।

পদ্মজাকে পূর্ণা জড়িয়ে ধরে রেখেছে। পদ্মজা বলল,'কথা বলছিস না কেন?"

'কাল চলে যাবা আপা?'

'তাই তো কথা হচ্ছে।'

'আমার খুব মনে পড়ে তোমাকে।'

'কাঁদছিস কেন? আসব তো আমি।'

'সে তো অনেক অনেক মাস পর পর।'

পদ্মজা কিছু বলতে পারল না। হেমলতা কথা বলছেন আমির আর মজিদের সাথে। খলিল,আলমগীর নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে। বিকেল থেকে রিদওয়ানের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। পদ্মজা হেমলতার উপর চোখ রেখে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল,'আম্মা খুব শুকিয়েছে। খায় না?'

'না। মাঝে মাঝে সারাদিন পার হয়ে যায় তবুও খায় না।'

'জোর করে খাওয়াতে পারিস না?'

'ধমক মারে। শুনে না কথা।'

'আম্মা ঘাড়ত্যাড়া।"

'ঠিক বলেছো।'

'উনি কেমন? ঝগড়া করে আম্মার সাথে?'

'উনিটা কে?'

'আব্বার প্রথম বউ।'

'তুমিতো দেখতেও যাওনি।'

'শ্বশুরবাড়ি থেকে চাইলেই যাওয়া যায় না। বল না,কেমন? আদর করে তোদের?'

'ভালো খুব। সহজ,সরল। আম্মাকে খুব মানে। প্রেমা-প্রান্তকে অনেক আদর করে। দেখতেও খুব সুন্দর। আগে সাপুড়ের বউদের মতো সাজতো। আমার পছন্দ না বলে এখন আর সাজে না।'

'তুই নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করিস?'

'এখন করি না। তুমি কাকে দিয়ে এতো খোঁজ রাখো?'

'সে তোর জানতে হবে না। তাহলে উনি ভালো তাই তো?'

'হুম।'

'মিলেমিশে থাকিস তাহলে।'

'ঢাকা যাওয়ার আগে দেখে যাও একবার।'

'বাপের প্রথম বউকে দেখার ইচ্ছে নেই আমার।' পদ্মজা থমথমে স্বরে বলল।

পূর্ণা বলল,'আচ্ছা। আমি আজ তোমার সাথে ঘুমাব।'

'হুম ঘুমাবি। আম্মার খেয়াল রাখবি। আম্মাকে দেখে মনে হচ্ছে,কোনো বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা করে। সারাক্ষণ ভাবে। তুই কথা বলবি,সময় দিবি।'

'আমি তোমার মতো সব সামলাতে পারি না।'

'চেষ্টা করবি। ভোরে উঠে মগা ভাইয়াকে পাঠাব। আব্বা আর প্রেমা-প্রান্তকে নিয়ে আসতে। সবাইকে চোখের দেখা দেখে যাব।'

পূর্ণা পদ্মজাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। কান্না পাচ্ছে খুব। কত দূরে চলে যাবে তার আপা! পদ্মজা অনুভব করে পূর্ণার ভেতরের আর্তনাদ। সে পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'খুব দ্রুত আসব।'

পদ্মজা মাঝে শুয়েছে। তার দুই পাশে হেমলতা আর পূর্ণা। পূর্ণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। আর পদ্মজা হেমলতার এক হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। হেমলতা নিরবতা ভেঙে পদ্মজাকে বললেন,'পদ্ম?'

'হু,আম্মা?'

' শহরে নিজেকে মানিয়ে নিবি। শক্ত হয়ে থাকবি। আর মনে রাখবি, কেউ কারোর না। সবাই একা। সবসময় নিজের উপর বিশ্বাস রাখবি,নিজের উপর আস্থা রাখবি। সৎ পথে থাকবি। কখনো কারো উপর নির্ভরশীল হবি না।

যদি তুই কারো উপর ভালো থাকার দায়িত্ব দিয়ে দিস,কখনো ভালো থাকবি না। নিজের ভালো থাকার দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়। নিজেকে কখনো একা ভাববি না। যেখানেই থাকি আমি, আমার প্রতিটা কথা তোর সাথে মিশে থাকবে। ছায়া হয়ে থাকবে। আল্লাহ সবাইকে কোনো না কোনো উদেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। সেই উদ্দেশ্য সফল হলে আর বেঁচে থাকার মানে থাকে না। মৃত্যুতে ঢলে পড়ে। আমার ইদানীং মনে হয়, আমার দায়িত্ব ছিল তোকে জন্ম দেয়া,বড় করে তোলা,বাস্তবতা দেখানো। সেই দায়িত্ব কতটুকু রাখতে পেরেছি জানি না। কিন্তু তোর দায়িত্ব অনেক বড় কিছু!'

পদ্মজা চাপা স্বরে বলল,'কী সেটা?'

'জানি না।'

'তুমি এতো কী ভাবো আম্মা? মুখটা এরকম ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে কেন? খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করবে। আমি পরেরবার এসে যেন দেখি,মোটা হয়েছো।

হেমলতা হাসলেন। সাদা ধবধবে দাঁত ঝিলিক মারে। তিনি পদ্মজাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন,'পরেরবার যখন আসবি একদম অন্য রকম দেখবি।'

'কথা দিচ্ছো?'

'দিচ্ছি।'

পদ্মজা হাসল। পূর্ণা বলল,'আমাকেও জড়িয়ে ধরো আপা।'

পদ্মজা পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরে। আর হেমলতা দুই মেয়েকে একসাথে জড়িয়ে ধরেন। তারপর বললেন,'এবার চুপচাপ ঘুম হবে। কোনো কথা না।'

মাঝরাতে হেমলতার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চোখ খুলে কান খাড়া করে শুনেন,কেউ হাঁটছে। কাঁথা গা থেকে সরিয়ে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামেন। সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন। পায়ের শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে যান। সাদা পাঞ্জাবি পরা একটা পুরুষের অবয়ব দেখতে পান। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকলেন,'রিদওয়ান? '

রিদওয়ান কেঁপে উঠে পিছনে ফিরল। চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। সে যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে,দেখেই বোঝা যাচ্ছে। হেমলতা প্রশ্ন করলেন,'এত রাতে এখানে কী করছো?'

'জ...জি হাঁটছিলাম।'

'এতো রাতে?'

'প্রায়ই হাঁটি। জিজ্ঞাসা করতে পারুন অন্যদের।'

হেমলতা রিদওয়ানকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করে নিয়ে বলল,' কোনোভাবে আমাকে খুন করতে এসেছো কী?'

রিদওয়ান থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'ন..না না! আপনাকে কেন খ..খুন করতে যাবো?'

'প্রমাণ সরাতে।' হেমলতার সহজ কথা।

রিদওয়ান হঠাৎই অন্যরকম স্বরে কথা বলল, 'সে তো আমিও একজন প্রমাণ। স্বচক্ষে দেখা জ্বলজ্বলন্ত প্রমাণ। আপনিও আমাকে খুন করে প্রমাণ সরাতে পারেন। যেহেতু দুজনই একই পথের। কাউকে কারোর খুন করার প্রয়োজন নেই। আমি এখানে অন্য কাজে এসেছি।'

হেমলতা কঠিন চোখে তাকান। পরপরই চোখ শীতল করে নিয়ে বললেন,'শুভ রাত্রি।

রিদওয়ান হেসে হেলেদুলে হেঁটে চলে যায়। হেমলতা ঘরের ঢুকার জন্য ঘুরে দাঁড়ান। হাঁটার পূর্বেই শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। ভাগ্যিস আওয়াজ হয়নি! তিনি হাতে ভর দিয়ে উঠার চেষ্টা করেন। বাম হাতের মাংস পেশি শক্ত হয়ে আছে। হাত নাড়াতে কষ্ট হয়। ভর দিয়ে উঠা আরো কষ্টদায়ক। তিনি ওভাবেই বসে থাকলেন অনেকক্ষণ।

#পদ্মজা

চলবে....

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ৪৩

পাখিদের কলতানে পদ্মজার ঘুম ভাঙল। পদ্মজা জানালার ফাঁক গলে আসা দিনের আলো দেখতে পেল। সে তড়িঘড়ি করে উঠে বসে। অন্যদিন ফজরের আযানের সাথে সাথে উঠে পড়ে। আজ দেরি হয়ে গেল!

'পূর্ণাকে তুলে নিয়ে যা। একসাথে অযু করে নামায পড়তে বস।'

হেমলতার কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ঘুরে তাকাল। তিনি কোরআন শরীফ পূর্বের জায়গায় রেখে বললেন, 'পূর্ণাকে একটু বুঝ দিস। নামায পড়তে চায় না।'

'আচ্ছা,আম্মা।'

পদ্মজা পূর্ণাকে ডেকে নিয়ে কলপাড়ে যায়। এরপর দুই বোন একসাথে নামায পড়তে বসল। নামায শেষ করে হেমলতার সামনে এসে দাঁড়াল পদ্মজা। হেমলতা জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজা হেমলতার চোখ দেখে বলল, 'আম্মা, তোমার চোখ এমন লাল হলো কেন?'

হেমলতা দুই চোখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'রাতে ঘুমাইনি তাই।'

পদ্মজা উৎকণ্ঠা,'কেন? কেন ঘুম হয়নি? কীরকম দেখাচ্ছে তোমাকে। বিছানায় পড়াটাই শুধু বাকি।'

কিছু চুল পদ্মজার মুখের উপর চলে এসেছে। হেমলতা তা কানে গুঁজে দিয়ে আদরমাখা কণ্ঠে বললেন,'আজ আমার মেয়ে চলে যাবে। তাই আমি সারারাত জেগে আমার আদরের মেয়েকে দেখেছি।'

হেমলতার কথা শুনে পদ্মজা আবেগী হয়ে উঠে। হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে কান্নামাখা কণ্ঠে বলল, 'আমার খুব মনে পড়ে তোমাকে। চলো আমার সাথে। একসাথে থাকব। তোমার না ইচ্ছে ছিল,আমাকে নিয়ে শহরে থাকার।

'পাগল হয়ে গেছিস! মেয়ের জামাইর বাড়িতে কেউ গিয়ে থাকে? ২-৩ দিন হলে যেমন তেমন।'

হেমলতার শরীরের উষ্ণতা পদ্মজাকে ওম দিচ্ছে। মায়ের উষ্ণতায় কী অদ্ভুত শান্তি! পদ্মজা কান্না করে দিল। হেমলতা পদ্মজার মুখ তুলে বললেন, 'সকাল সকাল কেউ কাঁদে? বাড়ির বউ তুই, শ্বাশুড়ি কী করছে আগে দেখে আয়। যা।'

পদ্মজা আরো কাঁদতে থাকল। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মুছছে। আবার ভিজে যাচ্ছে। বুকটা হাহাকার করছে। কত দূরে চলে যাবে সে!

কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। পিছন থেকে শোনা যায়,হেমলতা বলছেন,

'বাচ্চাদের মতো করছিস কিন্তু।'

পদ্মজা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে। ঢোক গিলে নিজেকে শক্ত করল। এরপর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। পদ্মজা ঘর ছাড়তেই হেমলতার চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি দ্রুত জল মুছেন। পালঙ্কের দিকে চেয়ে দেখেন,পূর্ণা চিৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে। কখন ঘুমাল? হেমলতার হাসি পেয়ে গেল। তিনি কাঁথা দিয়ে পূর্ণাকে ঢেকে দিলেন।

পদ্মজা রান্নাঘরে ঢুকতেই ফরিনা মুখ ঝামটালেন,'আইছো ক্যান? যাও ঘুমাও গিয়া।'

'কখন এতো দেরি হয়ে গেছে বুঝিনি।' মিনমিন করে বলল পদ্মজা'

'বুঝবা কেন? মা আইছে তো। হউরির লগে তো আর মায়ের মতো মিশতে মন চায় না।'

পদ্মজা অবাক হয়ে তাকাল। আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল,'আমিতো মিশতেই চাই। আপনি সবসময় রেগে থাকেন।'

'মুখের উপরে কথা কইবা না। যাও এহন।'

পদ্মজা ঘুরে দাঁড়ায় চলে যাওয়ার জন্য। ফরিনা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন,'কইতেই যাইবাগা নাকি? জোর কইরা তো কাম করা উচিত। এই বুদ্ধিডা নাই?'

পদ্মজা স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন সে কাজ করার জন্য জোরাজুরি করে,কিন্তু ফরিনা করতে দেন না। এজন্যই সে এক কথায় চলে যাচ্ছিল। আর এখন কী বলছেন! সে ব্যাপারটা হজম করে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। ফরিনা গলার স্বর পূর্বের অবস্থানে রেখেই বললেন,' হইছে,কাম করতে হইব না। এরপর তোমার মায়ে কইবো দিনরাত কাম করাই তার ছেড়িরে। যাও। বারায়া যাও।'

পদ্মজা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লতিফা ঠোঁট চেপে হাসছে। ফরিনার এমন ব্যবহারের সাথে সে অভ্যস্ত। বেশ অনেকক্ষণ পর পদ্মজা বলল, 'আম্মা,আমি করবটা কী?'

পদ্মজা মাথা থেকে ঘোমটা সরে গেছে। মুখটা দেখার মতো হয়েছে। ফরিনা পদ্মজার মুখ দেখে হেসে ফেললেন। আবার দ্রুত হাসি লুকিয়েও ফেললেন। এই মেয়েটাকে তিনি অনেক আগেই ভালোবেসে ফেলেছেন। এতো শান্ত,এতো নম্রভদ্র! হেমলতাকে হিংসে হয়। হেমলতার গর্ভকে হিংসে হয়। পদ্মজার ঢাকা যাওয়া নিয়ে প্রথম প্রথম ঘোর আপত্তি ছিল ফরিনার। কিন্তু এখন নেই। উপর থেকে যাই বলুন না কেন, তিনি মনে মনে চান পদ্মজা

পড়তে যাক। অনেক পড়ুক। অনেক বেশি পড়ুক। এই মেয়ের জন্ম রান্নাঘরে রাঁধার জন্য নয়। রানীর আসনে থাকার জন্য। পদ্মজা ফরিনার দুই সেকেন্ডের মৃদু হাসি খেয়াল করেছে। সে সাহস পেল। ফরিনার কাছে এসে দাঁড়ায়। ফরিনা চোখমুখ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন,'ঘেঁষতাছো কেন?'

পদ্মজা শিমুল তুলোর ন্যায় নরম স্বরে বলল,'আমার খুব মনে পড়বে আপনাকে। আপনার বকাগুলোকে। আপনি খুব ভালো।'

ফরিনা তরকারিতে মশলা দিচ্ছিলেন। হাত থেমে যায়। পদ্মজার দিকে তাকান। পদ্মজা বলল, 'আমি আপনাকে একবার জড়িয়ে ধরব আম্মা?'

ফরিনা কিছু বলতে পারলেন না। এই মেয়েটা এতো অদ্ভুত, এতো ভালো কেন? পদ্মজার চোখের দিকে চেয়ে অনুভব করেন, কয়েক বছরের লুকোনো ক্ষত জ্বলে উঠেছে। ক্ষতরা পদ্মজার সামনে উন্মোচন হতে চাইছে। কোনোভাবে কী যন্ত্রনাদায়ক এই ক্ষত সারাতে পারবে পদ্মজা? ভরসা করা যায়? পদ্মজার মায়ামাখা দুটি চোখ দেখে বুকে এমন তোলপাড় শুরু হয়েছে কেন? ৩২ বছর আগের সেই কালো রাত্রির কথা কেন মনে পড়ে গেল? যে কালো রাত্রির জন্য আজও এই সংসার,এই বাড়িকে তিনি আপন ভাবতে পারেন না। প্রতিটি মানুষের সাথে বাজে ব্যবহার করেন। সেই যন্ত্রণা কেন বুক খুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে?

উত্তরের আশায় না থেকে পদ্মজা জড়িয়ে ধরল ফরিনাকে। ফরিনা মৃদু কেঁপে উঠলেন। এরপর পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। পদ্মজা ফরিনার বুকে মাথা রাখতেই টের পেল,ফরিনার বুক ধুকধুক, ধুকধুক করছে।

হাওলাদার বাড়ির থেকে ডানে দুই মিনিট হাঁটার পর ঝাওড়া নামের একটি খালের দেখা পাওয়া যায়। খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে হাওলাদার বাড়ির সবাই। ট্রলার নিয়ে মাঝি অপেক্ষা করছে। ট্রলারটি হাওলাদার বাড়ির। পদ্মজা পরনে কালো বোরকা। লাবণ্য যাবে না। সকাল থেকে তার ডায়রিয়া শুরু হয়েছে। তিন-চার দিন পর আলমগীর ঢাকা নিয়ে যাবে। আজ আমির আর পদ্মজা যাচ্ছে। প্রেমা,প্রান্ত,মোর্শেদ,বাসন্তী সবাই সকালেই এসেছে। সবার সাথে কথা হয়েছে। পূর্ণা হেঁচকি তুলে কাঁদছে। হেমলতা পদ্মজার দুই হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু দিলেন। তারপর বললেন,'ঠিক মতো পড়বি,খাবি। স্বামীর খেয়াল রাখবি। কাঁদবি না কিন্তু। একদম কাঁদবি না।'

'তুমি কাঁদছো কেন আম্মা?'

'না,না কাঁদছি না।' বলেও হেমলতা কেঁদে ফেললেন। পদ্মজার কান্নার বেগ বেড়ে যায়। বোরকা ভিজে একাকার। একদিকে মা অন্যদিকে তিন ভাই-বোন কেঁদেই চলেছে। হেমলতা নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন,পারছেন না। পদ্মজা বলল, 'আর কেঁদো না আম্মা। তুমি অসুস্থ।'

হেমলতা ঢোক গিলেন কান্না আটকাতে। তারপর বললেন, 'কাঁদব না। সাবধানে যাবি। দেরি হচ্ছে তো। আমির,নিয়ে যাও আমার মেয়েকে। যা মা। সাবধানে যাবি। নিয়মিত নামায পড়বি।'

পদ্মজা হেমলতার পা ছুঁয়ে সালাম করল। পদ্মজার দেখাদেখি আমিরও করল। বাড়ির সব গুরুজনদের সালাম করে ট্রলারে পা রাখতেই হেমলতার কণ্ঠে উচ্চারিত শব্দমালা ভেসে আসে,'আমার প্রতিটা কথা মনে রাখবি। কখনো ভুলবি না। আমার মেয়ে যেন অন্য সবার চেয়ে গুণেও আলাদা হয়। শিক্ষায় কালি যেন না লাগে।'

পদ্মজা ফিরে চেয়ে বলল, 'ভুলব না আম্মা। কখনো না। তুমি চোখের জল মুছো। আমাদের আবার দেখা হবে।'

হেমলতা তৃতীয় বারের মতো চোখের জল মুছেন। এরপর হাত নেড়ে বিদায় জানান। ট্রলার ছেড়ে দেয়। পদ্মজা এক দৃষ্টে হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকে। হেমলতা চেয়ে থাকেন পদ্মজার দিকে। দুজনের চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় বর্ষণ হচ্ছে। কাঁদছেন মোর্শেদ। তবে পদ্মজার জন্য কম,হেমলতার জন্য বেশি। হেমলতার দিনগুলো এখন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। আরো কাঁদছেন ফরিনা। প্রতিদিন বাড়িজুড়ে একটা সুন্দর মুখ,সুন্দর মনের জীবন্ত পুতুল মাথায় ঘোমটা দিয়ে আর হেঁটে বেড়াবে না। আবারও মরে যাবে তার দিনগুলো। হারিয়ে যাবে সাদা কালোর ভীড়ে।

মাদিনী নদীর ঠান্ডা আদ্রতা বাতাসে মিশে ছুঁয়ে দিচ্ছে পদ্মজার মুখ। জল শুকাতে শুকাতে আবার ভিজে যাচ্ছে। আমির পদ্মজার কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল,'এবার তো থামো।'

আমিরের আলত ছোঁয়ায় পদ্মজা আরো প্রশ্রয় পেয়ে কাঁদতে থাকল। আমির বলল, 'এ তো আরো বেড়ে গেছে! থামো না। আমি আছিতো। আমরা ছয় মাস পর পর আসব। অনেকদিন থেকে যাবো।'

'সত্যি তো? কাজের বাহানা দেখাবেন না?'

'মোটেও না।' আমির পদ্মজার চোখের জল মুছে দিল। এরপর চোখের পাতায় চুমু দিল। পদ্মজা নুয়ে যায়। বলল, 'নদীর পাড় থেকে কেউ দেখবে।'

'কেউ দেখবে,কেউ দেখবে,কেউ দেখবে! এই কথাটা ছাড়া আর কোনো কথা পারে আমার বউ?'

পদ্মজা আমিরের দিকে একবার তাকাল। এরপর চোখের দৃষ্টি সরিয়ে বলল, 'আমরা ট্রলার দিয়ে ঢাকা যাব?'

'সেটা সম্ভব না। কিছুক্ষণ পরই ট্রেনে উঠে যাবো।'

আমির পদ্মজাকে ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়াতেই, আমিরকে হতবাক করে দিয়ে পদ্মজা ট্রলারের ভেতর ঢুকে গেল।

#পদ্মজা

চলবে....

Next পার্টের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পার্ট - ৪৪

ট্রেনের বগিতে হেঁটে সামনে এগোচ্ছে আমির। তার এক হাতে লাগেজ অন্য হাতে পদ্মজার হাত। শক্ত করে ধরে রেখেছে,যেন ছেড়ে দিলেই হারিয়ে যাবে। পদ্মজার মুখ নিকাবের আড়ালে ঢেকে রাখা। সে এদিকওদিক তাকিয়ে আমিরকে প্রশ্ন করল,'খালি সিট রেখে আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'কেবিনে।'

ততক্ষণে দুজন ৭৬ নাম্বার কেবিনের সামনে চলে আসে। আমির দরজা ঠেলে পদ্মজাকে নিয়ে ঢুকল। চারটা বার্থ। চারজনের কেবিন বোঝাই যাচ্ছে। পদ্মজা বলল, 'আরো দুজন আসবে কখন? ট্রেন তো ছেড়ে দিচ্ছে।'

'চার বার্থই আমাদের।'

পদ্মজা ডান পাশের বার্থে বসতে বসতে বলল, 'অনেক খরচ করেছেন।'

আমির লাগেজ জায়গা মতো রেখে পদ্মজার পাশে বসল। বলল, 'নিকাব খুলো এবার। কেউ আসছে না।'

পদ্মজা নিকাব খুলল। ঝমঝম শব্দ তুলে ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে। আমির জানালা খুলে দিতেই পদ্মজার চুল তিরতির করে উড়তে থাকল। পদ্মজা দ্রুত দুই হাত মুখের সামনে ধরে, বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। আমির বাম পাশের বার্থে বসে হাসল। বলল, 'হাত সরাও। দেখি একটু বউটাকে।'

পদ্মজা দুই হাত সরাল। ঠোঁটে আঁকা হাসি। চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে আছে। চুল অবাধ্য হয়ে উড়ছে। আমির এক হাতের উপর থুতুনির ভর দিয়ে বলল,'এই হাসির জন্য দুনিয়া এফোঁড়ওফোঁড় করতে রাজি।'

পদ্মজা দাঁত বের করে হাসল। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। আমির পদ্মজার পাশে এসে বসে,পদ্মজার চুল খোঁপা করে দিল। তারপর বলল, ' এবার বোরকাটা খুলে ফেল। গরম লাগছে না?'

পদ্মজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। আমির বলল,'কেউ আসবে না পদ্মবতী। পৌঁছাতে বিকেল হবে। নিশ্চিন্তে শুধু বোরকা খুলতে পারো। আর কিছু খুলতে হবে না।'

পদ্মজার কান রি রি করে উঠে। আমিরের উরুতে কিল দিয়ে বলল,'ছিঃ।'

আমির উচ্চস্বরে হেসে উঠল। পদ্মজা ভ্রুকুটি করে বোরকা খুলে। এরপর জানালার ধারে বসে বলল, 'আমরা যে বাড়িতে যাচ্ছি,আর কে কে থাকে?'

'একজন দারোয়ান আর একজন বুয়া আছে। যে বাড়ি না তোমার বাড়ি।''

'উনারা বিশ্বস্ত?'

'নয়তো রেখে এসেছি?'

পদ্মজা কিছু বলল না। আমির পদ্মজার পাশ ঘেঁষে বসল। পদ্মজার কানের দুলে টোকা দিয়ে, কোমর জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে বসে। শীতল একটা অনুভূতি সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। চোখ বুজে স্বভাববশত বলে উঠে, 'কেউ দেখবে!'

আমির ভ্রুকুঞ্চন করে চোখ তুলে তাকায়। পদ্মজা বুঝতে পারে, সে ভুল শব্দ উচ্চারণ করে ফেলেছে। জিহ্বা কামড়ে আড়চোখে আমিরকে দেখে হাসার চেষ্টা করল। আমির বেশ অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, পদ্মজার ঘাড়ে নাক ডুবিয়ে বলল, 'দেখুক। যার ইচ্ছে দেখুক।'

দরজায় টোকা দিচ্ছে কেউ। শব্দে পদ্মজার ঘুম ছুটে গেল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে,মনে পড়ছে না। আমিরের কোলে তার মাথা ছিল। মানুষটা এতক্ষণ বসে ছিল? পদ্মজাকে এভাবে উঠতে দেখে আমির ইশারায় শান্ত হতে বলল। পদ্মজা দ্রুত নিকাব পড়ে নেয়। এরপর আমির দরজা খুলল। ঝালমুড়ি নিয়ে একজন লম্বা ধরণের লোক দাঁড়িয়ে আছে। নাকটা মুখের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। আমির বলল, 'এভাবে অনুমতি না নিয়ে টোকা দেয়া অভদ্রতা। আমাদের দরকার পরলে আপনাদের এমনিতেই খুঁজে নিতাম। আর এমন করবেন না। আপনার জন্য আমার বউয়ের ঘুম ভেঙে গেছে। নিন টাকা। ঝালমুড়ি দেন।'

লোকটি বেশ আনন্দ নিয়ে ঝালমুড়ি বানিয়ে দিল। বোধহয় আর বিক্রি হয়নি। হতে পারে আমিরই প্রথম কাস্টমার। লোকটি চলে গেল। আমির কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তারপর পদ্মজাকে বলল, ' একজন লোক ঝালমুড়ি বিক্রি করতে এসেছিল। এই নাও খাও। এরপর আবার ঘুমাও।'

দুজনে একসাথে ঝালমুড়ি খেতে খেতে সুখ-দুঃখের গল্প শুরু করে। আমির তার শহুরে জীবনের গতিবিধি বলছে। কখন কখন বাসায় থাকে। কীভাবে ব্যবসায় সময় দেয়। পদ্মজা মন দিয়ে শুনছে। একসময় পদ্মজা বলল, 'একটা কথা জানার ছিল।'

'কী কথা?'

"আমার মনে হচ্ছে,আপনাদের বাড়িতে লুকোনো কোনো ব্যাপার আছে। শুধু মনে হচ্ছে না , একদম নিশ্চিত আমি।'

আমির উৎসুক হয়ে ঝুঁকে বসল। আগ্রহভরে জানতে চাইল,"কীরকম?'

পদ্মজা আরো এগিয়ে আসে। আকাশে দুপুরের কড়া রোদ। ছলাৎ করে রোদের ঝিলিক জানালায় গলে কেবিনে ঢুকে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। বাতাস ভ্যাপসা গরম। মাঝে মাঝে শীতল,ঠান্ডা। সেসব উপেক্ষা করে পদ্মজা তার ভেতরের সন্দেহগুলো বলতে শুরু করল,'রুম্পা ভাবিকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আমি নিশ্চিত। কেন বন্দি করে রাখা হয়েছে সেটা দাদু জানেন। উনি সবসময় রুম্পা ভাবির ঘরের দরজায় নজর রাখেন। আমি অনেকবার ঢুকতে চেয়েছি,পারিনি। বাড়ির পিছনের জঙ্গলে কিছু একটা আছে। সেটা ভূত,জ্বীন জাতীয় কিছু না। অন্যকিছু। এমনটা মনে হওয়ার তেমন কারণ নেই। আমার অকারণেই মনে হয়েছে, জঙ্গলটা আপনাআপনি সৃষ্টি হয়নি আর ভয়ংকরও হয়নি। কেউ বা কারা এই জঙ্গলটিকে যত্ন করে তৈরি করেছে। ভয়ংকর করে সাজিয়েছে। এছাড়া, বাড়ির সবাইকে আমার সন্দেহ হয়। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?'

আমির একটুও অবাক হলো না,মুখের প্রকাশভঙ্গী পাল্টালো না। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'জানি আমি এসব।'

পদ্মজা আমিরের দুই হাত খামচে ধরে এক নিঃশ্বাসে বলল,'আমাকে বলুন। অনুরোধ লাগে,বলুন। আমি শুনতে চাই। অনেকদিন ধরে নিজের ভেতর পুষে রেখেছি।'

আমির অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। বলল,'আমার ধারণা তোমার ধারণা অবধিই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে কিছু জানি না। এই রহস্য খুঁজে বের করার ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও আমি হজম করেছি। আমার ইচ্ছে মাটিচাপা দিয়েছি।'

আমিরের গলাটা কেমন শুনাল। পদ্মজা কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল,'কেন? কেন দিয়েছেন?'

আমির হাসল। বলল,'ধুর! এখন এসব গল্প করার সময়? শুনো, এরপর কী করব....'

পদ্মজা কথার মাঝে আটকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল,'কথা ঘুরাবেন না। আমি খেয়াল করেছি,হাওলাদার বাড়ির প্রতি আপনি উদাসীন। কোনো ব্যাপার পাত্তা দেন না। সবসময় বাড়ির চেয়ে দূরে দূরে থাকেন। কোনো ঘটনায় নিজেকে জড়ান না। কেন নিজেকে গুটিয়ে রাখেন?'

আমিরের দৃষ্টি অস্থির। সে এক হাতে বার্থ খামচে ধরার চেষ্টা করে। ঘন ঘন শ্বাস নেয়। পদ্মজা খুব অবাক হয়! আমিরের এতো কষ্ট হচ্ছে কেন?

পদ্মজার উৎকণ্ঠা, 'কী হলো আপনার? কোথায় কষ্ট হচ্ছে?'

'না! কিছু হয়নি। এই পদ্মজা?'

আমির চট করে পদ্মজার দুই হাত শক্ত করে ধরল। চোখ দুটিতে ভয়। পদ্মজা আমিরের চোখের দিকে তাকাল। আমির বলল,'আমার তোমাকে অনেক কিছু বলার আছে। অনেকবার বলতে গিয়েও পারিনি। আজ যখন কথা উঠেছে...আচ্ছা পদ্মজা, আমার পরিচয় জেনে আমাকে ছেড়ে যাবে না তো? আমি তোমাকে হারালে একাকীত্বে ধুঁকে ধুঁকে নিঃশেষ হয়ে যাব। আমার জীবনের একমাত্র সুখের আলো তুমি।'

পদ্মজার হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। সে পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারছে না। আমির উত্তরের আশায় চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছে। পদ্মজা ধীর কণ্ঠে বলল,'লুকোনো সব কথা বলুন আমাকে। আপনি আমার স্বামী। আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কখনো ভাবি না আমি। বিশ্বাস করুন!'

আমির নতজানু হয়ে বলল,'আমি আমার আব্বার অবৈধ সন্তান। আমার জন্মদাত্রী জন্ম দিয়েই মারা যায়। দিয়ে যায় অভিশপ্ত জীবন।'

পদ্মজা দুই পা কেঁপে উঠে। মাথা ভনভন করে উঠে। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত গড়িয়ে যায়। আমির ঢোক গিলে আবার বলল,'আমার জন্মদাত্রী মারা যাওয়ার পর আব্বা আমাকে নিয়ে আসেন। আমার বর্তমান আম্মা আমাকে দেখে খুব রেগে যায়। কিছুতেই আমাকে মানতে চায়নি। তখন ছেলেমেয়ে ছিল না আম্মার। তাই মাস ঘুরাতেই আমাকে মেনে নিল। ছেলের মতো আদর শুরু করল। এসব দাদুর মুখে পরে শুনেছি। আব্বা আমাকে তুলে এনে জায়গা দিলেও সন্তানের মতো ভালোবাসেননি কখনো। যখন আমার এগার বছর আমি আর রিদওয়ান একসাথে জানতে পারি,আমি আব্বার অবৈধ সন্তান। আব্বা আবার রিদওয়ানকে খুব আদর করতেন। রিদওয়ান ছোট থেকেই আমার সাথে ভেজাল করতো। ঝগড়া করতো। যখন এমন একটা খবর জানতে পারল,ও আরো হিংস্র হয়ে উঠে। আমি তখন অনেক শুকনো আর রোগা ছিলাম। রিদওয়ান স্বাস্থ্যবান, তেজি ছিল। আব্বার এমন ছেলেই পছন্দ। কেন পছন্দ জানি না। উনিশ থেকে বিশ হলেই রিদওয়ান খুব মারতো। আব্বার কাছে বিচার দিলে রিদওয়ান আরো দশটা বানিয়ে বলতো। তখন আব্বা আমাকে মারতেন। রিদওয়ান একবার আমাকে জঙ্গলে বেঁধে ফেলে রেখেছিল। দেড় দিন পড়ে ছিলাম। রাতে ভয়ে প্যান্টে প্রস্রাব করে দিয়েছি। মুখ বাঁধা ছিল। তাই এতো চিৎকার করেছি তবুও কেউ শুনেনি। ভয়ে বুক কাঁপছিল। মনের ভয় মিশিয়ে ভয়ংকর ভয়ংকর ভূত,দানব দেখেছি। বাঁচানোর মতো কেউ ছিল না। দেড়দিনের সময় আমাদের বাড়িতে কাজ করতেন,ফকির মিয়া নামে একজন,উনি আমাকে জঙ্গলে বাঁধা অবস্থায় পান। বাড়িতে বৈঠক বসে। রিদওয়ানকে দুটো বেতের বারি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। রিদওয়ান এক তো বলিষ্ঠবান তার উপর আমার দুই বছরের বড়। কিছুতেই পেরে উঠতাম না।পানিতে ঠেসে ধরে রেখেছে অনেকবার। ওর মস্তিষ্ক অসুস্থ। আমার জীবন জাহান্নাম হয়ে উঠে। আম্মাকে বললেও আম্মা বাঁচাতে পারতেন না। সবসময় নিশ্চুপ। কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য যখন আমার পনেরো বয়স শীতের রাতে পালিয়ে যাই। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। এরপরদিন চোখ খুলে দেখি,আমি হাওলাদার বাড়িতে। আমার সামনে রিদওয়ান, আব্বা,চাচা,আম্মা সবাই। বুঝে যাই,আমার কোনো জায়গা নাই আর। এখানেই থাকতে হবে। যতই কষ্ট হউক থাকতে হবে।'

আমিরের কণ্ঠে স্পষ্ট কান্না। চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা হেঁচকি তুলে কাঁদছে। আমির অশ্রুসজল চোখ মেলে পদ্মজার দিকে তাকাল। হেসে ফেলল। পদ্মজার দুই চোখের জল মুছে দিয়ে বলল,'আরেএ পাগলি! কাঁদছো কেন? এসব তো পুরনো কথা। আমার পড়াশোনাটা আবার চলছিল ভালোই। আমি ভালো ছাত্র ছিলাম। এ দিক দিয়ে বুদ্ধিমান ছিলাম। সবসময় ভালো ফলাফল ছিল। এজন্য কদর একটু হলেও পেতাম। যখন

আমার আঠারো বয়স বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু অনুভব করি। রাত করে অদ্ভুত কিছুর শব্দ শুনি। জঙ্গলে আলো দেখতে পাই। চাচাকে প্রায় রাতে জঙ্গলে যেতে দেখি। রিদওয়ান আর চাচা মিলে কিছু একটা নিয়ে সবসময় আলাপ করতো। ওদের চোখেমুখে থাকতো লুকোচুরি খেলা। আমি একদিন রাতে চাচাকে অনুসরণ করি। প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর চাচা দেখে ফেলে। এই ভুলের জন্য কম মার খেতে হয়নি সেদিন! তবুও বেহায়ার মতো কয়দিন পর আবার অনুসরণ করি। রিদওয়ান পিছনে ছিল দেখিনি। আব্বা সেদিন অনেক মারল। দা ছুঁড়ে মারেন। এই যে থুতুনির দাগটা,এটা সেই দায়ের আঘাত। একসময় আব্বা আমাকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। বললেন, আমাকে শহরে পাঠাবেন। পড়ালেখার জন্য। কোনো ব্যবসা করতে চাইলে তারও সুযোগ করে দিবেন। আমি যেন এই বাড়ি আর বাড়ির আশপাশ নিয়ে মাথা না ঘামাই। আমি মেনে নেই। রিদওনায়ের সাথে থাকতে হবে না আর। এর চেয়ে আনন্দের কী আছে? চলে আসি ঢাকা। শুরু হয় নিজের জায়গা শক্ত করার যুদ্ধ। এখানে এসেও অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। তবুও থেমে যাইনি। যুদ্ধ করে চলেছি। আমাকে বাঁচতে হবে। মানুষের মতো বাঁচতে হবে। কারো লাথি খেয়ে না। যখন আমার তেইশ বছর,তখন থেকে আমার কদর বেড়ে যায়। ব্যবসায় মোটামুটি সফল হয়ে যাই। ভাগ্য ভালো ছিল আমার। অতিরিক্ত পরিশ্রম আমাকে নিরাশ করেনি। তখন আব্বা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রিদওয়ান আগের মতো হাত তুলার সাহস পায় না। সেই আমি আজ এই জায়গায়। এখন আমার যে অবস্থান হাওলাদার বাড়ির কারোর সাহস নেই আমার চোখের দিকে তাকানোর। আমি চাইলেই শোধ নিতে পারি। কিন্তু নেব না। তারা থাকুক তাদের মতো। রিদওয়ান ছোটবেলা যা করেছে, মেনে নিয়েছি। এখন তোমার দিকেও নজর দিয়েছে। ওর নজর আমার বাড়িগাড়ি,অফিস-গোডাউনেও আছে। আমি টের পাই। ও পারলে আমাকে খুন করে দিত। কিন্তু পারে না। আমার ক্ষমতার ধারেকাছেও ওর জায়গা নেই। এখন আমার নিজের এক বিশাল রাজত্ব আছে। আমার অহংকার করার মতো অনেক কিছু আছে। হাওলাদার বাড়ির কেউ কেউ মিলে আমাকে নিয়ে কোনো পরিকল্পনা করছে। আমি নিশ্চিত। তাই হাওলাদার বাড়িতে আমি থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। আম্মা ছাড়া ওই বাড়ির সবার ভালোবাসা মুখোশ মাত্র। আমার দরকার ছিল একজন ভালো মনের সঙ্গিনী। আমি পেয়ে গেছি আর কিছু দরকার নেই। আমি আমার অর্ধাঙ্গিনীকে তার আসল সংসারে নিয়ে যাচ্ছি। এখন আমার মন শান্ত। কোনো চিন্তা নেই। খুব বেশি সুখী মনে হচ্ছে।'

আমির পদ্মজার হাতে চুমু খেল। পদ্মজা তখনও কাঁদছে। সে আচমকা আমিরকে জড়িয়ে ধরল। গভীরভাবে,শক্ত করে। এরপর কান্নামাখা কণ্ঠে বলল,'আমি কখনো আপনাকে কষ্ট দেব না। কোনোদিন না। কেউ আপনাকে ছুঁতে আসলে আমি তার গর্দান নেব। আমি উন্মাদ হয়ে তাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করব।'

'কারো সেই ক্ষমতা নেই আর। মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো।'

পদ্মজা আরো শক্ত করে ধরার চেষ্টা করে। আমির পদ্মজার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল,'এই প্রথম আমার বউয়ের গভীর আলিঙ্গন পেলাম। ভালো লাগছে। ছেড়ো না কিন্তু।'

প্লাটফর্মে হাঁটছে ওরা। আমির পদ্মজার এক হাত ধরে রেখেছে। খুব দ্রুত হাঁটছে। পদ্মজা তাল মেলাতে পারছে না। চেষ্টা করছে। মোটরগাড়ি নিয়ে একজন কালোচশমা পরা লোক অপেক্ষা করছিল। আমির সেখানে গিয়ে থামে। লোকটা সালাম দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ব্যাগ জায়গামতো রাখে। আমির আগে পদ্মজাকে উঠতে বলল। পদ্মজা অবাক হয়। এরকম গাড়ির সাথে সরাসরি পরিচয় নেই তার। কিন্তু প্রকাশ করল না। আমিরের কথামতো গাড়িতে উঠে বসল। এরপর আমির উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করে। আমির পদ্মজাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল,'আমাদের নিজস্ব গাড়ি। কথা ছিল কিন্তু, আমার গাড়ি দিয়ে রাতবেরাতে যখন তখন ঘুরতে বের হবো।'

পদ্মজা কিছু বলল না। সে উপভোগ করছে নতুন জীবন। ঘন্টাখানেকের মধ্যে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামে। কালো চশমা পরা লোকটা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে আমিরের ডান পাশের দরজা খুলে দিল। আমির পদ্মজাকে নিয়ে নামল। পদ্মজা বাড়িটা দেখে মুগ্ধ হয়। দ্বৈত(ডুপ্লেক্স) বাড়ি। একজন দারোয়ান দৌড়ে এসে সালাম দিল। পদ্মজার সাথে পরিচিত হলো। এরপর আসে একজন মধ্যবয়স্ক নারী। ইনি বোধহয় বাড়ির কাজের লোক। সবাই একসাথে বাড়ির ভেতর ঢুকল। পদ্মজা তার নতুন বাড়ি মন দিয়ে দেখছে। পূর্ব দিক থেকে সদর দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখতে পেল বিশাল বৈঠকখানা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ পাশে বারান্দা তাতে নানা ধরনের ফুল ফুটে আছে টবের মধ্যে, মনে হবে যেন একটা ছোটোখাটো বাগান। বৈঠকখানার দক্ষিণ পশ্চিম কোণার দিকে বেশ বড় শোবার ঘর। পদ্মজা প্রশ্ন করার আগে আমির বলল,'না,এটা আমাদের ঘর না।'

উত্তর পশ্চিম কোণার দিকে রান্নাঘর এবং টয়লেট। আর এই দুয়ের মাঝে মানে বৈঠকখানার পশ্চিম দিকের মাঝখানটায় খাওয়ারঘর(ডাইনিং)। বৈঠকখানার মাথার উপর দিকে তাকালে সেখানে সোনালী কালারের ঝাড়বাতি ঝুলছে। বৈঠকখানার উত্তর দিকে একটা সিড়ি সাপের মত পেঁচিয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। আমির পদ্মজাকে নিয়ে সেদিকে হাঁটে। সিঁড়ি পেরুনোর পর হাতের বাঁ দিকে অনেক বড় একটা শোবার ঘর। দামী,দামী জিনিসে সৌন্দর্য আকাশছোঁয়া। দুজন একসাথে ঢুকে। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে সবকিছু দেখছে। আমির বলল,'গোসল করে নাও?'

পদ্মজা বোরকা খুলে কলপাড় খুঁজতে থাকল। আমির গোসলখানার দরজা খুলে দিয়ে বলল,'এইযে এদিকে।'

দুজন একসাথে ফ্রেশ হয়ে রুম থেকে বের হলো। পদ্মজা দুই তলাটা আরেকটু দেখার জন্য ডানদিকে মোড় নিল। প্রথমে চোখে পড়ল বড় ব্যালকনি। এরপর আরেকটা শোবার ঘর। ব্যালকনিতে লতাপাতার ছোট ছোট টব।

বিরাট অট্টালিকায় সুখের সাথে কেটে যায় পাঁচ মাস। লাবণ্য দেশ ছেড়েছে দুই মাস হলো। বুয়া কাজ ছেড়েছে তিন মাস। পদ্মজা আর কাজের লোক নিতে দিল না। সে এক হাতেই নাকি সব পারবে। তবুও আমির একটা ১২-১৩ বছর বয়সী মেয়ে রেখেছে সাহায্যের জন্য। ভোরের নামায পরে রান্নাবান্না করে পদ্মজা। এরপর শাড়ি পাল্টে নেয়। কলেজে যাওয়ার জন্য। আমিরকে ব্লেজার,টাই পরতে সাহায্য করে। প্রথম যেদিন আমিরকে ব্লেজার পরতে দেখেছিল,অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,'এই পোশাকের নাম কী? আপনাকে খুব বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

আমির হেসে জবাব দিয়েছিল, 'ব্লেজার। বাইরে থেকে আনা।'

এমন অনেক কিছুই পদ্মজার অজানা ছিল। সবকিছু এখন তার চেনাজানা। এই বিলাসবহুল জীবন বেশ ভালো করেই উপভোগ করছে। মানুষটা সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তবুও ফাঁকেফাঁকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে। পদ্মজাকে নিয়ে গোডাউন দেখিয়েছে,অফিস দেখিয়েছে। সবকিছু সাজানো, গোছানো। গোডাউনে বিভিন্ন ধরণের পণ্য। কত কত রকমের দ্রব্য। পদ্মজা জীবনে ভালোবাসা এবং অর্থ দুটোই চাওয়ার চেয়েও বেশি পেয়েছে।

সকাল নয়টা বাজে। আমির তাড়াহুড়ো করছে, তার নাকি আজ দরকারি মিটিং আছে। পদ্মজা শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে দৌড়ে দৌড়ে খাবার পরিবেশন করছে। আমির দুই তলা থেকে নেমেই বলল,'আমি গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কলেজ চলে যেও।'

'আরেএ,খেয়ে যাবেন তো।'

'সময় নেই। আসছি।'

'খেয়ে যান না।'

'বলছি তো,তাড়া আছে। জোরাজুরি করছো কেন?'

আমির দ্রুত বেরিয়ে যায়। পিছু ডাকতে নেই,তাই পদ্মজা ডাকল না। মনাকে ডেকে বলল,'খেয়ে নাও তুমি।'

মনা পদ্মজার সাহায্যকারী। পদ্মজার ছোটখাটো ফরমায়েশ পালন করে। পদ্মজা বৈঠকখানায় গিয়ে বসে। আজ কলেজে যেতে ভালো লাগছে না। ভোরে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছে। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝুম বৃষ্টি। অকারণে মন বিষণ্নতায় চেয়ে আছে। অকারণেও না বোধহয়! আমির বিরক্ত হয়ে কথা বলেছে,এজন্যই বোধহয় মন আকাশে বৃষ্টি নেমেছে। পদ্মজা পুরোটা দিন উপন্যাস পড়ে কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে কলিং বেল বাজে। পদ্মজা দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে দিল। আমির দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে বাতাস। পদ্মজা বলল, 'আসুন।'

আমির ভেতরে আসে না। সে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তাকিয়ে আছে পদ্মজার দিকে। পদ্মজা কপাল কুঁচকাল। বলল,'কী হলো? আসুন।'

আমির চট করে পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। পদ্মজা চেঁচিয়ে উঠে বলল,'কেউ দেখবে।'

আমির মনাকে ডাকল,'মনা? কই রে? দেখে যা।'

'আপনি ওকে ডাকছেন কেন?'

'এবার কাউকে দেখাবই।'

'উফফ! আল্লাহ,ছাড়ুন।'

'মনা? মনা?'

মনা দুই তলা থেকে নেমে আসে। আমির মনাকে দেখে বলল,'এই দেখ তোর আপারে কোলে নিয়েছি। দাঁড়া,তোর সামনে একটু আদর করি।'

পদ্মজা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। চাপাস্বরে বলল,'মনা কী ভাববে! আমি আর বলব না,কেউ দেখবে। ছেড়ে দিন।'

আমির পদ্মজাকে নামিয়ে দিল। মনা কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। আমির বলল,'যা ঘরে যা।'

মনা যেন এইটা শোনার অপেক্ষায় ছিল। দৌড়ে চলে যায়। পদ্মজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমিরকে গুরুজনদের মতো বলল,'আক্কেলজ্ঞান কখন হবে আপনার? বয়স তো কম হলো না।'

অবিকল পদ্মজার কথার ধরণ অনুসরণ করে আমির বলল,'আর কতদিন কেউ দেখবে কথাটা মুখে থাকবে? বিয়ের তো কম দিন হলো না।'

'আপনি...আপনি কালাচাঁদ না কালামহিষ।'

'এটা পূর্ণা বলতো না? হেহ,আমি মোটেও কালো না।'

'তো কী? এইযে দেখুন,দেখুন। আমার হাত আর আপনার হাত।'

পদ্মজা হাত বাড়িয়ে দেখায়। আমির খপ করে পদ্মজার হাত ধরে চুমু খেয়ে বলল,'এই হাতও আমার।'

পদ্মজা বলল,'ঠেসে ধরা ছাড়া আর কিছু পারেন আপনি? ছাড়ুন।'

আমির পদ্মজার হাত ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকল।

#পদ্মজা

চলবে....

Next পার্টের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজআমি পদ্মজা - ৪৫

____

দেখতে দেখতে চলে এসেছে শীতকাল। সকাল দশটা বাজে। অথচ,কুয়াশার চাদরে চারিদিক ঢাকা। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা। মনটা কু গাইছে। বুকে অজানা একটা ঝড় বইছে। স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়াতে পারছে না। ঢাকা আসার পর থেকে নিয়মিত পূর্ণার লেখা চিঠি পেত। প্রায় চার মাস হলো বাড়ি থেকে কোনো চিঠি আসছে না। পদ্মজা নয়টা চিঠি পাঠিয়েছে। একটারও উত্তর আসেনি। বাড়ির সবার কথা খুব মনে পড়ছে। ব্যালকনি ছেড়ে রুমে চলে আসে পদ্মজা। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়। একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখে। হাওলাদার

বাড়িতে টেলিফোন এনেছে। পূর্ণা হাওলাদার বাড়িতে এসে পদ্মজার সাথে যোগাযোগ করে। পদ্মজা কথা বলতেই ওপাশ থেকে পূর্ণার উল্লাস ভেসে আসল, 'আপা? আপা আমি তোমার গলার স্বর শুনতেছি। তুমি শুনছো?'

'শুনছি। কেমন আছিস? আম্মা কেমন আছে? বাড়ির সবাই ভালো আছে?'

'সবাই ভালো। তুমি কেমন আছো? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার গলার স্বর শুনছি!'

'আচ্ছা,শোন?'

'বলো আপা।'

'আশেপাশে কেউ আছে?'

'খালাম্মা আছে।'

'এই বাড়িতে আর আসবি না। আমি যতদিন না আসব। মনে রাখবি?'

'কেন? কেন আপা?'

'মানা করেছি,শুনবি।'

'আচ্ছা,কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এবার প্রতিদিন দুলাভাইয়ের বাড়িতে আসব। আর তোমার সাথে কথা বলব। ধুর!'

'আবার যখন আসব আমাদের বাড়িতে টেলিফোন নিয়ে আসব। এরপর প্রতিদিন আমাদের কথা হবে। এখন আমার মানা শোন।'

'টাকা কই পাবে?'

'সেদিন উনি বলেছেন, নিয়ে আসবেন। আমি মানা করেছিলাম। বললেন, তুমি আনন্দে থাকলেই আমার সুখ। তোমার সুখের জন্যই এখন আমার সব। আর কী বলার?'

'দুলাভাই খুব ভালো তাই না আপা?'

'হুম। আম্মার শরীর সত্যি ভালো আছে?'

'আছে। আগের চেয়ে ভালো।'

'খেয়াল রাখিস আম্মার।'

'রাখব।'

বাতাসটা বেড়েছে। পদ্মজার গা কাঁটা দিচ্ছে। আচমকাই ঘুমটা ভেঙে যায়। চট করে উঠে বসে। হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল,টেলিফোন নেই। একদম বাস্তবের মতো অনুভূতি হচ্ছিল। পদ্মজা দেয়াল ঘড়িতে দেখে, এগারোটা বাজে। টেলিফোন পুরো দেশে হাতেগোনা কয়জনের বাসায় আছে। সেখানে গ্রামে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যাবে ভাবা হাস্যকর।

পদ্মজা বিছানা ছেড়ে ড্রয়িংরুমে চলে আসে। কপালে হাত দিয়ে দেখে গায়ে জ্বর এসেছে।পূর্ণার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। রান্নাঘরে যেতে যেতে ডাকল,'মনা?'

পরক্ষণেই মনে পড়ল,মনা বাসায় নেই। দুইদিন আগে বাড়িতে গিয়েছে। খুব একা লাগছে তার। সবকিছুই রান্না করা আছে। আর কী রাঁধবে? এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া যায়। পদ্মজা এক কাপ চা নিয়ে ড্রয়িংরুমের জানালার পাশ ঘেঁষে বসল। গ্রামের সোনালি দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। মোর্শেদ প্রথম যেদিন সোয়েটার কিনে দিয়েছিলেন সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। সকাল সকাল উঠে খেজুরের রস দিয়ে পিঠা খাওয়া। কত লোভনীয় সেই দিনগুলো। কলিং বেল বেজে উঠল।

অসময়ে কলিং বেল শুনে পদ্মজা অবাক হলো। আমিরতো এখন আসবে না। দুই ঘন্টা আগেই বের হলো। তাহলে কে এসেছে? গায়ে শাল টেনে নিল সে। এরপর দরজা খুলল। দরজার সামনে আমির দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা অবাক হয়ে জানতে চাইল,'এতো দ্রুত?'

'তৈরি হও,বাড়িতে যাব।'

পদ্মজা চোখের পলক ফেলে আবার তাকাল। বলল,'বাড়িতে মানে অলন্দপুর?'

আমির দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলল,'হুম। দ্রুত যাও। শাড়ি পাল্টাও।'

পদ্মজার উৎকণ্ঠা,'হুট করে যে! কোনো খারাপ খবর?'

আমির হেসে বলল,'তেমন কিছুই না। কয়দিন ধরে দেখছি মন খারাপ করে বসে থাকো। তাই হুট করে যাওয়ার কথা ভাবলাম। তোমার কলেজ তো শীতের বন্ধই আছে। আমি এক সপ্তাহর জন্য ম্যানেজারকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। আর আলমগীর ভাইয়া এসেছে। কোনো চিন্তা নেই। এবার দ্রুত যাও। ট্রেন বারোটায়। আজকের শেষ ট্রেন কিন্তু এটাই। আমি তৈরি আছি। শুধু লাগেজে দুই তিনটা শার্ট ঢুকিয়ে নিলেই হবে।'

পদ্মজা আর কিছু বলল না। ছুটে যায় দুই তলায়। তার হৃৎপিণ্ড খুশিতে দামামা বাজাচ্ছে। দশ মিনিটের ব্যবধানে শাড়ি পাল্টে, লাগেজও গুছিয়ে ফেলে। দুজন বেরিয়ে পড়ে। গন্তব্য অলন্দপুর। দীর্ঘ আট মাস পর জন্মস্থান, জন্মদাত্রী, জন্মদাতা,ভাই-বোন সবাইকে দেখতে পাবে পদ্মজা। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা এতোটাই কাজ করছে যে,শীতের প্রকোপ টের পাচ্ছে না সে।

কেবিনে ঢোকার পর থেকে বার বার এক কথাই বলে চলেছে পদ্মজা,'কতদিন পর যাচ্ছি! আম্মা হুট করে আমাকে দেখে জ্ঞান না হারিয়ে ফেলে। পূর্ণা নিশ্চিত জ্ঞান হারাবে।'

আমির হাসল। পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,'আসো গল্প করি।'

পদ্মজার তাকাল। তার চোখ দুটি হাসছে। চিকমিক করছে। সে প্রশ্ন করল,'আলমগীর ভাইয়া আমাদের বাসায়ই উঠবেন?'

'না। অফিসেই থাকবে।''

'রানি আপা ভালো আছে? কিছু বলছে?'

আমির চুল ঠিক করতে করতে ব্যথিত স্বরে বলল,'ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। বাচ্চা নষ্ট করতে দিল না। এরপর মৃত বাচ্চা জন্ম দিল। এখন অবস্থা আরো করুণ। ঘরেই বন্দী।'

'ইশ! খারাপ লাগে ভাবলে। মানুষের কপাল এতো খারাপ কী করে হয়!'

——————————————————

মোড়ল বাড়ির সড়ক দেখা যাচ্ছে। পদ্মজা খুশিতে আত্মহারা। দ্রুত হাঁটছে। সে কখনো বাহারি শাড়ি, বোরকা পরে না। আজ পরেছে। শাড়ি বোরকা দুটোতেই ভারী কাজ,চকচক করা ছোট-বড় পাথর।। দেখলে মনে হয়,হীরাপান্না চিকচিক করছে। সে তার মাকে দেখাতে চায়,সে কতোটা সুখী। কোনো কমতি নেই তার জীবনে। মোড়ল বাড়ির গেইট ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সব আনন্দ,উল্লাস নিভে যায়। পূর্ণা,প্রেমা দাঁড়িয়ে আছে। দুজনকে চেনা যাচ্ছে না। শুকিয়ে কয়লা হয়ে গেছে।

চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। গাল ভাঙা। গায়ে শুধু হাড্ডি। মনে হচ্ছে কতদিন অনাহারে কাটিয়েছে। পূর্ণা পদ্মজাকে দেখেই 'আপা' বলে কেঁদে উঠল। ছুটে না এসে মাটিতে দপ করে শব্দ তুলে বসে পড়ল। প্রেমা দৌড়ে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। কাঁদতে থাকল। পদ্মজা বাকরুদ্ধ। অজানা

আশঙ্কায় গলা শুকিয়ে আসছে। চোখ দুটো খুঁজতে থাকল মাকে। পদ্মজা আমিরের দিকে তাকাল। আমিরের চোখ অস্থির। পদ্মজা প্রেমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আড়চোখে দেখে,পূর্ণা হাউমাউ করে কাঁদছে। কেন আসছে না ছুটে? কীসের এতো কষ্ট ওর?

পদ্মজা এগিয়ে আসে। পূর্ণাকে টেনে তুলে ক্ষীণ স্বরে বলল,'এতো শুকিয়েছিস কেন? আম্মা...আম্মা ভালো আছে?'

'আপা...আপারে।' বলে পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল পূর্ণা। পদ্মজা ঘরের ভেতর তাকায়। কয়েক জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। অজ্ঞাত ভয়ে গলা দিয়ে কথা আসছে না তার। পূর্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর ঢুকল পদ্মজা। সদর ঘরে চেনা অনেকগুলো মুখ। প্রতিবেশী সবাই। আপন মানুষগুলো কোথায়? পদ্মজা আরো দুই পা এগিয়ে আসে। উঠান থেকে মনজুরার কণ্ঠ ভেসে আসে,'পদ্ম আইছে,পদ্ম...'

সদর ঘরের মধ্যখানে পাটিতে শুয়ে আছেন হেমলতা। গায়ের উপর কাঁথা। মেরুদণ্ড সোজা করে শুয়ে আছে। গোলাপজলের ঘ্রাণ চারপাশে। পদ্মজার বুকের হাড়গুলো যেন গুড়োগুড়ো হতে শুরু করল। বুকে এতো ব্যাথা হচ্ছে! সে হেমলতার পাশে বসল। নিস্তরঙ্গ গলায় ডাকল,'আম্মা? ও আম্মা?'

হেমলতা পিটপিট করে তাকান। চোখ দুটি ঘোলা। গাল ভেঙে গেছে। চোখ দুটি গভীর গর্তের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার পথে। পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ সরিয়ে নিলেন। চিনতে পারলেন না। পদ্মজা হেমলতার এক

হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু দিল। দুই ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে হেমলতার হাতে। তাতেও হেমলতার ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি নিজের মতো ঘরের ছাদে তাকিয়ে আছেন। মনজুরা সদর ঘরে ঢুকেই বিলাপ শুরু করেন মাত্র,পদ্মজা জোরে চেঁচিয়ে উঠল,'চুপ করো। কেউ কাঁদবে না। চুপ করো।'

সবার কান্না থেমে যায়। পদ্মজা হেমলতাকে বলল,'ও আম্মা? কথা বলো? আমি...আমি তোমার পদ্মজা। তোমার আদরের পদ্মজা।'

'আম্মা চারমাস ধরে কাউকে চিনে না আপা।' পূর্ণা ডুকরে কেঁদে উঠল। পদ্মজার চোখ পড়ে সদর ঘরের কোণে। মোর্শেদ কপালে হাত দিয়ে বসে আছেন। মানুষটাকে চেনা যাচ্ছে না একদমই। পিঠের হাড্ডি ভেসে আছে। পদ্মজা বাকহীন হয়ে পড়েছে। কিছু বলবে নাকি কাঁদবে? বুকে কেমন যেন হচ্ছে! শরীরের শক্তি কে যেন শুষে নিয়েছে। পদ্মজা দুই হাতে হেমলতার মাথা তুলে ধরল। হেমলতা তাকান। নিষ্প্রাণ চাহনী। হেমলতার মাথাটা পদ্মজা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে। আকুল ভরা কণ্ঠে বলল,একবার কথা বলো আম্মা? একবার দুই হাতে জড়িয়ে ধরো।'

হেমলতার হাত দুটো নেতিয়ে আছে মাটির উপর। পূর্ণা খেয়াল করে হেমলতার হাত দুটি কাঁপছে। চেষ্টা করছে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরার কিন্তু পারছেন না। তাহলে কী পদ্মজাকে চিনতে পেরেছেন? পদ্মজা কাঁদতে থাকল। অনেকে অনেক কিছু বলছে। কারো কথা কানে ঢুকছে না। শুধু বুঝতে পারছে,এই পৃথিবীর বুক থেকে তার মা হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে হেমলতা। হারিয়ে যাচ্ছে তার কল্পনার রাজ্যের রাজরানী। স্বপ্ন তো সব পূরণ হয়নি! এ তো কথা ছিল না। তবে কেন এমন হচ্ছে? পদ্মজার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সারা শরীর বিষিয়ে যাচ্ছে। কাঁপা ঠোঁটে হেমলতার পুরো মুখে চুমু খেল পদ্মজা। ভারি করুণ ভাবে বলল,'ও আম্মা? কোথায় হারালো তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,ঝাঁঝালো কণ্ঠ?'

কেটে যায় অনেকটা মুহূর্ত। কাছের মানুষেরা ছাড়া আর কেউ নেই। কারো মুখে রা নেই। হেমলতার মতোই সবাই বাকহীন, স্তব্ধ। কেউ খায়নি। বাসন্তী গুপ্ত ব্যাথা নিয়ে রেঁধেছেন। প্রেমা-প্রান্ত,আমির ছাড়া কেউ খেল না। পদ্মজাকে অনেক জোরাজুরি করেছে আমির। পদ্মজা খেল না। আমিরও আর ঘাঁটল না। পদ্মজা জানতে পারল, দুই মাস ধরে হেমলতা বিছানায় পড়ে আছেন। এক দুটো কথা বলেন মাঝে মাঝে। চারদিন ধরে তাও বলেন না। গতকাল ভোরে মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়েছে। এমন অবস্থা হয়েছিল, সবাই ভেবেছিল আত্মাটা বেরিয়েই যাবে।

হাওলাদার বাড়ি থেকে সবাই দেখতে আসে। তখন জানা যায়,আলমগীর ঢাকা যাচ্ছে। মোর্শেদ অনুরোধ করে বলে,পদ্মজা আর আমিরকে খবর দিতে। ওরা যেন দ্রুত চলে আসে। রাতের ট্রেনে সকালে গোডাউনে পৌঁছে আলমগীর। আমিরকে সব বলে। আমির সব শুনে আর দেরি করেনি। পদ্মজাকে নিয়ে চলে আসে। পথে কান্নাকাটি করবে,তাই কিছু বলেনি। পদ্মজা এতসব জেনে কিছু বলল না। অভিমানের পাহাড় তৈরি হয়েছে মনে। কারো কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না। সারাক্ষন চেষ্টা করছে,হেমলতার সাথে কথা বলার। হেমলতা কিছুতেই কথা বলছেন না। একটু-আধটু পানির বেশি আর কিছুই খাচ্ছেন না। গায়ে মাংস বলতে নেই। চামড়া ঝুলে গেছে। পদ্মজা হেমলতার পুরো শরীর মুছে দিয়ে কাপড় পাল্টে দিল। এরপর শোয়া অবস্থায় অযু করাল। ঠোঁট ভেঙে কেঁদে আরো একবার আকুতি করল,'একবার কথা বলো আম্মা। একবার ডাকো পদ্মজা বলে।'

হেমলতা তাকালেন। কিছু বললেন না। তাকিয়েই রইলেন। মাঝরাতে সবাই যখন ঘুমে,পদ্মজা জেগে। ক্লান্ত হয়ে সবার চোখ দুটি লেগে গেলেও,তার চোখ দুটি পলকও ফেলছে না। মনে হচ্ছে,কে যেন চারপাশে ঘুরছে তার মাকে নিয়ে যেতে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,শেয়ালের হাঁক ছাপিয়ে সে যেন কারো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। অবচেতন মন, আজরাইলের উপস্থিতি অনুভব করছে। পদ্মজার বুকে ভয় জেঁকে বসে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। এদিকওদিক তাকিয়ে কেঁদে অনুরোধ করে,'অনুরোধ করছি,আমার মাকে কষ্ট দিবেন না।'

মুখে হাত চেপে কান্না আটকানোর প্রচেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হতে থাকল পদ্মজা। কাঁদতে কাঁদতে কণ্ঠ নিভে এসেছে। ঠান্ডায় শরীর জমে গেছে। চোখটা লেগেছে মাত্র,তখনি দপদপ একটা শব্দ ভেসে আসে। পদ্মজা চমকে তাকাল। হেমলতা হাত দিয়ে মাটি থাপড়াচ্ছেন। শরীর কাঁপছে। পদ্মজার নিঃশ্বাস থেমে যায়। হেমলতার এক হাত শক্ত করে ধরে কেঁদে উঠে বলল, 'আম্মা,আম্মা যেও না আমাকে ছেড়ে। ও আম্মা। আম্মা...আমার কষ্ট হচ্ছে আম্মা। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? আম্মা পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে যেও না। আম্মা...আম্মা।'

পদ্মজা দ্রুত হেমলতাকে জড়িয়ে ধরে। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। সবার ঘুম ছুটে যায়। একসাথে করুণ কান্নার স্বরে ভেসে উঠে মোড়ল বাড়ি। পদ্মজা কাউকে অনুরোধ করে বলে,'নিয়েন না আমার আম্মাকে। কষ্ট দিচ্ছেন কেন এতো? আমার আম্মার কষ্ট হচ্ছে। আম্মা। ও আম্মা। আম্মা আমাকে ছেড়ে যেও না।'

পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে সূরা ইয়াসিন পড়া শুরু করল। হেমলতা শেষবারের মতো উচ্চারণ করেন,'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আত্মাটা বেরিয়ে যায়। শরীরের কাঁপাকাঁপি থেমে যায়। দেহটা শুধু পড়ে রয় পরিত্যক্ত বস্ত্রের মতো। পদ্মজা দেহটাকে খামচে জড়িয়ে ধরে আম্মা বলে চিৎকার করে উঠল। আশেপাশের সব বাড়ি থেকে মানুষ ছুটে আসে। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারায়। ফজরের আযান পড়ছে। আমির পদ্মজাকে হেমলতার থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। কিছুতেই প্রাণ বিহীন দেহটা পদ্মজা ছাড়তে চাইল না। যেন তার ডাকেই ফিরে আসবে হেমলতা। এমন কী হতে পারে না? হেমলতা কথা বলে উঠলেন। আবার হাঁটলেন। পদ্মজাকে ধমকে বললেন,'চুপ! এতো কীসের কান্না? আমার মেয়ে হবে শক্ত আর কঠিন মনের। এতো নরম হলে চলবে না।'

এটা শুধুই কল্পনা। আত্মা একবার দেহ ছেড়ে দিলে আর ফিরে আসে না। আপন ঠিকানায় ফিরে যায়। হেমলতা নামে মানুষটার আয়ুকাল এতটুকুই ছিল। তিনি উড়াল দিয়েছেন পরকালে। রেখে গেছেন আদরের তিন কন্যা। আদরের কন্যাদের ছেড়ে তো কখনো দূরে থাকতে পারতেন না! এবার কীভাবে চলে গেলেন? তিনি নিশ্চয় মৃত্যুর সাথে কঠিন যুদ্ধ করেছেন! পেরে উঠেননি।

ভোরের আলো ফুটতেই পদ্মজা নিজেকে শক্ত করল। গোসল করে এসে কোরআন শরীফ নিয়ে বসল। হেমলতা বলতেন,'মা-বাবা মারা গেলে কান্নাকাটি না করে লাশের পাশে বসে কোরআান শরীফ পড়া ভালো। এতে করে কবরে আযাব থাকলে কম হয়। (এই কথার কোনো সত্যতা নেই। তবে অনেক গ্রামাঞ্চলের মানুষ এই কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।)

সে প্রতিটা অক্ষর পড়ছে আর কাঁদছে। জীবনের আকাশের সাতরঙা রংধনু নিভে গেছে। আর কখনো উঠবে না। কোনোদিন না। মোর্শেদ পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে চোখের জল মুছছেন। আবার ভিজে যাচ্ছে। গোসলের পর হেমলতার মুখটা উজ্জ্বল হয়েছে। ঠোঁটের কোণে যেন হাসি লেগে আছে। পদ্মজা হেমলতার মৃত দেহের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাদা কাপড়ে মোড়ানো লম্বা দেহটা দেখে বুকটা হাহাকার করে উঠে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে,'আমি

জানি,তোমার রুহ আমার পাশেই আছে। এভাবে কথা না ভাঙলেও পারতে আম্মা। বলেছিলে, কখনো কিছু লুকোবে না! বেহেশতে ভালো থেকো আম্মা। আমি পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্তকে দেখে রাখব।'

এরপর হাটুভেঙে খাঁটিয়ার সামনে বসল। হেমলতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,'আল্লাহকে বলে খুব দ্রুত আমাকে নিতে এসো কিন্তু।'

আমির,হিমেল সহ আরো দুইজন খাঁটিয়া কাঁধে তুলে নিল। কালিমা শাহাদাত বলতে বলতে তারা সামনে এগোয়। পূর্ণাকে তিনজন মহিলা ধরে রেখেছে। সে হাত পা দিয়ে ঝাঁপিয়ে চেষ্টা করছে ছোটার। তার ইচ্ছে হচ্ছে মৃত দেহটাই আঁকড়ে ধরে রাখতে। পদ্মজা মাটিতে বসে পড়ে। কী যেন বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! আম্মা...আম্মা বলে দুই হাতে মাটি খামচে ধরে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, বিড়বিড় করে,'আমার আম্মাকে কষ্ট দিও না মাটি। একটুও কষ্ট দিও না। আমার আম্মাকে যত্নে রেখ। হীরের টুকরো তোমার বুকে ঘুমাতে যাচ্ছে। কষ্ট দিও না...কষ্ট দিও না।'

হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপছে পদ্মজা। সন্ধ্যে থেকে খুব ঠান্ডা পড়েছে। এক কাপড়ে মাটিতে মা একা আছে ভেবে পদ্মজার অশান্তি হচ্ছিল। তাই কম্বল নিয়ে রাতের বেলা ছুটে আসে মায়ের কবরে। সদ্য হওয়া কবরের কাঁচা মাটির ঘ্রাণ আসছে। পদ্মজা কম্বল দিয়ে মায়ের কবর ঢেকে দিল।এরপর দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আম্মা...মনে আছে তোমার? যখন আমি ছোট অনেক। আব্বা আমার গায়ের কম্বল নিয়ে গিয়েছিল। তখন তুমি তোমার শাড়ির আঁচল দিয়ে সারারাত আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলে? মনে আছে? আমাকে কেন সেই সুযোগ দিলে না? কেন বললে না,তুমি মরণ রোগে আক্রান্ত। আমার জীবনে অভিশপ্ত আক্ষেপ কেন দিয়ে গেলে আম্মা? কেন পেলাম না আমার মাকে সন্তানের মতো আদর করার সুযোগ ? কোন দোষে আমার সঙ্গ তুমি নিলে না?

মৃত্যুর আগে নিজের মেয়ের সাথে এতো বড় অনাচার করে গেলে আম্মা! বিশ্বাসঘাতকতা করলে। আমিতো তোমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতাম। কখনো কোনো বিষয়ে জোর করিনি। জোর করে জানতে চাইনি। আমি বিশ্বাস করতাম তুমি সব বলবে আমায়। তুমি নিজে আমাকে বার বার বলেছো,তোমার জীবনের এক বিন্দু অংশ থাকবে না যা আমাকে বলবে না। তবে কেন সেই কথা রাখতে পারলে না? আমার কষ্ট হচ্ছে আম্মা। তুমি অনুভব করছো? আমি তোমার বুকে শুয়ে অভিযোগ তুলছি, তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো! আমার কাছ থেকে

কেড়ে নিয়েছো দশ মাস। তুমি পারতে,আমাকে বলতে। তুমি পারতে আমাকে বিয়ে না দিয়ে নিজের কাছে রাখতে। তুমি পারতে আমাকে আরো দশ মাস আমার মায়ের সঙ্গ দিতে। আমি এতো আক্ষেপ নিয়ে কী করে বাঁচবো আম্মা?'

কয়েকটা শেয়াল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝরাতে কবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ কাঁদতে পারে,এমন হয়তো কখনো দেখেনি তারা। পদ্মজা হেমলতার কবরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর অশ্রু বিসর্জন করছে। আত্মহত্যা পাপ না হলে হয়তো এই পথই বেছে নিত সে। মোর্শেদ,আমির টর্চ নিয়ে পদ্মজাকে খুঁজতে খুঁজতে কবরে আসে। হেমলতার কবর দেখে মোর্শেদ দূর্বল হয়ে পড়েন। পদ্মজার সাথে সাথে তিনিও কাঁদতে থাকেন। আমিরের শব্দভান্ডারে স্বান্তনা মজুদ নেই। সে সাহস করতে পারল না কথা বলার। কান্না থামিয়ে পদ্মজা মুখস্থ সূরা ইয়াসিন পড়তে থাকল। সে চায় না তার মায়ের বিন্দুমাত্র কষ্ট হউক কবরে। সন্তানের আমল নাকি পারে,মৃত মা-বাবার শাস্তি কমাতে। যদি কোনো পাপের শাস্তি হেমলতার আমলনামায় থেকে থাকে তা যেন মুছে যায় পদ্মজার কণ্ঠের মধুর স্বরে। ধীরে ধীরে পদ্মজার কণ্ঠ কমে আসে। ঠান্ডায় জমে যায়। চোখের মণির রং পাল্টে যায়। আমির দ্রুত পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। এরপর মোর্শেদকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। হেমলতা পড়ে রইলেন একা একা। শেয়ালগুলি একসাথে চেঁচিয়ে উঠল। মৃত্যুর মতো সত্য আর নেই। জন্মালে মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করতেই হবে।

হেমলতার ঘরে পদ্মজা আর পূর্ণা বসে আছে, দরজা বন্ধ করে। পুরো বিছানা জুড়ে হেমলতার পরনের কাপড়চোপড়। এসবই শেষ স্মৃতি। পূর্ণা দুটো শাড়ি বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে থেমে থেমে কাঁদছে। পদ্মজা মাটিতে বসে আছে। উসকোখুসকো চুল। পূর্ণা আর কাঁদতে পারছে না। বুক ফেটে যাচ্ছে তবুও শব্দ বেরোচ্ছে না। পদ্মজা হেমলতার চুড়ি দুটো হাতে নিয়ে বলল,'আম্মা বলে এখন কাকে ডাকব? পূর্ণা আমাদের আম্মা কই গেলো?'

পূর্ণা বিছানা থেকে নেমে আসে। পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা স্বরে বলল,'আল্লাহ কেন এমন করলো আপা? আমাদের প্রতি একটু দয়া হলো না।'

'এই ঘরটায় আর আসবে না আম্মা!'

'আপা,আম্মা আসে না কেন? আপা...আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আমাকে মেরে ফেলো।'

'কাঁদিস না বোন। আমাদের সবার আবার দেখা হবে পরকালে। এরপর আর মৃত্যু নেই। অনন্তকাল একসাথে থাকব। ঠিক দেখা হবে।'

পালঙ্কের উপর একটা পুরনো খাতা। পদ্মজা হাত বাড়িয়ে নিল। পূর্ণা এই খাতার প্রতিটি অক্ষর আগেই পড়েছে। তাই আর ঘাঁটল না। সে ক্লান্ত দেহ নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা খাতার পৃষ্ঠা উল্টায়,

আমার আদরের পদ্মজা,

আজ পনেরো দিন তোর বিয়ের। প্রতিটা রাত আমার নির্ঘুমে কাটে। পুরো বাড়িজুড়ে তোর স্মৃতি। স্মৃতিগুলো আমায় বিষে জর্জরিত করে দেয়। মেয়ে হয়ে জন্মালে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হয়। তবুও মানতে কষ্ট হচ্ছে,আমার মেয়ে সারাজীবনের জন্য অন্যের ঘরে চলে গিয়েছে। বলেছিলাম,আমার জীবনের বিন্দুমাত্র অংশ তোর অজানায় রাখব না। সেই কথা রাখতে আমি লিখতে বসেছি। স্বপ্ন ছিল,তোকে অনেক পড়াব। অনেক...অনেকদিন নিজের কাছে রাখব। কিন্তু মানুষের সব স্বপ্ন কী পূরণ হয়? দীর্ঘ দুই বছর আমার শরীরে বাসা বেঁধে ছিল এক রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। কিন্তু পাত্তা দেইনি। যখন তোর মেট্রিক পরীক্ষার জন্য আকবর ভাইজানের বাড়িতে গেলাম তখন একজন ভালো ডাক্তারের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আকবর ভাইজানের বন্ধু। দেখা করতে এসেছিলেন। তখন তুই পরীক্ষা কেন্দ্রে ছিলি। উনার নাম আসাদুল জামান। বিলেত ফেরত ডাক্তার। কথায় কথায় আমার সমস্যাগুলোর কথা বলি। তিনি খালি চোখে আমাকে দেখেন। কিছু প্রশ্ন করেন। উনার ধারণা জানান, আমি পারকিনসন্স ডিজিস নামক প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত। যার ৮০ ভাগ লক্ষণ আমার সাথে মিলে যায়। তিনি দ্রুত আমাকে পরীক্ষা করতে বলেন। এই রোগের চিকিৎসা তো দূরে থাক দেশে এই রোগ পরীক্ষার কেন্দ্রও হাতেগোনা ১-২ টা আছে। সেদিনটা আমার জীবনের বড় ধাক্কা ছিল। আমি দিকদিশা হারিয়ে ফেলি। আমি মারা গেলে আমার তিন মেয়ের কী হবে? কী করে বাঁচবে? ভয়ানক এই রোগ নিয়ে তোর সামনে হাসতে আমার ভীষণ কষ্ট হতো। তবুও হাসতে হতো। মুহিব খুব ভালো ছেলে। তাই তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেইনি। আমি মারা যাওয়ার আগে তোর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম। বিয়ে ঠিক করে ফিরে আসি গ্রামে। প্রতিটা দিন,প্রতিটা মুহূর্ত অসহনীয় যন্ত্রনায় কাটতে থাকে। আসাদুল জামান ঢাকার এক হাসপাতালের নাম লিখে দিয়েছিলেন। যেখানে এই রোগের পরীক্ষা করা হয়। ১০০ ভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা করানোটা জরুরি। তার জন্য কেউ একজনকে দরকার পাশে। তোর আব্বাকে সব বলি। সব শুনে তোর আব্বা হাউমাউ করে বাচ্চাদের মতো কেঁদেছে! আল্লাহর উপর ভরসা রেখে,চলে যাই ঢাকা। আমি তখন হুঁশে ছিলাম না। মৃত্যু আমার পিছনে ধাওয়া করছিল। তাই মাথায়

আসেনি,আমি না থাকলে আমার মেয়েদের কোনো ক্ষতি হতে পারে। ঢাকা যাওয়ার পথে আল্লাহর কাছে আকুতি করি,যেন পরীক্ষায় কিছু ধরা না পড়ে। বিয়েটা ভেঙে দিতে পারি। আর আমার মেয়েদেরকে নিয়ে আরো কয়টা বছর বাঁচতে পারি। কিন্তু আল্লাহ শুনলেন না। তিনি দয়া করলেন না মা! জানতে পারি,আমার হাতে সময় কম। এ রোগের নিরাময় নেই। যেকোনো বছরে যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি। এই কথা শোনা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোদের কথা মনে পড়তেই আবার নিজেকে শক্ত করে নিয়েছি। যতদিন বাঁচব শক্ত হয়ে বাঁচব। তোর জীবন গুছিয়ে দিয়ে যাব। আমি পেরেছি। তোর বিয়ে হয়েছে। ভালো ছেলের সাথে। সুখে আছিস। এইতো শান্তি। আমার ভাবতে কষ্ট হয়, একদিন তোকে, তোদের সবাইকে আমি ভুলে যাব। এখন তো কথা ভুলে যাই। তখন নিজের নাড়ি ছেড়া সন্তানদের মুখও অচেনা হয়ে যাবে। কী নির্মম তাই না মা?

তুই ঢাকা চলে গিয়েছিস অনেকদিন হলো। আমার মনে হচ্ছে,আমাদের আর দেখা হবে না। আমার শরীরের অবস্থা ভালো না। আজ নাকি প্রান্তকে চিনতে পারিনি আমি। বেশ অনেক্ষণ ওর চেহারাটা আমার অচেনা লেগেছে। কী অদ্ভুত! ভুলে যেয়ে আবার মনে পড়ে। হাত, পা, মাথা মুখের থুতনি, চোয়াল মাঝে মাঝে খুব কাঁপে। ধীরে ধীরে শরীরের ভারসাম্য একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। লাহাড়ি ঘরে গিয়েছিলাম,হুট করে চৌকির উপর থেকে পড়ে গিয়েছি। পূর্ণার সে কী কান্না! মেয়েটা খুব কাঁদুনে হয়েছে। একদমই হাঁটতে ইচ্ছে করে না। শক্তি কুলোয় না। তোর কথা খুব মনে পড়ে। বৃদ্ধ হয়ে তোর শরীরে ভর দিয়ে হাঁটার ইচ্ছে ছিল মনে। পেটের চামড়ার ফোস্কার মতো কী যেন হয়েছে। চুলকায়, ব্যাথা করে। রাতে ঘুম হয় না যন্ত্রনায়। তোর আব্বা আমার অশান্তি দেখে ঘুমাতে পারে না। বাসন্তী আপা সব জানে। মানুষটা অনেক ভালো। ভুল তো সবাই করে। এমন কেউ আছে? যে জীবনে ভুল করেনি। বাসন্তী আপার রান্না নাকি অনেক মজার হয়। খুব ভালো ঘ্রাণ হয়। প্রান্ত,প্রেমা সারাক্ষণই বলে। কিন্তু আমি সেই ঘ্রাণ পাই না। ঘ্রাণশক্তিটাও লুপ্ত হয়ে গেছে। কয়দিন ধরে টয়লেটও হচ্ছে না। খাবার গিলতে পারি না। কোন পাপে এমন করুণ দশা হলো আমার? বোধহয়, আর শক্তি পাবো না লেখার। পুরনো সবকিছু স্থায়ীভাবে ভুলতে আর কতক্ষণ? সব লক্ষণ তো জেঁকেই বসেছে শরীরে। বাকি শুধু দুনিয়াটাকে ভুলে যাওয়া। আজ সারারাত জেগে আরো কিছু কথা লিখতে চাই। সেদিন আমি জলিল আর মজনুর ছেলেকে খুন করেছি। ছইদ তার আগেই খুন হয়ে গিয়েছিল। আটপাড়ার বড় বিলের হাওড়ের টিনের ঘরে ওরা তিনজন সবসময় জুয়া খেলে,গাঁজা খায়। সেদিনও গাঁজা খেয়ে পড়েছিল। গিয়ে দেখি ছইদের লাশ এক কোণে পড়ে আছে। দা হাতে দাঁড়িয়ে আছে তোর দেবর রিদওয়ান। ও আমাকে দেখে পালিয়ে যায়। এরকম দৃশ্য দেখে অপ্রস্তত হয়ে পড়ি তবুও থেমে থাকিনি। ঘুমন্ত জলিল আর মজনুর ছেলেকে বেঁধে....। বাকিটুকু বললাম না। শুধু এইটুকু বলব, আমি যখন জলিল আর মজনুর ছেলেকে কোপাচ্ছিলাম তখন রিদওয়ান ঘরের এক পাশে লুকিয়ে ছিল। সে সব দেখেছে। আমি বের হতেই সে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করে। আজও জানতে পারিনি,সে কেন ছইদকে খুন করেছে। তুই ঢাকা চলে গিয়েছিস

ভেবে শান্তি লাগছে। রিদওয়ান ভয়ংকর মানুষ। তার খুন করার হাত বলছে,এটা তার প্রথম খুন নয়। সাবধানে থাকবি। আমিরকে সাবধানে রাখবি। তোর শ্বাশুড়িকে কাঁদতে দেখেছি। উনাকে আপন করে রাখবি।

আর লেখা যাচ্ছে না। হাত কাঁপছে। কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে চারিদিক। এই খাতাটা প্রান্তের। লুকিয়ে নিয়ে এসেছি। আমার সব শাড়ির সাথে ট্রাঙ্কের ভেতর যত্নে রাখছি। আমার অনুপস্থিতিতে যখন পড়বি কাঁদবি না একদম। জীবনে বড় হবি। আমি না থাকলে মৃত্যুর কামনা করবি না। এটাও এক ধরণের পাপ। আল্লাহর যখন ইচ্ছে হবে মৃত্যু দিবেন। তিনি যে কারণে সৃষ্টি করেছেন,তা পূরণ হলেই মৃত্যু ধেয়ে আসবে। শুধু মৃত্যুর কথা স্বরণ রাখবি। কোরআনের পথে চলবি। কোনো পাপে জড়াবি না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবি না। আমাদের আবার দেখা হবে। আমার মায়ের সাথে আবার দেখা হবে। তুইতো আমার মা। আমার পদ্মজা। আমার সাত রাজার ধন। আমার তিন কন্যা আমার অহংকার। আমার বেহেশত। ভালো থাকবি। খুব ভালো থাকবি। মা কিন্তু দেখব। কান্নাকাটি করতে দেখলে ওপারে আমার শান্তি হবে না। তাই কাঁদবি না। আল্লাহ হাফেজ।'

পড়া শেষ হতেই খাতাটা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে পদ্মজা। হাতপা ছুঁড়ে আম্মা,আম্মা বলে কাঁদতে থাকে। তার আর্তনাদে চারিদিক স্তব্ধ হয়ে যায়।

....

পদ্মজার মাথার ছায়া এভাবেই হারিয়ে যায়। পদ্মজা কী হয়ে উঠতে পারে নিজের ছায়া নিজে? পারবে ভাই-বোনদের আগলে রাখতে? বাকি রহস্যের কিনারায় পৌঁছাতে? সব প্রশ্নের উত্তর আছে দ্বিতীয় খন্ডে। খুব দ্রুত নিয়ে আসব ২য় খন্ড। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবে। নিজের দায়িত্ব নিজের। ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য হেমলতা হয়ে উঠুন। অস্থায়ী সময়ের জন্য বিদায়।

#পদ্মজা

চলবে......

প্রথম পর্বের সমাপ্তি

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে#আমিপদ্মজা পাট- ৪৬

১৯৯৬ সাল। ঘনকুয়াশার ধবল চাদর সরিয়ে প্রকৃতির ওপর সূর্যের নির্মল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কাঁচের জানালার পর্দা সরাতেই এক টুকরো মিষ্টি পেলব রোদ্দুর পদ্মজার সুন্দর মুখশ্রীতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নীচ তলা থেকে মনার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আপামনি।'

মিষ্টি রোদের কোমল ছোঁয়া ত্যাগ করে ঘুরে দাঁড়াল পদ্মজা। আমির আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে লেপের ওম ছেড়ে উঠে বসল। দরজার বাইরে চোখ পড়তেই দেখতে পেল পদ্মজাকে। ধনুকের মতো বাঁকা শরীরে সবুজ সুতি শাড়ি। মাথায় লম্বা বেনুনি, চওড়া পিঠের ওপরে সাপের মতন দুলছে। পাতলা কোমর উন্মুক্ত। আমির চমৎকার করে হেসে ডাকল,'পদ্মবতী।'

পদ্মজা ফিরে না তাকিয়েই জবাব দিল,'অপেক্ষা করুন,আসছি।'

আমির মুখ গুমট করে বলল,'ইদানীং আমাকে একদমই পাত্তা দিচ্ছো না তুমি। বুড়ো হয়ে গেছি তো।'

ওপাশ থেকে আর সাড়া আসল না। আমির অলস শরীর টেনে নিয়ে বারান্দায় গেল। পদ্মজা বৈঠকখানায় এসে দেখে,মনা সোফায় পানের কৌটা নিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। নয় বছরের মনা এখন চৌদ্দ বছরের ছটফটে কিশোরী। পদ্মজা গম্ভীর স্বরে বলল,' পান খাওয়ার অনুমতির জন্য ডেকেছিস?'

মনা নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা নত অবস্থায় রেখেই চোখ উল্টিয়ে তাকিয়ে পদ্মজাকে দেখল একবার। এরপর আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল,'অনেকদিন খাই না। আপামনি একটা খেতে দাও না?'

মনা চাইলে লুকিয়ে খেতে পারতো। কিন্তু সে পদ্মজাকে ডেকে অনুমতি চাইছে। পদ্মজা মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। সোফায় বসে প্রশ্ন করল,'পান কে দিয়েছে? আবার সাথে পানের কৌটাও!'

'আব্বা আসছিল।' ভীতু কণ্ঠে বলল মনা।

'কখন?'

'ভোরবেলা।'

'বাসায় আসেনি কেন?'

'কাজে যাচ্ছে তাই।'

'উনি এমনি এমনি কেন আনবেন পানের কৌটা? তুই স্কুল থেকে ফেরার পথে বস্তিতে গিয়েছিলি, তাই না?'

মনা জবাব দিল না। তার চুপ থাকা প্রমাণ করছে,পদ্মজার ধারণা সত্য। পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। বলল,'একটা পান খাবি। কৌটাসহ বাকি পান,সুপারি রহমত চাচাকে দিয়ে তোদের বস্তিতে পাঠিয়ে দেব।'

পদ্মজা চলে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল,'তুই নাকি গণিতে ফেইল করেছিস?'

পদ্মজার প্রশ্নে মনা চোরের মতো এদিকওদিক চোখের দৃষ্টি দৌড়াতে থাকল। পদ্মজা ধমকে উঠল,'বলছিস না কেন? আমি প্রতিদিন রাতে সময় নিয়ে তোকে গণিত বুঝিয়েছি। তবুও ফেইল করলি কী করে?'

মনা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,'পরীক্ষার আগের দিন পড়িনি। পরীক্ষায় গিয়ে সব ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছিল।'

'কেন পড়িসনি? সেদিন আমি অসুস্থ ছিলাম না? তাই আমি দুই তলায় ছিলাম নিচে একবারও আসতে পারিনি। এই সুযোগে পড়া রেখে টিভি দেখেছিলি তাই তো?'

মনা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। পদ্মজা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। বেহায়ার মতো আবার স্বীকারও করছে,পড়া রেখে টিভি দেখেছে! ঢাকা আসার পরের বছরই মনাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল সে। এখন মনা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। মাথায় বুদ্ধি বলতে নেই। সারাক্ষণ টিভি, টিভি আর টিভি! এতো পড়ানোর পরও কিছু মাথায় রাখতে পারে না। পদ্মজা বিরক্তি নিয়ে জায়গা ছাড়ল। শোবার ঘরে ঢুকতেই আমির আক্রমণ করে বসল। পদ্মজার কোমরের উন্মুক্ত অংশে হাত রাখতেই পদ্মজা 'উফ! ঠান্ডা।' বলে ছিটকে সরে গেল। আমির হতভম্ব হয়ে গেল। দুই পা এগোতেই প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রিনরিনে কণ্ঠে ধমক বেরিয়ে আসল,'একদম এগোবেন না। এই শীতের মধ্যে ভেজা হাতে ছুঁলেন কীভাবে? আচ্ছা,আপনি আমার কালো সোয়েটারটা দেখেছেন? পাচ্ছি না। শীতে জমে যাচ্ছি একদম।'

আমির কিছু বলল না। সে পদ্মজার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা এদিকওদিক তার কালো সোয়েটারটা খুঁজল। এরপর আমিরের দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। বলল,'এভাবে সঙের মতো খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

আমির কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। পদ্মজা পাশের ঘরে চলে গেল। কালো সোয়েটারটা খুঁজে বের করতেই হবে। এ সোয়েটারটা পরে সে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আমির টেলিফোন রেখে পদ্মজাকে ডেকে জানাল, সে বের হবে। জরুরি দরকার। পদ্মজা সোয়েটার খোঁজা রেখে তাড়াতাড়ি করে খাবার পরিবেশন করল। গরুর মাংস গরম করল। আমির খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিয়মমতো পদ্মজার কপালে চুমু দিয়ে বেরিয়ে গেল। পদ্মজা তৈরি হয় রোকেয়া হলে যাওয়ার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে রোকেয়া হলের অনেক মেয়েকেই চিনে। আজ মনার স্কুল নেই। সে একাই বাসায় থাকবে। পদ্মজা হলে যাচ্ছে এক ছোট বোনের সাথে দেখা করার জন্য। আমিরের তো কখনোই ছুটি নেই। নিজের ব্যবসা। যখন তখন কাজ পড়ে যায়।

রোকেয়া হলের চারপাশ সবুজ গাছে আবৃত। পদ্মজা গেইটের বাইরে গাড়ি রেখে এসেছে। হিম শীতল বাতাসে চোখজোড়া ঠান্ডায় জ্বলছে। তার পরনে বোরকা। মুখে নিকাব। রোকেয়া হলের 'ক' ভবনে এসে জানতে পারল যার খুঁজে সে এসেছে সে নেই। চারিদিক নিরিবিলি। প্রায় সবাই ক্যাম্পাসে। নির্জন পরিবেশে এমন ঠান্ডা বাতাস রোমাঞ্চকর অনুভূতি। রোকেয়া হলে এ নিয়ে অনেকবার এসেছে সে। পদ্মজা 'ক' ভবনের নিচ তলার শেষ মাথার কাছাকাছি অবধি গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তখন অতি সূক্ষ্ম একটা শব্দ কানে ভেসে আসে। পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। দুই পা পিছিয়ে চোখ বুজে শোনার চেষ্টা করল। শব্দটা তীব্র হয়েছে! যেন কাছে কোথাও ধস্তাধস্তি হচ্ছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকায়। একটা মেয়ের চাপা কান্নার শব্দ কর্ণকুহরে পৌঁছাতেই পদ্মজা দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো ছুটে আসে শেষ কক্ষের দরজার সামনে। পৌঁছেই দেখতে পেল অর্জুন এবং রাজু একটা মেয়েকে টেনে হিঁচড়ে কক্ষ থেকে বের করতে চাইছে। ক্যাম্পাসের ছাত্রসংগঠনের নেতা এরা। ছয় মাস হলো ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বে এসেছে। আর এখনই ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেছে। পদ্মজার উপস্থিতি টের পেয়ে অর্জুন,রাজু তাকাল। মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। পদ্মজাকে দেখে মেয়েটা ছুটে আসতে চাইলে অর্জুন ধরে ফেলে। পদ্মজা বেশ শান্তভাবেই বলল,'ক্ষমতার অপব্যবহার করতে নেই। ছেড়ে দাও মেয়েটাকে।'

পদ্মজার কণ্ঠ মেয়েটা চিনতে পারল। অস্ফুটভাবে ডাকল,'পদ্ম আপা।'

এরপর বলল,'পদ্ম আপা,আমি মিঠি। পদ্ম আপা ওরা আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও।'

পদ্মজা ভালো করে খেয়াল করে চিনতে পারল মিঠিকে। অর্জুন মিঠির গালে শরীরের সব শক্তি দিয়ে থাপ্পড় মেরে রাজুকে বলল,'এরে ঘাড়ে উঠা। এই আপনি সরেন। মাঝে হাত ঢুকাবেন না। বিরক্ত করা একদম পছন্দ না আমার।'

পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়াল। বলল,'দেখো, মা জাতিকে এভাবে অপমান করতে নেই। হাতে ক্ষমতা পেয়েছো সৎভাবে চলো। সবার ভালোবাসা পাবে। এভাবে নিজেরা অন্যের ইজ্জত নষ্ট করছো সেই সাথে নিজেদের পাপী করছো।'

'এই ফুট এখান থেকে। নীতি কথা শোনাতে আসছে।'

'ভালোভাবে বলছি,ভেজাল না করে ছেড়ে দাও। নারীকে নারীরূপে থাকতে দাও। শক্ত হতে বাধ্য করো না।'

অর্জুন রাগে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলল,'আর একটা কথা বললে জামাকাপড় খুলে মাঠে ছেড়ে দেব।'

কথাটা শেষ করে অর্জুন চোখের পলক ফেলতে পারল না। তার আগে পদ্মজার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসে যায় তার ফর্সা গালে। অর্জুন রক্তিম চোখে কিড়মিড় করে তাকায়। মিঠিকে ছেড়ে পদ্মজার গলায় চেপে ধরে। পদ্মজা সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের অণ্ডকোষ বরাবর লাথি বসিয়ে দিল। অর্জুন কোঁকিয়ে উঠল। অণ্ডকোষে দুই হাত রেখে বসে পড়ল। রাজু বিশ্রি গালিগালাজ করে পদ্মজার দিকে তেড়ে আসে। পদ্মজা মেঝে থেকে ইট তুলে রাজুর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। মিঠি ভয়ে চোখ খিঁচে ফেলে। রাজুর কপাল ফেটে রক্তের ধারা নামে। অর্জুন আকস্মিক তেড়ে এসে পদ্মজার নিকাব টেনে খুলে। ঘোলা চোখের ভয়ংকর চাহনি,রক্তজবার মতো ঠোঁটের কাঁপুনি অর্জুনের অন্তর কাঁপিয়ে তুলে। তবুও দমে থাকেনি। পদ্মজাকে হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। পদ্মজা তার কাঁধের ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে অর্জুনের গলায় টান বসায়। এই দৃশ্য দেখে মিঠির শরীর কাঁপতে থাকে। অর্জুন চিৎকার করে বসে পড়ে। গলায় হাত দিয়ে দেখে গলাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়নি। চামড়া ছিঁড়েছে শুধু। তার হৃৎপিণ্ড যেন মাত্রই মৃত্যু সাক্ষাৎ পেল। পদ্মজার অভিজ্ঞ হাত তার কলিজা শুকিয়ে দিয়েছে। মেঝেতে বসে হাঁপাতে থাকে। পদ্মজা ছুরির রক্ত অর্জুনের গেঞ্জিতে মুছে বলল,'তোমাদের ভাগ্য ভালো পদ্মজার হাতে পড়েছো। হেমলতার হাতে পড়োনি।'

এরপর মিঠিকে প্রশ্ন করল,'আমার জানামতে তুমি ১ম বর্ষে আছো। আর হলে দ্বিতীয় তলায় থাকার কথা। এখানে আসলে কী করে?'

মিঠির ভয় এখনও পুরোপুরি কাটেনি। সে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল,'আমি গত কয়দিন অসুস্থ ছিলাম। ক্যাম্পাসে যেতে পারিনি। অর্জুন দাদা নাজমাকে দিয়ে আমাকে ডেকেছিল।'

'ওমনি চলে এসেছো? কয়দিন আগে ৩য় বর্ষের একটা মেয়ের কী হাল হয়েছে দেখোনি,শুনোনি? এরপরও এদের ডাকে সাড়া দিলে কেন?'

'না দিয়েও উপায় নাই।'

পদ্মজা আর কিছু বলতে পারল না। মিঠিকে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। এরপর নিকাব পরতে পরতে বলল,'এসব বেশিদিন সহ্য করা যায় না। মেয়েরা হলে এসে থাকে পড়াশোনার জন্য। আর এসব নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়। তোমার চেনাজানা আরো যারা মানসিক,শারিরীকভাবে ভুক্তভোগী আছে সবার নামের তালিকা আমাকে দিতে পারবে?'

মিঠি জানতে চাইল,'কেন?

'সবাইকে নিয়ে প্রশাসনের কাছে যাব। তাদের নিরবতা আর মেনে নেব না। ক্যাম্পাসে আসার পর থেকে নেতাদের অপকর্ম দেখছি। থামানোর চেষ্টা করেছি। একজন,দুজন থামে আরো দশজন বাড়ে। এইবার আমাদের আন্দোলন করতে হবে।'

মিঠি মিনমিনিয়ে বলল,'কেউ ভয়ে আন্দোলন করতে চায় না। অনেকবার দিন তারিখ ঠিক হয়েছে শুনেছি। এরপর যাদের আসার কথা ছিল তাদের মধ্যে আশি ভাগই আসতো না। অনেককে বাসায় আক্রমণ করা হয়েছে।'

পদ্মজার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসল। সমাজে মেয়েরা এতো দূর্বল! তাদের দেহের লুকায়িত আকর্ষণীয় ছন্দগুলো না থাকলে হয়তো তারাও সাহসী হতো। ছন্দ হারানোর ভয় থাকত না। কাউকে ভয় পেতে হতো না। পদ্মজা মিঠিকে বলল,'তুমি বরং কয়দিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসো। এখানে থাকা তোমার জন্য এখন বিপদজনক। আমি আগামীকাল গ্রামে যাচ্ছি। আমার আম্মার মৃত্যুবার্ষিকী। ছোট বোনের মেট্রিক পরীক্ষা দেড় মাস পর। আরেক বোনের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি। দেড়-দুই মাসের মতো গ্রামে থাকব। এরপর এসে এই নেতাদের ব্যবস্থা করব। তোমাদের বর্ষের শিখা আছে না? বেশ সাহসী মেয়েটা। ওর মতো আরো কয়টা মেয়ে পাশে থাকলেই হবে। তুমি যাও এখন। দ্রুত বাড়ি ফেরার চেষ্টা করো। যতক্ষণ এখানে আছো একা চলাফেরা করো না। শিখাও তো মনে হয় হলেই থাকে?'

'জি।'

'ওর সাথে থেকো।'

'কখনো কথা হয়নি।'

'এখনতো ক্যাম্পাসে বোধহয়। আচ্ছা বিকেলে আমি আবার আসব। ওর সাথে কথা বলব। আমি আসছি এখন।'

'পদ্ম আপা?'

পদ্মজা তাকাল। মিঠি পদ্মজাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। ভেজাকণ্ঠে বলল,'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

'বাঁচার সংগ্রামে ভীতু হলে চলে না মিঠি।'

'ভেবেছিলাম জীবনটা শেষ হয়েই গেল বুঝি।'

'কখনো এমন ভাববে না। বিপদে সামর্থ্য মতো যা পারো করবে। শরীরের শক্তি নিশ্চয় কম নয়। মনের জোরটা কম। সেই জোরটা বাড়াবে। মনের জোর বাড়াতে টাকা লাগে না। কঠিন জীবন সহজ করে তোলার দায়িত্ব নিজেরই নিতে হয়।'

মিঠি মাথা তুলে তাকাল। একটু সরে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছল। এরপর বলল,'দ্রুত ফিরবে পদ্ম আপা। আমরা আমাদের নিরাপত্তার যুদ্ধে নামব।'

পদ্মজা হেসে বলল,'ফিরব। দ্রুত ফিরব।'

গাড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটছে। বাড়ির নাম আগে ছিল,আমির ভিলা। বছর ঘুরতেই আমির বাড়ির নাম পাল্টে দিল,পদ্ম নীড়। পদ্মজা জানালার কাচ তুলে বাইরে তাকাল। রাস্তাঘাটে মানুষজন কম। ঠান্ডা বাতাস। সূর্যের আলোয় একদমই তেজ নেই। যেন থুড়থুড়ে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। পদ্মজা আকাশপানে তাকিয়ে তিনটা প্রিয় মুখকে খোঁজে। চোখ দুটি টলমল করে উঠে। কোথায় আছে তারা? আবার কবে হবে দেখা? পদ্মজা কাচ নামিয়ে দিল। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

নিস্তব্ধ বিকেল ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে অলন্দপুরের আটপাড়া। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় নূপুরধ্বনিতে। পূর্ণার চঞ্চল কাদামাখা দুটি পা দৌড়ে ঢুকে মোড়ল বাড়ি। পায়ের নূপুরজোড়া রিনঝিন রিনঝিন সুর তুলে ছন্দে মেতেছে। পরনে লাল টুকটুকে শাড়ি। আঁচল কোমরে গোঁজা। শাড়ি গোড়ালির অনেক উপরে পরেছে। । বাড়িতে ঢুকেই চেঁচিয়ে ডেকে উঠল,'বড় আম্মা। ও বড় আম্মা।'

বাসন্তী রান্নাঘর ছেড়ে দৌড়ে আসেন। হাতের চুড়িগুলো ঝনঝন করে উঠে। মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। তাও কিঞ্চিৎ। পূর্ণাকে এভাবে হাঁপাতে দেখে প্রশ্ন করলেন,'বাড়িতে ডাকাত পরছে?'

'আপার চিঠি।' পূর্ণা হাতের খামটা দেখিয়ে বলল।

আপার চিঠি শুনে প্রেমা বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সে পড়ছিল। ওড়না দিয়ে ঘোমটা টানা। ষোড়শী মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সবার চেয়ে আলাদা হয়েছে। খুব ভীতু এবং লাজুক সে। পূর্ণা বড় বোন হয়ে সারাদিন বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। আর সে ঘরে বসে পড়ে,বাড়ির কাজ করে। স্কুলে যায়। পদ্মজার কথামতো প্রতিদিনের রুটিন অনুসরণ করে। সে বলল,'কী বলছে আপা? চিঠি দাও।'

পূর্ণা কপাল কুঁচকে বলল,'তোর পড়তে হবে না। বলছে,মাঘ মাসের ১৯ তারিখ আসছে। অনেকদিন থেকে যাবে।''

'আজ কত তারিখ?' প্রশ্ন করলেন বাসন্তী।

পূর্ণা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,'১৯ শে মাঘ।'

বাসন্তীর চোখ দুটি যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। বিস্ফোরিত কণ্ঠে বললেন,'আজই! বিকেল তো হয়ে গেছে।'

পূর্ণা অস্থির হয়ে বাসন্তীর কাছে দৌড়ে আসে। দুই হাতে ধরে করুণ স্বরে বলল,'তাড়াতাড়ি সালোয়ার কামিজ বের করো আমার। এই রূপে দেখলে একদম মেরে ফেলবে আপা।'

বাসন্তী আরোও করুণ স্বরে বললেন,'মা, আমি আগে আমার রূপ পাল্টাই। তুমি তোমারটা খুঁজে নাও।'

কথা শেষ করেই বাসন্তী ঘরের দিকে যান। বুক দুরুদুরু কাঁপছে। পরনে ঝিলমিল, ঝিলমিল করছে টিয়া রঙের শাড়ি। দুই হাতে তিন ডজন চুড়ি। কপালে টিপ,ঠোঁটে লিপস্টিক। এ অবস্থায় পদ্মজা দেখলে কেলেঙ্কারি হয়ে

যাবে। তিনি সাজগোজ পূর্ণার কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর পূর্ণার কথায়ই দুজন মিলে আবার শুরু করেছেন। পদ্মজা এক-দুই দিনের জন্য প্রতি শীতে বাড়ি আসে তখন সব রঙ-বেরঙের জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়। পূর্ণা চিঠি প্রেমার হাতে দিয়ে ঘরে যায়। ট্রাঙ্ক খুলে সাদা-কালো রঙের সালোয়ারকামিজ দ্রুত পরে নেয়। হাতের চুড়ি খুলতে গিয়ে কয়টা ভেঙে যায়। অন্যবার দুই-তিন দিন আগে চিঠি আসে। আর আজ যেদিন পদ্মজা আসছে সেদিনই চিঠি আসতে হলো! দশ দিন আগে চিঠি পাঠিয়েছে পদ্মজা। ডাকঘর থেকেই দেরি করেছে। পূর্ণা মনে মনে ডাকঘরের কর্মচারীদের গালি দিয়ে চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করছে। সে দ্রুত জুতা পরে বারান্দায় আসে। প্রেমাকে তাড়া দিল,'জলদি পানি নিয়ে আয়।'

প্রেমার বেশ লাগছে। সে মনেপ্রাণে দোয়া করছে,পদ্মজা এখুনি এসে যাক আর দেখুক পূর্ণার সাজগোজ। কিন্তু প্রকাশ্যে পূর্ণার আদেশ রক্ষার্থে কলসি নিয়ে কলপাড়ে গেল। পূর্ণা মনে মনে আয়তুল কুরসি পড়ছে! এই বুঝি পদ্মজা এসে গেলো! গতবার মার তো খেয়েছেই। তার সাথে পদ্মজা রাগ করে তিন মাস চিঠি লিখেনি। বাতাসের বেগে পাতায় মড়মড় আওয়াজ হচ্ছে। আর পূর্ণার মনে হচ্ছে, এইতো তার রাগী আপা হেঁটে আসছে। নাহ পানির জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। পূর্ণা কলপাড়ে ছুটে যায়। কলসি থেকে পানি নিয়ে পায়ের কাদা,ঠোঁটের লিপস্টিক ধুয়ে ফেলে। কপালের টিপ খুলে কলপাড়ের দেয়ালে লাগিয়ে রাখে। হাতের চুড়ি, গলার হার,কানের বড় বড় দুল ট্রাঙ্কের ভেতর রেখে এসেছে। পায়ের দিকে আবার চোখ পড়তেই, সে আঁতকে উঠল। নূপুরজোড়া হাঁটার সময় অনেক আওয়াজ তুলে। এ রকম নূপুর পরা নাকি ইসলামে নিষিদ্ধ। আবার দৌড়ে গেল ঘরে। দৌড়ার সময় বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। নূপুর দুটো খুলে ট্রাঙ্কের ভেতর রেখে দিয়ে মাটিতে ধপ করে বসে লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। বিড়বিড় করে বলল,'বাঁচা গেল!'

এরপর হাঁটুতে থুতুনি রেখে মিষ্টি করে হাসল। আজ তার আপা আসবে। তার জীবনের সবচেয়ে দামী এবং ভালোবাসার মানুষটা আসবে। ঈদের আনন্দের চেয়েও বেশি এই আনন্দ। পূর্ণা মাথায় ঘোমটা টেনে রান্নাঘরে যায়। প্রায় বছর খানেক পর আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে সে। বাসন্তী সাদা রঙের শাড়ি পরেছেন। তাড়াহুড়ো করে এটা ওটা রাঁধছেন। পূর্ণা সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াল। বাসন্তী বললেন,'প্রান্তরে বল গিয়ে লাল রঙের দাগ দেয়া রাজহাঁসটা ধরতে।'

পূর্ণা চুলায় লাকড়ি আরেকটা দিয়ে লাহাড়ি ঘরের দিকে যায়। প্রান্তকে লাহাড়ি ঘরেই বেশি পাওয়া যায়। প্রেমা পদ্মজার জন্য হেমলতার ঘরটা গুছাচ্ছে।

#পদ্মজা

চলবে....

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - ৪৭

ইট-পাথরের শহরের সবই কৃত্রিম। কৃত্রিমতা ছেড়ে ছায়ায় ঘেরা মায়ায় ভরা গ্রাম, আঁকা-বাঁকা বয়ে চলা নদী-খাল, সবুজ শ্যামল মাঠের প্রাকৃতিক রূপ দেখে তৃষ্ণার্ত নয়নের পিপাসা মিটাতে গিয়ে পদ্মজা আবিষ্কার করল,তার চোখে খুশির জল! সবেমাত্র অলন্দপুরের গঞ্জের সামনে ট্রলার পৌঁছেছে। ট্রলারটি হাওলাদার বাড়ির। আলমগীর ও মগা উপস্থিত রয়েছে। তারা দুজন ট্রলার নিয়ে রেলস্টেশনের ঘাটে অপেক্ষা করছিল। আমির পদ্মজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতেই পদ্মজা বলল,'ইচ্ছে হচ্ছে জলে ঝাঁপ দেই।'

আমির আঁতকে উঠল,'কেন?'

পদ্মজা আমিরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। এরপর বলল,'অল্পতে ভয় পেয়ে যান কেন? বলতে চেয়েছি,অনেকদিন পর চেনা নদীর জল দেখে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ডুব দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। '

আমির এক হাতে পদ্মজার বাহু চেপে ধরে নিজের সাথে মিশিয়ে বলল,' তাই বলো!'

পদ্মজা আমিরের দিকে তাকাল। আমিরের গাল ভর্তি দাঁড়ি। ঘন হয়েছে খুব। চোখের দৃষ্টি গাঢ়,তীক্ষ্ণ। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষ! অথচ,একটা সন্তান নেই। বাবা ডাক শুনতে পারে না। মানুষটার জন্য দুঃখ হয়। পদ্মজা গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আযান পড়ছে। ট্রলার মোড়ল বাড়ির ঘাটে ভীড়ে। প্রথমে পদ্মজার চোখে পড়ে রাজহাঁসের ছুটে চলা। ঝাঁক ঝাঁক রাজহাঁস দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকছে।

হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে চারিদিক মুখরিত। ট্রলারের শব্দ শুনে পূর্ণা,প্রেমা,প্রান্ত,ছুটে আসে ঘাটে। আগে আগে আসে পূর্ণা। পদ্মজা প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেই পূর্ণা জান ছেড়ে ডেকে উঠল,'আপা।'

পূর্ণাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে পদ্মজা ভয় পেয়ে যায়। সাবধান করে,'আস্তে পূর্ণা।'

বলতে বলতে সিঁড়িতে পূর্ণার পা পিছলে গেল। পদ্মজা দ্রুত আঁকড়ে ধরে। এখুনি অঘটন ঘটে যেত! পদ্মজা পূর্ণাকে ধমক দিতে প্রস্তুত হয়, তখনই পূর্ণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পদ্মজাকে। বুকে মাথা রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চারণ করল,'আপা! আমার আপা!'

পদ্মজার বুক বিশুদ্ধ ভালোলাগায় ছেয়ে গেল। মৃদু হেসে পূর্ণাকে কিছু বলার জন্য আবার প্রস্তুত হয়,তখন প্রেমা,প্রান্ত এসে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা টাল সামলাতে না পেরে শেষ সিঁড়ি থেকে নদীর জলে পড়ে যাচ্ছিল,ট্রলারের আগায় দাঁড়িয়ে থাকা আমির দুই হাতে দ্রুত পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরে তার খুঁটি হলো। পদ্মজা চোখ খিঁচে ফেলে। যখন বুঝতে পারল সে পড়েনি,তার ভাইবোনেরাও পড়ে যায়নি তখন চোখ খুলল। ঘাড় ঘুরিয়ে তার সহধর্মীর মুখ দেখে হাসল। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। পূর্ণা, প্রেমা হেঁচকি তুলে কাঁদছে! খুশিতে কেউ এভাবে কাঁদে? তবে পদ্মজার ভালো লাগছে। বাসন্তীকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পদ্মজা তার ভাই-বোনদের বলল,'আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিবি না তোরা?'

পূর্ণা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল,'চলো।'

পদ্মজা সিঁড়ি ভেঙে বাসন্তীর সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা রঙের শাড়ি পরে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকা এই মানুষটার প্রতি পদ্মজার অনেক ঋণ। হেমলতা মারা যাওয়ার ছয় মাসের মাথায় মোর্শেদ পৃথিবী ছাড়েন।

শোকে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফেলে যান কিশোরী দুই মেয়ে,বউ এবং এক ছেলেকে। অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। সংসার চলে না। আমির সাহায্য করতে চেয়েছিল। পদ্মজার আত্মসম্মানে লাগে। সে কিছুতেই স্বামীর টাকায় বাবার বাড়ির সংসার চালাবে না। নিজেরও কাজ করার উপায় ছিল না। এমতাবস্থায় বাসন্তী চাইলে ফেলে চলে যেতে পারতেন। তিনি যাননি। এক পড়ন্ত বিকেলে পদ্মজাকে বললেন,'নকশিকাঁথা সেলাই করতে পারি আমি। শখে সেলাই করতাম। দুই তিনজন পয়সা দিয়ে কিনতে চাইত। টাকার দরকার ছিল না,তাই বিক্রি করিনি। তুমি বললে,আমি নকশিকাঁথা গঞ্জে বেঁচার চেষ্টা করতাম।'

পদ্মজা সেদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। বাসন্তী ছুটে ঘরে যান। একটা নকশিকাঁথা নিয়ে আসেন। পদ্মজাকে দেখান। অসম্ভব সুন্দর হাতের কাজ! আমির নকশিকাঁথা দেখে মুগ্ধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বলল,বড় ভাইয়া যখনি ঢাকা যাবে নকশিকাঁথা দিয়ে দিবেন। শহরে নকশিকাঁথার চাহিদা রয়েছে অনেক। আপনাদের সমস্যা কিছুটা হলেও ঘুচে

যাবে। এক কাজ করলেই তো পারেন আরো দুই-তিনজনকে নিয়ে নকশিকাঁথা বানানো শুরু করেন। তাহলে অনেকগুলি হবে। তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দিবেন। ঢাকা বিক্রির পর দ্বিগুণ টাকা আসবে।'

এ প্রস্তাবে পদ্মজা অমত করল না। সেদিন থেকে বাসন্তী দুই হাতে দিনরাত পরিশ্রম করছেন। পূর্ণাকে মেট্রিক অবধি পড়ালেন। প্রেমা,প্রান্তকে এখনও পড়াচ্ছেন। পূর্ণার যেকোনো আবদার পূরণ করে চলেছেন। বাসন্তীর পা ছুঁয়ে পদ্মজা সালাম করল। এরপর বলল,'কেমন আছেন আপনি?'

'ভালো আছি মা। তুমি, জামাইবাবা সবাই ভালো আছোতো?'

'আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আগের চেয়ে শুকিয়েছেন। ত্বক ময়লা হয়েছে। নিজের যত্ন নেওয়া ভুলে গিয়েছেন?'

বাসন্তী চোখ নামিয়ে হাসেন। এক হাতে নিজের মুখশ্রী ছুঁয়ে বলল,'সেই বয়স কী আর আছে? বিধবা মানুষ!'

'পূর্ণা খুব জ্বালায় তাই না? বাধ্য করে রঙিন শাড়ি পরতে,সাজতে।'

বাসন্তী চমকে তাকালেন। পদ্মজা হাসছে। পূর্ণা মাথায় ব্যাগ নিয়ে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। আহ্লাদী হয়ে অভিযোগ করল,'আপা তুমি নাকি মুচির সাথে আমার বিয়ে দিতে এসেছো?'

পদ্মজা হাসি প্রশস্ত হয়। আমিরের দিকে তাকিয়ে এরপর পূর্ণার দিকে তাকাল। বলল,'কে বলেছে? তোর ভাইয়া?'

পূর্ণা আমিরকে ভেংচি কেটে পদ্মজাকে বলল,'আর কে বলবে? আপা আমি মুচি বিয়ে করব না। আমার ফর্সা, চকচকে জামাই চাই।'

মগা পূর্ণাকে রাগানোর জন্য বলল,'মেট্রিক ফেইল করা ছেড়িরে ধলা জামাই হাঙ্গা করব না।'

পূর্ণা কিড়মিড় করে তাকাল। পদ্মজা পূর্ণার গাল টেনে দিয়ে বলল,'আচ্ছা,এসব নিয়ে পরে আলোচনা হবে। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। বাড়িতে চল।'

তারপর দুই হাতে দুই বোন-ভাইকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির উঠানে পা রাখে সে। সতেজ হয়ে জামাকাপড় পাল্টে নেয় আমির ও পদ্মজা। এরপর রাজহাঁস ভূনা আর গরম গরম ভাতের ভোজন হয়। আলমগীর, মগাও ছিল। আলমগীর

বাড়ি ফেরার আগে আমির-পদ্মজাকে বলে যায়,'আগের স্মৃতি আর কতদিন বুকে রাখবি তোরা? দাদু মরার পথে। চাচি আম্মা আত্মগ্লানি আর তোদের না দেখার শোকে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গিয়েছে।

এবার অন্তত বাড়িতে আসিস। অনুরোধ রইল আমার। পদ্মজা তুমি আমিরকে বুঝিয়ো।'

পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল,'এবার বাড়ির সবাইকে গিয়ে দেখে আসব। আপনি নিশ্চিন্তে যান।'

'অপেক্ষায় থাকব।''

'আসব ভাইয়া।' বলল পদ্মজা।

আলমগীর, মগা চলে গেল। আমির পদ্মজাকে বলল,'আমি যাব না।'

'এবার যাওয়া উচিত। অনেক তো হলো। চার বছর কেটেছে। ভয়ংকর রাতটা আজীবন বুকে তাজা হয়ে থাকবে। তাই বলে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। ইসলামে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।'

'ওই বাড়িতে গেলে আমার দমবন্ধকর কষ্ট হয় পদ্মজা।'

'সে তো আমারও হয়। কিন্তু আম্মার কথা খুব মনে পড়ে। আম্মারতো কোনো দোষ ছিল না। তবুও শাস্তি পাচ্ছেন।'

'ছিল দোষ।'

'যে আসল দোষী তার দেখা আজও পেলাম না। অথচ,যিনি দোষী না তিনি সবার চোখে দোষী।'

'আম্মা সেদিন কেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? এটাই আম্মার দোষ।'

'জোর করে ঘুম আটকিয়ে রাখা যায়? আমরা আগামীকাল যাচ্ছি,এটাই শেষ কথা।'

'পদ্মজ....'

আমিরের বাকি কথা পদ্মজা শুনল না। সে হেমলতার ঘরের দিকে এগুলো। হেমলতার ঘরের দরজা খুলতেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। শিহরিত হয়ে কেঁপে উঠে সে। ছয় বছর আগের মতোই সব। নেই শুধু মা! পদ্মজা ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে। আলমারি খুলে হেমলতার শাড়ি বের করে ঘ্রাণ শুঁকে। বুকের সাথে জড়িয়ে রাখে। গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। হাউমাউ করে কান্নাটা আসে না অনেকদিন। কষ্টগুলো চেপে থাকে বুকের ভেতর। পূর্ণা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আপাকে দেখছে। পদ্মজা বার বার নাক টানছে। অজস্র চুমুতে ভরিয়ে

দিচ্ছে মায়ের শাড়ি। যেন সে শাড়ি না তার মাকেই চুমু দিচ্ছে। পূর্ণার মন ব্যথায় ভরে উঠে। তার কী মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে নাকি আপার কান্না দেখে কষ্ট হচ্ছে? জানে না পূর্ণা। শুধু উপলব্ধি করছে,তার কান্না পাচ্ছে।

কান্নার শব্দ শুনে পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পূর্ণাকে কাঁদতে দেখে,দ্রুত চোখের জল মুছে হাতের শাড়ি আলমারিতে রাখল। এরপর পূর্ণাকে ডাকল,'আয় এদিকে।'

পূর্ণা ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগিয়ে আসে। পদ্মজা বিছানায় বসল। পূর্ণা পদ্মজার কোলে মাথা রেখে কাচুমাচু হয়ে শুয়ে পড়ল। পদ্মজা বলল,'বয়স একুশের ঘরে। মনটা তো সেই চৌদ্দ-পনেরো বছরেই পড়ে আছে।'

পূর্ণা পদ্মজার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,'আমার খুব কান্না পাচ্ছে।'

'কাঁদিস না।'

'ঠেলেঠুলে বেরিয়ে আসছে তো।'

'থামানোর চেষ্টা কর।'

'থামছে না।'

'তুই তো আরো কাঁদছিস।'

'বেড়ে যাচ্ছে তো।'

পদ্মজা ঠাস করে পূর্ণার গালে থাপ্পড় বসাল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণার কান্না থেমে যায়। চোখ বড় বড় করে তাকায়। পদ্মজা আওয়াজ তুলে হেসে উঠে। পূর্ণা দ্রুত উঠে বসে। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে হেসে বলল,'থেমে গেছে।'

পদ্মজার হাসি বেড়ে গেল। মুখে হাত চেপে হাসি আটকানোর চেষ্টা করে।

হাসির ঠ্যালায় চোখে জল চলে আসে। পূর্ণা কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। থামাতে বললে,আরো বেড়ে যায়। ব্যাপারটা যে কেউ উপভোগ করে। প্রেমা ঘরে ঢুকে অভিমানী কণ্ঠে বলল,'আমাকে ছাড়া কী নিয়ে কথা বলে হাসা হচ্ছে?'

পদ্মজা হাসতে হাসতে বলল,'পূর্ণা কাঁদছিল। থামাতে পারছিল না।'

প্রেমা হেসে বিছানায় উঠে বসে। দুই পা ভাঁজ করে বসে বলল,' বড় আপা,ছোট আপা নামায পড়ে না।'

পদ্মজা হাসি থামিয়ে পূর্ণার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল,'কী রে? তুই নামায পড়িস না কেন? চিঠিতে তো বলিস অন্য কথা।'

পূর্ণার ইচ্ছে হচ্ছে প্রেমাকে লবণ,মরিচ দিয়ে ক্যাচ ক্যাচ করে কাঁচা আমের মতো কামড়ে খেতে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সামলাতে হবে। সে পদ্মজাকে বোঝানোর চেষ্টা করল,'আপা,বিশ্বাস করো শুধু এক ওয়াক্ত পড়িনি। আর...আর প্রেমাকে আমি আমার...হ্যাঁ আমার চুড়ি দেইনি বলে...'

'মিথ্যে বলবি না। কতবার বলেছি,মিথ্যা কথা ছাড়তে। সত্য স্বীকার কর। কীসের কাজ তোর? পড়ালেখা ছেড়েছিস,চার বছর। মেট্রিকটা আবার পড়লি না। বিয়ে করতে চাস না বলে বিয়ের জন্যও জোর করিনি। তার মূল্য এভাবে কথা না শুনে দিবি? এটা তো আমারও কথা না। যিনি সৃষ্টি করেছেন উনার আদেশ।'

পূর্ণা মাথা নত করে রাখে। পদ্মজা বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল,'ঘুমাব না তোদের সাথে।'

প্রেমা আর্তনাদ করে উঠল,'আপা,আমার দোষ কী?'

পূর্ণা পদ্মজার কোমর জড়িয়ে ধরে। কিছুতেই যেতে দিবে না। পদ্মজা বলল,'ছাড় বলছি।'

পূর্ণা আকুতি করে বলল,'যেও না। এখন থেকে প্রতিদিন পড়ব। সত্যি বলছি।'

'সত্যি তো?' বলল পদ্মজা।

'সত্যি।'

পদ্মজা বিছানায় পা তুলে বসল। পূর্ণা আড়চোখে প্রেমাকে দেখল। দৃষ্টি দিয়ে যেন হুমকি দিল,'আমারও দিন আসবে!'

গ্রামে আসলে আমির প্রান্তর সাথে ঘুমায়। পদ্মজাকে তার বোনদের সাথে ছেড়ে দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দুই বোনকে নিয়ে শুয়ে পড়ে পদ্মজা। কত কত গল্প তাদের! পদ্মজা শুধু শুনছে আর হাসছে। প্রেমার মুখ দিয়ে

সহজে কথা আসে না,পদ্মজা আসলে কথার ঝুড়ি নিয়ে বসে। পূর্ণা নিজের বিয়ে নিয়ে বেশি কথা বলছে। পরিকল্পনা করছে। তখন প্রেমা ব্যাঙ্গ করে বলল,'ছোট আপার লজ্জার লেশমাত্র নেই।'

তখন পূর্ণা ক্ষেপে গিয়ে বলল,'তুই যে প্রান্তরে বলছিলি শহরে গিয়ে সাহসী পুলিশ বিয়ে করবি। আমি কাউকে বলেছি? বলেছি,তোর লজ্জা নাই?

প্রেমা লজ্জায় জবুথবু হয়ে যায়! তার বড় আপার সামনে ছোট আপা কী বলছে! লজ্জায় কান দিয়ে ধোয়া বেরোতে থাকে। পদ্মজা হাসল। প্রেমাকে বলল, 'লজ্জার কিছু নেই। অভিভাবকদের নিজের পছন্দ জানানো উচিত। তোর বিয়ে পুলিশের সাথেই হবে। আর পূর্ণার বিয়ে হবে পূর্ণার পছন্দমত।'

পদ্মজার কথায় পূর্ণা ভারি খুশি হলো। সে আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল,' নায়কের মতো জামাই চাই। একদম লিখন ভাইয়ার মতো। ওহ আপা, জানো লিখন ভাইয়া এখানে শুটিং করতে আসছে। এক সপ্তাহ হলো।'

পদ্মজা জানতে চাইল,'কার বাড়ি?'

'সাতগাঁয়ের হান্নান চাচার বাড়ি। বিশাল বড় টিনের বাড়ি।'

পদ্মজা চুপ হয়ে গেল। এই মানুষটা শুধুমাত্র তার স্মৃতি। কিন্তু মানুষটার জীবনের পুরোটা জুড়ে সে। এইতো মাস চারেক আগে, পদ্মজা পত্রিকা পড়তে বসেছিল। তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখন শাহর ছবি সাথে উপরের শিরোনাম দেখে বেশ অবাক হয় পদ্মজা। শিরোনামে লেখা, 'লিখন শাহর পদ্ম ফুল'। পদ্মজা আগ্রহ নিয়ে প্রতিটি লাইন পড়ে। সাংবাদিক লিখনকে প্রশ্ন করেছেন, 'ত্রিশ তো পার হয়েছে। বিয়ে করবেন কবে?'

লিখন জানিয়েছে,'সে যখন আসবে।'

'আমরা কী জানতে পারি,কে সে? যদি দ্বিধা না থাকে।'

'জানাতে আমার বাধা নেই। সে পদ্ম ফুল। আমার সাতাশ বছরের কঠিন মনে তোলপাড় তুলে দিয়েছিল। সেই তোলপাড়ের তাণ্ডব বুকের ভেতর আজও হয়। সেই ফুলের সুবাস নাকে আজও লেগে আছে। শুধু আমি তাকে জয় করতে পারিনি।'

লিখন শাহর সাক্ষাৎকারের কথোপকথন বেশ তোলপাড় তুলে ঢাকায়। এরকম একজন সুদর্শন পুরুষকে কোন নারী অবহেলা করেছে? তা নিয়ে মানুষের কত কল্পনা-জল্পনা, আলোচনা -সমালোচনা। পদ্মজার অস্বস্তি হয় খুব।

পূর্ণা পদ্মজাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকল,'ঘুমিয়ে গেলে আপা?'

'না। তারপর বল।' নিস্তরঙ্গ গলায় বলল পদ্মজা।

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,শিয়ালের হাঁক ভেসে আসছে কানে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। তবুও কথা শেষ হচ্ছে না পূর্ণা-প্রেমার। পদ্মজাও মানা করছে না। বরং অবাক হচ্ছে,তার বোনেরা কত কথা লুকিয়ে রেখেছে তার জন্য!

কাক ডাকা ভোর। ঘন কুয়াশায় চারপাশ ডুবে আছে। বাতাসের বেগ বেশি। ঠান্ডায় ঠোঁট কাঁপছে। পদ্মজার পরনে দামী,গরম সোয়েটার। আবার শালও পরেছে। বাসন্তী সুতি সাদা শাড়ি পরে রান্না করছেন। মাঝে মাঝে কাঁপছেন। পদ্মজা দ্রুত পায়ে রান্না ঘরে ঢুকল। বাসন্তী পদ্মজাকে দেখে হেসে বললেন,'কিছু লাগবে?'

পদ্মজা খেয়াল করে দেখল বাসন্তীর মুখটা ফ্যাকাসে। ঠান্ডায় এমন হয়েছে। সে শক্ত করে প্রশ্ন করল,'আপনার শীতের কাপড় নেই?'

বাসন্তী হেসে বলল,'আছে তো।'

'তাহলে এভাবে শীতে কাঁপছেন কেন? নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। বয়স হয়েছে তো। যান ঘরে যান।'

'ভাত বসিয়েছি।'

'আমি দেখব।'

'সারারাত তো সজাগ ছিলে আম্মা। তুমি ঘুমাও। আমি রাতে ঘুমিয়েছি।'

'তাহলে সোয়েটার পরে আসেন।'

বাসন্তী মাথা নত করে বসে রইলেন। পদ্মজা বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। এরপর নিজের গায়ের শাল বাসন্তীর গায়ে দিয়ে বলল,'নিজের জন্যও কিছু কেনা উচিত। পূর্ণা বয়সে বেড়েছে বুদ্ধিতে না। ও পারে না কিছু সামলাতে। শুধু আবদার করতে পারে। যতদিন বেঁচে আছেন নিজের যত্ন নিন। আমি ঘরে যাচ্ছি।'

পদ্মজা রান্নাঘর ছেড়ে বারান্দার গ্রিলে ধরে বাইরে তাকাল। কুয়াশার জন্য বাড়ির গেইটও দেখা যাচ্ছে না। সে ঘুরে দাঁড়াল ঘরে ঢোকার জন্য। তখন মনে হলো, উঠানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা আবার ঘুরে তাকাল। দেখতে পেল,তার শ্বাশুড়ি ফরিনাকে। তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে আছে। শুকিয়েছে খুব বেশি। গায়ে লাল-সাদা রঙের মিশ্রণে শাড়ি। ফরিনার চারপাশে উড়ো কুয়াশা। কুয়াশার দেয়াল ভেদ করে যেন তিনিই শুধু আসতে পেরেছেন। পদ্মজা হন্তদন্ত হয়ে বের হলো। কাছে এসে দাঁড়াতেই বুকটা হুহু করে উঠল। ফরিনা পদ্মজাকে দেখে কেঁদে দিলেন। পদ্মজা ফরিনার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। পা ছুঁয়ে সালাম করল। এরপর ফরিনার ঠান্ডা দুই হাত ধরে বলল,'এতো সকালে কেন আসতে গেলেন? আমরা তো যেতামই।'

'এতো রাগ তোমার?'

'না,আম্মা। আপনার প্রতি কোনো রাগ নেই আমার। আট মাস আপনি আমার যে যত্ন নিয়েছেন মায়ের অভাববোধ করিনি। মনে হয়েছিল, আমার মা ছিল আমার পাশে।'

'তাইলে কেরে যাও না আমার কাছে? আমার ছেড়ায় কেন মুখ ফিরায়া নিছে আমার থাইকা?'

'উনি পাগল। আম্মা, আপনি কেমন আছেন? দেখে বোঝা যাচ্ছে,ভালো নেই। আম্মা বিশ্বাস করুন,আপনার প্রতি আমাদের রাগ নেই। ওই বাড়িটা দেখলে খুব কষ্ট হয় আম্মা। খুব যন্ত্রনা হয়। এজন্য যাই না। আপনাকে অনেকবার চিঠি লিখেছি, যেন ঢাকা গিয়ে কয়দিন থেকে আসেন। গেলেন না কেন?'

ফরিনা অবাক হয়ে বললেন,'আমার কাছে তো কুনু চিডি আসে নাই।'

'সেকী! আমি তো এই চার বছরে ছয়টা চিঠি লিখেছি আপনার নামে। পাঠিয়েছিও।'

'আমি তো পাই নাই।'

ফরিনা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পদ্মজা বলল, 'আচ্ছা এ ব্যাপারে কথা বলব উনার সাথে। আমি যখন আম্মার কবর জিয়ারত করতে আসি তখনও তো এসে আমাকে আর উনাকে দেখে যেতে পারতেন আম্মা।'

'তোমরা বাড়িত যাও না বইলা,আমি ভাবছি আমারে ঘেন্না করো তোমরা তাই সামনে আইতে পারি নাই। আমার জন্যও আমার নাতনিডা...'

ফরিনা হুহু করে কেঁদে উঠলেন। পদ্মজার চোখ ছলছল করে উঠল। সে ফরিনাকে বলল,'আপনার জন্য কিছু হয়নি আম্মা। আপনি এভাবে ভাববেন না। কান্না থামান।'

'যতই বলো মা,কান্না থামাবে না। চার বছর ধরে এভাবে কাঁদছে।'

মজিদের কণ্ঠস্বর শুনে পদ্মজা দ্রুত ঘোমটা টেনে নিল। মজিদকে সালাম করে বলল,'ভালো আছেন আব্বা?'

'এইতো আছি কোনোমতে।'

'আম্মা,আপনি কান্না থামান। আমার খারাপ লাগছে।'

ফরিনা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন। এরপর বললেন,'আমার বাবু কই?'

'ভেতরের ঘরে ঘুমাচ্ছে। ডেকে দিচ্ছি।'

'না,থাহক। ঘুমাক।'

পদ্মজা শ্বশুর, শ্বাশুড়িকে সদর ঘরে নিয়ে আসে। আস্তে আস্তে সবার ঘুম ভাঙে। আমির যত যাই বলুক, মাকে দেখেই নরম হয়ে যায়। জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে শুরু করে। মজিদ ছেলে আর ছেলের বউকে ছাড়া কিছুতেই বাড়ি যাবেন না। কম হলেও চার-পাঁচ দিন থেকে আসতে হবে। অবশেষে, আমির রাজি হলো। প্রেমার সামনে পরীক্ষা তাই প্রেমাকে সাথে নিল না। বাসন্তী, প্রেমা,প্রান্ত বাড়িতে রয়ে যায়। পূর্ণা সাথে যায়।

হাওলাদার বাড়ির গেইট পেরিয়ে ভেতরে পা দিতেই পদ্মজার সর্বাঙ্গ অদ্ভুত ভাবে কেঁপে উঠে। সূর্য উঠেনি। দমকা বাতাস হচ্ছে। সেই বাতাসে সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে বাজপাখি উড়ে যায়। সেই পাখির ডাক অদ্ভুত হাহাকারের মতো। যেনও মনের চেপে রাখা কষ্ট ও ক্ষোভ নিয়ে কেউ আত্মচিৎকার করছে। নাকি এটা নিছকই

পদ্মজার ভাবনা? চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের সামনে এসে দাঁড়াল সে। চার বছর পূর্বেই তো এখানে এই জায়গাটায় তার আদরের তিন মাসের কন্যা পারিজার রক্তাক্ত লাশ পড়ে ছিল! পদ্মজার বুক কেমন করে উঠল! বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমির উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল,'খারাপ লাগছে?'

পদ্মজা স্বাভাবিক হয়ে বলল,'না।'

থামল, নিঃশ্বাস নিল। এরপর বলল,' পূর্ণাকে দেখুন,কেমন পাগল।'

আমির সামনে তাকাল। পূর্ণা মাথার উপর ব্যাগ নিয়ে সবার আগে বড়ই খেয়ে খেয়ে কোমর দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! অন্দরমহলের সামনে এবং আলগ ঘরের পিছনের মধ্যিখানে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। হেমন্তকালে ধান কাটা হয়েছে,তখন কামলারা আলগ ঘরে থেকেছে। তাদের জন্যই এই টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। টিউবওয়েলের চারপাশে গোল করে সিমেন্ট দিয়ে মেঝেও করা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা কলপাড় তৈরি হয়েছে। পূর্ণা নারিকেল গাছের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। কলপাড়ে এক সুদর্শন যুবক পিঁড়িতে বসে গোসল করছে। পরনে লুঙ্গি। রানি গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন বলছে। পূর্ণা ব্যাগ রেখে হা করে সেই যুবককে পরখ করে। সুঠম,সুগঠিত শরীর,মায়াবী- ফর্সা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক। প্রশস্ত বুকে ঘন পশম। চওড়া পিঠ। শক্তপোক্ত দেখতে দুই হাত। ডান হাতে ছোট কলস নিয়ে মাথায় পানি ঢালছে। সেই জল চুল থেকে কপাল,কপাল থেক ঠোঁট,ঠোঁট থেকে বুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ চুল ঝাঁকি দিয়ে উঠল। জলের ছিটা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। রানি যুবকটিকে বকতে বকতে দূরে সরে দাঁড়ায়। যুবকটি আবারও মাথায় পানি ঢেলে চুল ঝাঁকায়। উদ্দেশ্য, রানিকে ভিজিয়ে দেয়া। পূর্ণা মুগ্ধ হয়ে গেল। সে দ্রুত ব্যাগ মাটিতে রেখে দিল। ওড়না ঠিক করে,চুল ছেড়ে দিল। এরপর কলপাড়ের দিকে হেঁটে গেল। ঠোঁটে তার হাসি। চোখের দৃষ্টি দেখলে যে কারো মনে হবে, পূর্ণা অপরিচিত এই যুবকটিকে চোখ দিয়ে পিষে ফেলছে। কলপাড়ের পাশে ভেজা কাদা ছিল। পূর্ণা পা রাখতেই পিছলে পড়ে যায়। ধপাস শব্দ শুনে যুবকটি লাফিয়ে উঠে ভরাট কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'বোয়াল মাছ! বোয়াল মাছ!'

#পদ্মজা

চলবে...

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট- ৪৮

ঘটনাটি পদ্মজার চোখে পড়তেই ছুটে আসে। রানি আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব। সে পূর্ণাকে তুলতে দৌড়ে আসতে গিয়ে শাড়ির সাথে পা প্যাঁচ লাগিয়ে পূর্ণার চেয়ে ঠিক এক হাত দূরে ধপাস করে পড়ল! এ যেন ধপাস করে পড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যুবকটি হাসবে নাকি সাহায্য করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সেকেন্ড দুয়েক ভেবে মনস্থির করল, হাসা ঠিক হবে না। সাহায্য করা উচিত। কলপাড় থেকে এক পা নামাতেই পদ্মজা চলে আসে। পূর্ণাকে তোলার চেষ্টা করে। যুবকটি রানিকে সাহায্য করে উঠার জন্য। পদ্মজা উদ্বিগ্ন হয়ে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল,'খুব ব্যথা পেয়েছিস?'

পূর্ণার মুখ ঢেকে আছে রেশমি ঘন চুলে। আড়চোখে একবার যুবকটিকে দেখল। এরপর মিনমিনিয়ে বলল,'না।'

ফরিনা ছুটে এসে বললেন,'এইডা কেমনে হইলো। এই ছেড়ি এমনে আইলো কেন? ও ছেড়ি কোনহানে দুঃখ পাইছো?'

পূর্ণা নরম কণ্ঠে বলল,'চাচি,ব্যাথা পাইনি।'

'পাওনি মানে কী? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছো না। পদ্মজা,ওকে নিয়ে যাও। কাদা মেখে কী অবস্থা!' বলল আমির।

রানি পদ্মজা আর আমিরকে দেখে প্রচন্ড অবাক হয়েছে! খুশিতে তার কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমিরের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলল,'দাভাই? তুমি আইছো! পদ্মজা, এতোদিনে আমরারে মনে পড়ছে?'

পদ্মজা মৃদু হেসে বলল,'তোমাকে সবসময়ই মনে পড়ে আপা। আমরা পরে অনেক গল্প করব। পূর্ণাকে নিয়ে এখন ভেতরে যাই।'

পদ্মজা এবং ফরিনা পূর্ণাকে ধরে ধরে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। পিছু পিছু রানিও গেল। যুবকটি আমিরের সামনে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল,'আসসালামু আলাইকুম আমির ভাই। চিনতে পারতাছেন?'

আমির যুবকটিকে চেনার চেষ্টা করল। এরপর বলল,'মৃদুল না?'

'জি ভাই।'

আমিরের হাসি প্রশস্ত হলো। মৃদুলের সাথে করমর্দন করে বলল,'সেই ছোটবেলায় দেখেছি। কতবড় হয়ে গেছিস। চেনাই যাচ্ছে না।'

'আমার ঠিকই আপনারে মনে আছে।'

আমির মৃদুলের বাহুতে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে বলল,'ছোটবেলা তো তুমি করে বলতি। এখন আপনি আপনি বলছিস কেন?'

মৃদুল এক হাতে ঘাড় ম্যাসাজ করে হাসল। এরপর বলল,'১৬-১৭ বছর পর দেখা হইছে তো।'

'তো কী হয়েছে? তুমি বলে সম্বোধন করবি। গোসল করছিলি নাকি?'

'জি।'

'কাপড় পাল্টে আয়,অনেক আলাপ হবে।'

'আচ্ছা ভাই।'

আমির নারিকেল গাছের পাশে তাদের ব্যাগ দেখতে পেল। এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা নিল,এরপর অন্দরমহলের দিকে গেল।

বৈঠকখানায় পদ্মজা বসে আছে। পূর্ণার কোমরে,পায়ে গরম সরিষা তেল মালিশ করে দিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছে। হুমকিও দিয়ে এসেছে,ঘর থেকে বের হলে একটা মারও মাটিতে পড়বে না। পূর্ণা মুখ দেখে মনে হয়েছে,আর বের হওয়ার সাহস করবে না। বেশ জোরেই পড়েছিল। পা,কোমর লাল হয়ে গেছে। এই বাড়িটা মৃতপ্রায়। আগে তাও মানুষ আছে বলে মনে হতো। এখন মনেই হয় না এই বাড়িতে কেউ থাকে। নির্জীব, স্তব্ধ। রান্নাঘর থেকে বেশ কিছুক্ষণ পর পর টুংটাং শব্দ আসছে। ফরিনা এবং আমিনা তাড়াহুড়ো করে রান্না করছেন। আমির বের হয়েছে। বাড়িতে মাত্রই এলো আর কীসের কাজে বেরিয়েও পড়ল। স্তব্ধতা ভেঙে একটা ছোট বাচ্চা দৌড়ে আসে পদ্মজার কাছে। বাচ্চাটার কোমরে, গলায় তাবিজ। তাবিজের সাথে ঝনঝন শব্দ তোলা জাতীয় কিছু গলায় ঝুলানো। পদ্মজা বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। রানি বৈঠকখানায় এসে বাচ্চাটিকে বলল,'আলো আম্মা,এদিকে আয়। তোর গায়ে ময়লা। পদ্ম মামির কাপড়ে লাগব।'

পদ্মজা আলোর গাল টেনে বলল,'কিছু হবে না। থাকুক।'

এরপর আলোর গালে চুমু দিল। আলোর দুই বছর। রানির মেয়ে হয়েছে শুনেছিল পদ্মজা। কিন্তু আসতে পারেনি দেখতে। এবারই প্রথম দেখা। পদ্মজা বলল,'আলো ভাগ্যবতী হবে। দেখতে বাপের মতো হয়েছে।'

বাপের মতো হয়েছে কথাটি শুনে রানির মুখ কালো হয়ে যায়। তার প্রথম বাচ্চা মারা যাওয়ার এক বছরের মাথায় সমাজের নিন্দা থেকে বাঁচাতে খলিল হাওলাদার রানির জন্য পাত্র খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু কেউই রানিকে বিয়ে করতে চায় না। সবাই জেনে গিয়েছিল,রানি অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়েছে। এরপর বাচ্চাটা মারাও গেল। কোনো পরিবার রানিকে ঘরের বউ করতে চাইছিল না। এদিকে বিয়ে দিতে না পেরে সমাজের তোপে আরো বেশি করে পড়তে হচ্ছিল। খলিল হাওলাদার পিতা হয়ে রানিকে ফাঁস লাগিয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তখন মজিদ হাওলাদার মদনকে ধরে আনলেন। মদন,মগার বাবা মা নেই। দুই ভাই এই বাড়িতেই ছোট থেকে আছে। এই বাড়ির সেবার কাজে নিযুক্ত। বাধ্য হয়ে মদনের সাথে বাড়ির মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। মদন কামলা থেকে ঘর জামাই হয়। রানি মন থেকে মদনকে আজও মানতে পারেনি। কখনোও পারবেও না। ঘৃণা হয় তার। মাঝে মাঝে আলোকেও তার সহ্য হয় না। আলোর মুখটা দেখলেই মনে হয়, এই মেয়ে মদনের মেয়ে। কামলার মেয়ে!

আলো আধোআধো স্বরে বলল,'নান্না,নান্না।'

পদ্মজা আদুরে কণ্ঠে বলল,'নানুর কাছে যাবে?'

আলো পদ্মজার কোল থেকে নামতে চাইল। পদ্মজা নামিয়ে দিল। আলো দৌড়ে রান্নাঘরে যায়। রানি বলল,'আম্মার জন্য পাগল এই ছেড়ি। সারাবেলা আম্মার লগে লেপ্টায়া থাকে।'

'তুমি নাকি আলোকে মারধোর করো?'

রানি চমকাল। প্রশ্ন করল,'কেলা কইছে?'

'শুনেছি। আলো একটা নিষ্পাপ পবিত্র ফুল। ওর কী দোষ?'

রানি চুপ করে রইল। পদ্মজা বলল,'সব রাগ এইটুকু বাচ্চার উপর ঝাড়া ঠিক না আপা।'

'আমার কষ্টডা বুঝবা না পদ্মজা।'

'বুঝি। এতোটা অবুঝ না আমি। আলো মদন ভাইয়ার মেয়ে এটা ঠিক। কিন্তু তোমারও তো মেয়ে। তোমার গর্ভে ছিল। তোমার রক্ত খেয়েছে দশ মাস।'

'আমি কী আমার ছেড়িরে ভালোবাসি না? বাসি। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়। জানো পদ্মজা,আবদুল ভাইয়ের কথা মনে হইলে আমার সব অসহ্য লাগে। একলা একলা কাঁনদি। তহন আলো কানলে...আমি ওরে এক দুইডা থাপ্পড় মারি। পরে আফসোস হয় কেন মানলাম ছেড়িডারে। ও তো আমারই অংশ।'

'নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো। নিয়তির উপর কারো হাত নেই। অতীত ভুলতে বলব না। কিছু অতীত ভুলা যায় না। কিন্তু চাইলেই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে বাঁচা যায়। নিজেকে মানিয়ে নাও। আলোর প্রতি যত্নশীল হও। মানুষের মতো মানুষ করো। একটা মেয়েকে নিয়ে সমাজে বাঁচা যুদ্ধের মতো। গোড়া থেকে খেয়াল দাও।'

'তোমার কথা হুনলে বাঁচার শক্তি পাই পদ্মজা।'

পদ্মজা হাসল। বৈঠকখানায় আমির এসে প্রবেশ করল। তার পিছু পিছু মৃদুল। মৃদুলকে দেখে রানি হাসল। পদ্মজাকে দেখিয়ে বলল,'এইযে এইডা হইছে,পদ্মজা। তোর ভাবি।'

মৃদুল পদ্মজাকে সালাম করার জন্য ঝুঁকতেই পদ্মজা বলল,'না,না। কোনো দরকার নেই। বসুন আপনি।'

মৃদুল বসল। এরপর পদ্মজাকে বলল,'আপনের কথা কথা অনেক শুনছি। আজ দেখার সৌভাগ্য হলো।'

আমির পদ্মজাকে বলল,'ওর নাম মৃদুল। রানির মামাতো ভাই। ছোটবেলা আমাদের বাড়িতে কয়দিন পর পর আসতো। যখন আট-নয় বছর তখন দূরে চলে যায়। আর দেখা হয়নি। চাইলেই দেখা হতো। কেউ চায়নি। তাই দেখাও হয়নি।'

'কোথায় থাকেন?' জানতে চাইল পদ্মজা।

'জি ভাবি,রামপুরা।'

রামপুরার কথা পদ্মজা শুনেছে। তাদের জেলার শহর এলাকার নাম রামপুরা। সবাই চিনে এই এলাকা। ছেলেটার চেহারা উজ্জ্বল, চকচকে। হাসিখুশি! আলাপে আলাপে জানতে পারল,মৃদুল পদ্মজার চেয়ে দুই বছরের বড়। মেট্রিক ফেইল করার পর আর পড়েনি। মিয়া বংশের ছেলে। কথাবার্তায় শুদ্ধ-অশুদ্ধ দুই রূপই আছে। আর ভীষণ রসিক মানুষও বটে!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর পদ্মজা দোতলায় গেল। সাথে আমির রয়েছে। নূরজাহান বেশ কয়েক মাস ধরে অসুস্থ। শরীরের জায়গায় জায়গায় ঘা। চামড়া থেকে দূর্গন্ধ বের হয়। সারাক্ষণ যন্ত্রনায় আর্তনাদ করেন। নূরজাহানের ঘরে ঢুকতেই নাকে দূর্গন্ধ লাগে। পদ্মজা নাকে রুমাল চেপে ধরে। নূরজাহান বিছানার উপর শুয়ে আছেন। সময়ের ব্যবধানে একেবারে নেতিয়ে গিয়েছেন। বয়সটা যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। হাড্ডি ভেসে আছে। লজ্জাস্থান ছাড়া পুরো শরীর উন্মুক্ত। এক পাশে লতিফা দাঁড়িয়ে আছে। নূরজাহানের মাথার কাছে একজন

কবিরাজ বসে রয়েছেন। একটা কৌটা থেকে সবুজ দেখতে তরল কিছু নূরজাহানের ক্ষত স্থানগুলোতে লাগাচ্ছেন। পদ্মজা নূরজাহানের বাম পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নাক থেকে রুমাল সরিয়ে দূর্গন্ধের সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। ডাকল,'দাদু? দাদু...শুনছেন।'

নুরজাহান ধীরে ধীরে চোখ খুলেন। পদ্মজা প্রশ্ন করল,'খুব কষ্ট হয়? কোথায় কোথায় বেশি যন্ত্রণা হয়?'

নূরজাহান শুধু তাকিয়ে রইলেন। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজার বুকটা হাহাকার করে উঠল। বয়স্ক একজন বৃদ্ধা কত কষ্ট করছে! লতিফা বলল,'দাদু কথা কইতে পারে না। খালি কান্দে।'

নূরজাহানের অসহায় চাহনি দেখে পদ্মজার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। সে নূরজাহানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল,'আল্লাহর নাম স্বরণ করেন। ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। ধৈর্য্য ধরুন।'

তারপর লতিফাকে বলল,'ভালো করে খেয়াল রেখো উনার।'

আমির বেশ অনেকক্ষণ নূরজাহানের সাথে কথা বলল। নূরজাহান জবাব দেন না,শুধু উ,আ শব্দ করেন। আমিরের দুই চোখ বেয়ে জল পড়ে। পদ্মজার ভালো লাগে না দেখতে। সে আমিরকে বুঝিয়ে,শুনিয়ে বাইরে নিয়ে আসে। বারান্দা পেরোনোর পথে রুম্পার ঘরের দরজা খোলা দেখল পদ্মজা। যাওয়ার সময় তো বন্ধই ছিল। পদ্মজা ঘরের ভেতর উঁকি দেয়। দেখল,কেউ নেই। পালঙ্কও নেই। সে আমিরকে প্রশ্ন করল,'রুম্পা ভাবি কোথায়?'

আমিরও এসে উঁকি দিল। খালি ঘর। সে অবাক স্বরে বলল,'জানি না তো।'

পদ্মজা চিন্তায় পড়ে গেল। হেমলতা মারা যাওয়ার পর গ্রামে আর থাকেনি। শহরে ফিরে যায়। এক মাসের মাথায় জানতে পারল, সে গর্ভবতী। গর্ভাবস্থার প্রথম পাঁচ মাস খুব খারাপ যায়। প্রতি রাতে হেমলতাকে স্বপ্নে দেখতো। ছয় মাসের শুরুতে ফরিনা নিয়ে আসেন গ্রামে। এ সময় পদ্মজার একজন মানুষ দরকার। কাছের মানুষদের দরকার। তাই আমিরও নিষেধ করেনি। তার মধ্যে আবার মারা গেলেন মোর্শেদ। পদ্মজা আরো ভেঙে পড়ে। কাছের মানুষদের সহযোগিতায়, বাচ্চার কথা ভেবে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করে। সফলও হয়। তখন পদ্মজা অনেকবার চেষ্টা করেছে রুম্পার সাথে দেখা করার। মদন আর,নূরজাহানের নজরের বাইরে গিয়ে কিছুতেই সম্ভব হয়নি। এরপর কোল আলো করে এলো ফুটফুটে কন্যা। পদ্মজা তারপরও চেষ্টা চালিয়ে গেল। রুম্পাকে নজরবন্দি করে রাখাটা খটকা বাড়িয়ে দেয়।

একদিন সুযোগ আসে। সেদিন রাতে নূরজাহান, মদন, আমির,রিদওয়ান,আলমগীর সবাই যাত্রাপালা দেখতে যায়। বাড়িতে বাকিরা থাকে। দুই তলায় শুধু পদ্মজা তার মেয়ে পারিজা আর ফরিনা ছিল। ফরিনার দায়িত্বে পারিজাকে রেখে রুম্পার ঘরে যায় পদ্মজা। রুম্পা তখন প্রস্রাব,পায়খানার উপর অচেতন হয়ে পড়েছিল। পদ্মজা নাকে আঁচল চেপে ধরে সব পরিষ্কার করে। রুম্পার জ্ঞান ফেরায়। জানতে পারে তিন দিন ধরে রুম্পাকে খাবার দেয়া হচ্ছে না। পদ্মজা খাবার নিয়ে আসে। রুম্পাকে খাইয়ে দেয়। কথা বলার সুযোগ হওয়ার আগেই ফরিনার চিৎকার ভেসে আসে। ফরিনার কাছে পারিজা আছে! পদ্মজার বুক ধক করে উঠে। ছুটে বেরিয়ে আসে। ঘরে এসে দেখে ফরিনা নেই। ফরিনার আর্তনাদ ভেসে আসছে কানে। পদ্মজা সেই আর্তনাদের সাথে দুমড়ে,মুচড়ে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে উল্টিয়ে পড়ে। তবুও ছুটে যায়। ফরিনার কান্নার চিৎকার অনুসরণ করে অন্দরমহলের বাইরে বেরিয়ে আসে। চাঁদের আলোয় ভেসে উঠে তার তিন মাসের কন্যার রক্তাক্ত দেহ। ফুটফুটে কন্যা! ছোট ছোট হাত,পাগুলো নিথর হয়ে পড়ে আছে। সময় থেমে যায়। মনে হয়, নিশুতি রাতের প্রেতাত্মারা একসঙ্গে, একই স্বরে চিৎকার করে কাঁদছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে যায়। কোন পাষাণ মানবসন্তান তিন মাসের বাচ্চার গলায় ছুরি চালিয়েছে? তার কী হৃদয় নেই? পদ্মজা মেয়ের নাম ধরে ডেকে চিৎকার দিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে।

পুলিশ আসে,তদন্ত হয়। ফরিনা দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। তিনি হাত বাড়িয়ে দেখেন,পারিজা নেই। দ্রুত উঠে বসেন। পদ্মজা নিয়ে গেল নাকি খুঁজতে থাকেন। বারান্দা থেকে বাইরে চোখ পড়তেই দেখলেন,একজন মোটা, কালো লম্বা চুলের লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। খালি জায়গায় কাঁথায় মোড়ানো কিছু একটা পড়ে আছে। ফরিনা ছুটে বাইরে আসেন। নাতনির রক্তাক্ত দেহ দেখে চিৎকার শুরু করেন। পুলিশ কোনো কিনারা খুঁজে পায়নি। এরপরের দিনগুলো বিষাক্ত হয়ে উঠে। পদ্মজা মাঝরাতে চিৎকার করে কেঁদে উঠত। খাওয়া-দাওয়া একদমই করতো না। মাঝরাতে মেয়ের কবরে ছুটে যেত। আমির পদ্মজাকে নিয়ে হাওলাদার বাড়ি থেকে দূরে সরে আসে। প্রায় এক বছর পদ্মজা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। এরপর বুকে ব্যথা নিয়েই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে,একদিন ফিরবে অলন্দপুর। সেই নিষ্ঠুর খুনিকে শাস্তি দিবেই। জানতে চাইবে,কীসের দোষে তার তিন মাসের কন্যা বলি হলো?

কেউ জানুক আর নাই বা জানুক,পদ্মজা জানে হাওলাদার বাড়িতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য,পারিজার খুনিকে বের করা। সে শতভাগ নিশ্চিত এই বাড়ির কেউ না কেউ জড়িত এই খুনের সাথে। শুধু বের করার পালা। পুরনো কথা মনে পড়ে পদ্মজা দুই চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকল। আমির জল মুছে দিল। এরপর বলল,'বোধহয় তিন তলায় রাখা হয়েছে।'

পদ্মজা তিন তলার সিঁড়ির দিকে তাকাল। শুনেছে,তিন তলার কাজ নাকি সম্পূর্ণ হয়েছে। অনেকগুলো ঘর হয়েছে। সে আর কথা বাড়াল না। এখন গোসল করা উচিত। আযান পড়বে। আজ রাত থেকেই সে নিশাচর হবে। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে,সব রহস্যের জাল কাটতে হবে। এটাই তার নিজের সাথে নিজের প্রতিজ্ঞা। আমির ডাকল,'কী হলো? কী ভাবো?'

পদ্মজা আমিরের দিকে একবার তাকাল। এরপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল,'কিছু না। ঘরে চলুন।'

'কিছু তো ভাবছিলে।'

'এতদিনের জন্য আসছি গ্রামে। চাকরিটা থাকবে তো?'

'থাকবে না কেন? রফিক কতোটা সম্মান করে আমাকে দেখোনি? আর তোমার যোগ্যতার কী কমতি আছে? যেখানে ইচ্ছে সেখানেই চাকরি হবে।'

পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। আমিরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,'আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে চাকরি করতে দিবেন?'

আমির হেসে ফেলল। বলল,'তা অবশ্য দেব না।'

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

মাথা নত করে সালাম করা ঠিক না। কথাটি অনেকেই আমাকে বলেছেন। আমি পদ্মজা উপন্যাসটি অনেক বছর আগের সমাজ নিয়ে। তখন গুরুজনদের সালাম করা ছিল বাধ্যতামূলক। শিক্ষার গুণ,ভদ্রতা! সেই সমাজের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে বার বার পা ছুঁয়ে সালাম করার দৃশ্য দিতে হচ্ছে। এমনকি বর্তমানেও এই রীতি আছে। আশা করি কেউ ভুল বুঝবেন না। ধন্যবাদ।Next পার্টের লিংক কমেন্ট বক্সে#আমিপদ্মজা পার্ট - ৪৯

পড়ন্ত বিকেলের শীতল বাতাসে শরীর কাঁটা দিচ্ছে। পদ্মজা শাল গায়ে জড়িয়ে নেয়। নিচতলায় এসে ফরিনার ঘরে যায়। ফরিনা কাঁথা সেলাই করছিলেন। পদ্মজাকে দেখে দুই পা ভাঁজ করে বসলেন। বললেন,'তুমি আইছো!'

পদ্মজা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল,'জি আম্মা। কাঁথা সেলাই করছিলেন নাকি। আমি সাহায্য করি?'

'না,না তুমি এইসব পারবা না। সুঁই লাগব হাতে।'

'কিছু হবে না আম্মা। প্রতিদিনই সেলাই করা হয়।'

ফরিনা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন,'তুমি কাঁথা সিলাও?'

পদ্মজা হেসে বলল,'ওই একটু।'

'কেরে? আমরা থাকতে তুমি সিলাও কেরে? তোমার সৎ আম্মায় তো নকশিকাঁথা সিলায়। হে থাকতে তোমার সিলাই করা লাগে কেরে?'

পদ্মজা ফরিনার হাত থেকে সুঁই টেনে নিয়ে বলল,'আব্বা মারা যাওয়ার পর দুই বছর আমি কেমন অবস্থা ছিলাম জানেনই তো। সে অবস্থায় আমার পক্ষে আমার পরিবারের জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। তখন উনি(বাসন্তী) পর হয়েও,সৎ মা হয়েও নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্ব তুলে নিলেন। কিন্তু উনি যতটুকু করতেন ততটুকুতে পরিবার চলতে গিয়ে হিমশিম খেতো। তাই আমিও চেষ্টা করেছি একটু যদি নকশিকাঁথার পরিমাণটা বাড়ানো যায়।' পদ্মজার ফুলের পাপড়ির মতো ফোলা ফোলা দুটি ঠোঁটে অল্প হাসি। সেই হাসিতে পরমা সুন্দরীর মুখমন্ডল অল্প আভায় আলোকিত। ফরিনা অবাক হয়ে সেই হাসি দেখেন। মন দিয়ে কাঁথায় ফুল তুলছে পদ্মজা। দাঁত দিয়ে সুতা কেটে ফরিনার দিকে তাকাল সে। পদ্মজার নিখুঁত চোখ-নাক। ফরিনা তাকিয়েই আছেন। পদ্মজা ডাকল,'আম্মা?'

ফরিনার সম্বিৎ ফিরল। তিনি প্রশ্ন করলেন,'তুমি নাকি শহরে কাম করো?'

পদ্মজা হাসল। বলল,'হুম,করা হয়। প্রেমা,প্রান্ত দুইজনই পড়াশোনা করে। পড়ালেখার কত খরচ! আর পূর্ণা তো পড়ালেখার চেয়ে বেশি খরচ করে ফেলে শাড়ি-অলংকার কিনতে গিয়ে। আম্মা নেই। বাধা দিতে কষ্ট হয়। আর উনি নিজের সব সঞ্চয় উজার করে দেন আমার তিন ভাই বোনকে। টাকা তো থাকে না। তাই চাকরি নিতে হলো। দুই বোনের বিয়ে দিতে হবে না? আমার তো ফরজ কাজ বাকি। তার জন্য টাকা জমাতে হচ্ছে। আর,উনার নকশিকাঁথার টাকার সাথে বেতনের কিছুটা অংশ মিলিয়ে পাঠিয়ে দেই। বেশ ভালোই চলছে। উনি আছেন বলেই আমার মাথার উপরের চাপটা কমেছে।'

'হ,বাসন্তী অনেক ভালা।আমি হের চেয়ে চার বছরের বড়। মেলা সম্মান করে আমারে। আচ্ছা,আমির তোমারে বাইরে কাম করতে দিছে?'

এ প্রশ্নে পদ্মজা কপাল চাপড়ে বলল,'আর বলবেন না আম্মা! কী যে যুদ্ধ করতে হয়েছে। শেষমেশ রাজি হয়েছেন। কিন্তু উনার অফিসে নাকি চাকরি করতে হবে। উনার অফিসে চাকরি নিলে উনি আমাকে কোনো কাজ করতে দিতেন? টাকা ঠিকই মাস শেষে দিতেন। ঘুরেফিরে, স্বামীর টাকায় বাপের বাড়ি খায় কথাটা আত্মসম্মানের সাথে লেগে যেত। এ নিয়ে তিনদিন আমাদের ঝগড়া ছিল। আলাদা থেকেছি,কেউ কারো সাথে কথা বলিনি।'

ফরিনা বেশ আগ্রহ পাচ্ছেন। উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন,'এরপরে কী হইলো? কাম করতে দিছে কেমনে?'

'এরপর... তিন দিন পর এসে বলল,চাকরি পেয়েছে একটা। ছয় ঘন্টা কাজ। হিসাব রক্ষকের পদ। বেতন ভালো। জানেন আম্মা,আমি ভীষণ অবাক হয়েছি! এতো কম সময়ের চাকরি আবার বেতনও তুলনায় বেশি। এরপর জানতে পারি,উনার পরিচিত একজনের অফিসে চাকরি বন্দোবস্ত উনিই করেছেন। উনি চান না আমি বেশি সময় বাইরে থাকি। আবার জেদ ধরেও বসে ছিলাম। এভাবেই সব ঠিক হয়। ইনশাআল্লাহ আম্মা,পূর্ণার বিয়েটা ধুমধামে হয়ে যাবে। প্রেমার তো দেরি আছে। অনেক পড়বে ও।'

ফরিনা পদ্মজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এরপর বললেন,'আল্লাহ হাজার বছর বাঁচায়া রাখুক।'

'আম্মা,রুম্পা ভাবি কী তিন তলায়?'

'হ।'

'আজ দেখতে যাব ভাবছি। চাবি কার কাছে?'

ফরিনা মুখ গুমট করে বললেন,'হেই ঘরে যাওনের দরকার নাই। রিদওয়ান চাবি দিব না। ওরা আর আমারারে দাম দেয় না। যেমনে ইচ্ছা চলে।'

'দিবে না মানে কী? আপনি গুরুজন আপনাকে দিতে বাধ্য।'

'চাইছিলাম একবার,যা ইচ্ছা কইয়া দিছে।' ফরিনার মুখে আধার নেমে আসে। তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে আবার বললেন,'চাবি চাওনের লাইগগা রিদওয়ান হের আম্মারেও মারছে।'

পদ্মজার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়,'সেকী! মায়ের গায়ে হাত তুলছে?'

ফরিনা কাঁথা সেলাই করতে করতে বললেন,'নিজের মা আর কই থাইকা! এই ছেড়ার মাথা খারাপ। অমানুষ।'

'বাড়ির অন্যরা কিছু বলেনি?'

'অন্যরা কারা?'

'আব্বা,চাচা,বড় ভাই কেউ কিছু বলেনি?'

'বাকিদের কথা জানি না। তোমার শ্বশুর তো নিজেই শকুনের বাচ্চা।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। ফরিনাও চকিতে চোখ তুলে তাকান। তিনি মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন। দুজন দুজনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। পদ্মজা প্রশ্ন করার আগে ফরিনা বললেন,'পূর্ণায় গাছে উঠছে। সকালে আছাড়ড়া খাইল বিকেল অইতেই গাছে উইট্টা গেছে। ছেড়িডারে কয়ডা মাইর দিও।'

পদ্মজা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে,তার শ্বাশুড়ি আগের কথাটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। সে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারল না। মৃদু কণ্ঠে বলল,'আমি আসি আম্মা।'

'যাও।'

পদ্মজা দরজা অবধি এসে ফিরে তাকাল। ফরিনা দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলেন। পদ্মজা ঘর ছাড়তেই তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পদ্মজা উদাসীন হয়ে হাঁটছে। ফরিনা কেন নিজের স্বামীকে শকুনের বাচ্চা বললেন? পদ্মজা দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। এখন এসব ভাবা যাবে না। রিদওয়ানের কাছ থেকে চাবি নিতে হবে। সে দ্রুত পায়ে হেঁটে রিদওয়ানের ঘরের সামনে আসে। দরজায় শব্দ করতেই ওপাশ থেকে রিদওয়ানের কণ্ঠ ভেসে আসে,'কে?'

পদ্মজা জবাব না দিয়ে,আরো জোরে শব্দ করল। রিদওয়ান কপাল কুঁচকে দরজা খুলল। পদ্মজাকে দেখে কপালের ভাঁজ মিলিয়ে যায়। ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। মোটা হয়েছে আগের চেয়ে। গালভর্তি ঘন দাঁড়ি। এক দুটো চুল পেকেছে। সে খুশিতে গদগদ হয়ে বলল,'আরে বাপরে,পদ্মজা আমার দুয়ারে এসেছে!'

পদ্মজা সোজাসুজি বলল,'রুম্পা ভাবির ঘরের চাবি দিন।'

রিদওয়ান দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। বলল,'এতদিন পর এসেছো আবার আমার ঘরের সামনে। ভেতরে আসো,বসো। এরপর কথা বলি।'

'আমি আপনার সাথে কথা বলতে আসিনি। দয়া করে চাবিটা দিন।'

'চাবি তো দেব না।'

'কী সমস্যা?'

রিদওয়ান পদ্মজার কাঁধে হাত রেখে বলল,'আরে,ঘরে আসো তো আগে।'

পদ্মজা এক ঝটকায় রিদওয়ানের হাত সরিয়ে দিল। চোখ গরম করে তাকিয়ে বলল,'চাবি দিন।'

'চোখ দিয়ে তো আগুন ঝরছে। কিন্তু আমি তো ভয় পাচ্ছি না। চাবি আমি দেব না।'

'দেবেন না?'

রিদওয়ান আড়মোড়া ভেঙে আয়েশি ভঙ্গিতে বলল,' না।'

পদ্মজা আর কথা বাড়াল না। চলে গেল। রিদওয়ান পিছু ডেকেছে। সে শুনেনি। মগাকে দিয়ে পাথর নিয়ে তিন তলায় আসে। মদন একটা ঘরের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে ছিল। পদ্মজা বুঝতে পারে,তাহলে এই ঘরেই রুম্পা আছে। সে দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই মদন বলল,'কিছু দরকার ভাবি?'

পদ্মজা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল,'তালা ভাঙব। মগা,তালা ভাঙ।'

মদন দরজার সামনে দাঁড়ায়। বলে,'রিদওয়ান ভাইয়ের কাছে চাবি আছে। তার কাছ থাইকা লইয়া আসেন। তালা ভাইঙেন না।'

'উনি আমাকে চাবি দেননি। তাই আমি তালা ভাঙব। আপনি সরে দাঁড়ান।'

'না ভাবি,এইডা হয় না। আমার উপরে এই ঘরডার ভার দিছে ।'

'আপনি সরে দাঁড়ান।' পদ্মজা কথাটা বেশ জোরেই বলল। মদন হাওলাদার বাড়ির বউয়ের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পাচ্ছে না। সে দৌড়ে নিচে যায়। বাড়ির সবাইকে গিয়ে বলে পদ্মজা তালা ভাঙছে।

খলিল,আলমগীর, আমির,রিদওয়ান,ফরিনা,আমিনা ছুটে আসেন। ততক্ষণে পদ্মজা তালা ভেঙে ফেলেছে। আমির হন্তদন্ত হয়ে এসেই প্রশ্ন করল,'তালা ভাঙলে কেন?'

'আপনার ভাই আমাকে চাবি দেননি। আমার রুম্পা ভাবির সাথে দেখা করার ইচ্ছে হচ্ছিল তাই ভেঙেছি।'

'এইডা অসভ্যতা। তোমারে ভালা ভাবছিলাম। ছেড়ি মানুষের এতো তেজ, অবাধ্যতা ভালা না।'

পদ্মজা এক নজর খলিলকে দেখল। এরপর রুম্পার ঘরে ঢুকল। রুম্পা ঘরের মাঝে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লম্বা চুল এখন ঘাড় অবধি! কে কেটে দিয়েছে? যেন চুল না ময়লা ঝাড়ু। পদ্মজা দৌড়ে রুম্পার পাশে এসে বসে। রুম্পার শাড়ি ঠিক করে দিয়ে ডাকল,'ভাবি? ভাবি? শুনছো ভাবি? '

রুম্পার সাড়া নেই। গলায়,হাতে,পায়ে মারের দাগ। ফরিনা দেখে চমকে যান। রুম্পার এক হাত চেপে ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন,'কেলায় মারছে বউডারে? আল্লাহ গো,কেমনে মারছে। রক্ত শুকায়া পাথথর হইয়া গেছে। এর লাইগগা আমরারে রুম্পার কাছে আইতে দেও না তোমরা? বউডা তোমরারে কী করছে? পাগল মানুষ।' ফরিনা বাড়ির পুরুষদের দিকে চেয়ে কেঁদে বললেন।

আমিনা দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বরাবরই অন্যরকম মানুষ। অহংকারী, হিংসুক। অন্যদের ভালো দেখতে পারেন না। রানির জীবনটা এভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আরো বেশি খামখেয়ালি হয়ে উঠেছেন। পদ্মজা

আমিরের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল,'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? অন্যরা পাষাণ। আপনি তো পাষাণ না। ভাবিকে বিছানায় তুলে দিন।'

পদ্মজার কথায় আমির রুম্পাকে কোলে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমির, ফরিনা ছাড়া বাকি সবাই বিরক্তিতে কপাল ভাঁজ করে চলে যায়। তারা অসন্তুষ্ট। খলিল যাওয়ার আগে বিড়বিড় করে পদ্মজাকে অনেক কিছু বললেন। পদ্মজা সেসব কানে নেয়নি। সে শুধু অবাক হয়। মানুষগুলোর প্রতি ঘৃণা হয়। সে রুম্পার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছে। আমিরকে বলে,কবিরাজ নিয়ে আসতে। আমির চলে যায়। ফরিনার কাছ থেকে পদ্মজা জানতে পারল,তিনি দুই বছর পর রুম্পাকে দেখছেন! কী অবাক কান্ড! কখন চুল কাটা হয়েছে জানেন না। পদ্মজা জানতে চাইল,'কেন এতো ভয় পান বাড়ির পুরুষদের? একটু শক্ত করে কথা বলে ভাবিকে দেখতে আসতে পারলেন না? ভাবির মা বাপের বাড়ি কোথায়? উনারা মেয়ের খোঁজ নেন না?'

'রুম্পার মা বাপ নাই। ভাই আছে দুইডা। ভাইগুলা আগেই খোঁজ নিত না। পাগল হুনার পর থাইকা নামও নেয় নাই।'

'মানুষ এতো স্বার্থপর কী করে হয় আম্মা?'

ফরিনা রুম্পার শাড়ির ময়লা ঝেড়ে দেন। ঘরদোর পরিষ্কার করেন। রুম্পার জ্ঞান ফিরে। কিন্তু কথা বলার শক্তিটুকু নেই। সে ড্যাবড্যাব করে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন পদ্মজার জন্য অপেক্ষায় ছিল। পদ্মজার জন্যই বেঁচে আছে! কিছু বলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। কতদিন ধরে তাকে পানি ছাড়া কিছু দেওয়া হচ্ছে না। ক্ষুধার চোটে বালি খেয়েছে। ঘরের এক কোণে বালির বস্তা রাখা। পেট খারাপ হয়ে পুরো ঘর নষ্ট করেছে। বমি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গতকাল থেকে সে অজ্ঞান। তবুও কেউ এসে দেখেনি। পদ্মজার চোখের জল আপনাআপনি পড়ছে। রুম্পার কষ্ট তাকে দুমড়েমুচড়ে দিচ্ছে। সে মনে মনে শপথ করে,রুম্পাকে নিয়ে যাবে শহরে। ফরিনা ও পদ্মজা মিলে রুম্পাকে গোসল করাল। এরপর নতুন শাড়ি পরিয়ে,গরম গরম ভাত খাওয়াল। চুলে তেল দিয়ে দিল। খাওয়া শেষে রুম্পা বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। শরীরের শক্তিটুকু আসতে সময় লাগবে। একটু ঘুমালেই হতো। পদ্মজা রুম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল,'ঘুমাও ভাবি।'

রুম্পার দূর্বল দুটি হাত পদ্মজার হাত শক্ত করে ধরতে চাইছে। পদ্মজা টের পেল। সে রুম্পার দুই হাত শক্ত করে ধরে বলল,'তোমাকে ছেড়ে যাব না। থাকব আমি।'

রুম্পার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা মুছে দিল। ফরিনাকে বলল,'আম্মা আমি আমার ঘর থেকে আমার কোরআান শরীফ আর জায়নামাজ নিয়ে আসি। আর উনাকে বলে আসি আপাতত আমি রুম্পা ভাবির সাথে থাকব।'

'যাও তুমি। আমি এইহানে আছি।'

পদ্মজা বেরিয়ে গেল। বারান্দা পেরোবার সময় আলগ ঘরের সামনের উঠানে চোখে পড়ল। সেখানে পূর্ণা,রানি বাচ্চাদের নিয়ে গোল্লাছুট খেলছে। পূর্ণার পরনে শাড়ি! মেয়েটা এতো দস্যি হলো কী করে? সে চোখ সরিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেল। সন্ধ্যার আযান পড়ার বেশি দেরি নেই।

রানি এক দলের নেতা,পূর্ণা অন্য দলের। দুই দলের নাম শাপলা আর গোলাপ। প্রতি দলে ছয়জন করে। বাচ্চাগুলোর বয়স ৯-১০ এরকম।

আলো আলগ ঘরের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে। মৃদুল আলগ ঘর থেকে বেরিয়ে বলল,'এই বাচ্চারা আমিও খেলতাম।'

রানি বলল,'না,না। তোরে নিতাম না।'

পূর্ণা মৃদুলকে দেখেই অন্যদিকে চাইল। তার ভীষণ লজ্জা করছে,মৃদুলের সামনে পড়তে! মৃদুল আরেকটু এগিয়ে এসে বলল,'ডরাইতাছোস? ডরানিরই কথা। এই মৃদুলের সাথে কেউ পারে না। আর তুই তো মুটকি। কেমনে পারবি?'

'আমি তোর চার মাসের বড়। সম্মান দিয়া কথা ক। মাঝখান থাইকা সর। খেলতে দে।'

'ধুর,তোর ছেড়ির এখন খেলার সময়। আর তুই খেলতাছস। সর। এই এই,বোয়াল মাছ। তোমার দলের একটারে বাদ দিয়া আমারে লও। এই মুটকিরে একশোটা গোল্লা না দিলে আমি বাপের ব্যাঠা না।'

পূর্ণা হা করে তাকায়। তাকে বোয়াল মাছ ডাকা হচ্ছে! এজন্য তার দিকে তাকিয়ে বাচ্চারাও হাসছে! দেখতে চকচকে সুন্দর হয়ে গেছে বলে কী,যা ইচ্ছে ডাকার অধিকার বাঘিনী পূর্ণা দিয়ে দিবে? কখনো না। সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল,'আমাকে আপনার কোন দিক দিয়ে বোয়াল মাছ মনে হচ্ছে?'

পূর্ণাকে কথা বলতে দেখে মৃদুল হাসল। রসিকতা করে বলল,'আরে কালি বেয়াইন দেখি কথা কইতেও পারে।'

পূর্ণা আহত হলো। এক হাতে নিজের গাল ছুঁয়ে ভাবল,সে কী কালি ডাকার মতো কালো? বাঘিনী রূপটা মুহূর্তে নিভে গেল। তার চোখ দুটি ছলছল করে উঠে। যাকে পছন্দ করলো,সে-ই কালি বলছে। পূর্ণা থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল। রানি বলল,'মৃদুইললে সর কইতাছি। খেলতে দে।'

'আমিও খেলাম। এই আন্ডা তুই বাদ। তোর বদলে আমি বেয়াইনের দলের হয়ে খেলাম।'

মৃদুলের এক কথায় ন্যাড়া মাথার ছেলেটি সরে দাঁড়ায়। মৃদুল খেলার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল। এরপর পূর্ণাকে বলল,'কালি বেয়াইন তুমি আগে যাইবা? নাকি আমি আগে যামু?'

পূর্ণা মিনমিনিয়ে বলল,'আমি খেলব না।'

রানি দূর থেকে বলল,'দেখছস মৃদুইললা তুই খেলার মাঝে ঢুকছস বইললা পূর্ণা খেলত না। সবসময় কেন খেলা নষ্ট কইরা দেস তুই?'

মৃদুল সেসব কথায় ভ্রুক্ষেপও করল না। সে রসিকতার স্বরেই বলল,'আরে বেয়াইনের শক্তি ফুরায়া গেছে। আর খেলতে পারব না। এই আন্ডা তুই আয়। বেয়াইন খেলব না। তুই আইজ হারবিরে আপা।'

রানি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল,'আমার দলই জিতব।'

'আগে আগে চাপা মারিস না। আমার মতো দেখায়া দে। এই পেটওয়ালা তুই আগে যা।'

পূর্ণা ব্যথিত মন নিয়ে আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের পথে পা রাখে। সে কালো সে জানে! কিন্তু কেউ কালি বললে তার খুব খারাপ লাগে। আল্লাহ কেন তাকে সৌন্দর্য দিলেন না? একটু ফর্সা করে দিলে কী হতো? তার আপার মতো কালো রঙে সবাই সৌন্দর্য কেন খোঁজে পায় না? পূর্ণা দুই হাত দিয়ে দুই চোখের জল মুছে। অভিমানী মন থেমে থেমে কাঁদছে। এই শাড়ি তো মৃদুলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই পরেছিল সে। দরকার নেই এই চকচকে পুরুষ। কেউ তাকে কালি বললে সে ভীষণ রাগ করে! ভীষণ।

#পদ্মজা

চলবে...

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা পাট - 50

সুনসান নিরবতা চারিদিকে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। পদ্মজা

তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছে কখন রুম্পা চোখ খুলবে। বিভোর হয়ে ঘুমাচ্ছে। পদ্মজা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। দরজায় কেউ টোকা দিতেই পদ্মজা সাবধান হয়ে গেল। রুম্পার নিরাপত্তা নিয়ে তার মন অস্থির হয়ে আছে। সে গম্ভীরকণ্ঠে জানতে চাইল,'কে কে ওখানে?'

'আমি।'

আমিরের কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। এরপর দরজা খুলল। আমিরের চুল এলোমেলো। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সে পদ্মজাকে দেখে বলল,'ঘুম ভেঙে গেল। তোমাকে মনে পড়ছে।'

'আমি তো এখন যেতে পারব না।'

'আমি থাকি তাহলে।' আমিরের নির্বিকার কণ্ঠ।

পদ্মজা চোখ রাঙিয়ে বলল,'শীতের রাতে মাটিতে থাকবেন? রুম্পা ভাবি বিছানায় ঘুমাচ্ছে। এই ঘরে থাকলে মাটিতেই থাকতে হবে। ঘরে যান।'

'মাটিতেই থাকব।'

'ধুর! আপনি সবসময় ঘাড়ত্যাড়ামি করেন। আপনাকে তো আমি বলে এসেছি কতোটা দরকার রুম্পা ভাবির সাথে থাকা।'

'গত দিনও বোনদের সাথে ছিলে। আজ রুম্পা ভাবির সাথে।'

'কয়টা দিনই তো। আজীবন একসাথেই থাকব।'

'আচ্ছা যাচ্ছি,এখনও ঘুমাওনি কেন?'

পদ্মজা একবার রুম্পাকে দেখে নিয়ে বলল,'এইতো ঘুমাব।'

আমির চারপাশ দেখে বলল,'আর,সাবধানে থাকবে। রিদওয়ান দোতলায় ঘুরঘুর করছে। ভয় পাবে না। আমি আছি।'

পদ্মজা চিন্তিত আমিরের চোখের দিকে তাকাল। বলল,'আপনি আমার সাথে থাকতে নয়,দেখতে আসছেন আমি ঠিক আছি নাকি তাই না? ভয় পাবেন না তো একদম।'

আমির দুই হাতে পদ্মজার দুই গাল ধরল,'আমি তো জানি আমার পদ্মবতী কতোটা সাহসী! এজন্যই এই বাড়িতে আসার সাহস করতে পেরেছি।'

'আহ্লাদ হয়েছে? এবার যান।'

আমির হেসে চলে গেল। পদ্মজা অনেকক্ষণ অন্ধকার বারান্দায় তাকিয়ে রইল। এরপর দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমিরকে সে কতোটা ভালোবাসে সে নিজেও জানে না! আমিরের প্রতিটি স্পর্শ,কথায় ছন্দে হৃদয় স্পন্দিত হয়। আমিরের পাগলামি,খেয়াল রাখা,দায়িত্ববোধ সবকিছু পদ্মজাকে মুগ্ধ করে। একজন আদর্শ স্বামী বোধহয় একেই বলে। আমিরের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন সে ঘুমিয়ে পড়ল। ভালোবাসার মানুষদের নিয়ে ভাবা সময়টা জাদুর মতো। চোখের পলকে নির্ঘুম রাত কেটে যায় নয়তো নিজের অজান্তে আবেশে ঘুম চলে আসে।

সকালে উঠেই পূর্ণাকে গিয়ে ডেকে তুলল পদ্মজা। এরপর রুম্পার ঘরে এসে নামায পড়ল। কোরআন পড়ল। রুম্পার ঘুম আরো কিছুক্ষণ পর ভাঙে। রুম্পাকে ধরে ধরে টয়লেটে নিয়ে যায় পদ্মজা। এরপর রুম্পাকে রেখে রান্নাঘর থেকে খাবার আনতে যায়। ফরিনা মাত্র চুলা থেকে খিচুড়ি নামিয়েছেন।

'আম্মা,ভাবির জন্য খিচুড়ি নিয়ে যাই?' বলল পদ্মজা।

ফরিনা হেসে বললেন,'এইডা আবার কওন লাগে। লইয়া যাও। তুমি খাইবা কুনসময়?'

'ভাবিকে খাইয়ে এসে তারপর উনাকে নিয়ে খাব। আম্মা,রাতের হাঁসের মাংস আছে না?'

'হ আছে তো। ওইযে ওই পাতিলডায়।'

পদ্মজা গরম গরম খিচুড়ি হাঁসের মাংসের ভুনা দিয়ে নিয়ে আসে। ঘরে ঢুকে দেখল,রুম্পা মেঝেতে পড়ে আছে। পদ্মজা থালা বিছানার উপর রেখে রুম্পাকে তোলার চেষ্টা করে। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,'ভাবি মেঝেতে পড়লেন কীভাবে?'

রুম্পা কিছু বলছে না। সে উদ্ভ্রান্টের মতো ছটফট করছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পদ্মজাকে দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে। পদ্মজা খুব বিস্মিত। রুম্পা এমন করছে কেন? সে রুম্পাকে প্রশ্ন করেই চলেছে,'কেউ এসেছিল ঘরে? কে এসেছিল? ভয় দেখিয়েছে? ভাবি...ভাবি বলো আমাকে। ভাবি...ধাক্কাচ্ছো কেন? আমি তোমার জন্য খাবার এনেছি।'

খাবারের কথা শুনে রুম্পা থমকে গেল। পদ্মজার দিকে এক নজর তাকিয়ে বিছানার দিকে তাকাল। ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের উপর। এতো গরম খাবার গাপুসগুপুস করে খেতে থাকল। পদ্মজা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। এমনভাবে রুম্পা খাচ্ছে যেন আর কোনোদিন খাওয়া হবে না। সুযোগ আসবে না। পদ্মজা পানি এগিয়ে দিল। রুম্পা অল্প সময়ের ব্যবধানে পুরো থালার খিচুড়ি এবং এক বাটি হাঁসের মাংস ভুনা খেল।

খাওয়া শেষে পদ্মজা নমনীয় কণ্ঠে প্রশ্ন করল,'ভাবি আমার সাথে একটু কথা বলবেন?'

রুম্পা দূরে সরে যায়। দেয়াল ঘেঁষে বসে। মাথা দুইদিকে নাড়িয়ে ইশারা করে,সে কথা বলবে না। পদ্মজা তবুও আশা ছাড়ল না। সে রুম্পার পাশে গিয়ে বসল। রুম্পার এক হাত মুঠোয় নিয়ে বলল,'আমি তোমাকে আমার সাথে ঢাকা নিয়ে যাব। যাবে?'

রুম্পা এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিল। পদ্মজাকে ধাক্কা মেরে চেঁচিয়ে বলল,'বাইর হ আমার ঘর থাইকা। বাইর হ তুই।'

রুম্পার ব্যবহারে পদ্মজা আহত হলো,'ভাবিই! আমি তোমার ভালো চাই।'

'বাইর হ কইতাছি। বাইর হ।'

শীতের ঠান্ডা হিম বাতাস জানালা দিয়ে ঢুকছে। শীতের দাপট বেড়েছে। এবারের শীত বোধহয় মানুষ মারার জন্য এসেছে! এতো ঠান্ডা! রুম্পার পরনে শাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। ঠান্ডায় তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। পদ্মজা রুম্পার চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করল। রুম্পার চোখ বার বার দরজার দিকে যাচ্ছে। পদ্মজা উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল না

অবধি, ছুটে আসে দরজার কাছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আগন্তুক ছুটে পালাতে চায়। পদ্মজা জোরালো কণ্ঠে ডেকে উঠল,'লতিফা বুবু।'

লতিফা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পদ্মজাকে দেখল। এরপর সিঁড়িভেঙে নিচে নেমে যায়। তার চোখে ভয় ছিল। একটা ঝনঝন শব্দ হয়। পদ্মজা চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। রুম্পা পাগলামি শুরু করেছে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ছে। পদ্মজা রুম্পাকে থামানোর চেষ্টা করে। অনেক বোঝায়। কিছুতেই রুম্পা থামে না। রুম্পার হাত থেকে স্টিলের গ্লাস পদ্মজার কপালে এসে পড়ে। পদ্মজা 'আহ' বলে বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রুম্পা পাগলামি থামিয়ে দিল। ছুটে এসে পদ্মজার আহত স্থানে হাত রাখে, উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে,'আমি তোমারে ইচ্ছা কইরা দুঃখ দেই নাই বইন। বেশি বেদনা করতাছে?'

আঞ্চলিক ভাষায় রিনঝিনে কণ্ঠ! পদ্মজা দুই চোখ মেলে তাকায়। রুম্পা পদ্মজার কপালের ফোলা অংশে ফু দিচ্ছে। সে ভীষণ অস্থির হয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে,পদ্মজাকে অনেক পছন্দ করে রুম্পা। মুখোশ খুলে বেরিয়ে এসেছে আসল রূপে। সে কঠিন নয়,পাগল নয়। বরং বড্ড নরম,কোমল। পদ্মজা শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল,'কেন পাগলের অভিনয় কর ভাবি?'

রুম্পার হাত থেমে যায়। সে ধরা পড়ে গেছে।

____

কুয়াশার স্তর ভেদ করে একটা নৌকা খালে ঢুকে। নৌকা চালাচ্ছে মৃদুল। গতকাল যে ছেলেটাকে মৃদুল আন্ডা ডেকেছিল সেই ছেলেটাও নৌকায় আছে। তার ভালো নাম,জাকির। মৃদুলের সাথে বাচ্চাকাচ্চাদের অনেক খাতির। পূর্ণা খালের ঘাটে বসে ছিল। সে ফজরের নামায পড়ে,খিচুরি খেয়ে এখানে চলে এসেছে। মন খারাপের সময় ঘাটে বসে থাকতে তার ভালো লাগে। গতকাল রাতে খাওয়ার সময় মৃদুল কম হলেও বিশ বার তাকে কালি ডেকেছে। অন্ধকারে নাকি দেখাই যায় না। এমন অনেক কথা বলেছে। কালো রঙের মেয়ে হওয়া বোধহয় পাপ! আবার পদ্মজাও রাতে তার সাথে থাকেনি। পুরো রাত সে কেঁদেছে। কেউ কেন তাকে কালি বলবে! আবার তার আপাও তাকে সময় দিল না। শ্বশুরবাড়ির অন্য বউকে নিয়ে ব্যস্ত। পূর্ণার খুব অভিমান হয়েছে। বয়স বিশ পার হলেও রয়ে গেছে সেই ছোট্ট কিশোরী মেয়েটি। মৃদুল নৌকা থামিয়ে পূর্ণাকে ডাকল,'কালি বেয়াইন।'

পূর্ণা তাকাল না। মৃদুল আবার ডাকল,'বেয়াইন গো।'

তাও পূর্ণা সাড়া দিল না। মৃদুল জাকিরকে বলল,'কী রে ব্যাঠা, বুঝছিস কিছু? এই ছেড়িরে ভূতে ধরল নাকি?'

জাকির দাঁত বের করে শুধু হাসল। মৃদুল জোরে বলল,'আরে বেয়াইন কী কানে শুনে না? কাল তো ঠিকই শুনছিল। ঠান্ডা কী কানের ভেতরে ঢুইকা গেছে? ও কালি বেয়াইন। বেয়াইন...'

পূর্ণা হুট করে উঠে দাঁড়াল। আঙুল শাসিয়ে মৃদুলকে বলল,'আপনার কী মা বাপ নাই? থাকলেও শিক্ষা দেয়নি যারে তারে যা ইচ্ছে ডাকা উচিত না। অসভ্যতা অন্য জায়গায় করবেন আমার সামনে না। আমি কালো আমি জানি। আপনাকে কালি বলে সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমি আপনাকে অনুমতি দেইনি আমাকে কালি ডাকতে বা বেয়াইন ডাকতে। আমি আপনার বেয়াইনও না। আমার ধুলাভাইয়ের আপন ভাই না আপনি। কোথাকার কে আপনি? এই ফর্সা চামড়ার দেমাগ দেখান? আরেকবার আমাকে কালি বললে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না।'

কথা শেষ করেই পূর্ণা কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যায়। রেখে যায় অপমানে থমথম করা একটা মুখ। মৃদুল ঘোর থেকে বেরোতে পারছে না। তাকে একটা মেয়ে এভাবে বলেছে? তার মতো সুন্দর ছেলের জন্য গ্রামের সবকটি মেয়ে পাগল। আর এই কালো মেয়েটা তাকে এভাবে অপমান করলো! মৃদুল রাগে বৈঠা ছুঁড়ে ফেলে খালে। নৌকা থেকে রাগে নামতে গেলে তার এক পায়ে নৌকা ধাক্কা খেল। ফলে নিমিষে দূরে চলে যায় নৌকাটি। নৌকায় থাকা ছেলেটি চিৎকার করল,' মৃদুল ভাই। আমি আইয়াম কেমনে? বৈডাডাও ফালায়া দিছো।'

মৃদুল বিরক্তি নিয়ে ফিরে তাকাল। সত্যি নৌকা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। এই ঠান্ডার মধ্যে ছোট বাচ্চাটা সাঁতরে পাড়ে আসবে কীভাবে!

মৃদুল রাগ এক পাশে রেখে বরফের মতো ঠান্ডা জলে ঝাঁপ দিল।

রুম্পা থেমে থেমে কাঁদছে। পদ্মজা অনবরত প্রশ্ন করে যাচ্ছে। সে ভীষণ অস্থির। একজোড়া পায়ের শব্দ ভেসে আসতেই রুম্পার কান্না থেমে গেলে। যেন এই পায়ের শব্দগুলো সে চিনে। রুম্পা কাঁপতে থাকল। রুম্পার অবস্থা দেখে পদ্মজার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত গড়িয়ে যায়। রুম্পা পদ্মজার এক হাত ধরে চাপাস্বরে দ্রুত বলল,'এহান থাইকা চইলা যাও বইন। আর আগাইয়ো না। ওরা পিশাচের মতো। ছিঁইড়া খাইয়া ফেলব। ওদের দয়ামায়া নাই।

তুমি অনেক ভালা। তোমারে কোনোদিন ভুলতাম না আমি। তুমি এইহানে থাইকো না। তুমি এই বাড়ির কেউয়ের লগে যোগাযোগ রাইখো না।'

'ওরা কী করেছে? ভাবি, অনুরোধ করছি আমাকে বলুন। ভাবি অনুরোধ করছি।'

রুম্পা সেকেন্ডে সেকেন্ডে ঢোক গিলছে। পায়ের শব্দটা যত কাছে আসছে তার কাঁপুনি তত বাড়ছে। সে ছলছল চোখে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে কোনোমতে বলল,'পিছনে...উত্তরে...ধ রক্ত।'

পরমুহূর্তেই দরজা ঠেলে রুমে ঢুকে খলিল হাওলাদার। এতো জোরে দরজা ধাক্কা দিয়েছেন যে, বিকট শব্দ হয়। হুংকার ছেড়ে পদ্মজাকে বললেন,'তুমি এই ঘর থাইকা বাইর হও। অনেক অবাধ্যতা দেখাইছো আর না।'

খলিলের চোখ দুটি দেখে পদ্মজার রক্ত ছলকে উঠে। গাঢ় লাল। সে দুই হাতে রুম্পাকে জড়িয়ে ধরে বলল,'আমি রুম্পা ভাবির সাথে থাকব।'

'থাকবা না তুমি।'

'কেন জানতে পারি?'

'একটা পাগলের সাথে কীসের থাকন?'

'রুম্পা ভাবি পা...' পদ্মজা কথা শেষ করতে পারল না। বুকে মুখ লুকিয়ে রাখা রুম্পা পিঠে চিমটি দিয়ে ভেজাকণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলল,'কইও না। আমি পাগল না কইও না। দোহাই লাগে।'

পদ্মজা থেমে গেল। খলিল বললেন,'বাড়ায়া যাও বউ।'

পদ্মজা নাছোড়বান্দা হয়ে বলল,'যাব না আমি। রুম্পা ভাবির সাথে থাকব আমি।'

রুম্পা পদ্মজাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে আবার পাগলামি শুরু করে। খলিল রুম্পাকে আঘাত করার জন্য উদ্যত হতেই পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়াল। বলল,'নিজের মেয়েকে অমানুষের মারতে পারেন বলে সবার মেয়েকে মারার অধিকার পাবেন না।'

পদ্মজার কথা মাটিতে পড়ার আগে খলিলের শক্ত হাতের থাপ্পড় পদ্মজার গালে পড়ে। পদ্মজা ব্যথায় 'মা' বলে আর্তনাদ করে উঠল।

#পদ্মজা

চলবে...

Next পাটের লিংক কমেন্ট বক্সে

®ইলমা বেহরোজ

#আমিপদ্মজা - ৫১

ভোর হয়েছে আর কতক্ষণই হলো! দু ঘন্টার মতো। এর মধ্যেই মেঘলা আকাশ বেয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকে। পূর্ণা আলগ ঘরের সামনে থাকা বারান্দার চেয়ারে মুখ ভার করে বসে আছে। তার গায়ে সোয়েটার,সোয়েটারের উপরে তিন তিনটে কাঁথা। তবুও পাতলা ঠোঁট জোড়া ঠান্ডায় কাঁপছে। বসে থাকতে থাকতে একসময় বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। কোথাও যাওয়ার মতো অবস্থা নেই। তার চেয়ে বরং আপার সাথে আড্ডা দেয়া যাক। চৌকাঠে পা রাখতেই মৃদুলের কণ্ঠস্বর কানে এলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মৃদুল কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে আসছে। শরীর ভেজা। রানি আপা,রানি আপা বলে ডাকছে। কিন্তু এখানে তো রানি নেই। মৃদুল বারান্দায় পা রেখেই পূর্ণার মুখটা দেখতে পেল। তার দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে, সঙ্গে মৃদুলের কপালে ভাঁজ পড়ে। এই মেয়ের জন্যই তো এমন ঘটনা ঘটলো। এখন ঠান্ডায় কাঁপতে হচ্ছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। শার্ট খুলে দড়িতে মেলে দিয়ে ডাকল,'কইরে রানি আপা। শীতে মইরা যাইতেছি। কাপড় নিয়ে আয়। ভেজা শরীর নিয়া ঘরে কেমনে ঢুকব?'

পূর্ণা কাঠখোট্টা গলায় বলল,'রানি আপা এইখানে নাই। হুদাই চেঁচাচ্ছেন।'

মৃদুল পূর্ণার স্বরেই পাল্টা জবাব দিল,'তোমারে কইছি আমার উত্তর দিতে? আমার ইচ্ছে হইলে আমি চেঁচাব। তোমার ভালা না লাগলে কানে ফাত্তর ঢুকায়া রাখো।'

পূর্ণা দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করে তাকিয়ে থাকে। মৃদুল আড়চোখে পূর্ণাকে দেখে। আবার চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। বাতাস বেড়েছে। খালি গায়ে কাঁপুনি শুরু হয়। মৃদুলকে এভাবে কাঁপতে দেখে পূর্ণার মায়া হচ্ছে। সে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল,'আমি আপনার কাপড় নিয়ে আসব?'

মৃদুল চোয়াল শক্ত রেখেই আবারও আড়চোখে তাকাল। কিন্তু উত্তর দিল না। সে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণাকে উপেক্ষা করছে। পূর্ণা জবাবের আশায় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর চলে যায়। পূর্ণা চলে যেতেই মৃদুল শীতের তীব্রতায় মুখ দিয়ে ' উউউউউউ' জাতীয় শব্দ করে কাঁপতে থাকল। যতক্ষণ না প্যান্ট শুকাবে ঘরের ভেতর ঢুকতে পারবে না। তার ঘরে যাওয়ার পথে ধান ছড়ানো আছে। এদিক দিয়ে গেলে ধান ভিজে নষ্ট হবে। সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নেই। কেউ যদি কাপড় দিয়ে যেত! পূর্ণা আলগ ঘরের পিছনে উত্তর দিকে যে বারান্দা আছে সেখানে মগাকে পেল। মগা ঝিমুচ্ছে।

'মগা ভাইয়া?'

মগা তাকাল। পূর্ণা বলল,' মৃদুল ভাইয়ের ঘর কোনটা?'

মগা আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিল। পূর্ণা মৃদুলের ঘরে গিয়ে একটা লুঙ্গি আর শার্ট নিয়ে বেরিয়ে আসে। মৃদুল পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা শীতের কাতরতা বন্ধ করে দিল। পূর্ণা মৃদুলের চেয়ে এক হাত দূরে এসে দাঁড়ায়। লুঙ্গি,শার্ট এগিয়ে দেয়। মৃদুল ঘুরে তাকায়। আর রাগ দেখানো সম্ভব নয়। রগে, রগে ঠান্ডার তীব্রতা ঢুকে গেছে। রক্ত শীতল হয়ে এসেছে। সে পূর্ণার হাত থেকে নিজের কাপড় নিতে নিতে হৃদয় থমকে দেয়ার মতো একটা মায়াবী মুখশ্রী আবিষ্কার করলো। টানা টানা চোখ,চোখের পাঁপড়িগুলো এতো ঘন যে মনে হচ্ছে কোনো বিশাল বটবৃক্ষ ছায়া ফেলে রেখেছে,পাতলা ফিনফিনে ঠোঁট,ত্বকে তেলতেলে ভাব। চকচক করছে। লম্বা এলো চুল বাতাসে উড়ছে। শ্যামবর্ণের মুখ এতো আকর্ষণীয় হয়? কিছু সৌন্দর্য বোধহয় এভাবেই খুব কাছে থেকে চিনে নিতে হয়। মৃদুলের দৃষ্টি শীতল হয়ে আসে। সে আগে লুঙ্গি নিল। পূর্ণা অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে,'আমি দেখছি না। আপনি পাল্টে ফেলুন।'

মৃদুল মোহময় কোনো টানে আবার ফিরে তাকায়। তবে মুখটা আর দেখতে পেল না। মায়াবী মুখটা অন্যদিকে ফিরে আছে। সে লুঙ্গি পাল্টে মিনমিনিয়ে বলল,'শার্টটা?'

পূর্ণা হেসে শার্ট এগিয়ে দিল। মৃদুলের এলোমেলো দৃষ্টি। হুট করেই বুকে ঝড়ো বাতাস বইছে। কী আশ্চর্য! পূর্ণা গর্বের সাথে বলল,'আমাকে কালি বলে কষ্ট দিলেও আমি আপনার কষ্ট দেখতে পারিনি। আমি এমনই মহৎ।'

অন্যসময় হলে হয়তো মৃদুলও পাল্টা জবাব দিত। কিন্তু এখন ইচ্ছে হচ্ছে না। মোটেও ইচ্ছে হচ্ছে না। পূর্ণা কিছু না বলে আলগ ঘরে ঢুকে যায়। মৃদুল দ্রুত পায়ে দুই পা এগিয়ে আসে। আবার পিছিয়ে যায়। আজকের দিনটা অন্যরকম লাগছে। আচ্ছা,দিনটা অন্যরকম নাকি অনুভূতি অন্যরকম?

পদ্মজা নিজেকে ধাতস্থ করার আগেই খলিল পদ্মজাকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দেন। এরপর দ্রুত দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। পদ্মজা গালে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। চোখের জল বিসর্জন হচ্ছে আঘাতের কষ্টে? নাকি কারো হাতে থাপ্পড় খাওয়ার অপমানে? কে জানে! খলিল কপাল কুঁচকে আরো কী কী যেন বলে চলে যান। পদ্মজা ঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সে আকস্মিক ঘটনাটি হজম করতে পারছে না। দিকদিশা যেন হারিয়ে ফেলেছে। ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ পেয়ে পদ্মজা সম্বিৎ ফিরে পেল। সে বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকাল। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কীভাবে সামলানো উচিত তার মাথায় আসছে না। একটু দূরে চোখ পড়তেই দেখতে পেল,লতিফাকে। পদ্মজাকে তাকাতে দেখেই লতিফা আড়াল হয়ে যায়। পদ্মজা সে জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই তীব্র শীতে আবার বৃষ্টি হবে নাকি! ভাবতে ভাবতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নামে। পদ্মজার গা কেঁপে উঠে ঠান্ডার তীব্রতায়।

সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে। সুপারি গাছগুলো একবার ডানে দুলে পড়ছে তো আরেকবার বামে। আলগ ঘরের পিছনের বারান্দায় মগা গায়ে কাঁথা মুড়িয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে। পদ্মজা শাড়ির আঁচল ভালো করে টেনে ধরে শীত থেকে বাঁচতে। আবহাওয়ার অবস্থা ভালো না তার মধ্যে বৃষ্টি আর বাতাস! সামান্য শাড়ির আঁচলে কী ঠান্ডার তীব্রতা আটকানো যায়!

ইচ্ছেও করছে না ঘরে যেতে। সে এদিকওদিক চেয়ে দেখল। শেষ কর্ণারে একটা চেয়ার দেখতে পেল। চেয়ারটা আনার জন্য এগোয়। তখন নাকে একটা বিশ্রি বোটকা গন্ধ আসে। পদ্মজার স্নায়ু সজাগ হয়ে উঠে। যত এগোচ্ছে গন্ধটা তীব্র হচ্ছে! সে সাবধানে এক পা এক পা করে ফেলছে।

এরিমধ্যে আমিরের চেঁচামেচি কানে আসে। পদ্মজা থমকে যায়। উলটো ঘুরে বাইরে উঁকি দেয়। বাইরে ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। সবার আগে চোখে পড়ে আমিরকে। পদ্মজা সবকিছু ভুলে ছুটে নেমে আসে নিচ তলায়। এরপর বাইরে আসে। আমির তার চাচাকে মারছে! যেভাবে পারে কিল,ঘুষি দিচ্ছে। আমির এতোটাই রেগে গিয়েছে যে,নিজের আপন চাচাকে মারছে! মজিদ হাওলাদার, রিদওয়ান, আমিনা,রানি, সবাই আটকানোর চেষ্টা করছে। কেউ পারছে না। আমির খলিলকে ছেড়ে রিদওয়ানকে ধাক্কা মেরে কাঁদায় ফেলে দিল। আমিরের আচরণ উন্মাদের মতো। সে বিশ্রি গালিগালাজ করতে করতে রিদওয়ানের পেটে লাথি বসায়। রিদওয়ান কুঁকিয়ে উঠল। আমিনা আমিরকে কিল,থাপ্পড় দিয়ে আঘাত করছেন। তাতেও কাজ হচ্ছে না। এমন বেয়াদব তো আমির না! পদ্মজা দৌড়ে আসে। আমিরকে চিৎকার করে বলে,'কী করছেন আপনি? পাগল হয়ে গেছেন? ছাড়ুন।'

আমির পদ্মজার জবাব দেয় না। খলিলকে থাবা মেরে ধরে। খলিলের নাক বেয়ে রক্ত ঝরছে। সেই অবস্থায়ই মুখে আরেকটা ঘুষি মারে। রানি, আমিনা হাউমাউ করে কাঁদছে। মৃদুল,পূর্ণা,মগা,মদন সবাই ছুটে আসে। মৃদুল,পদ্মজা

দুই হাতে আমিরকে টেনে সরাতে চায়। কিন্তু পারল না। আমিরের শরীরে যেন কয়েকটা বাঘের শক্তি ঢুকেছে। সে কিছুতেই ক্লান্ত হচ্ছে না। মৃদুল দুই হাতে জাপটে ধরে আমিরকে দূরে সরিয়ে আনে। আমির হিংস্র বাঘের মতো হাত পা ছুড়তে ছুড়তে বলে,'কুত্তার বাচ্চারা অনেক কিছু করছস করতে দিছি। আমার বউয়ের গায়ে হাত দেস কোন সাহসে। মৃদুল ছাড়। আমি ওদের আজরাইলের মুখ দেখিয়ে ছাড়ব।'

মৃদুলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আমির। ছুটে এসে রিদওয়ানকে ধরে। পদ্মজা হতভম্ব হয়ে পড়েছে! রিদওয়ান গতকাল তার কাঁধে হাত দিয়েছিল, আর আজ খলিল থাপ্পড়ে মেরেছে। এসব কে বলেছে আমিরকে? থাপ্পড়টা লতিফা দেখেছিল। তাহলে কী লতিফা বলেছে?

আমিনা পদ্মজার পায়ে লুটিয়ে পড়েন। পদ্মজা দ্রুত সরে যায়,'চাচি কী করছেন!'

আমিনা কাঁদতে কাঁদতে বললেন,'থামাও এই কামড়াকামড়ি। আল্লাহর দোহাই লাগে।'

পদ্মজা কী করবে বুঝতে পারছে না। আমির তার কথা শুনছেই না। আর আমিরের এমন রাগ সে দেখেনি! গুরুজনদের গায়ে হাত তোলার মতো রাগ আমিরের হতে পারে এটাও ধারণার বাইরে। পদ্মজা আমিরের সোয়েটার খামচে ধরে কণ্ঠ কঠিন করে বলল,'ছাড়ুন বলছি। ছাড়ুন।'

আমির তাও শুনলো না। সে ধাক্কা মেরে পদ্মজাকে সরিয়ে দিল। দুই হাত দূরেই নারিকেল গাছ ছিল। সেখানে পড়লে নিশ্চিত কোনো অঘটন ঘটে যেত,অঘটন ঘটার পূর্বেই দুটো হাত পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরে। পদ্মজা কৃতজ্ঞতা নজরে তাকায়। ফরিনাকে দেখতে পেল। পদ্মজা অবাক হয়। ফরিনা এরকম ধস্তাধস্তি দেখেও চুপ করে আছেন। থামানোর চেষ্টা অবধি করছেন না। পদ্মজা আবার আমিরকে থামানোর চেষ্টা করল। মৃদুল চেষ্টা করল। কিছুতেই কিছু হয় না। আমির খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে,অনেক বছরের রাগ একসাথে মিটিয়ে নিচ্ছে। পদ্মজা আমিরকে অনুরোধ করে সরে আসতে। সেই অনুরোধ আমিরের কর্ণকুহর অবধি পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ! পদ্মজা অসহায় মুখ করে সরে যাবে তখনই দুটি শক্তপোক্ত হাত আমিরকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করে। সেই হাতে খুব দামী ঘড়ি। হাতের মালিককে দেখার জন্য পদ্মজা চোখ তুলে তাকায়। মুখ দেখে চমকে উঠে! দীর্ঘ সময় পর আবার সেই মানুষটির সাথে দেখা। যে মানুষটি তার প্রথম ভালোবাসা না হলেও প্রথম আবেগমাখা অনুভূতি ছিল। সে লিখন শাহ! পদ্মজা দূরে সরে দাঁড়ায়। মৃদুল,লিখন মিলে আমিরকে তুলে অনেকটা দূরে নিয়ে আসে।

আমির ছটফট করছে ছোটার জন্য। অথচ ছুটতে পারছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে লিখনকে দেখে সে স্থির হয়ে যায়। লিখন হেসে বলল,'এবার থামুন। অনেক শক্তি ফুরিয়েছেন।'

আমির কিছু বলতে চাইল তখনই রিদওয়ান সবার অগোচরে ইট দিয়ে আমিরের ঘাড়ে বারি মারে। আমির আর্তনাদ করে বসে পড়ে। লিখন রিদওয়ানকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। পদ্মজা উৎকর্ণ হয়ে দৌড়ে আসে। আমিনা,রানি খলিল এবং রিদওয়ানকে নিয়ে দ্রুত আলগ ঘরে চলে যায়। দরজা বন্ধ করে দেয়। মজিদ মগাকে বললেন,'তাড়াতাড়ি যা গঞ্জে। বিপুল ডাক্তাররে নিয়ে আয়। আমার বাড়িতে এসব কী হচ্ছে!'

ফরিনা তখনও দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। এই ঘটনা তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি! যেন এই ঘটনার জন্য তিনি খুশি। কী চলছে তার মনে?

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা - ৫২

ফরিনা তাড়াহুড়ো করে খোশমেজাজে রান্না করছেন। সাহায্য করার মতো পাশে কেউ নেই। একাই দৌড়ে দৌড়ে সব করছেন। হাওলাদার বাড়িতে অতিথি এসে একদিন না থেকে যেতে পারে না। এতে নাকি গৃহস্থ বাড়ির অমঙ্গল হয়। তাই মজিদ লিখনকে থেকে যেতে জোর করেছেন। পদ্মজা নিজের ঘরে স্বামী সেবায় ব্যস্ত। আমিরের ঘাড়ের চামড়া ফুলে গেছে। হাড়ে বিষের মতো যন্ত্রণা। বিপুল ডাক্তার ঔষধপত্র দিয়েছেন। পদ্মজা অশ্রুসজল নয়নে আমিরের মুখের দিকে চেয়ে চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ স্বামীর যন্ত্রণা দেখেছে। সহ্য করতে হয়েছে। মাত্রই আমির চোখ বুজেছে। সে মনে মনে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছে,দ্রুত যেন আমিরের ব্যথাটা সেড়ে যায়। নয়তো তাকে যেন দিয়ে দেয়। ঘাড়ের আহত অংশে পদ্মজা আলতো করে ছুঁয়ে দেয়। নীল হয়ে আছে। লতিফা নিরবে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। পদ্মজা কারো উপস্থিতি টের পেয়ে জলদি চোখের জল মুছল। তারপর লতিফাকে দেখে বলল,'লুতু বুবু!'

লতিফা বলল,'খাইবা না? খালাম্মা খাইতে ডাকতাছে।'

পদ্মজা গম্ভীরকণ্ঠে বলল,'আম্মা নিজের ছেলেকে কেন দেখতে আসেননি?'

'খালাম্মায় লিখন ভাইজানের লাইগে রাঁনতাছিল।'

পদ্মজা ক্ষিপ্ত হয়,'নিজের ছেলেকে না দেখে উনি কীভাবে অতিথির জন্য ভোজ আয়োজন করছেন? আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

লতিফা নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পদ্মজা অনেকক্ষণ ক্ষিপ্ত নয়নে মেঝেতে চোখ নিবদ্ধ করে রাখল। এরপর আমিরকে এক ঝলক দেখে, লতিফাকে বলল,'তুমি যাও,আমি আসছি।'

লতিফা দুই পা এগোতেই পদ্মজা ডেকে উঠল,'লুতু বুবু।'

লুতু দাঁড়াল। পদ্মজা বলল,'তুমি আমার উপর নজর রাখছিলে কেন? আর আমাকে না জিজ্ঞাসা করে থাপ্পড়ের কথাই বা কেন বলেছো উনাকে?'

লতিফার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সে নত হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা আরো দুই বার প্রশ্ন করেও কোনো জবাব পেল না। তাই বলল,'নিষেধাজ্ঞা আছে নাকি?'

এইবার লতিফা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। সে কিছু একটা ভাবল। এরপর মুখ তুলে দেখল পদ্মজা তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। লতিফা অপ্রতিভ হয়ে উঠে। বলে,'আমি যাই। নইলে খালাম্মায় চেতব।'

পদ্মজার উত্তরের আশায় থাকেনি লতিফা। তড়িঘড়ি করে চলে যায়। পদ্মজা ভ্রূকুটি করে দরজার বাইরে তাকিয়ে থাকে। প্রতিটি প্রশ্ন যেন আলাদা আলাদা। অথচ তার মনে হয় সব প্রশ্নের এক উত্তর,এক যোগসূত্র। এখন সেসব ভাবার সময় না। আমিরের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। পদ্মজা আমিরের কপাল ছুঁয়ে তাপমাত্রা অনুমান করে। ভীষণ গরম। জ্বর উঠছে নাকি!

লিখন,মৃদুলের আড্ডা জমে উঠেছে। দুজন জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। লিখনের নায়িকা তিন দিন আগে ঘাট থেকে পিছলে নদীতে পরে গেছে। সাঁতার জানে না তাই প্রচুর পানি খেয়েছে। সেই সাথে পা মচকে গেছে। কোমরেও ব্যথা পেয়েছে। এই কথা শুনে মৃদুল হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। পূর্ণা দূর থেকে কটমট করে মৃদুলের দিকে তাকিয়ে আছে। কত অসভ্য এই লোক! মানুষের আঘাতের কথা শুনে হাসে! তার গা জ্বলে যাচ্ছে মৃদুলের হা হা করে হাসা দেখে। লিখন আরো জানাল,সে এবং তার দল গত তিনদিন নায়িকা ছাড়া দৃশ্যগুলোর

শুটিং করেছে। বাকি যা দৃশ্য আছে সবকিছুতে নায়িকার উপস্থিতি থাকতেই হবে। তাই আপাতত শুটিং স্থগিত আছে। আশা করা যাচ্ছে, তিন-চার দিনের মধ্যে নায়িকা সুস্থ হয়ে যাবে। পূর্ণাকে দূরে বসে থাকতে দেখে লিখন ডাকল। পূর্ণা খুশিতে গদগদ হয়ে দৌড়ে আসে। ঘন্টা দুয়েক আগে একটু কথা হয়েছিল। আর হয়নি। লিখন প্রশ্ন করল,'ভেতরের অবস্থা কেমন? আমির হাওলাদার আগের চেয়ে কিছুটা ভালো অনুভব করছেন?'

'হু,ঘুমাচ্ছে দেখে এলাম। আপা আছে পাশে।'

'তোমার আপা পাশে থাকলে আর কী লাগে!' লিখনের কণ্ঠটা করুণ শোনায়। পূর্ণা প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,'ভাইয়া,আপনি কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাবেন। তখন বললাম, কিছুই বললেন না।'

'আচ্ছা,যাব।'

'প্রান্ত অনেক খুশি হবে।'

'প্রান্ত যেন কে?'

'আমার ভাই। ওইযে খুন-

'মনে পড়ছে। কী যেন নাম ছিল... মুন্না বা এরকম কিছু নাম ছিল না?'

'জি ভাইয়া।'

'সবাই কত বড় হয়ে গেছে। পড়াশোনা আর করোনি কেন?'

পূর্ণা বাম হাত চুলকাতে চুলকাতে বলল,'মেট্রিক ফেইল করাতে আর পড়তে ইচ্ছে করেনি।'

মৃদুল ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল,'তুমিও মেট্রিক ফেইল?'

পূর্ণা আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল,'কেন? আরো কেউ আছে এখানে?'

মৃদুল মুচকি হেসে চুল ঠিক করতে করতে চমৎকার করে বলল,'আমিও মেট্রিক ফেইল।'

মৃদুলের কথা শুনে লিখন সশব্দে হেসে উঠল। পূর্ণা সরু চোখে তাকিয়ে আছে মৃদুলের দিকে। মজা করলো নাকি সত্য বলল? লিখন ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে বলল,'মৃদুল মজা করছো নাকি সত্যি?'

মৃদুল গুরুতর ভঙ্গিতে বলল,'আচ্ছা,মিথ্যা কইতে যামু কেন? এতে আমার লাভডা কী?'

মৃদুলের ভঙ্গি দেখে লিখন চারপাশ কাঁপিয়ে হাসল। সাথে তাল মিলাল পূর্ণা ও মৃদুল। লিখন আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে। দেখতে কত ভালো দেখাচ্ছে। কী অপূর্ব মুখ। বলিষ্ঠ শরীর। পূর্ণা কেন জানি আজও মনে হচ্ছে,লিখনের পাশেই পদ্মজাকে মানায় বেশি। পরক্ষণেই পূর্ণা নিজেকে শাসাল,'চুপ থাক পূর্ণা! আমির ভাইয়ার মতো ভালো মানুষ দুটি নেই। আপার জন্য উনি সেরা।'

তবুও মন বুঝে না। হয়তো সৌন্দর্যের মিলটার জন্যই লিখন,পদ্মজা দুটি নাম তার ভাবনায় একসাথে জোড়া লেগে যায়। অথচ,বিবেক দিয়ে ভাবলে মনে হয় আমিরের জায়গা কেউ নিতে পারবে না। কেউ না। সে অনন্য।

হাসিখুশি মুহূর্ত উবে যায় খলিলের কর্কশ কণ্ঠে,'বেহায়া,বেলাজা ছেড়ি। পর পুরুষের সামনে কেমনে দাঁত মেলায়া হাসতাছে। ঘরে বাপ মা না থাকলে এমনই হয়। এই ছেড়ি ঘরে যাও।'

লিখন,মৃদুলের সামনে এভাবে কটু কথা শুনে পূর্ণা বুক ফেটে কান্না আসে। সে এক পলকে লিখন,মৃদুলকে দেখে আলগ ঘরের ভেতর চলে যায়। লিখন,মৃদুল হতভম্ব। খলিলের মাথায়,হাতে ব্যান্ডেজ। নাকের নিচে চামড়া উঠে গেছে,মাংস দেখা যাচ্ছে। তবুও তেজ কমে না। তিনি পূর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,'মা ডা মইরা যাওয়ার পর থেকে এই ছেড়ি দস্যি হইয়া গেছে। এত বড় ছেড়ি,বুড়া হইতাছে। বড় বইনে বিয়া দেয় না। কোনদিন কোন কাম ঘটায় আল্লায় জানে। তা লিখন দুপুরের খাবার খাইছো?'

লিখনের ইচ্ছে হচ্ছে না এই কুৎসিত ভাবনার লোকটার জবাব দিতে। যেহেতু সে এই বাড়ির অতিথি। তাই মনের কথা শুনতে পারল না। বলল,'জি না।'

মৃদুল খলিলকে উপেক্ষা করে আলগ ঘরে ঢুকে পড়ে। পূর্ণা আলগ ঘরের পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মৃদুল পিছনে এসে দাঁড়াল। কোমল স্বরে বলল,'খালুর কথায় কষ্ট পাইছো?'

পূর্ণা মৃদুলের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল,'আপনি কারো কষ্টের কথা ভাবেন দেখে ভালো লাগলো।'

'সবসময় ত্যাড়া কথা কেন কও? আমি যদি আগে জানতাম,তোমারে কালি কইলে তোমার এত্ত কষ্ট হয়। আমি কইতাম না।'

পূর্ণা তাকাল। পূর্ণার দৃষ্টি দেখে মৃদুলের মন কেমন করে উঠল। এ দৃষ্টির নাম বোধহয় 'মন কেমন করা দৃষ্টি'। পূর্ণা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল,'মাফ চাইছেন?'

মৃদুলের জোড়া ভ্রু কুঁচকে আসে। দুই পা পিছিয়ে যেয়ে বলে,'জীবনেও না।'

পদ্মজা ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো রান্নাঘরে ঢুকে ফরিনাকে বলল,'আম্মা,কী হয়েছে আপনার?'

ফরিনা প্রবল বিস্ময়ে জানতে চাইলেন,'কেন? কী হইব আমার?'

ফরিনার ব্যবহারে পদ্মজা খুব অবাক। সে কিঞ্চিৎ হা হয়ে তাকিয়ে রইল। ফরিনা নিশ্চিন্ত মনে চুলা থেকে পাতিল নামালেন। তারপর বললেন,'ও পদ্মজা,মগারে একটু কইবা লিখন,মৃদুলরে ডাইকা আনতে। লিখন ছেড়াডা কহন আইছে। এহনও খায় নাই।'

পদ্মজা আর ঘাঁটল না ফরিনাকে। সে বুঝে গেছে কোনো জবাব পাবে না। সদর ঘরে পার হতেই সদর দরজায় মৃদুল এবং লিখনের দেখা পেল। পদ্মজা চট করে আঁচল দিয়ে মাথা ঢেকে নিল। তারপর বলল,'আপনারা এখানে এসে বসুন। আম্মা,আপনাদেরই খোঁজ করছিলেন।'

কথা শেষ হতেই পদ্মজা সদর ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে চলে গেল। লিখন আবিষ্ট হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সেই পুরনো দিনের মতোই তার স্বপ্নের প্রেয়সী এক ছুটে পালিয়ে বেড়ায়। পার্থক্য শুধু এটাই,আগে লজ্জায় পালাত,এখন অস্বস্তিতে। লিখন গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পদ্মজাকে এক ঝলক দেখার জন্য এই বাড়িতে সে পা দিয়েছে। যাকে ভালোবাসে তার স্বামীর বাড়িতে আসা কতটা কষ্টের তা শুধু তার মতো অভাগারাই জানে। মৃদুল লিখনের দৃষ্টি খেয়াল করে কিছু একটা আন্দাজ করে বলল,'পদ্মজা ভাবিকে চিনেন?'

'চিনব না কেন-

লিখন থেমে গেল। সে নিজের অজান্তেই কী বলে দিচ্ছিল! হেসে বলল,' এতসব জেনে কী হবে? আসো গিয়ে বসি। তারপর বলো,কখনো প্রেমে পড়েছো?'

'না মনে হয়।' উদাসীন হয়ে বলল মৃদুল।

'নিশ্চিত হয়ে বলো।'

মৃদুল ভাবল। কোন নারীর প্রতি তার আকর্ষণ বেশি কাজ করেছে। উত্তর পেয়েও গেল। সকালেই সে পূর্ণার মধ্যে অদ্ভুত কিছু পেয়েছে। অজানা অনুভূতি অনুভব করেছে। এটা কী প্রেম? মৃদুল নিশ্চিত নয়। তাই সে বলল,'না,পড়ি নাই।'

'আচ্ছা,সেসব বাদ। বিয়ে করছো কবে সেটা বলো।'

'উমম,হুট করে একদিন। আমার ইচ্ছে,আমি হুট করে একদিন বিয়ে করে আম্মারে চমকে দেব।'

লিখন সশব্দে হাসল। বলল,'জানো মৃদুল,মানুষের সব চাওয়া পূরণ হয় না। প্রতিটি মানুষের জীবনের কোনো না কোনো পাশে অপূর্ণতা থাকে।'

'তাহলে বলছেন,আমার এই ইচ্ছে পূরণ হইব না?'

'না তা বলছি না। হুট করে বিয়ে করে ফেলা আর কেমন অসম্ভব কাজ? মেয়ে রাজি থাকলেই হলো। মেয়ে বেঁকে গেলে কিন্তু কিচ্ছা খতম।'

লিখন আবার সশব্দে হাসল। মৃদুলও অকারণে তাল মিলিয়ে হাসে আর ভাবে,একটা মানুষ এতো হাসতে পারে কীভাবে? এতো সুখী লিখন শাহ?

সে তো আর জানে না দুঃখীরা পাহাড় সমান কষ্ট লুকোয় হাসির আড়ালে।

আস্তে আস্তে বাড়ির সবাই আসে। আমির ছাড়া। রিদওয়ান, খলিল এত শান্তভাবে আছে যে মনেই হচ্ছে না সকালে এতো বড় ঘটনা ঘটে গেছে। বাড়ির মহিলারা দৌড়ে দৌড়ে খাবার পরিবেশন করছে। পদ্মজা খুব অবাক হয়ে প্রতিটি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করছে। লিখনও এতে কম অবাক হয়নি। কত শান্ত পরিবেশ! ঝগড়ার পর মান-অভিমান,তর্ক-বিতর্ক থাকে। সেসব কিছুই নেই। পদ্মজা সবার সামনে আলাদা প্লেটে খাবার নিয়ে ফরিনাকে বলল,'আম্মা,আমি উনার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছি। ঘুম ভেঙেছে হয়তো।'

পদ্মজা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছে। লিখন সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকে। পদ্মজার হাঁটার ছন্দ দৃপ্ত ও সাবলীল। মাথায় শাড়ির আঁচলে ঘোমটা টানা। স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। এই স্বামীটা কী সে হতে পারত না? এতোটাই অযোগ্য ছিল! অযোগ্য নাকি নিয়তির খেলা? কেন ভোলা যায় না এই নারীকে?

লিখনের বোন লিলি আর পদ্মজা একই ক্যাম্পাসের হওয়া সত্ত্বেও লিখন কখনো পদ্মজার সামনে এসে দাঁড়ায়নি। পদ্মজার অস্বস্তি হবে ভেবে। সে পদ্মজার চোখে ভালোবাসা দেখতে চায়,বিব্রতভাব বা অস্বস্তি দেখতে চায় না। এ যে বড় যন্ত্রণার। এতোদিনেও বুকের ভেতর কীভাবে পুষে আছে এক পাক্ষিক ভালোবাসা? কোনোভাবে কী এই ভালোবাসা পূর্ণতা পাবে! আসবে কী সেই সুদিন? লিখনের শুষ্ক চক্ষু সজল হয়ে উঠে। সে ভাবতে পারে না, পদ্মজা বিবাহিত! লিখনের সম্মূখ বরাবর মৃদুল ছিল। মৃদুল লিখনের প্রতিক্রিয়া দেখে অনেক কিছুই বুঝে নিল। নিশ্চিত হওয়া যাবে পূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করলে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে পূর্ণার সাথে কথা বলতে হবে। মৃদুল চারিদিকে চোখ বুলিয়ে পূর্ণাকে খোঁজে।

পদ্মজা আমিরকে ধরে ধরে বসাল। ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যথা। টিকে থাকা যাচ্ছে না। রাগে কিড়মিড় করছে এখনও। পদ্মজা শান্ত করে। তারপর খাইয়ে দিল। খাওয়া শেষে আমির ম্লান হেসে বলল,'লিখনের সাথে কথা হয়েছে?'

পদ্মজা নিষকম্প স্থির চোখে তাকাল,'উনার সাথে কেন কথা হতে যাবে আমার?'

'উনি তো তোমার জন্যই এসেছেন।'

'আপনাকে বলেছে? অন্য দরকারেও আসতে পারে।'

আমির হাসল। বলল,'সে আজও তোমাকে পছন্দ করে। আশা করে তুমি তার কাছে যাবে।'

'অসম্ভব। যা তা বলছেন। আপনি এসব বললে আমার খারাপ লাগে।'

পদ্মজা থামল। আমির মৃদু হাসছে। পদ্মজা আমিরের কোলে মাথা রেখে আদুরে কণ্ঠে বলল,'আপনি জানেন না আপনাকে কত ভালোবাসি আমি। আমি আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্তও ভাবতে পারি না।'

'তাহলে বাচ্চার জন্য বিয়ে করতে বলো কেন?'

'বন্ধ্যা নারীর কত যন্ত্রণা বুঝবেন না।'

' আমাদের একটা মেয়ে হয়েছিল।'

'আর হবে না,তাই বলি।'

'হবে,আল্লাহ চাইলে হবে। তাছাড়া আমার কাছে তো ফুটফুটে একটা বউই আছে। আর কী লাগে?'

পদ্মজা আমিরের কোল থেকে মাথা তুলে বসে। তারপর চিরুনি দিয়ে আমিরের চুল আঁচড়ে দিয়ে বলল,'চুলগুলো বড় হয়েছে অনেক।'

'হু,আচ্ছা এদিকে আসো।'

আমির পদ্মজাকে এক হাতে টান দিতে গিয়ে ঘাড়ে চাপ খেয়ে 'আহ' করে উঠল। পদ্মজা ব্যস্ত হয়ে পড়ে,'খুব লেগেছে? আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেন এমন করেন আপনি!'

চারপাশ অনেকটা ফর্সা হয়েছে। দুপুরের সূর্যটা একটু দেখা যাচ্ছে। তাও তেজ নেই। কিছুক্ষণ পর আবার ডুবেও যাবে। পূর্ণা লবণ দিয়ে টক বড়ই খাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে,অমৃত খাচ্ছে। মৃদুল পূর্ণার পাশে এসে বসল।পূর্ণা চমকে উঠে। মৃদুলকে দেখে বুকে থুথু দেয়। তারপর বাজখাঁই কণ্ঠে বলল,'হুট করে এভাবে কেউ আসে?'

'আর কথা কইও না। তোমারে সারা দুনিয়া খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছি। মাত্র মগা কইল,তুমি নাকি ছাদে।'

'কেন? আমাকে খুঁজছেন কেন?'

'এমনে খ্যাঁট খ্যাঁট কইরা কথা কইতাছ কেন? একটু ভালো কথা আহে না মুখ দিয়ে?'

পূর্ণা একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর হেসে বলল,'দুঃখিত। এবার বলুন কী দরকার।'

'ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতাম আর কী!'

'আমার ব্যক্তিগত কোনো তথ্য নেই।'

'তোমার না,তোমার বড় বইনের। পদ্মজা ভাবির।'

পূর্ণা উৎসুক হয়ে তাকাল। মৃদুল উশখুশ করতে করতে বলল,'পদ্মজা ভাবি আর লিখন ভাইয়ের মধ্যে কী কোনো সম্পর্ক ছিল?'

পূর্ণা জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে,মৃদুল কোনো ফালতু প্রশ্ন করেছে। এরপর নির্বিকার কণ্ঠে বলল,'না। তবে,লিখন ভাই আপারে পছন্দ করতো। আপার সাথে ভাইয়ার বিয়েটা কেমনে হইছে জানেন?'

'আমির ভাইয়ের কথা বলছো?'

'আমার আপার কী আর কোথাও বিয়ে হয়েছে?'

'সোজা উত্তর দিতে পারো না? তারপর বলো।'

'ওই ঘটনাটা না হলে হয়তো লিখন ভাইয়ের সাথেই আপার বিয়েটা হতো। কিন্তু হয়নি। এতটুকুই।'

'লিখন ভাইরে দেখলে মনে হয়,তাদের মধ্যে কোনো গভীর সম্পর্ক ছিল। তারপর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ভাই অনেক ভালোবাসতে পারে।'

'হু।' পূর্ণা বড়ই খাচ্ছে তৃপ্তি করে।

মৃদুল বিরক্তি নিয়ে অনেকক্ষণ পূর্ণার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। চারপাশ দেখে। পূর্ণা বাঁকা চোখে মৃদুলকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরখ করে নেয়। মৃদুলের উপস্থিতি তার হৃদ স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করে। কিন্তু তা প্রকাশ করার সাহস হয় না। পূর্ণা আরেকটা বড়ই হাতে নিল। তখন মৃদুল ডাকল,'বেয়াইন।'

পূর্ণা তাকায়। মৃদুল ঝুঁকে ছাদের মেঝেতে কিছু দেখছে। পূর্ণা উৎসুক হয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। মৃদুল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল,'রক্ত না?'

পূর্ণা মৃদুলের মতো ঝুঁকে ভালো করে খেয়াল করল। তারপর বিস্ফোরিত কণ্ঠে বলল,'তাই তো।'

'মানুষের রক্ত না পশুর রক্ত নিশ্চিত হইতাম কেমনে?'

'পশুর রক্ত এইখানে আসবে কেন?'

'মানুষের রক্তই কেন আসবে?'

'তাই তো।'

দুইজন চিন্তিত হয়ে ভাবতে থাকল। পূর্ণা বলল,'মনে হয় কোনো পাখি শিকার হয়েছে। আর রক্তাক্ত অবস্থায় এখানে এসে পড়েছে।'

'তাহলে মরা পাখিটা কই?'

'ধরুন,আহত হয়েছে কিন্তু মরেনি। এরপর চলে গেছে।'

সন্ধ্যারাত। জোনাকিপোকারা ছুটে বেড়াচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস। সেই বাতাসে পাতলা শার্ট পরে লিখন নারিকেল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। জোনাকি পোকা দেখছে। মাঝেমধ্যে অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে কাউকে চোখ দুটি খুঁজছে। সেদিন হেমলতা ফিরিয়ে দেয়ার পর সারা রাত বাড়ি ফেরেনি সে। ক্ষেতে বসেছিল। আকাশ কাঁপিয়ে কেঁদেছে। কেউ শুনেনি। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো কষ্ট দুটো নেই। স্বপ্নে সাজানো সংসার ভেঙে চুরমার হওয়ার দিন ছিল সেদিন। এক সময় ইচ্ছে হয়েছিল পদ্মজাকে তুলে নিয়ে পালাতে। কিন্তু বিবেক সাড়া দেয়নি। পরদিন সকালে উঠেই মা-বাবাকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। প্রতিটা মুহূর্তে আফসোস হয়,শুরুতে কেন হেমলতার কাছে প্রস্তাব দিতে পারল না সে! পরবর্তী কয়েকটা মাস ঘোরের মধ্যে কেটেছে। সিনেমা জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। এরপর জীবনের গতিটা স্বাভাবিক হয়েছে ঠিকই কিন্তু মন...মন তো ভেঙে গুড়িয়ে গেছে। আজও জোড়া লাগেনি। পদ্মজা কী কখনো জানবে,ঢাকায় কতবার পদ্মজার পিছু নিয়েছে সে। জানবে কী তার ভালোবাসার গভীরতা?

লিখন আনমনে হেসে উঠল। চোখে জল ঠোঁটে হাসি! এ হাসি সুখের নয়,যন্ত্রণার।

পূর্ণা অন্দরমহলে আসেনি। পদ্মজা ভীষণ রেগে আছে। আলগ ঘরের বারান্দায় সারাক্ষণ কী করে এই মেয়ে? এর আগেও যখন পারিজা তার পেটে ছিল। পূর্ণা এই বাড়িতে অনেকদিন ছিল। তখনও মাঝ রাত অবধি আলগ ঘরের বারান্দায় বসে থাকত। পদ্মজা শাল গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে আসে অন্দরমহল থেকে। সারাদিন পূর্ণার খোঁজ নেয়া হয়নি। এখন ধরে ঘরে নিয়ে যাবে। নির্জন,থমথমে পরিবেশ। তখন লিখনের কণ্ঠ ভেসে আসে,'পদ্মজা?'

পদ্মজা কণ্ঠটি শোনামাত্র ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠে। অপ্রতিভ হয়ে উঠে। একটা মানুষ কেন তাকে এত বছর মনে রাখবে? কেন অনুচিত আশা করে বসে থাকবে! পদ্মজার রাগ হয়,অস্বস্তি হয়। কষ্টও হয়। প্রার্থনা করে, এই

মানুষটার জীবনে কেউ আসুক। এসে তার জীবনটা কানায় কানায় পূর্ণ করে দিক। ভুলিয়ে দিক অতীত। পদ্মজা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,'এভাবে রাতের বেলা ডাকবেন না।'

পদ্মজা লিখনকে উপেক্ষা করে দুই পা এগিয়ে যায়।

'জীবন থেকে তো সরেই গিয়েছো। আমি তোমাকে বিব্রত করতে চাই না। তাই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সামনে আসিনি। আজ যখন এসেই পড়েছি কয়েক হাত দূরে থেকেই একটু কথা বললে কী খুব বড় দোষ হয়ে যাবে?'

লিখনের করুণ কণ্ঠ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে পদ্মজা। লিখন হাসল। সুরগুলি যেন ফিরে এসে প্রাণে মৃদুগুঞ্জন শুরু করে দিয়েছে। পদ্মজার উপস্থিতি এভাবে কাঁপন ধরাচ্ছে কেন! আজকের এই সময়টা সুন্দর, ভারি সুন্দর!

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা - ৫৩

কোনো সাড়া নেই। পদ্মজা পিছনে ফিরে তাকাল। লিখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে তার দিকে চেয়ে কী দেখছে! পদ্মজা আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। কাটা কাটা গলায় বলল,'কিছু বলার যখন নেই,আসি আমি।'

' ভুলে গেছো আমায়? মনে পড়ে না?' লিখনের কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

পদ্মজার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ,'না ভুলবার মতো কোনো সম্পর্ক কী আমাদের ছিল? ছিল না। আর এভাবে নির্জনে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। আপনি বুঝদার মানুষ,জ্ঞানী মানুষ। এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝবেন।'

লিখন ম্লান হেসে বলল,'আচ্ছা,আজ আসো।'

'একটা অনুরোধ ছিল।'

'কী?'

পদ্মজা ফের আবার তাকাল। সরাসরি লিখনের চোখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লিখনের বুক কেঁপে উঠে। সে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। পদ্মজা বলল,'নিজেকে এবার গুছিয়ে নিন। মরীচিকার পিছনে অনেক দৌড়েছেন,আর না। এবার নিজের জীবনটা নতুন করে সাজান। আপনার মনের জোর বাড়ান। মানুষ দ্বিতীয় প্রেমেও পড়ে। দ্বিতীয় বার কাউকে ভালোবাসে। মনপ্রাণ উজাড় করে ভালোবাসে। আপনি চেষ্টা করুন। আপনিও পারবেন। কেউ না কেউ আপনার জন্য অবশ্যই আছে।'

'পদ্ম ফুল।'

পদ্মজা একটু সময়ের জন্য হলেও থমকায়। লিখন বলল,'এভাবেই ভালো আছি আমি। তুমিও এভাবেই সারাজীবন ভালো থেকো।'

পদ্মজা কী প্রতিক্রিয়া দিবে বুঝে উঠতে পারছে না। এই লিখন শাহ তো এক ধ্যানেই পড়ে আছে। সে আর কথা বাড়াল না। যে বুঝেও বুঝতে চায় না,তাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। সে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বলল,'শুভ রাত্রি।'

লিখন পদ্মজার যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকে। তার অশ্রুসজল চাহনি। তবে বুকে প্রশান্তি। জীবনের খরতাপ দহনে মায়াময় পদ্মজার কণ্ঠ,একটু দেওয়া সময় তার বুকে প্রশান্তির ঢেউ তুলেছে। এই...এইটুকু সময়ের স্মৃতি নিয়েই কয়েকটা রাত আরামে ঘুমানো যাবে। সে বিড়বিড় করল,'আমি মানতে পারি না তুমি অন্য কারো। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

শেষের শব্দ তিনটে ঘোর লাগা কণ্ঠে ভেঙে ভেঙে বলল।

পূর্ণাকে ঘরে এনে পদ্মজা ধমকে বলল,'এই ঠান্ডার মধ্যে সোয়েটার না পরে কীভাবে থাকিস? বাইরে বাতাসও হচ্ছে। আমার কোনো কথাবার্তাই কী শুনবি না?'

পূর্ণা অপরাধী স্বরে বলল,'আর হবে না আপা। আগামীকাল সন্ধ্যার আযানের সাথে সাথে ঘরে চলে আসব।'

'জি, না। বিকেল থেকেই ঘরে থাকবেন। এমনিতেই এই বাড়ির অবস্থা ভালো না। তুই দুই দিন পর বাড়িতে চলে যাবি।'

'তুমি যাবে না?'

পদ্মজা আনমনে কিছু ভাবল। তারপর বলল,'যাব। কয়দিন পর। আচ্ছা,শোন রাতে টয়লেটে যেতে ভয় পেলে আমাকে ডাকবি। চেপে রাখবি না।'

'আচ্ছা।'

পূর্ণা খুক খুক করে কাশতে থাকল। পদ্মজা বিচলিত হয়ে বলল,'কাশিও হয়ে গেছে! কত ঠান্ডা বাঁধিয়েছিস। জ্বরও আছে নাকি দেখি।'

পদ্মজা পূর্ণার কপাল ছুঁয়ে তাপমাত্রা অনুমান করে বলল,'আছেই তো। তুই কী নিজের যত্ন নেয়া শিখবি না? সারাদিন নতুন শাড়ি পরে, সাজগোজ করে ঘুরে বেড়ালেই নিজের যত্ন নেয়া হয়ে যায়? স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে তো।'

পূর্ণা বাধ্য মেয়ের মতো বলল,'আচ্ছা,নেব।'

'তা তো সবসময় বলিস। তুই বস, আমি কুসুম গরম পানি নিয়ে আসছি। গড়গড়া কুলি করে এরপর ঘুমাবি।'

'আপা-

'তুই চুপ থাক। চুপচাপ লেপের ভেতর শুয়ে থাক। আমি আসছি।'

পদ্মজা রান্নাঘরে এসে দেখে বালতিতে পানি নেই। বাড়ির সবাই যার যার ঘরে আছে। হয়তো ঘুমিয়েও গেছে। আমির তো সেই কখন ঘুমিয়েছে। পদ্মজা ছোট বালতি হাতে নিয়ে কলপাড়ে আসে। চারিদিক নির্জন,থমথমে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। পদ্মজা আশেপাশে চোখ ঘুরিয়ে নিল। ঝাপসা আলোয় পুরো বাড়িটাকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। যদিও এই বাড়িতে সবসময়ই রহস্য বিদ্যমান! পদ্মজা বালতি রেখে,কল চাপতে যাবে তখনই কানে একটা ঝনঝন শব্দ আসে। স্টিলের কিছু কাছে কোথাও পড়েছে। পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। কান খাড়া করে বুঝতে পারল শব্দটা রানির ঘর থেকে আসছে। রানি আপার কোনো বিপদ হলো না তো? পদ্মজা ছুটে আসে রানির ঘরের সামনে। কানে ক্রোধ মেশানো চাপা কণ্ঠ ভেসে আসে,'তোমার লগে কয়বার হুতছি বইললা ভাইবো না সবসময় হুইতে দিয়াম। মাডিতে যেভাবে এতদিন ছিলা,আজও থাকবা। বিছানাত উঠার জন্য গাঁইগুঁই করবা না।'

'মাডিত অনেক ঠান্ডা লাগে। আমারে এক কোণাত জায়গা দেও।'

'তুমি মাডিত থাকবা মানে মাডিত থাকবা। কামলা হইয়া মালিকের ছেড়ির লগে হুইবার সাহস আর করবা না।'

'আমি বিছানাত ঘুমাইয়াম। তুমি আমার বউ লাগো।'

'তুমি মাডিত ঘুমাইবা। আমি তোমারে জামাই মানি না।'

'দেহো রানি-

এরপরই একটা আর্তচিৎকার ভেসে আসে। রানি-মদন তর্ক করছে। নিশ্চয় রানি মদনকে ধাক্কা দিয়েছে। আর মদন ব্যথা পেয়েছে। পদ্মজা একবার ভাবল,দরজায় কড়া নাড়বে। এরপর ভাবল,স্বামী-স্ত্রীর অনেক কথা সে শুনে ফেলেছে। আর না শোনাই ভালো। যেহেতু তারা কারো সামনে ঝগড়া করে না,রাতে নিজ ঘরে সবার অগোচরে ঝগড়া করে। তাহলে ব্যপারটা ব্যক্তিগত। পদ্মজা সরে আসে। তবে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। এই দাম্পত্য সংসারে কী ভালোবাসা, সুখ আসবে না? মদন তো দেখতে খারাপ না। শুধু এতিম আর এই বাড়ির একজন বাধ্য ভৃত্য। এ ছাড়া তো ভীষণ সহজ-সরল। সবার সাথে হেসেখেলে কথা বলে। ঠোঁটে হাসি সবসময় থাকে।

লিখন, মৃদুল একই ঘরে একই বিছানায় শুয়েছে। লিখনের জন্য আলাদা ঘর ছিল। কিন্তু সে মৃদুলের সাথেই শুয়েছে। ছেলেটাকে খুব ভালো লেগেছে তার। সোজাসুজি কথা বলে। মনে কিছু চেপে রাখতে পারে না। এতক্ষণ বকবক করেছে। সবেমাত্র অন্যপাশে ফিরে চোখ বুজেছে। বোধহয় ঘুম পেয়েছে। লিখনের মনটা আনচান আনচান করছে। ইচ্ছে হচ্ছে,পদ্মজাকে দেখতে। একসাথে বসে গল্প করতে। কিন্তু এ তো সম্ভব নয়। এই বাড়িতে আর আসা যাবে না। পদ্মজার সামনে এলেই মন বেপরোয়া হয়ে যায়। কত-শত ইচ্ছে জেগে উঠে। লিখনের ব্যাক্তিত্ব ভীষণ শক্ত। শুধু এই একটা জায়গাতেই সে দূর্বল। এভাবে চলতে পারে না। নিজের জায়গায় নিজেকে শক্ত থাকতে হবে। লিখন জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল। মৃদুল ফিরে তাকাল। বলল,'ভাইয়ের ঘুম পাইতাছে না?'

'হু। তুমি ঘুমাও।'

মৃদুল মেরুদণ্ড সোজা করে শুয়ে বলল,'আপনি -

'আপনি না তুমি। একটু আগেই না আমাদের কথা হলো। তুমি আমাকে তুমি বলবে।'

মৃদুল হাসল। বলল,'তুমি যে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছো,সে মেয়েটা পদ্মজা ভাবি। তাই না?'

লিখন অপ্রস্তুত হয়ে উঠল। পদ্মজা যে বাড়ির বউ সে বাড়ির আত্মীয়র সাথে এসব নিয়ে কথা বলাটা নিশ্চয় অনুচিত! এতে পদ্মজার অসম্মান হবে। সে তো চায় না,পদ্মজা কষ্ট পাক। তাকে নিয়ে কেউ দুই লাইন বেশি

ভাবুক। পদ্মজা সবসময় ভালো থাকুক। লিখন জোরপূর্বক হাসল। তারপর বলল,'কী বলছো! তেমন কিছুই না। ঘুমাও এখন। আমারও অনেক ঘুম পাচ্ছে।'

লিখন অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে পড়ে। মৃদুল হতাশ হয়ে চোখ বুজে।

পদ্মজা অন্ধকারে ধীরে ধীরে হাঁটছে। হাতে কাঁচের গ্লাস। তাতে কুসুম গরম পানি। সিঁড়িতে পা রাখতেই কারো পায়ের আওয়াজ কানে আসে। পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে,আলমগীর চোরের মতো চারপাশ দেখে দেখে সদর দরজার দিকে যাচ্ছে। পদ্মজা দ্রুত সিঁড়ি থেকে নেমে চেয়ারের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। গ্লাস রেখে দেয় এক পাশে। তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ হয়ে আলমগীরকে পরখ করছে। আলমগীরের পরনে পাঞ্জাবি। বাড়িতে ভদ্রলোকের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। শান্তশিষ্ট,চুপচাপ। মাঝেমধ্যে ঢাকা যায়। দেখা হয়,তবে কথা হয় না। কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়। নিজ ইচ্ছায় কথা বলে না। আলমগীর সদর দরজা পেরিয়ে যায়। পদ্মজা সাবধানে আলমগীরের পিছু নেয়। পায়ের জুতাগুলো হাঁটার তালে মৃদু শব্দ তুলছে। তাই পদ্মজা জুতাজোড়া খুলে দরজার পাশে রেখে দিল। আলমগীর অন্দরমহলের ডান দিকে এগোচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক চারিদিকে। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকছে। গা ছমছমে পরিবেশ। এদিকওদিক কোনো মৃদু শব্দ হতেই পদ্মজা উৎকর্ণ হয়ে উঠছে। কেমন গা কাটা দিচ্ছে। এতো রাতে দীর্ঘদেহী এই লোক যাচ্ছে কোথায়? হাঁটতে হাঁটতে তারা বাড়ির পিছনে চলে আসে। আলমগীর অন্দরমহলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে এটাই তার গন্তব্য। পদ্মজা কলাগাছের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। বাতাসে গা কাঁপুনি দিচ্ছে। আলমগীর টর্চ জ্বালিয়ে চারপাশ দেখে নিল। তারপর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করল। মনে হচ্ছে,কাউকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। পদ্মজার রগে রগে দামামা শুরু হয়। কী হতে চলেছে? আজ সে কী দেখবে?

পূর্ণা বিরক্ত হয়ে শোয়া থেকে উঠে বসে। এতক্ষণ হয়ে গেল তার আপা আসছে না কেন? সে জুতা পরে বেরিয়ে আসে। নেমে আসে নিচ তলায়। রান্নাঘরে যাওয়ার পথে পায়ে কাঁচের গ্লাস লেগে পড়ে যায়। পূর্ণা ভয় পেয়ে যায়। এখানে গ্লাস কে রাখল! আংশিক পানি তার পায়ে লাগে। মনে হচ্ছে, পানিটা গরম। এই রাতের বেলা গরম পানি এখানে...কীভাবে? পূর্ণা ভাবে, তার আপার পানি গরম করার কথা ছিল। কিন্তু গরম করে এখানে কেন রাখবে? ঘরে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। পূর্ণা রান্নাঘরে এসে দেখে পদ্মজা নেই। সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দরজার পাশে পদ্মজার জুতা দেখে ভয়টা আরো বেড়ে যায়। সে দৌড়ে আমিরের ঘরে গেল। গিয়ে দেখল,আমির ঘুমাচ্ছে। পদ্মজা নেই। পূর্ণা এবার ঘামতে থাকল। সে শুনেছে,এই বাড়িতে ভূত-জ্বীন আছে। এরা মানুষের ক্ষতি করে। বিশেষ করে সুন্দর মানুষদের। তার মানে তার আপার গুরুতর বিপদ! পূর্ণা এক দৌড়ে রান্নাঘরে আসে।

লণ্ঠন জ্বালিয়ে নেয়। অন্যসময় হলে ভয় কাজ করত। আজ করছে না। সে তার আপাকে জান দিয়ে হলেও বাঁচাবে। মনে হয়,কোনো শয়তান জ্বীন তার বোনকে ধরেছে এবং পুকুরপাড়ে নিয়ে গেছে। পূর্ণা ঝটপট বেরিয়ে পড়ে। কাউকে ডাকার বুদ্ধি অবধি মাথায় আসেনি। সে আতঙ্কে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। আয়তুল কুরসি পড়তে পড়তে পুকুরপাড়ের পথ ধরে।

পদ্মজাকে চমকে দিয়ে তৃতীয় তলার একটা জানালা হাট করে খুলে যায়। সেখান থেকে একটা মোটা দড়ি আলমগীরের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। পদ্মজার ওষ্ঠদ্বয় নিজেদের শক্তিতে আলাদা হয়ে যায়। দুই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। আলমগীর সেই দড়ি বেয়ে তৃতীয় তলায় উঠে যায়। দড়ি বেয়ে উপরে উঠার দ্রুততা দেখে মনে হলো,এর আগে বহুবার আলমগীর দড়ি বেয়ে উপরে উঠেছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে পড়ে। জানালা দিয়ে আলমগীর কার ঘরে গিয়েছে? তৃতীয় তলায় সে একবার গিয়েছে তাই জানেও না কোন ঘরে কী আছে। পায়ের গোড়ালিতে ঠান্ডা শিরশিরে অনুভব হচ্ছে। পদ্মজা এক হাত দিয়ে ছুঁতেই বুঝতে পারে জোঁকে ধরেছে। জোঁকে তার খুব ভয় আছে। কিন্তু এখন ভয় করছে না। এখন তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে অন্যকাজে। সে জোঁক ছাড়িয়ে নিল। অনেকক্ষণ পার হয়ে যায় আলমগীরের দেখা নেই। দড়ি তো ঝুলছে। মানে নামবে আবার। পদ্মজা কোমরে এক হাত রেখে তাকিয়ে রইল। আচমকা মনে পড়ে,তৃতীয় তলায় রুম্পা আছে। ডান দিকের কোনো এক ঘরে। আর আলমগীর ডান দিকের কোনো ঘরের জানালা দিয়েই ঢুকেছে। মানে কী রুম্পার কাছে গিয়েছে? পদ্মজা বারংবার শুধু চমকাচ্ছে। আলমগীর দড়ি বেয়ে নেমে পড়ে। তারপর ইশারায় অন্য কাউকে নামতে বলে। কাঙ্ক্ষিত সেই মুখটি দেখে পদ্মজার পিল চমকে উঠে। রুম্পা! শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে দড়ি বেয়ে নামছে। বার বার দড়ি থেকে হাত ছুটে যাচ্ছে। আলমগীর দুই হাত বাড়িয়ে রেখেছেন যাতে রুম্পা পড়ে গেলে তিনি ধরতে পারেন। পদ্মজার বুক দুরুদুরু করছে,যদি রুম্পা পড়ে যায়! এতো ঝুঁকি কেন নিয়েছে?

রুম্পার পা মাটিতে পড়তেই আলমগীর শক্ত করে রুম্পাকে জড়িয়ে ধরে। রুম্পার কান্নার সুর ভেসে আসে। তাৎক্ষণিক আলমগীর রুম্পার মুখ চেপে ধরে কিছু বলল। তারপর টর্চের আলো দিয়ে চারপাশ দেখে, রুম্পাকে এক হাতে শক্ত করে ধরে হাঁটা শুরু করল। তখন কোত্থেকে উদয় হয় একজন অদ্ভুত লোকের। লোকটা কালো,মোটা,লম্বা চুল। এক হাতে রাম দা, অন্য হাতে লাঠি। অজানা বিপদের আশঙ্কা পেয়ে পদ্মজার ভয় হলো। পা থেকে কিছুটা দূরে থাকা কয়েকটা পাথরের মধ্যে বড়সড় দেখে একটা পাথর হাতে নিল। যেন বিপদে কাজে লাগানো যায়। আলমগীর আর অজ্ঞাত লোকটির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়। একসময় তা হাতাহাতিতে চলে যায়। রুম্পা ভয়ে জুবুথুবু হয়ে গেছে। অজ্ঞাত লোকটি রুম্পাকে ধরতে চাইছে। কিন্তু আলমগীর তা হতে দিচ্ছে না। পদ্মজার মনে হচ্ছে,এখন তার সামনে যাওয়া উচিত। আল্লাহর নাম নিয়ে সে কলাগাছের পেছন থেকে বেরিয়ে

আসে। আলমগীর অজ্ঞাত লোকটির হাত থেকে রামদা নিয়ে দূরে ফেলে দিল। তখনই সে পদ্মজাকে দেখতে পেল। চেঁচিয়ে উঠে বলল,'বোন,সাহায্য করো।'

অজ্ঞাত লোকটি পদ্মজাকে দেখে আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠল। সে ছুটে এসে ছোঁ মেরে রুম্পাকে ধরতে চাইল। আলমগীর অজ্ঞাত লোকটির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুই হাতে ঝাপটে ধরে রেখে রুম্পাকে বলে,'তুমি যাও রুম্পা।'

রুম্পা দৌড়ে পদ্মজার কাছে আসে। সে হাঁপড়ের মতো হাঁপাচ্ছে। ভয়ে ঘামছে। আলমগীর অজ্ঞাত লোকটিকে আটকে রাখতে পারছে না। সে অনেক কষ্টে অনুরোধ করে,'আমার রুম্পারে ওরা মেরে ফেলবে। তুমি ওরে খালপাড়ে নিয়ে যাও বোন। আমি আজীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকব।'

পদ্মজা দুই হাতে আঁকড়ে ধরে রুম্পাকে। আলমগীরের হাত থেকে পড়ে যাওয়া টর্চের আলো অজ্ঞাত লোকটির মুখে পড়তেই পদ্মজার খুব চেনা মনে হয়। আবার পারিজার খুনির বর্ণনাও ঠিক এমনই। ভাবতেই, পদ্মজার রক্ত ছলকে উঠে। সেই মুহূর্তে মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে আবির্ভাব ঘটে পূর্ণার। সে পুকুরপাড়ে যাচ্ছিল। টর্চের আলো পেয়ে সে এদিকে ছুটে এসেছে। অজ্ঞাত লোকটি রুম্পার উদ্দেশ্যে হাতের লাঠি ছুঁড়ে মারে। পদ্মজা দ্রুত রুম্পাকে নিয়ে সরে যায়। লাঠি গিয়ে সোজা পূর্ণার কাঁধে পড়ে। সে আপা বলে আর্তনাদ করে বসে পড়ে। পদ্মজা দিকদিশা হারিয়ে ফেলে। কী করবে সে? মনে হচ্ছে রুম্পাকে কেউ খুন করতে চাইছে তাই আলমগীর তাকে নিয়ে পালাচ্ছে। আর এই নাম না জানা লোক,রুম্পাকে আঘাত করতে চাইছে। আবার পূর্ণাও আঘাত পেয়েছে। কী করবে পদ্মজা? রুম্পাকে নিয়ে খালের দিকে যাবে? পূর্ণাকে এই ভয়ংকর পরিবেশ থেকে নিরাপদে নিয়ে যাবে? নাকি পারিজার খুনিকে ধরবে?

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা - ৫৪

থেকে থেকে দূরে হুতুম প্যাঁচা ডাকছে। যা ভুতুড়ে শোনাচ্ছে। গা কাঁপুনি ঠান্ডা। সময়টা যেন থমকে দাঁড়িয়ে চড়ছে দণ্ড শূলে। পদ্মজা ছুটে আসে পূর্ণার কাছে। পূর্ণা উবু হয়ে শুয়ে পড়েছে। কাঁদছে মা,মা করে। পদ্মজা এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে রুম্পাকে। আরেক হাতে পূর্ণার কাঁধে ছুঁয়ে দেখল কোথায় আঘাত পেয়েছে। ঠান্ডায় তার ঠোঁট কাঁপছে। কানে ভেসে আসছে দুজন পুরুষের ধস্তাধস্তির দুপদাপ শব্দ। পদ্মজার ঠান্ডা হাতে পূর্ণার আহত

স্থানের রক্ত লাগতেই সে আঁতকে উঠল। রুম্পাকে ছেড়ে পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরল। পাশে তাকিয়ে দেখল,যে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে সে লাঠির আগায় কাঁচি বাঁধা। পূর্ণার ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পূর্ণার পুরো শরীর। আলমগীর অজ্ঞাত লোকটির সাথে আর পারছে না। সে আকুতি, মিনতি করে পদ্মজাকে বলছে,'পদ্মজা,পদ্মজা, বোন সহায় হও।'

টানাপোড়নে পদ্মজার হাত পা কাঁপতে থাকল। সে পূর্ণাকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। পূর্ণা কিছুতেই উঠতে পারছে না। যন্ত্রনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে সে। পূর্ণার কান্না দেখে পদ্মজার বুক ব্যথায় বিষে যাচ্ছে। এই রাত, রাতের আঁধার এতো পাষাণ কেন হলো! আলমগীরের আর্তনাদ ভেসে আসে। পদ্মজা চমকে ফিরে তাকাল। অজ্ঞাত লোকটি আলমগীরের স্পর্শকাতর স্থানে অস্বাভাবিকভাবে আঘাত করেছে। ফলে সে দূর্বল হয়ে আর্তনাদ করে উবু হয়ে ছটফট করছে। অজ্ঞাত লোকটি দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে ছুটে এসে রুম্পাকে ধরতে চাইল। পদ্মজা বাধা হয়ে দাঁড়াল। অজ্ঞাত লোকটি কর্কশ কণ্ঠে পদ্মজাকে হুংকার দিল,'আমার কাম আমারে করতে দে।'

একটা মানুষের কণ্ঠস্বর এতো ভয়ংকর কী করে হয়! এই কণ্ঠস্বর যে কাউকে কাঁপিয়ে তুলবে। পদ্মজা কিঞ্চিৎ চমকালেও থেমে থাকল না। উত্তরে হাওয়ায় তার চুল এলোমেলো হয়ে উড়ছে। সে অজ্ঞাত লোকটির মতোই হুংকার দিয়ে বলল,'নিজের ভালো চান তো আত্মসমর্পণ করুন।।

পদ্মজার কথা শুনে লোকটি ব্যঙ্গ করে হাসল। খুব কাছ থেকে অজ্ঞাত লোকটির মুখ দেখে পদ্মজা কপাল কুঁচকে ফেলল। লোকটির মুখ থেকে বিশ্রি একটা দূর্গন্ধ আসছে। স্বাস্থ্যবান দেহ,গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। সাদা দাঁতকপাটি আর লাল ভয়ংকর চোখ দুটিই আগে নজর কাড়ছে। পদ্মজা কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই অজ্ঞাত লোকটি পদ্মজাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। এরপর লাঠি হাতে তুলে নিল। রুম্পা ছুটে পালাতে চাইল। কিন্তু পারল না। অজ্ঞাত লোকটি তার গলা চেপে ধরল।

পদ্মজা দৌড়ে এসে অজ্ঞাত লোকটির পিঠে কিল ঘুষি দিল। তাও কাজ হলো না। পদ্মজার গায়ের শক্তি লোকটিকে এক চুলও নাড়াতে পারেনি। রুম্পা গোঙাচ্ছে। পূর্ণা যন্ত্রনায় কাঁদছে,ভয়ে জুবুথুবু হয়ে আছে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। নিশাচর পাখিরা আজ যেন অদ্ভুত স্বরে ডাকাডাকি করছে। কেমন গা কাঁপিয়ে তোলা! ঝিঁঝিঁপোকাদের ডাক বেড়েছে,কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে বাতাসের বেগ।

অজ্ঞাত লোকটির হিংস্র থাবা রুম্পাকে গ্রাস করে নিয়েছে। লোকটি পা দিয়ে মাটি থেকে লাঠি তুলল। তারপর লাঠির আগা থেকে কাঁচি হাতে নিল।

আর একটু ক্ষণ তাহলেই সেই ধারালো কাঁচি রুম্পার গলার রগ টেনে নিবে। উড়ে যাবে রুম্পার রুহ। আলমগীর নিজের যন্ত্রণা ভুলে ছুটে আসে তার সহধর্মিণীর প্রাণ বাঁচাতে। তার আগেই ঘটে যায় ভয়ংকর এক দৃশ্য। পদ্মজা অজ্ঞাত লোকটির পড়ে থাকা রামদা তুলে তার পিঠেই কোপ বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত লোকটি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ফলে রাম দা আরো গভীরে প্রবেশ করে। গরু জবাইয়ের পর গরু যেভাবে কাতরায় অজ্ঞাত লোকটি সেভাবে কাতরাতে থাকল। রক্ত ছিটকে পড়ে পদ্মজার শাড়িতে,মুখমণ্ডলে। কাতরাতে থাকা দেহটি ডিঙিয়ে আলমগীর রুম্পার কাছে যায়। তারপর পদ্মজার দিকে তাকাল। পদ্মজার বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে। চোখে যেন ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায় দেহটি। নিস্তেজ হয়ে পড়ে পদ্মজাও। সে এলোমেলো পায়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। তার শরীর কিঞ্চিৎ কাঁপছে। এটা সে কী করেছে! এ যে অচিন্তনীয় কাজ! সব এলোমেলো লাগছে। মাথা ভনভন করে ঘুরছে। গা গুলিয়ে উঠছে।

পূর্ণা এই দৃশ্য দেখে নিজের রক্তক্ষরণ ভুলে যায়। ভয়ে কাঁপতে থাকে। নাভি উল্টে বমি বেরিয়ে আসে। আলমগীর তাড়াহুড়ো করে পদ্মজার পাশে এসে দাঁড়াল। পদ্মজার বুকে বইছে অপ্রতিরোধ্য তুফান! সে নিষকম্প চোখে তাকিয়ে আছে নিথর দেহটির দিকে। আলমগীর একটা চাবি পদ্মজার হাতে গুঁজে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলল,'ভয় পেয়ো না। এই বাড়িতে দিন দুপুরে খুন হলেও তা বাইরের কেউ জানবে না। সকালে উঠে দেখবে এখানে বাবলুর লাশও নেই রক্তও নেই। কেউ না কেউ সরিয়ে দিবে। সব দুঃস্বপ্ন মনে হবে। দ্রুত ঘরে ফিরে যাও। আমার অনেক কথা বলার আছে। আমি চিঠি লিখব। তোমার বাপের বাড়ির ঠিকানায়। আসছি।'

রুম্পা দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরল। তার বুকটা হাহাকার করছে। পদ্মজার কথা খুব মনে পড়বে। আলমগীর অস্থির হয়ে চারিদিক দেখছে। আতঙ্কে সে কাঁপছে। এই বুঝি কেউ এসে গেলো। আর রুম্পাকে আবার বন্দি করে দিল। এমন অশান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আতঙ্কে যেকোনো মুহূর্তে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। রুম্পা পদ্মজাকে কিছু বলতে চেয়েছিল,আলমগীর বলতে দিল না। তার আগেই টেনে নিয়ে দৌড়াতে থাকল। পদ্মজা তাদের যাওয়ার পানে চেয়ে থাকল। ঝিঁঝিঁপোকাদের আলোর ভীড়ে দুজন হারিয়ে যাচ্ছে। তারা বাঁচার আশায় দৌড়াচ্ছে। না হওয়া সংসার পাতার স্বপ পূরণ করতে দৌড়াচ্ছে। দুজন আড়াল হয়ে যেতেই পদ্মজা দুই হাতে নিজের মুখ ছুঁলো। এরপর দুই হাত সামনে এনে দেখল,টকটকে লাল রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে সে বমি করতে থাকল। তারপরপরই সম্বিৎ ফিরল। সে পূর্ণাকে খুঁজতে থাকল। একটু দূরে পূর্ণা ঘাসের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। পদ্মজা দৌড়ে আসে। পূর্ণা পিটপিট করে তাকায়। পূর্ণাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করানোর চেষ্টা

করে। একুশ বছর বয়সী একটা মেয়ের শরীর তো কম ভারি নয়। পদ্মজার শক্তিতে কুলোচ্ছে না। সে পূর্ণাকে আকুতি করে বলল,'উঠার চেষ্টা কর বোন।'

পূর্ণার শরীরে ভূমিকম্প বয়ে যাচ্ছে। সে পুরো ভর পদ্মজার উপর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। পদ্মজা শরীরের পুরোটা শক্তি দিয়ে পূর্ণাকে আগলে ধরে সামনে হাঁটা শুরু করে। পদ্মজার পা জোড়া ঠকঠক করে কাঁপছে। সে জানে না এটা শীতের কাঁপুনি নাকি ভয়ংকর কোনো কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার উত্তেজনা। মনে হচ্ছে যেন ভয়ংকর একটা ঝড় হুট করে শুরু হয়ে হুট করে থেমে গেছে। আর রেখে গেছে নিঃশ্বাস থামিয়ে দেওয়া নিস্তব্ধতা। পদ্মজা ঘামছে, কাঁপছে। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে,এই বুঝি মৃত বাবলু উঠে দাঁড়াল। অনেক অনেক প্রেতাত্মা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই বোনের উপর!

জঙ্গলের গাছপালা থেকে প্যাঁচাদের দল তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে,সদ্য খুন হওয়া একটা মৃত দেহ পড়ে আছে ঘাসের উপর। আরেকটু দূরে ছিমছাম গঠনের শাড়ি পরা একটা মেয়ে চুল খোলা রেখে এলোমেলো পায়ে আরেকটা দূর্বল দেহকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির ভেতর! দুজনের গায়ে তাজা লাল রক্ত। এই দৃশ্য তো রাতের আঁধারের চেয়েও ভয়ংকর! যার স্বাক্ষী হয়ে রইল রাতের আঁধার আর নিশাচর পাখিরা।

প্রতিদিনের মতোই ভোরের আলো নিকষকালো রাতকে ঠেলে দূরে সরিয়ে পৃথিবীটাকে আলোকিত করে তুলেছে। পাখিরা কিচিরমিচির করে ডাকছে। নতুন করে শুরু হয়েছে আরেকটা দিন। শুধু পদ্মজার সময়টা থমকে গেছে। সে তার গোসলখানায় বসে আছে। কনকনে ঠান্ডায় গোসল করেছে। এরপর থেকেই উদাসীন হয়ে ভেজাকাপড়ে বসে আছে। পূর্ণা অন্য ঘরে ঘুমাচ্ছে। পদ্মজা রাতে ধীরেসুস্থে পূর্ণার ক্ষত সামলেছে। বুঝতে দেয়নি,সে মনে মনে কতোটা ভেঙে পড়েছে। যখন রাতে তারা দুই বোন দুই তলায় উঠছিল,তখন পিছনে কেউ যেন ছিল! এতো চিৎকার, চেঁচামিচি হয়েছে আর কেউ শুনেনি? অন্দরমহলের রিদওয়ান এবং মজিদের ঘরের মানুষদের তো শোনার কথা ছিল। কারণ তাদের ঘর ডান দিকে,আর ডান দিকেই এতো বড় ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে। পূর্ণা জোরে জোরে কেঁদেছে,আলমগীর চেঁচিয়েছে। বাবলু নামের সেই লোকটি খুন হওয়ার সময় আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার করেছিল। দুপদাপ শব্দ তুলে কাতরেছিল। তবুও কেউ আসেনি! কেন? তার কেন মনে হচ্ছে,সবাই শুনেছে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। পদ্মজার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে আসে। সবকিছু কেমন ওলটপালট লাগছে। কাউকে খুন করার মতো সাহস কী করে হলো? এ কী মা হেমলতার গুণ! পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। চোখ পড়ে আলমগীরের দেয়া চাবিটার দিকে। চাবিটা দেখতে অনেক বড়। সে অপলক চোখে চাবির দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমির ঘুম থেকে উঠে পদ্মজাকে দেখতে না পেয়ে গোসলখানায় উঁকি দিয়ে পদ্মজাকে দেখে সে চমকে উঠল। পদ্মজার শাড়ি হাঁটু অবধি তোলা। আঁচল বুকে নেই। চুল এলোমেলো। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। থেমে থেমে কাঁপছে। তাতেও পদ্মজার ভ্রুক্ষেপ নেই। আমির হন্তদন্ত হয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করল। পদ্মজার দুই বাহু দুই হাতে চেপে ধরে উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল, 'পদ্মবতী, কী হয়েছে? এ কী অবস্থা তোমার।'

পদ্মজা কিছু বলল না। সে আমিরের চোখের দিকে নিজের চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল। আমির দ্বিগুণ বিচলিত হয়ে বলল,'এই পদ্ম, তুমি কাঁপছো তো। কী হয়েছে?'

পদ্মজার ঠোঁট দুটি ভেঙ্গে আসে। আর চোখ ছাপিয়ে জল। আমির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা আচমকা আমিরকে জড়িয়ে ধরল। আমিরের পুরো শরীর মুহূর্তে ঠান্ডা বরফ হয়ে যায়। পদ্মজা বাঁধভাঙা নদীর মতো হু হু করে কাঁদতে থাকল। আমির শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল,'বলো না কী হয়েছে? আমার চিন্তা হচ্ছে।'

পদ্মজা আরো শক্ত করে আমিরকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,'আমি...আমি খ..খুন করেছি।'

'কী...কী বলছো! এই পদ্মজা।'

পদ্মজা আমিরের পিঠ খামচে ধরে বলল,'আ...আমি..এটা কেমনে করলাম!'

আমির পদ্মজাকে নিজের সামনাসামনি বসিয়ে বলল,'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। সব বলো না আমাকে! কান্না থামাও।'

পদ্মজা মেঝেতে দৃষ্টি রেখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে পুরো ঘটনাটা বলল। সে নিজের কাজে নিজে অবাক। আমির পদ্মজাকে শান্ত করার জন্য বুকের সাথে চেপে ধরে বলল,'কিছু হয়নি। শান্ত হও। কান্না থামাও।'

পদ্মজার কান্না থামে। সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। তার মাথা কাজ করছে না। মস্তিষ্ক শূন্যের কোঠায়। আমির তা বেশ বুঝতে পেরেছে। আলমারি থেকে শাড়ি,ব্লাউজ নিয়ে আসল। নিজে পদ্মজাকে পরিয়ে দিল। পদ্মজার পুরো শরীর যেন শরীর না, বরফ। এতোই ঠান্ডা! আমির পদ্মজার চুল মুছে দিয়ে বলল,'ঘরে চলো। না, থাক। আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

পদ্মজা তরঙ্গহীন স্বরে বলল,'তোমার ঘাড়ে টান পড়বে। আমি যেতে পারব।'

আমির পদ্মজাকে ধরে ধরে নিয়ে আসে। পদ্মজাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে লেপ জড়িয়ে দিল গায়ে। তারপর বলল,'আমি থাকতে তোমার কিছু হবে না। ডান দিকে তো?'

পদ্মজা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। আমির সোয়েটার পরে বেরিয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বলল,'কই কোথাও তো কিছু পাইনি।'

পদ্মজা চমকে গেল। দ্রুত উঠে বসল। তারপর চোখ বড়বড় করে জানতে চাইল,'লাশ বা রক্ত কিছুই নেই?'

আমির নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল,'না তো। তুমি রাতে স্বপ্ন দেখেছো বোধহয়।'

পদ্মজা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। অস্থির হয়ে পড়ে। এটা কী করে সম্ভব! এই কাকডাকা ভোরে লাশ থাকবে না কেন! আলমগীরের বলা কথাগুলো মনে পড়তেই পদ্মজা সব বুঝতে পারে। ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে। তার ঠোঁট দুটি তিরতির করে কাঁপছে!

#পদ্মজা

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা - ৫৫

____

অন্ধকার নেমে এসেছে। সন্ধ্যা তার ঝাঁপি থেকে অন্ধকার নিয়ে এসে ঝপ করে রাত নামিয়ে দিল। বিদ্যুৎও চলে গেল। পদ্মজা হারিকেন জ্বালিয়ে প্রেমার ঘরে এলো। প্রেমা পড়ছিল। পূর্ণা শুয়ে আছে। পদ্মজাকে দেখে প্রেমা এগিয়ে এসে হারিকেন নিল। এরপর বলল,'আপা সন্ধ্যার নামায পড়েনি।'

'তুই পড়। আমি দেখছি।'

পদ্মজা পূর্ণার শিয়রে বসে কাশি দিল,পূর্ণার মনোযোগ পেতে। পূর্ণার সাড়া পাওয়া যায়নি। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। সেদিনের ঘটনার ছয় দিন কেটে গেছে। পূর্ণার স্বাভাবিক হতে দুইদিন লেগেছিল। দুইদিন ঘর থেকে বের হয়নি। কিন্তু কাঁধের ক্ষতটা শীতের কারণে পেকেছে। খুব জ্বালাতন করে। আপা,আপা করে কাঁদে। পদ্মজার ভালো লাগে না সেই কান্না শুনতে। কষ্ট হয়। পদ্মজার বুক ভারি হয়ে আসে। পূর্ণার গায়ে লেপ জড়িয়ে দিল। তারপর পূর্ণার মাথায় কিছুক্ষণ বিলি কেটে দিয়ে প্রেমাকে প্রশ্ন করল,' প্রান্ত কোথায়?'

'লাহাড়ি ঘরে।'

'কী করে ওখানে?'

'কী হিবিজিবি বানায়। বিজ্ঞানী হয়ে যাবে দেখো।'

'মজা করে বলছিস কেন? হিবিজিবি বানাতে বানাতেই একদিন চমকে দেয়ার মতো কিছু বানিয়ে ফেলবে। বিরক্ত করিস না। ওকে ওর মতো সময় কাটাতে দিস।'

'কে যায় ওরে বিরক্ত করতে। আমি আমার পড়া নিয়েই আছি।' কথা শেষ করেই প্রেমা পড়ায় মনোযোগ দিল। পদ্মজা মুচকি হাসল। প্রেমাকে খুব ভালো লাগে তার। মেয়েটা লাজুক না শুধু,ভীষণ বুদ্ধিমতীও বটে। চাল চলন আকর্ষণ করার মতো।

বাসন্তী এই রাতের বেলা হারিকেন জ্বালিয়ে কাঁথা সেলাই করছেন। পদ্মজা রাগী স্বরে বলার চেষ্টা করল,'রাতের বেলা কী করছেন আপনি? বিশ্রাম নিন এখন।'

বাসন্তী পদ্মজার দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন,'কিছুক্ষণ আগেই তো সন্ধ্যা হলো।'

'সারাদিন কাজ করেন। এখনও করবেন? বিকেলে এতোসব রান্নাও করলেন। যতদিন গ্রামে আছি আমি এই সেলাই-টেলাই যেন আর না দেখি।'

বাসন্তীকে আর কিছু বলতে না দিয়ে পদ্মজা কাঁথা কেড়ে নিল। বাসন্তীর কোনো কথা শুনেনি। আলমারির ভেতর কাঁথা,সুতা,সুঁই রেখে বলল,'যতদিন আছি আমি এগুলো বের করতে যেন না দেখি। বুঝছেন?'

'আমার কী আর কিছু বলার আছে?'

পদ্মজা হেসে ফেলল। সাথে বাসন্তীও। আমিরের আগমন ঘটে তখনি। পরনে বেশ দামী জ্যাকেট। পায়ে বুট। সে বাইরে গিয়েছিল,হেমলতার মিলাদের ব্যবস্থা করতে। পদ্মজা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল,'সব ঠিক হয়েছে? আর একদিন পরেই কিন্তু-

'কোনো চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে গেছে। পেটে ইদুর দৌড়াচ্ছে। খেতে দাও।'

বাসন্তী বিছানা থেকে দ্রুত নামলেন,'দিতেছি বাবা।'

'আমি যাচ্ছি তো।' বলল পদ্মজা।

'তুমি জামাইকে নিয়ে কলপাড়ে যাও। দেখ, জুতায় কাদা লাগিয়ে আসছে।'

সাথে সাথে পদ্মজা আমিরের পায়ের দিকে তাকাল। আমিরও তাকাল। পদ্মজা আক্ষেপের সুরে বলল,'এতো কাদা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন কেন!'

আমির তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। অপরাধী স্বরে বলল,'দুঃখিত আমি।'

'আসুন কলপাড়ে।'

কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে আছে। কুয়াশার স্তর এতোই ঘন যে পাঁচ-ছয় ফুট দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। পদ্মজা কল চাপছে, আমির জুতা থেকে কাদা ধুয়ে ফেলছে। কলের পানি কুসুম গরম। শীতের সময় কল থেকে গরম পানি আসার ব্যাপারটা দারুণ। আমির বলল,'পূর্ণা কী ঘুমিয়ে গেছে?'

'হু।'

'হু,ঘুমাবেই তো। প্রতিদিন সন্ধ্যার আযান পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর ফজরের আযানের আগ থেকে উঠে পকপক শুরু করে। ঘুমাতে পারি না।'

পদ্মজা শব্দ করে হাসল। বলল,'ঠিকই তো করে। ফজরে কীসের ঘুম?'

'বোনের পক্ষই তো নিবে।'

ক্ষণকাল পিনপতন নিরবতা। আমিরের জুতা ধোয়া শেষ। পদ্মজা শুকনো কণ্ঠে বলল,'ওই বাড়ির মানুষদের আসতে বলেছেন?'

ওই বাড়ির নাম উঠতেই আমির জ্বলে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল,'ওই বাড়ির নাম নিতে নিষেধ করেছি।'

'তবুও-

'না বলিনি। আর বলবও না।'

আমির পায়ে গটগট শব্দ তুলে চলে যায়। পদ্মজা আমিরের যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকল। সে রাতের পর ওই বাড়িতে তারা তিন দিন ছিল। তারপরই আমির চাপ দিতে থাকে,ওই বাড়ি ছাড়তে। সে সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকে। এভাবে আতঙ্ক নিয়ে বাঁচা যায় না। আমির রাতে ঘুমায় না, ছটফট করে। এই বুঝি পদ্মজার কিছু হয়ে গেল।

পদ্মজা খেয়াল করেছে, আমির রাতে কপালের উপর হাত রেখে চুপচাপ শুয়ে থাকে। তাছাড়া এইভাবে লাশ অদৃশ্য হয়ে গেল। পর পর তিন দিন কেটে যায় তবুও কেউ কিছু বলেনি। কারো মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। ব্যাপারটা ভয়ংকর। পূর্ণার ওখানে থাকা বিপদজনক। সে বিপদকে ভয় পায় না। কিন্তু পূর্ণার কিছু হলে সে মানতে পারবে না। আবার পূর্ণা একা এই বাড়িতে আসবে না। তাই বাধ্য হয়ে তিনজন একসাথে চলে এসেছে। তবে পদ্মজা আবার যাবে ওই বাড়িতে। যেতে তাকে হবেই। হাওলাদার বাড়ির প্রতিটি কোণার রহস্য সে নিজের নখদর্পণে আনবেই। এটা তার শপথ।

অনেক রাত হয়েছে। রাতের খাবারের সময় পূর্ণাকে ডেকে তোলা হয়। একবার ঘুম ভেঙে গেলে পূর্ণা আর ঘুমাতে পারে না। ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যায়। প্রেমা এখনও পড়ছে। পূর্ণা বিরক্তি নিয়ে প্রেমার দিকে তাকাল। মনে মনে বলে,এই মেয়ে কী বিশ্ব জয় করে ফেলবে পড়ে? এতো তো আপাও পড়েনি।

'বাত্তিডা নিভিয়ে এসে ঘুমা। অনেক পড়ছস।' কিড়মিড় করে বলল পূর্ণা।

প্রেমা গুরুজনদের মতো করে বলল,'বাত্তিডা না বাতিটা হবে।'

'থাপ্পড় দিয়ে দাঁত গাছে তুলে দেব, আমাকে কিছু শেখাতে আসলে।'

প্রেমার মুখে আঁধার নেমে আসে। সে থমথমে মুখ নিয়ে বই বন্ধ করে। ঝিম মেরে বসে থাকে। পূর্ণা সন্তুষ্ট হয়ে বলে,'এবার হারিকেনের আগুন নিভা। এরপর শুয়ে পড়।'

প্রেমা হারিকেনের আগুন নিভাতে প্রস্তুত হতেই,পূর্ণা বলল,'না,থাক নিভাতে হবে না। ভয় করে। তুই শুয়ে পড়।'

প্রেমা বাধ্যের মতো এসে শুয়ে পড়ে। লেপের ভেতর ঢুকে। তার ঠান্ডা পা জোড়া পূর্ণার পায়ে লাগতেই,পূর্ণা হইহই করে উঠে,'ও মাগো কী ঠান্ডা! দূরে যা।'

প্রেমা রাগী চোখে তাকাল। পূর্ণা ধমক দিয়ে বলল,'কি হইছে? এমনে তাকাস কেন? খেয়ে ফেলবি?'

পূর্ণার সাথে কথা বলে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারতে ইচ্ছে হচ্ছে না প্রেমার। পূর্ণার কথাবার্তাকে পাত্তা দিলে প্রেমার ঘুম নষ্ট হবে,সকালে উঠে নামায পড়াও হবে না,বই পড়াও হবে না। এটা ভেবে প্রেমা পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও যায়। পূর্ণা মাথা তুলে দেখে প্রেমা ঘুমালো নাকি। যখন বুঝলো ঘুমিয়ে গেছে,তখন লেপ দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিল প্রেমাকে। এরপর জড়িয়ে ধরল। যেন দ্রুত প্রেমার ঠান্ডা শরীর গরম হয়ে

আসে। এই বোনটাকে সে ভীষণ ভালোবাসে। খুব বেশি। শুধু ভালোবাসাটা প্রকাশ করতে পারে না কেন জানি! প্রেমার ঘুম খুব পাতলা। পূর্ণা তাকে জড়িয়ে ধরতেই তার ঘুম ছুটে যায়। ঠোঁটে ফুটে উঠে মুচকি হাসি। প্রায় এরকম হয়। সে ঘুমালে পূর্ণা তার কপালে চুমু দেয়,চুলে বিলি কেটে দেয়। হাত-পায়ের নখ কেটে দেয়। ভালোবাসার অনেক রূপ হয়! তেমনি এই দুই বোনের ভালোবাসাটা অন্যরকম। লুকিয়ে একজন আরেকজনকে ভালোবাসে। প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। দুজনই টের পায়। কিন্ত প্রকাশ্যে সাপে-নেউলে যুদ্ধ চলে!

পূর্ণার কিছুতেই ঘুম আসছে না। হারিকেনের আলো নিভু,নিভু। পূর্ণা উঠে বসে। আবার শুয়ে পড়ে। নিভু, নিভু আলোর দিকে চেয়ে মৃদুলের কথা ভাবে। মানুষটার কথা ইদানীং উঠতে বসতে মনে পড়ে তার। কাঁধে আঘাত পাওয়ার পর পূর্ণা দুইদিন ঘর থেকে বের হয়নি। তাই মৃদুল বার বার পূর্ণার ঘরে উঁকি দেয়। পদ্মজা সারাক্ষণ থাকতো তাই ঢোকার সাহস পায়নি। দুই দিন পর পূর্ণা ছাদে যায়। পিছু পিছু মৃদুলও আসে। পূর্ণার পিছনে দাঁড়িয়ে কাশে। পূর্ণা ফিরে তাকায়। মৃদুলকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখায়। পূর্ণা প্রশ্ন করল, 'কিছু বলবেন?'

মৃদুল বলল,'কেমন আছো ? হুনলাম,রাইতে রান্নাঘরে নাকি পইড়া গেছিলা।'

'হু। ভালো আছি।'

'তোমার কি ধপাস, ধপাস কইরা পইড়া যাওয়ার ব্যামো আছে?'

পূর্ণা কিছু বলেনি। পদ্মজা নিষেধ করেছে,সেদিনের রাতের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে। মৃদুল দেখল,পূর্ণা কপাল কুঁচকে,কাঁধে হাত বুলাচ্ছে। সে বিচলিত হয়ে জানতে চাইল,'বেদনা করে? দা'য়ের উপর পড়ছো কত্তটা কাটছে কে জানে! তার উপরে শীতের দিন এই ঘা সহজে ভালা হইব না। এইখানে তো বাতাস হইতাছে। ঘরে যাও। ঘা বাড়াইও না।'

'না। এইখানেই থাকব।'

মৃদুল আর জেদ ধরেনি। পূর্ণা যতক্ষণ ছিল, সেও ছিল। এরপরদিন একটু পর পর পূর্ণার খোঁজ নিয়েছে। পূর্ণা খুব সুন্দর একটা অনুভূতির সাক্ষাৎ পায়। শুরুতে মৃদুলকে দেখে শুধুই ভালো লাগলেও,আস্তে আস্তে মৃদুলের বিচরণ শুরু হয়েছে তার পুরো অস্তিত্ব জুড়ে। মৃদুলের কথা বলা,দুষ্টুমি,হাসি সব ভালো লাগে। মনের অনুভূতিগুলো হাটি হাটি পা করে গুরুতর সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি মৃদুলও যে তার ব্যাপারে আগ্রহী পূর্ণা টের পায়। এই বাড়িতে আসার পরদিন মৃদুল আমিরের সাথে দেখা করার অজুহাতে পূর্ণার সাথে দেখা করতে আসে। সবার

অগোচরে বলে যায়, তার সাথে পরের দিন দুপুরে উত্তরের ঘাটে দেখা করতে। পূর্ণা বলেছিল যাবে। কিন্তু পূর্ণা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙে সন্ধ্যায়। তাই আর যাওয়া হয়নি। গতকাল পদ্মজা বের হতেই দিল না। পূর্ণার মন কেমন কেমন করছে। খুব মনে পড়ছে মৃদুলকে। হারিকেনের আলো নিভে যায়,তখনই জানালায় টোকা পড়ে। পূর্ণা ভয় পেয়ে যায়। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। ভূত এলো নাকি! পূর্ণা ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে নামে। আবারও সেই ডাক ভেসে আসে। কণ্ঠটা পরিচিত। পূর্ণা ভ্রুকুঞ্চন করে টিনের দেয়ালে কান পাতে। আবারও ভেসে আসে চেনা স্বর,'এই পূর্ণা।'

কণ্ঠটা চেনার সাথে সাথে পূর্ণা জানালা খুলল। মৃদুলের মুখটা ভেসে উঠে। পূর্ণার বুক ধক করে উঠল। সর্বাঙ্গে একটা উষ্ণ বাতাস ছুঁয়ে যায়। সে ফিসফিসিয়ে বলল,'পাশের ঘরে আপা,ভাইয়া। আপনি ঘাটে যান। আমি আসছি।'

'আচ্ছা। '

মৃদুল চলে যায়। পূর্ণা তাড়াহুড়ো করে সোয়েটার পরে। শাল দিয়ে মাথা ঢাকল। তারপর হারিকেনে নতুন আগুন জ্বালিয়ে, হারিকেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ভালোবাসার কথা বলা হয়নি। কোনো সম্পর্ক নেই দুজনের। তবুও পূর্ণা কোনো এক বশীকরণের জাদুতে ছুটে যাচ্ছে মৃদুলের কাছে। কলপাড় অবধি গিয়ে আবার ছুটে আসে ঘরে। আয়না,কাজল বের করে। চোখে কাজল দেয়। তারপর বেরিয়ে যায়। ব্যস্ত পায়ে ঘাটে আসে। চারিদিকে জোনাকিপোকা। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। একটু দূরেই মৃদুল দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ণার হাঁটার গতি কমে যায়। সে অকারণে লজ্জা পাচ্ছে। মৃদুল এগিয়ে আসে। তার গলায় মাফলার। মাথায় টুপি। পরনে সোয়েটার। শীতল জলোবাতাসে শীত যেন আরো বেশি জেঁকে ধরছে। পূর্ণা মৃদুলের দিকে না তাকিয়ে, বিনিদ্র আরক্ত চোখে হারিকেনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চেয়ে বলল,'কেন ডেকেছেন?'

'কেমন আছো?'

পুরুষালি ভরাট কণ্ঠটি পূর্ণাকে কাঁপিয়ে তুলে। অন্যবেলা তো এমন হয় না। এখন এরকম হওয়ার কারণ কী, রাতের অন্ধকার এবং নির্জনতা?

পূর্ণা বলল,'ক্ষতস্থান পেকেছে। তাই একটু যন্ত্রণা হয়। আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো নেই।' মৃদুলের কণ্ঠটি করুণ শোনায়।

পূর্ণা মৃদুলের দিকে চোখ তুলে তাকায়। চোখাচোখি হয়। হারিকেনের আলোয় পূর্ণার কাজল কালো চোখ দুটি তীরের বেগে মৃদুলকে ঘায়েল করে। পূর্ণা সাবধানে প্রশ্ন করল,'কেন?'

'জানি না।'

'এতো রাতে আসা ঠিক হয়নি।'

'এতো রাইতে আমার ডাকে তুমি কেন সাড়া দিলা?'

'জানি না।'

দুজনের কেউই কথা খোঁজে পাচ্ছে না। দুজনের কেউই জানে না তারা কেন দেখা করেছে। মৃদুল জানে না, সে কেন এতো রাতে,তীব্র শীতে এখানে ছুটে এসেছে। পূর্ণা জানে না,সে কেন পর পুরুষের ডাকে সাড়া দিল। শুধু এইটুকু জানে,তাদের অশান্ত মন শান্ত হয়েছে। খালি খালি জায়গাটা পূর্ণ হয়েছে। তবে, হৃদস্পন্দন ছন্দ তুলে নৃত্য করছে। পূর্ণার কাঁধের ব্যথা বাড়ে। তাই তার ভ্রু দুটি বেঁকে গেল। কাঁধে এক হাত রাখে। মৃদুল ব্যথিত স্বরে জানতে চাইল,'আবার বেদনা করে? দেখি কেমনে কী হইছে।'

মৃদুল দুই পা এগিয়ে আসে। পূর্ণা পিছিয়ে যায়। লাজুক ভঙ্গিতে বলল,' অবিবাহিত মেয়ের কাঁধ দেখতে চাওয়া অন্যায়।'

'সে তো দেখা করাও অন্যায়। সব অন্যায় কী মানা যায়?'

'অনেকে তো মানে।'

'আমি পারি না।'

'আপনি অন্যরকম।'

'ব্যথা কমেছে?'

'হু,হুট করে ব্যথা বেড়ে যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে কমেও যায়।"

'পাকলে এরকম হয়।'

'হু।'

'ভয় হচ্ছে না?'

পূর্ণা কেমন করে যেন মৃদুলের দিকে তাকাল। মৃদুল থমকে যায়। পূর্ণা বলল,'কার ভয়? আপনার?'

'আমার আর সমাজ। দুইটাই।'

'আপনাকে ভয় পেলে আসতাম না। আর সমাজের ভয় অনেক আগেই কেটে গেছে।'

উত্তরে বলার মতো কিছু পেল না মৃদুল। ঝিঁঝিঁপোকারা ডাকছে। আলো দিচ্ছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে। তার মাঝে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী দাঁড়িয়ে আছে,বুকে ভালোবাসার উথালপাতাল ঢেউ নিয়ে। অনেকক্ষণ পর মৃদুল বলল,'আমি আসতে চাইনি।'

পূর্ণা আবারও সেই মন কেমন করা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। বলল,'তাহলে কেন এসেছেন?'

'মনে হইতাছে,কোনো বশীকরণ তাবিজের জোরে এখানে আইসা পড়ছি।'

পূর্ণা হেসে ফেলল। হারিকেনের মায়াবী আলোয় সে হাসি কী যে ভালো দেখাচ্ছিল। তার প্রশংসা করার মতো যোগ্য শব্দ মৃদুলের ভাষার ভান্ডারে মজুদ নেই। সে গাঢ় স্বরে বলল,'পিরিতির মায়া বড় জ্বালা।'

কপাল ইষৎ কুঁচকে পূর্ণা প্রশ্ন করল,'কার পিরিতের দহনে জ্বলছেন?'

'তোমারে কইতে হবে?'

'না।'

'ঘরে যাও।'

পূর্ণা তার মুখের ধারে হারিকেন ধরে মৃদুলের দিকে চেয়ে বলল,'আমি কাজল দিয়েছি।'

পূর্ণা ভেবেছে তার কাজল কালো চোখ মৃদুল দেখেনি। কিন্তু মৃদুল তো শুরুতেই দেখেছে। আর ঘায়েল হয়েছে। সে হেসে পূর্ণার চোখ,মুখ আবার দেখল। হারিকেনের হলদে আলোয় পূর্ণার তেলতেলে ত্বক চিকচিক করছে। মৃদুল বলল,'দেখেছি। ভালো লাগছে।'

মৃদুলের এইটুকু প্রশংসায় পূর্ণার মন নেচে উঠল। সে ঠোঁটে হাসি রেখে বলল,'সাবধানে বাড়ি যাবেন।'

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা - ৫৬

সুষ্ঠুভাবে হেমলতার মৃত্যুবার্ষিকীর মিলাদ সম্পন্ন হয়। বিকেলে মোড়ল পরিবারের সদস্যরা একসাথে আটপাড়ার মসজিদের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাথে বৃদ্ধা মনজুরা এবং হিমেল রয়েছে। মসজিদের কবরস্থানে পাশাপাশি শুয়ে আছেন মোর্শেদ,হেমলতা ও পারিজা। কবরের কাছে আসা নিষেধ বলে মেয়েরা দূর থেকে দুই চোখ ভরে তিনটি কবর দেখছে এবং চোখের জল বিসর্জন দিচ্ছে। মৃত্যুর এতোগুলি বছর পেরিয়ে গেছে তবুও কবরের সামনে এসে দাঁড়ালে বুকে এতো কষ্ট হয়! কাছের মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ভয়ানক বিষের নাম। এই বিষ যারা পান করেছে তারাই জানে কষ্টের মাত্রা। পূর্ণা ছিঁচকাঁদুনে। সে চোখের জলে স্নান করছে। পদ্মজা ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে কবরগুলোর দিকে। মা নামক মমতাময়ী মানুষটার ছায়ার অভাববোধ প্রতিটি পদক্ষেপে সহ্য করতে হয় । কত ভালোবাসতেন তিনি। মাথার উপর তার ছায়া ছাড়া নিঃশ্বাস নেওয়া দায় ছিল। আর আজ এতো বছর ধরে পদ্মজা দিব্যি এই মানুষটাকে ছাড়াই বেঁচে আছে। জন্মদাতা পিতা ছোট থেকে অনেক লাঞ্ছনা-বঞ্চনা করেছে। কত আকুল হয়ে থাকত পদ্মজা, পিতার ভালোবাসা পেতে। যখন ভালোবাসা পেল বেশিদিন পৃথিবীতে রইলেন না । মা মরা মেয়েদের রেখে নিজেও পাড়ি জমালেন ওপারে। তারপর পদ্মজার কোল আলো করে এলো কন্যা পারিজা। পিতা-মাতার মৃত্যুর শোক কিছুটা হলেও লাঘব হয়। কিন্তু এই সুখও বেশিদিন টিকেনি। খুব কম আয়ুকাল নিয়েই জন্মেছিল পারিজা। পদ্মজাকে আঁধারের গহীনে ছুঁড়ে ফেলে এক এক করে চলে যায় সুখতারারা। পদ্মজা বেশিক্ষণ দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি বুকের ভেতর চেপে রাখতে পারেনি। সে মুখ এক হাতে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে। বাসন্তী পদ্মজার মাথাটা পরম যত্নে নিজের কাঁধে রাখেন। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,'কেঁদো না মা। একদিন দেখা হবে। হাশরের ময়দানে।'

সময় তার নিজের গতিতে চলে। কারো জন্য থেমে থাকে না। কেটে যায় আরো তিনটা দিন। এর মাঝে পূর্ণা মৃদুলের সাথে শুটিং দেখতে গিয়েছে একবার। গ্রামের পথে দুজন হেসেখেলে কথা বলেছে। এতেই কানাঘুষা শুরু হয়েছে। এদিকে আমিরের ভীষণ জ্বর। শুকিয়ে গেছে অনেক। ভেতরে ভেতরে কী যেন ভাবে সারাক্ষণ। খাওয়া দাওয়াও কমে গেছে। সবসময় চিন্তিত থাকে। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে না। এদিকওদিক ঘুরে বেড়ায়। এখন শুয়ে আছে বারান্দার ঘরে। পদ্মজা কপালে জলপট্টি দিচ্ছে। আমিরের চোখ দুটি বন্ধ। পদ্মজা আদুরে গলায় ডাকল,'শুনছেন?'

আমির চোখ বন্ধ রেখেই বলল,'হু?'

'কী এতো ভাবেন?'

আমির চোখ খুলে পদ্মজার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটি ভয়ংকর লাল। রাতে না ঘুমানোর ফল। সে পদ্মজাকে পাল্টা প্রশ্ন করল,'কী ভাবব?'

'জানি না। কিছু তো ভাবেনই। চোখ দুটি তার প্রমাণ। আপনি কোনো কিছু নিয়ে কি ভীতিগ্রস্ত?'

আমির বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। বলল,'তেমন কিছু না।'

'যেমন,কিছুই হউক। বলুন না আমাকে।'

'আমাদের ঢাকা ফেরা উচিত।'

'হঠাৎ? '

'জানি না কিছু। আমার প্রায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে আজেবাজে স্বপ্ন দেখে। তোমাকে হারাতে পারব না আমি।'

'আমার কিছু হবে না। আমি কারো কোনো ক্ষতি করিনি যে-

পদ্মজা থেমে গেল। সে তো একজনকে খুন করেছে! পদ্মজার দৃষ্টি এলোমেলো হয়ে আসে। আমির পদ্মজার দিকে চেয়ে বলল,'তুমি কী করে কাউকে খুন করতে পারলে! আমি ভাবতেই পারি না। এরপর থেকেই ভয়টা বেড়ে গেছে। আমার খুব চিন্তা হয়। ঘুম হয় না। রাত জেগে পাহারা দেই কেউ যেন আমার পদ্মবতীকে ছুঁতে না পারে।'

পদ্মজার দুই চোখ জলে ভরে উঠে। বলে,'প্রথম তো বিশ্বাস করেননি,এটাই ভালো ছিল। এখন তো বিশ্বাস করে চিন্তায় পড়ে গেছেন। আর অসুস্থ হয়েও পড়েছেন।'

'আমি ভেবেছিলাম,স্বপ্ন দেখেছো। তাই ঘুম থেকে উঠে আবোলতাবোল বলছো। তারপর সুস্থ-স্বাভাবিক ভাবেও যখন বললে,অবিশ্বাস কী করে করি?'

'এতো ভালোবাসতে নেই। আমার কপালে সয় না।'

'ভালোবাসতে না করছো?'

'মোটেও না। মাত্রা কমাতে বলছি।'

পাশেই অজয়বাবুর আম বাগান। সাঁ সাঁ করে শীতল হাওয়া বইছে। পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে। পূর্ণা মৃদুলের চেয়ে পাঁচ-ছয় হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মস্তক নত। ওড়না বেসামাল হয়ে উড়ছে। মগাকে দিয়ে পূর্ণাকে ডেকে এনেছে মৃদুল। আসার পর থেকেই ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণা। দাঁত দিয়ে নখ কাটছে। মৃদুল নিরবতা ভেঙে বলল,

'আমি আগামীকাল বাড়িত যাইতেছি।'

পূর্ণা চকিতে তাকাল। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে প্রশ্ন করল,'কেন?'

মৃদুল মুচকি হেসে বলল,'নিজের বাড়িত কেন যায় মানুষ? এইহানে তো বেড়াইতে আইছিলাম।'

'ওহ।'

পূর্ণা মৃদুলের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। কান্না পাচ্ছে তার। মৃদুল এক ধ্যানে পূর্ণার দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বলল,'অন্যদিকে চাইয়া রইছো কেন? এদিকে চাও।'

পূর্ণা বাধ্যের মতো মৃদুলের কথা শুনে। তার দুইচোখে জল টলমল করছে। পূর্ণার মেঘাচ্ছন্ন দুটি চোখ দেখে মৃদুলের ভীষণ কষ্ট অনুভব হয়। সে কেমন একটা ঘোর নিয়ে জানতে চাইল,'চলে যাব,শুইনা কষ্ট হইতাছে?'

পূর্ণা আবারও দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। অভিমানী স্বরে বলল,'মোটেও না। চলে যান।'

'দুইদিন পরই আসতাছি।'

পূর্ণার চোখেমুখে হাসির ছটা খেলে যায়। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দুই কদম এগিয়ে এসে বলল,'সত্যি?'

'সত্যি। এবার হাত ধরি?'

মৃদুলের বেশরম আবদারে পূর্ণা লজ্জা পেল। সে দুই কদম পিছিয়ে যায়। দুই হাত পিছনে লুকিয়ে ঠোঁটে হাসি রেখে বলল,'বাড়ি থেকে আসার পর।'

পূর্ণা দৌড়ে পালায়। মৃদুল পিছনে ডাকে,'এই কই যাও।'

চঞ্চল পূর্ণা না থেমে ফিরে তাকায়। তার লম্বাকেশ হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে উড়ছে। সে মিষ্টি করে হেসে জবাব দিল,'বাড়ি যাই। আপনি সাবধানে যাবেন। জলদি ফিরবেন।'

মৃদুল তার গোলাপি ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে হেসে মাথা চুলকাল। কী অপূর্ব দেখাচ্ছে গ্রামের চঞ্চল শ্যামবর্ণের মেয়েটিকে। হাওয়ার তালে মেঠো পথ ধরে ছুটে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। চুল আর ওড়না দুটোই হাওয়ার ছন্দে সুর তুলে যেন উড়ছে।

সকাল সকাল মগা এসে খবর দিল,রানি মদনের মাথায় আঘাত করেছে। মদন এখন হাসপাতালে ভর্তি। খলিল হাওলাদার রানিকে মেরে আধমরা করে একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছেন। এ কথা শুনে পদ্মজা অস্থির হয়ে পড়ে। খলিল হাওলাদার এতোই জঘন্য যে, পদ্মজার মনে হয় এই মানুষটা নিজের মেয়েকে যেকোনো মুহূর্তে খুন করে ফেলতে পারে। পদ্মজা আমিরকে চাপ দেয়,ওই বাড়িতে নিয়ে যেতে। নয়তো সে একাই চলে যাবে। একপ্রকার জোর করেই আমিরকে নিয়ে আসে হাওলাদার বাড়িতে।হাওলাদার বাড়ির পরিবেশ থমথমে, নির্জন। সবসময়ই এমন থাকে। এ আর নতুন কি! অন্দরমহলে ঢুকতেই আমিনা আমিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আকুতি-মিনতি করে বলে,'বাপ,আমার মেয়েরে আমার কাছে আইননা দেও। নাইলে,ওর কাছে আমারে লইয়া যাও। তোমার দুইডা পায়ে ধরি।'

আমির আমিনাকে মেঝে থেকে তুলে আশ্বাস দেয়,'আমি দেখছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমির খলিলের ঘরের দিকে যায়। ফরিনা এসে বিস্তারিত বললেন,'রাইতের বেলা মদনের চিল্লানি হুনি। দৌড়ে সবাই আইয়া দেহি মদন পইড়া আছে। মাথা দিয়া কী যে রক্ত বাইর হইতাছে। আর রানির হাতে এত্ত বড় একটা ইট। ছেড়িডারে দেইখা মনে হইতাছিল,ছেড়িডার উপরে জ্বীনে আছর করছে। আরেকটু অইলে এতিম ছেড়াডা মইরা যাইত। বাবুর বাপ আর রিদওয়ান মেইলা তাড়াতাড়ি হাসপাতাল লইয়া গেছে। আর এইহানদে তোমার চাচা শ্বশুরে রানিরে মাইরা ভর্তা কইরা লাইছে। নাক মুখ দিয়া রক্ত ছুটছে। তবুও থামে নাই। আমরা অনেক চেষ্টা করছিলাম তোমার চাচাশ্বশুরের হাত থাইকা বাঁচাইতে,পারি নাই। আলোডা কি যে কান্দা কানছে! এহন ঘুমাইতাছে।''

আমির চাবি নিয়ে আসে। আমিনা সাথে যেতে চাইলে আমির বলল,'আমি আর পদ্ম যাচ্ছি। রানিরে নিচে নিয়ে আসি। পদ্ম আসো।'

পদ্মজা ছুটে যায় আমিরের পিছু পিছু। ঘরের দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই রানি তাকায়। রুম্পা যে ঘরে ছিল সেই ঘরেই তাকে রাখা হয়েছে। রানি কাঁদছিল। দরজা খোলার শব্দ শুনে থেমে যায়। বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে। চোখমুখের রক্ত শুকিয়ে গেছে। আমির,পদ্মজাকে দেখে রানি দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। কাউকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে নিজের জীবন নিয়ে সুখী না। পৃথিবীর সব কষ্ট যেন তার বুকে। এসব মারধোর আর গায়ে লাগে না। বাপের কথায় বাড়ির কামলা বিয়ে করল। এটা তার জন্য কতোটা অপমানের কেউ বুঝবে না। সে শুধু মানুষ ভেবেই বাড়ির কামলাকে স্বামী মানতে পারেনি। এতোটা উদার সে নয়। সে মানে সে ভালো না। বাপের জোরাজুরিতে নাতনিও দিল। তারপর থেকেই মদন পেয়ে বসে। কারণেঅকারণে তাকে ছুঁতে চায়। মদনের একেকটা ছোঁয়া রানির জন্য কতোটা বেদনাদায়ক তাও কেউ জানবে না। গতকাল রাতে মদন জোরদবস্তি করেছিল তাই রানি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

খালি ড্রামের নিচে থাকা ইট নিয়ে চোখ বন্ধ করে মদনের মাথায় আঘাত করে। এতে সে এখন মোটেও অনুতপ্ত না। পদ্মজা রানির মনের অবস্থা একটু হলেও বুঝতে পারছে। মেয়েটা হাসিখুশি থাকার জন্য বাচ্চাদের সাথে কাবাডি,গোল্লাছুট, কানামাছি কত কী খেলে! তবুও সুখী হতে পারে না। পদ্মজা সাবধানে রানির পাশে এসে বসল। বলল,'খুব মেরেছে?'

রানি পদ্মজার দিকে তাকিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে বলল,'তুমি জাইননা কী করবা? মলম লাগাইয়া দেওন ছাড়া আর কী করনের আছে?'

আমির কিছু বলতে উদ্যত হয়। পদ্মজা আটকে দেয়। সে চমৎকার করে হেসে রানিকে বলল,'মলম লাগানোর মানুষই বা কয়জনের ভাগ্যে জুটে আপা?'

রানির দৃষ্টি শীতল হয়ে আসে। এই মেয়েটার সাথে রাগ দেখানো যায় না।

পদ্মজার মাঝে অদ্ভুত কিছু আছে। যা রাগ দমন করতে পারে। রানি বলল,'আমি...আমি ভালা নাই পদ্মজা। আমি একটু আরাম চাই। সুখ চাই। আর কষ্টের বোঝা টানতে পারতাছি না।' রানির কথার ধরণ এলোমেলো। সে অন্য এক জগতে আছে। বন্দি পাখির মতো ছটফট করছে। মুক্তির আশায় ডানা ঝাঁপটাচ্ছে। পদ্মজার খুব মায়া হয়। ভীষণ অসহায় লাগে। ভালোবাসার মানুষ জীবনে এসে আবার হারিয়ে গিয়ে এভাবেই জীবন এলোমেলো করে দেয়। এতো যাতনা কেন প্রেমে? যার শূন্যতা আজও শান্তি দিল না রানিকে। প্রতিনিয়ত কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। রানির ভেতরটা যে একেবারে শূন্য। সে পিরিতের যন্ত্রনায় আজও কাতর! আচ্ছা,যদি রানিকে তার উপযুক্ত কোনো ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া হতো তবে কী সে তার ভালোবাসাকে ভুলতে পেরে একটু সুখী হতে পারত?

আমির,পদ্মজা ধরে ধরে রানিকে নিচ তলায় নিয়ে আসে। সবাই কত কী প্রশ্ন করে। রানি নিশ্চুপ। কারোর কোনো কথার উত্তর দেয়নি। সবাই যত্ন আত্তি করে। আমিনা খাইয়ে দেন। পুরো দিন রানি বিছানায় শুয়ে থাকে। আমিনা সারাদিন চেষ্টা করেছেন রানি যাতে কথা বলে। কিন্তু রানি যেন পণ করেছে,কথা না বলার। অন্যদিকে মদন ভালো আছে। কয়দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে। সেলাই লেগেছে। গঞ্জের হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল এরপর সেখান থেকে শহরে। এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে। রানিকে সবাই অনেক খারাপ কথা বলছে। অভিশাপ দিচ্ছে। অনেকে বাড়ি বয়ে এসে কটু কথা বলে গেছে। বাড়ির কেউ নিষেধ করেনি। রানি চুপ করে শুনেছে। বাড়ির অবস্থার কথা ভেবে আমির মোড়ল বাড়িতে ফেরার কথা বলেনি। দিনশেষে রাত আসে। সুন্দর পৃথিবীকে জাপটে ধরে ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হারিয়ে যায় রানি। সকালে চিঠি পাওয়া যায়। তাতে লেখা- "আমার আলোরে দেইখা রাইখো তোমরা।"

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা - ৫৭

____

ঘন কুয়াশা বেয়ে শীতের বিকেল নেমেছে ধীরে ধীরে। পদ্মজা আলোকে বুকের সাথে মিশিয়ে দু'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি বাড়ির গেইটের দিকে। বাড়ির সব পুরুষেরা সকালে বেরিয়েছে রানির খোঁজে। এখনও ফেরেনি। যে নিজের ইচ্ছায় হারিয়ে যায় তাকে কী আর খুঁজে পাওয়া যায়? তবুও পদ্মজা চাইছে,রানিকে যেন অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়া যায়। আলো সারাদিন মায়ের জন্য কেঁদেছে। মায়ের আদরের জন্য ছটফট করেছে। আলোর অস্থিরতা দেখে পদ্মজার দুই ঠোঁট কেঁপেছে। জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছে মায়ের মতো আদর করার। কিন্তু সে তো আলোর মা না, আলোর মায়ের গন্ধ তার গায়ে নেই। রানি মা হয়ে কী করে পারল আলোকে ছেড়ে যেতে? পৃথিবীর সব মা একরকম হয় না। সব মা সন্তানের জন্য ত্যাগ করতে জানে না। দুঃখ আপন করে নিতে জানে না। পদ্মজা আলোর কপালে চুমু দিল। মেয়েটা চুপ করে আছে। চারিদিক কুয়াশায় ধোঁয়া ধোঁয়া । দিন ডুবিডুবি । স্তব্ধ হয়ে আছে সময়। এক তলা থেকে আমিনার বিলাপ শোনা যাচ্ছে। তিনি এতো কাঁদতে পারেন! পদ্মজা ঘুরে দাঁড়াল ঘরে যেতে। তখনই সামনে পড়লেন ফরিনা। পদ্মজা হাসার চেষ্টা করে বলল,'আম্মা,আপনি!'

'আলো ঘুমাইছে?'

'না,জেগে আছে।' পদ্মজা আলোর কপালে আবার চুমু দিল।

ফরিনা বললেন,'রানিরে কি পাওন যাইব?'

'জানি না আম্মা।' পদ্মজার নির্বিকার স্বর।

'আলমগীর রুম্পারে লইয়া কই গেছে জানো তুমি? ওরা ভালো আছে তো?'

'আপনাকে সেদিনই বলেছি আম্মা,জানি না আমি।'

ফরিনা আর প্রশ্ন করলেন না। তিনি নারিকেল গাছের দিকে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। পদ্মজা সেকেন্ড কয়েক সময় নিয়ে ফরিনাকে দেখে। ফরিনা আগের মতো ছটফটে নেই। নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। আগে মনে হতো তিনি মনে মনে কোনো কঠিন কষ্ট পুঁতে রেখেছেন কিন্তু এমন কোনো শক্তি আছে যার জন্য তিনি হাসতে পারেন,বেঁচে আছেন। আর এখন দেখে মনে হচ্ছে,সেই শক্তিটা নষ্ট হয়ে গেছে! জীবনের আশার আলো ডুবে গেছে। কথাগুলো ভেবে পদ্মজা চমকে উঠে! সে তো আনমনে নিজের অজান্তে এসব ভেবেছে! কিন্তু সত্যিই কি এমন কিছু হয়েছে? পদ্মজা আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল,' আম্মা,আপনি আমাকে কিছু বলতে চান?'

ফরিনা তাকান। পদ্মজা তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে রইল ফরিনার দিকে। ফরিনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। হঠাৎ যেন পাহাড়ের শক্ত মাটির দেয়াল ভেঙে ঝর্ণধারার বাঁধ ভেঙে গেল। পদ্মজা খুব অবাক হয়। ফরিনা আঁচলে মুখ চেপে ধরেন। পদ্মজার উৎকণ্ঠা, 'আম্মা, আম্মা আপনি কাঁদছেন কেন? কী হয়েছে? বলুন না আমাকে। কী বলতে চান আমাকে?'

আচমকা ফরিনার কান্নার শব্দে আলো ভয় পেয়ে যায়। সে জোরে জোরে কাঁদতে থাকে। পদ্মজা আলোকে শান্ত করার চেষ্টা করে। বারান্দায় পায়চারি করে আদুরে কণ্ঠে বলে,'মা,কাঁদে না,কাঁদে না। কিছু হয়নি তো। মামি আছি তো।'

আলো জান ছেড়ে কাঁদছে। কান্না থামাচ্ছে না। বেশ অনেক্ষণ পর আলো কান্না থামায়। সাথে সাথে পদ্মজা ফরিনার দিকে এগিয়ে আসল। প্রশ্ন করল,'বলুন আম্মা। কী বলতে চান আমাকে?'

'কিচ্ছু না।' বলেই তড়িঘড়ি করে দোতলা থেকে নেমে যান তিনি। পদ্মজা আশাহত হয়ে অনেকবার ডাকে,তিনি শুনেননি। পদ্মজা বিরক্তি নিয়ে বাইরে তাকায়। দেখতে পায় মজিদ হাওলাদারকে। তিনি আলগ ঘর পেরিয়ে অন্দরমহলের দিকে আসছেন। খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছেন। পায়ে ব্যথা পেয়েছে নাকি! পদ্মজা নিচ তলায় যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়। তখনই মাথায় আসে,'কোনোভাবে কী আব্বাকে দেখে আম্মা ভয় পেল? আর উত্তর না দিয়ে চলে গেল?'

পদ্মজা মিলিয়ে ফেলে উত্তর। এমনটাই হয়েছে। ঘরের গোপন খবরই দিতে চেয়েছিলেন ফরিনা। কিন্তু ঘরের মানুষ দেখে আর দিতে পারলেন না। আচ্ছা, তিনি এমন হাউমাউ করে কেন কাঁদলেন? পদ্মজার কপালের চামড়া কুঁচকে যায়।

পদ্মজা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায়। আলোর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবে পিছনের সব অদ্ভুত ঘটনা। রুম্পা পাগলের অভিনয় করত,তাকে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল অথচ বাড়ির কেউ এতে ভ্রুক্ষেপ করতো না। রুম্পা দিনের পর দিন না খেয়ে ছিল। পদ্মজা যতটুকু বুঝেছে ফরিনা খুব ভালোবাসেন রুম্পাকে, তাহলে তিনি কেন খাবার নিয়ে যেতেন না? রুম্পার ঘরে লতিফা চোখ রাখে। রুম্পা লতিফাকে দেখে ভয় পেয়েছিল। যেদিনই সে জানতে পারে রুম্পা পাগল না, সেদিন রাতেই বাবলু নামের কালো লোকটি রুম্পাকে মারতে চেয়েছিল। এতসব কার নির্দেশে হচ্ছে? কে এই বাড়ির আদেশদাতা? আর আলমগীরই কী করে জানল রুম্পা খুন হতে চলেছে? তারপর একটা খুন হলো অথচ ভোর হওয়ার আগেই সেই লাশ উধাও হয়ে গেল। কেউ খুনির খোঁজ করল না! তারপর রুম্পা বা আলমগীরের কথা রানি আর ফরিনা ছাড়া কেউ জিজ্ঞাসাও করল না! এই বাড়ির মানুষ যেন জীবিত থেকেও মৃত। কী চলছে আড়ালে! তারপর আলমগীর তাকে একটা চাবি দিল। চাবিটা কীসের? রুম্পা বলেছিল,উত্তরে জঙ্গলে,ধ রক্ত। এই কথার মানেই বা কী?

পদ্মজা দ্রুত দুই চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার মাথা ব্যথা করছে। কপালের রগ দপদপ করছে। রানির নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি মাথা থেকে বেরিয়ে যায়। সে গাঢ় রহস্যের টানে উন্মাদ হয়ে উঠে। বাড়িতে খলিল,রিদওয়ান নেই। এই সুযোগে জঙ্গলে তাকে যেতেই হবে। পরিবেশে অস্পষ্টতা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল । বিকেল সন্ধ্যাকে ম্লান আলোয় জড়িয়ে ধরল । সন্ধ্যার আযান পড়ছে। পদ্মজা নিচ তলায় এসে আলোকে লতিফার কাছে দিয়ে নিজ ঘরে যায়। নামায আদায় করে নেয়। তারপর আলোকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। মজিদ পায়ে ব্যথা পেয়েছেন। তিনি ঘরে শুয়ে আছেন। ফরিনাও ঘরে। বাড়ির বাকি পুরুষরা তখনও ফিরেনি। আমিনা সদর দরজায় বসে আছেন। চুল এলোমেলো। কপালে এক হাত রেখে বাইরে তাকিয়ে রানির অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। মানুষটার অনেক দোষক্রুটি আছে ঠিক। তবে মেয়ের জন্য পাগল! বাড়ির আরেক কাজের মেয়ে রিনু আলোর সাথে শুয়ে আছে। আলো একা ঘরে কীভাবে থাকবে,তাই পদ্মজাই রিনুকে আলোর সাথে থাকতে বলেছে। লতিফা রান্নাঘরে রান্না করছে। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। মানবতাবোধ থেকেও অন্তত রানির নিখোঁজ হবার শোকে কাতর হওয়া উচিত। কিন্তু পদ্মজা কাতর হতে পারছে না। তাকে চুম্বকের মতো কিছু টানছে উল্টোদিক থেকে। পদ্মজা শক্ত করে খোঁপা বাঁধে। শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে, গায়ে জড়িয়ে নেয় শাল। হাতে নেয় টর্চ আর ছুরি। তারপর অন্দরমহলের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এক নিঃশ্বাসে ছুটে আসে জঙ্গলের সামনে। হাঁপাতে

থাকে। চোখের সামনে ঘন জঙ্গল। পিছনে কয়েক হাত দূরে অন্দরমহল। হাড় হিম করা ঠান্ডা। পদ্মজার ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

এই জায়গায় সে অনেকবার এসেছে,কিন্তু পা রাখতে পারেনি জঙ্গলে। কেউ না কেউ বা কোনো না কোনো ঘটনা তাকে বাগড়া দিয়েছেই। আজ কিছুতেই সে পিছিয়ে যাবে না। তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে। জঙ্গলের ঘাসে পা রাখতেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। গায়ের লোমকূপ দাঁড়িয়ে পড়ে। আরো কয়েক পা এগোতেই গা হিম করা অদ্ভুত সরসর শব্দ ভেসে আসে। পদ্মজার একটু একটু ভয় করছে। গাঢ় অন্ধকারে,এমন গভীর জঙ্গলে সে একা! শীতের বাতাসে গাছের পাতাগুলো শব্দ তুলছে আর পদ্মজা উৎকর্ণ হয়ে উঠছে। ভয়-ভীতি নিয়েই সে এগোতে থাকে। চারিদিকে ঘাস। সরু একটা পথে ঘাস নেই। মানে এই পথ দিয়ে মানুষ হাঁটাচলা করে। পদ্মজা সেই পথ ধরেই এগোতে থাকে। সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশ দেখছে। বড় বড় গাছ দেখে মনে হচ্ছে কোনো অশরীরী দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা মনে মনে আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দেয়।

একটা সময় পথ শেষ হয়ে যায়। পদ্মজা টর্চের আলোতে পথ খোঁজে। যেদিকেই তাকায় সেদিকেই বুনো লতাপাতা। যারা এখানে আসে তারা কী এখানেই থেমে যায়? পদ্মজা ভেবে পায় না। মাথার উপর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়। পদ্মজার বুক ধক করে উঠল। সে টর্চ ধরল মাথার উপর। দুটো পাখি উড়ে যায়। এরপর চোখে ভেসে উঠে চন্দ্র তারকাহীন ম্লান আকাশ।পদ্মজা লম্বা করে নিঃশ্বাস নিল। সে কি না কি ভেবেছিল! পদ্মজা সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশ দেখল। রুম্পা কী বলেছিল মনে পড়তেই সে উত্তরে তাকাল। বেশিদূর চোখ গেল না। ঝোপঝাড়ে ঢাকা চারপাশ। পদ্মজা মুখে অস্ফুট বিরক্তিকর শব্দ করল।

নিজে নিজে বিড়বিড় করে,'ধুর! কোনদিকে যাব এবার।'

ছটফট করতে থাকে পদ্মজা। তার হাত থেকে ছুরি পড়ে যায়। ছুরি তোলার জন্য নত হয় সে। ছুরির সাথে সাথে তার হাতে ঘাস উঠে আসে। পদ্মজা অবাক হয়। কেন যেন মনে হলো,এই বুনো ঘাসের শেকড় মাটির নিচে ছিল না। পদ্মজা উত্তর দিকের আরো কতগুলো ঘাস এক হাতে তোলার চেষ্টা করল। সাথে সাথে হাতে উঠে আসে। সত্যি শেকড় নেই মাটির নিচে! কেউ বা কারা পথের চিহ্ন আড়াল করতে নতুন তাজা ঘাস দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে পথ। পথ লুকোতে কি প্রায়ই এমন করা হয়? তাহলে তো বেশ পরিশ্রম করে! পদ্মজার উত্তেজনা বেড়ে যায়। সে উত্তর দিকের পথ ধরে এগোতে থাকে। হাঁটে প্রায় দশ মিনিট। এই মুহূর্তে সে চলে এসেছে জঙ্গলের মাঝে।

সামনে ঘন ঝোপঝাড়। পরিত্যক্ত ভাব চারিদিকে। ভূতুড়ে পরিবেশ। থেকে থেকে পেঁচা ডাকছে কাছে কোথাও। পদ্মজা বিপদ মাথায় নিয়ে ঝোপঝাড় দুই হাতে সরিয়ে অজানা গন্তব্যে হাঁটতে থাকে। কাঁটা লাগে মুখে। চামড়া ছিঁড়ে যায়। পদ্মজা ব্যথায় 'মা' বলে আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু ব্যথা নিয়ে পড়ে থাকেনি। সে এগোতে থাকে। ঝোপঝাড় ছেড়ে বড় বড় গাছপালার মাঝে আসতেই পদ্মজার মনে হয় তার পিছনে কেউ আছে! সে চট করে ঘুরে দাঁড়াল। কেউ নেই! সে মনের ভুল ভেবে সামনে হাঁটে। কিন্তু আবার মনে হয়,পিছনে কেউ আছে। পদ্মজা থমকে দাঁড়ায়। ঘুরে তাকায়। তার মনটা আনচান, আনচান করছে। কু গাইছে। কেমন ভয়ও করছে। এই গভীর জঙ্গলে সে একা। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা হলো। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে গভীর রাত। কোনো অঘটন ঘটে গেলে কেউ জানবে না। পদ্মজার রগে রগে শিরশিরে অনুভব হয়। ভয়টা বেড়ে গেছে। ভেঙে পড়ছে সে! রাত যেন শক্তি, সাহসিকতা চুষে নিতে পারে। পদ্মজা আল্লাহকে স্বরণ করে। হেমলতাকে স্বরণ করে। চোখ বুজে হেমলতার অগ্নিমুখ ভাবে। তিনি যেভাবে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেন সেভাবে পদ্মজা তাকায়। কান খাড়া করে চারপাশে যত জীব,প্রাণী আছে সবকিছুর উপস্থিতি টের পাওয়ার চেষ্টা করে। কাছে কোথাও অদ্ভুত এক জীব ডাকছে। নিশাচর পাখিদের তীক্ষ্ণ ডাকও শোনা যাচ্ছে। ঝিঁঝিঁপোকারা এক স্বরে ডাকছে। সাঁ,সাঁ বাতাস বইছে। এ সবকিছুকে ছাড়িয়ে একটা মানুষের গাঢ় নিঃশ্বাস তীক্ষ্ণভাবে কানে ঠেকে। খুব কাছে,পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে! নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পদ্মজার হাত দুটো শক্ত হয়ে যায়। অদ্ভুত এক শক্তিতে কেঁপে উঠে সে। চোখের পলকে দুই পা পিছিয়ে লোকটিকে না দেখেই ছুরি দিয়ে আঘাত করে। লোকটি 'আহ' করে উঠে। পদ্মজা চোখ খুলে ভালো করে দেখে,মুখটি অন্ধকারের জন্য অস্পষ্ট। তবে কণ্ঠটি পরিচিত মনে হলো। পদ্মজার ছুরির আঘাত লোকটির হাতে লেগেছে। পদ্মজা রাগী কিন্তু কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করে, 'কে আপনি?'

লোকটি ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ছুটে এসে পদ্মজার গলা চেপে ধরে। পদ্মজা আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। লোকটি এতো জোরে গলা চেপে ধরেছে যে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাথার উপর আরো ক'টি পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যায়। একটা বলিষ্ঠ হাত গাঢ় অন্ধকারে অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ের গলা টিপে ধরে রেখেছে। সুন্দরী মেয়েটি ছটফট করছে! লোকটির মুখ অন্ধকারে ঢাকা। ভয়ংকর দৃশ্য! পদ্মজা তার হাতের ছুরিটা শক্ত করে ধরে লোকটির পেটে ক্যাঁচ করে টান মারে। লোকটি আর্তনাদ করে সরে যায়। হাঁটুগেড়ে মাটিতে বসে পড়ে। পদ্মজা আবারও আঘাত করার জন্য এগোয়। লোকটি ফুলে ফেঁপে উঠে দাঁড়ায়। যেন নতুন উদ্যমে শক্তি পেয়েছে। লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ্মজার উপর। নখের আঁচড় বসায় হাতে। কেড়ে নেয় ছুরি। পদ্মজা ছুরি ছাড়া এমন হিংস্র পুরুষের শক্তির সামনে খুবই নগণ্য। যেভাবেই হউক এর হাত থেকে বাঁচতে হবে। পদ্মজা টর্চ দিয়ে লোকটির মাথায় বারি মারে। লোকটি টাল সামলাতে না পেরে পিছিয়ে যায়। পদ্মজা উলটোদিকে দৌড়াতে থাকে। পিছনে ধাওয়া করে আগন্তুক। দুইবার ছুরির আঘাত,একবার মাথায় টর্চের বারি খাওয়ার পরও আগন্তুক লুটিয়ে পড়েনি মাটিতে। নিশ্চিন্তে সে এই রহস্যের পাক্কা খেলোয়ার। পদ্মজার শাল পরে যায় গা থেকে। তার খোঁপা খুলে রাতের

মাতাল হাওয়ায় চুল উড়তে থাকে। ঝোপঝাড়ে মাঝে উদ্ভ্রান্তের মতো সে দৌড়াচ্ছে। কানে আসছে বাতাসের শব্দ! সাঁ,সাঁ,সাঁ! দুই হাতে শাড়ি ধরে রেখেছে গোড়ালির উপর। যেন শাড়িতে পা বেঁধে পড়ে না যায়। জুতা ছিঁড়ে পড়ে থাকে জঙ্গলে। কাঁটা কাঁটায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় পদ্মজার পা। রক্ত বের হয় গলগল করে। তবুও সে থামল না। সে এত সহজে মরতে চায় না। এই গল্পের শেষ অবধি যেতে হলে তাকে বাঁচতেই হবে।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা - ৫৮

____

রাতের আঁধার কেটে ভোরের আলোর মাধ্যমে শুরু হয়েছে আরেকটি নতুন দিন। পূর্ণা ও মগা মেঠোপথ ধরে হাওলাদার বাড়ি যাচ্ছে। মাথার উপর আকাশ আলো করা তেজবিহীন সূর্য। পূর্ণার পায়ের গতি চঞ্চল। সে অস্থির হয়ে আছে। পাশেই কৃষকের ফসলি জমি ছেয়ে গেছে সবুজের সমারোহে। ফসলি জমির সবুজ আর ঘাস, গাছ-পালার ডগায় জমে থাকা শিশির বিন্দু সকালের প্রকৃতিতে এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। অথচ সেই সৌন্দর্য পূর্ণাকে ছুঁতে পারছে না। অন্যবেলা হলে সে শিশিরভেজা ঘাসে গা এলিয়ে দিত। কোনো এক অদ্ভুত কারণে ঠান্ডার মধ্যেও তার শিশিরে ভিজতে ভালো লাগে। এখন সেই মন মেজাজ নেই। মগা কিছুক্ষণ আগে তাকে খবর দিয়েছে, গতকাল রাতে পদ্মজা আহত অবস্থায় জঙ্গল থেকে ফিরেছে। প্রেমা ঘরে পড়ছিল। বাসন্তী রান্নাঘরে। তাই তারা শুনতে পায়নি। পূর্ণা রোদে বসে সকালের খাবার খাচ্ছিল। যখন মগার কাছ থেকে এই খবর শুনল, খাবার রেখে মগাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কুয়াশা ঢাকা পথে উত্তুরে হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে পূর্ণা হাওলাদার বাড়ি আসে। এক ছুটে পদ্মজার ঘরে যায়। পদ্মজা ঘুমে। শিয়রে ফরিনা বসে আছেন। পূর্ণা করুণস্বরে জানতে চাইল,'ও খালাম্মা,আপার কী হয়েছে?'

ফরিনা ইশারায় শান্ত হতে বললেন। তারপর মুখে ধীরেসুস্থে রাতের ঘটনা খুলে বললেন। গতকাল এশার আযানের সময় পদ্মজা কোথা থেকে দৌড়ে সদর ঘরে এসে লুটিয়ে পড়ে। পা থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছিল। অনেকগুলো কাঁটা ফুঁটে ছিল। শ্বাস নিচ্ছিল ঘন ঘন। গালের চামড়ারও একই অবস্থা। ফরিনা,লতিফা,আমিনা,রিনু পদ্মজাকে দেখে চমকে যায়। আমিনা দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও,বাকি তিনজন পদ্মজাকে ধরে ঘরে নিয়ে আসে। পদ্মজা

পানি খেতে চায়। পানি খাওয়ার পর বলে,সে জঙ্গলে গিয়েছিল। জঙ্গলের কথা শুনে উপস্থিত দুজন কাজের মেয়ে ও ফরিনার মুখ পাংশুটে হয়ে যায়। তারা আর প্রশ্ন করেনি। যেন বুঝে গিয়েছে কি হয়েছিল! কাঁটা বের করতে গিয়ে আরো রক্তক্ষরণ হয়েছে। পদ্মজা যন্ত্রনায় ঠোঁট কামড়ে শুয়েছিল। চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়েছে। ব্যান্ডেজ করা খুব দরকার ছিল। কাটাছেঁড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ফরিনার ধারণা নেই। তাই তিনি মজিদ হাওলাদরকে গিয়ে বলেন। এই বাড়িতে প্রায়ই মারামারি, কাটাকাটি চলে। তাই মজিদ হাওলাদারের কাছে ব্যান্ডেজ,স্যাভলনসহ বিভিন্ন জিনিসপাতি রয়েছে। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপাতি নিয়ে আসেন। তারপর পদ্মজার পা ভালো করে পরিষ্কার করিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেন।

পূর্ণা পদ্মজার পায়ের কাছে বসে হাহাকার করে বলল,'আমার আপা এতো কষ্ট পেয়েছে!'

পূর্ণার চোখ বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। সে ফরিনার কাছে জানতে চায়,'ভাইয়া কোথায়?'

তাৎক্ষণিক ফরিনার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তিনি মিনমিনে গলায় বললেন,'জানি না।'

পূর্ণা অবাক স্বরে বলল,'ভাইয়া জানে না আপার কথা? রাতে দেখেনি?'

'বাবু তো বাড়িত আহেই নাই। রানিরে যে খুঁজতে গেল আর আইছে না।'

'রানি আপারে পাওয়া যায়নি?'

'না।'

'আচ্ছা-

পদ্মজা শরীর নাড়াচ্ছে দেখে পূর্ণা কথা থামিয়ে দিল। সে পদ্মজার পেটের কাছে এসে বসল। বলল,'আপা।'

পদ্মজা পিটপিট করে চোখ খুলে। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো টুপ করে পদ্মজার চোখেমুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পদ্মজা দ্রুত চোখ বুজে ফেলল। তারপর আবার ধীরে ধীরে চোখ খুলল। পূর্ণাকে দেখে অবাক হয়। উঠে বসতে চাইলে অনুভব করে পায়ে অনেক ব্যথা। সে পায়ের দিকে চেয়ে আরও অবাক হলো। পায়ে ব্যান্ডেজ এলো কী করে! মনে করার চেষ্টা করল। মনে মনে বিড়বিড় করে বলল,'রাতে এক ছুটে অন্দরমহলে চলে আসি। ভুলেও পিছনে ফিরে তাকাইনি। সদর ঘর থেকে আম্মা ঘরে নিয়ে আসেন। আব্বা ব্যান্ডেজ করে দেন। আম্মা খাইয়ে দেন। অনেক রাত

হয়। উনি তখনও ফিরেননি। তাই চিন্তা হয়। আম্মাকে জিজ্ঞাসা করলে আম্মা বলছিলেন,চলে আসবে। তারপর কি হয়েছিল মনে নেই। ঘুমিয়ে পড়ি বোধহয়।'

পদ্মজা ভাবনা থেকে বেরিয়ে সর্বপ্রথমে ফরিনাকে প্রশ্ন করল,'উনি ফিরেছেন?'

'না।'

পদ্মজা কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে অনেক্ষণ পর বলল,'চাচা আর রিদওয়ান ভাই ফিরেছে?'

'আইছে তো। তোমার চাচা এহন কই জানি না। রিদওয়ান হের ঘরেই আছে।'

'তাহলে আপনার ছেলে কোথায় আম্মা?' পদ্মজা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পূর্ণা পদ্মজার এক হাতে চেপে ধরে অনুরোধ করে,'আপা,শান্ত হও। খালাম্মা, রিদওয়ান ভাই আর ছোট চাচা কিছু বলেনি ভাইয়ার ব্যাপারে? আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?'

ফরিনা নির্বিকার স্বরে বললেন,'আমি হেরার লগে কথা কই না।'

'আপনার ছেলের জন্য আপনার চিন্তা হচ্ছে না? রাতে বাড়ি ফেরেনি। আপনি তো মা না-কি?' পদ্মজার গলা কাঁপছে। তার বুকের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে। আমিরের কিছু হলে সে মাঝ সমুদ্রে পড়বে। হেমলতার পর এই একটা মানুষকেই সে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে,ভালোবাসে। ফরিনা নিশ্চুপ। তিনি পদ্মজার কথা পাত্তা দিচ্ছেন না। পদ্মজার পা ব্যথায় টনটন করে উঠে। শীতের সময় কাটাছেঁড়া খুব যন্ত্রনার। যে যন্ত্রনায় পূর্ণা এখনও ভুগছে। সেদিন কাঁধে আঘাত পেল। আজও শুকায়নি ভালো করে। কিছুর ছোঁয়া লাগলেই ব্যথা করে। পূর্ণা পদ্মজাকে অনুরোধ করে বলল,'আপা,এমন করো না। ভাইয়া চলে আসবে। রানি আপাকে খুঁজতে গেছে। এজন্যই আসতে পারেনি।'

'রানি আপার বাপ-ভাই তো চলে আসছে।'

'তুমি তো জানোই আপা,রানি আপার বাপ-ভাই কেমন। রানি আপার জন্য মায়া শুধু ভাইয়ার। তাই ভাইয়া রানি আপারে ছাড়া আসতে পারছে না।'

পূর্ণার কথাগুলো যুক্তিগত হলেও পদ্মজার মন মানছে না। গোলমাল তো আছেই। পদ্মজা পূর্ণাকে এক হাতে সরিয়ে বিছানা থেকে নামার জন্য এক পা মেঝেতে রাখে। সঙ্গে সঙ্গে পুরো শরীরে একটা সূক্ষ্ম তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। পদ্মজা আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ে। ফরিনা ও পূর্ণা আঁতকে উঠল। পদ্মজাকে জোর করে শুইয়ে দিল। কিন্তু পদ্মজা নাছোড়বান্দা, সে তার স্বামীর খবর যতক্ষণ না পাবে শান্ত হবে না। ফরিনা আশ্বস্ত করে বললেন,'ওরা বাবুর ক্ষতি করব না। বাবুর কাছে ওদের অনেক কিছু পাওনের আছে। কাগজে-কলমে এই বাড়িডার মালিক বাবু।'

পদ্মজা তীর্যকভাবে তাকাল। বলল,'আপনি সব জানেন তাই না?'

পূর্ণা ফোড়ন কাটে,'কী জানবে?'

পূর্ণার উত্তর না দিয়ে পদ্মজা ফরিনাকে প্রশ্ন করল,'বলুন আম্মা।'

ফরিনা আড়চোখে দরজার দিকে তাকালেন। ফরিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে পদ্মজা,পূর্ণাও তাকাল। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ি দেখে মনে হচ্ছে,লতিফা। পূর্ণা ডাকতে উদ্যত হয়। পদ্মজা পূর্ণার হাত ধরে ফেলে। ইশারা করে চুপ থাকতে। তারপর ফরিনাকে প্রশ্ন করে,'তাহলে আপনি নিশ্চিত ওরা উনার ক্ষতি করবে না?'

'জানে মারব না।'

এ কথা শুনে পদ্মজা হকচকিয়ে যায়। সে উৎকর্ণ হয়ে বলল,'এ কথা কেন বলছেন?'

ফরিনা আবার নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। পদ্মজার মাথার রগ রাগে দপদপ করছে। এই বাড়ির মানুষগুলোর মনের ভাবনার কিনারা এতো জটিল! কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। একেকবার একেকজনের একেক রূপ।

পদ্মজাকে সারাদিন এটা-ওটা বলে বিছানায় রাখা হয়। ফরিনা সারাদিন পদ্মজার খেয়াল নিলেন। পদ্মজা সারাক্ষণ 'উনি,উনি' করে গেছে। ফরিনা কোনো জবাবই দিলেন না। আর দরজার ওপাশে সারাক্ষণ লতিফা ছিল। পূর্ণা অনেকবার লতিফাকে ধরেছে। তখন লতিফা হেসে বলেছে, পদ্ম আপা কেমন আছে, দেখতে আইছিলাম।' পূর্ণা কঠিনস্বরে অনেকবার নিষেধ করেছে,যেন আর না আসে। তবুও লতিফা এসেছে। পদ্মজা পূর্ণাকে নিষেধ করার পর পূর্ণা স্থির হয়। বিকেল হয়ে যায় তবুও আমিরের দেখা নেই। এদিকে পদ্মজা বিছানায় বসে ইশারায় ফজরের নামায কাযা করেছে। দুপুরের, আছরের নামাযও বসে বসে ইশারায় করেছে। (অসুস্থ মানুষ অজু ছাড়া কোন উপায়ে নিজেকে পবিত্র করে নামায পড়তে পারে,নামায শিক্ষা ঘাঁটলেই পাবেন।) ফরিনা দুপুরে না করেছিলেন,'এতো কষ্ট কইরা নামাযের কী দরহার! কইরো না। আল্লাহ মাফ করব এমনিতে।'

পদ্মজা তখন মিষ্টি করে হেসে জবাব দিয়েছিল,'যতক্ষণ হুঁশজ্ঞান আছে নামায ছাড়ার পথ নেই আম্মা। আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ মানুষকে ইশারায় নামায পড়ারও পথ দিয়েছেন। এটা কেন দিয়েছেন? নামায বাধ্যতামূলক বলে। ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অনেক বেশি আম্মা।'

ফরিনা এই কথার উপরে কিছু বলতে পারেননি। পদ্মজা ধর্মকর্ম নিয়ে খুব জানে। পদ্মজার কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। ধর্মের কথা বলার সময় পদ্মজা অন্য সবকিছু ভুলে যায়। তাই পুরোটা দুপুর তিনি পদ্মজাকে ইসলাম ধর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে প্রশ্ন করেই গেছেন। বিকেলবেলা পূর্ণা জানাল,সে আজ এই বাড়িতে থাকবে। পদ্মজা এ কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে জোরাজুরি করে পূর্ণাকে মোড়ল বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এই বাড়ি মোটেও সুবিধার না। সে ঝুঁকি নিতে চায় না। পূর্ণা চলে যাওয়ার আগে পদ্মজা কিছু সূরার নাম বলে দেয়। একটা দুই লাইনের সূরা শিখিয়ে দেয়। যেন পড়ে ঘুমায়। তাহলে বিপদ হবে না।

পূর্ণা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আযান পড়ে সন্ধ্যার। পূর্বের নিয়মেই নামায পড়ে পদ্মজা। ফরিনা পদ্মজার ঘর ছাড়েন। রান্নাঘরে যান। পদ্মজা নামায শেষ করে বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বুজে। আমিরের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে। দুইদিন কেটে যাচ্ছে আমিরের দেখা নেই। পদ্মজার মনের অবস্থা করুণ। বার বার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। প্রহর গুণছে এই বুঝি মানুষটা চলে এলো। পদ্মবতী, পদ্মবতী বলে একাকার করে দিল ঘর। কিন্তু আসে না। পদ্মজার বুকের বাম পাশে চিনচিন ব্যথা বেড়েই চলেছে। গতকাল রাতে আক্রমণ করা লোকটিকে সে তখন চিনতে পারেনি। কিন্তু এখন আন্দাজ করতে পারছে। তবে আমিরের শূন্যতা তাকে পোড়াচ্ছে খুব। সে এমন ছটফটানি নিয়ে আর থাকতে পারছে না। আহত পা মাটিতে রাখে। ভর দিতেই আবার সেই তীব্র ব্যথা। কিন্তু এর চেয়েও গভীর ব্যথা আমিরের দেখা না পাওয়া। পদ্মজার দুই পায়ের পাতার এক পাশ অক্ষত। সে ওই এক পাশ দ্বারা মাটিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এক তলায় যায়। সোজা চলে আসে রিদওয়ানের ঘরে। দরজা একটু খোলা ছিল। পদ্মজা একবার ভাবল,কড়া নেড়ে ঘরে ঢুকবে। কী মনে করে যেন,আর কড়া নাড়ল না। সোজা দরজায় ধাক্কা মারে। তখনই রিদওয়ান চমকে ঘুরে তাকায়। পদ্মজাকে দেখে তাড়াতাড়ি শার্ট পরতে উদ্যত হয়। পদ্মকা মুচকি হেসে বলল,'শার্ট পরে লাভ নেই। চোখে পড়ে গেছে।'

রিদওয়ান ফিরে দাঁড়াল। লম্বা করে হেসে শার্ট পরল। তারপর বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল,'বুদ্ধিমতী। তো দেখতে এসেছো কেমন আছি?

ভালো নেই। ছুরি এবং ছুরির মালিক দুজনেরই তেজ বেশি ছিল।'

পদ্মজা তিরষ্কার করে হাসল। দুই কদম এগিয়ে এসে বলল,'পাগলের প্রলাপ! আন্দাজ ঠিক হবে ভাবিনি। এবার বলুন,উনি কোথায়?'

রিদওয়ান ভ্রু দুটি বাঁকিয়ে বলল,'আমির?'

পদ্মজা জবাব দিল না। রিদওয়ান বলল,'আমি জানব কী করে,তোমার জামাই কোথায়?'

'জানেন না?' পদ্মজার কড়া প্রশ্ন।

রিদওয়ান উত্তরে হাসল। সে আলমারি থেকে একটা ছুরি বের করে দেখল। তারপর শীতল স্বরে প্রশ্ন করল,' তোমার ছুরিটার নাম কী? কোন দেশ থেকে এনে দিয়েছে আমির?'

'ফুটপাত থেকে কেনা। ছুরির ধার থাকলেই চলে। অভিজ্ঞ হতে হয় আক্রমণকারীর হাত। তাই ছুরির নাম না খুঁজে নিজের হাতটাকে অভিজ্ঞ করুন।' পদ্মজার সূক্ষ্ম অপমান বুঝতে রিদওয়ানের অসুবিধা হয় না। সে আলমারির কপাট লাগিয়ে এগিয়ে আসে। বলে,'ব্যঙ্গ করছ?'

পদ্মজা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল রিদওয়ানের দিকে। তারপর বলল,' কী আছে জঙ্গলে?'

'তা জেনে তুমি কী করবে?'

'কোন অপরাধ চলছে?'

'তোমাকে জানতে হবে না।'

'তখনও তো মারতে এসেছিলেন। এখন তো কাছে আছি,আক্রমণ করছেন না কেন?'

রিদওয়ান হাসল। পদ্মজার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। পদ্মজার ঘাড়ে ফুঁ দেয়। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজা দূরে সরে যায়। হুমকি দিয়ে বলে,'নোংরামি করার সাহস করবেন না। তখনের আঘাতগুলো ভুলে যাবেন না। আমি আমাকে রক্ষা করতে জানি।'

'এজন্যই পালিয়ে এসেছিলে?'

'পদ্মজা ক্ষণকালের জন্য পালিয়েছে। যা ই থাকুক আমি খুঁজে বের করবই। আর ধ্বংসও করব আমি।'

'দেখো,পদ্মজা তুমি আর এসব ঘেঁটো না। সুখে আছো সুখে থাকো। পরিণতি খারাপ হবে। ভালো করে বলছি,ঢাকা ফিরে যাও। এমুখো আর তাকিও না।'

'ভয় পাচ্ছেন?'

'কাকে? তোমাকে?' রিদওয়ান সশব্দে হাসল। রিদওয়ানের হাসি পদ্মজার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। রিদওয়ান হাসতে হাসতে বলল,' তোমাকে ভয় পাবে রিদওয়ান?'

'উনি কোথায় সত্যি জানেন না?'

'না,জানি না। '

'আমি কিন্তু-

'কী করবে? খুন করবে?' রিদওয়ান কিড়মিড় করে এগিয়ে আসে। পিছন থেকে পদ্মজার দুই হাত মুচড়ে ধরে বলল,'ভালো করে বলছি,আর গভীরে যেও না। এককালে তোমাকে বিয়ে করার কথা ভেবেছিলাম বলে বলছি, আর গভীরে যেও না। তোমার করুণ দশা আমিও আটকাতে পারব না।'

'ছাড়ুন আমাকে।'

'ছাড়ব না।' রিদওয়ান পদ্মজার কাঁধে ঠোঁট ছোঁয়াতেই পদ্মজার সারা শরীর রি রি করে উঠে। মাথা দিয়ে পিছনে থাকা রিদওয়ানের মুখে আঘাত করে। রিদওয়ান কিছুটা পিছিয়ে যায়। নাকে ভীষণ ব্যথা পেয়েছে। সে কিড়মিড় করে হিংস্র জন্তুর মতো তাকায়। বলিষ্ট,মোটাসোটা শরীরটাকে হারানো যেকোনো মেয়ের জন্য অসাধ্য। পদ্মজা নিজেকে রক্ষা করার জন্য টেবিল থেকে জগ নেয় হাতে। রিদওয়ান বলে,'তুমি বাড়াবাড়ি করছো পদ্মজা।'

'উনি যদি জানতে পারে আপনি আমার সাথে এই অসভ্যতামি করেছেন, আপনার দেহে প্রাণ থাকবে না।'

রিদওয়ান ফিক করে হেসে দিল। যেন মাত্রই পদ্মজা মজার কথা বলল। রিদওয়ান হাসি ঠোঁটে রেখে বলল,'আগে তো ও নিজেকে বাঁচাক। তারপর আমাকে প্রাণে মারবে।'

রিদওয়ানের এই কথাটি যেন বজ্রপাত ঘটায়। পদ্মজা চিৎকার করে জানতে চায়,'কোথায় রেখেছেন উনাকে? কী করেছেন উনার সাথে?'

'ঘরে যাও পদ্মজা।'

'আপনি বলুন,উনি কোথায়।'

'যাও ঘরে।'

'বলুন আপনি।'

'পদ্মজা-

পদ্মজা জগ ছুঁড়ে মারে রিদওয়ানের দিকে। রিদওয়ান সরে দাঁড়ায়। জগ স্টিলের থালাবাসনের উপর পড়ে। বিকট শব্দ হয়। সেই শব্দ শুনে খলিল ছুটে আসেন। ছুটে আসেন মজিদ। আসেনি একজন মহিলাও।

পদ্মজা বিছানার উপর ছুরি দেখে দ্রুত হাতে তুলে নেয়। সে তার নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে রিদওয়ানকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। রিদওয়ান ছুরি সহ পদ্মজার হাত ধরে ফেলে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে,' তোমার তিন বছরের ছুরি চালানোর অভিজ্ঞতা আর আমার বিশ বছরের পেশা। পেরে উঠতে পারবে না।'

পদ্মজার হাত থেকে খলিল ছুরি টেনে নেয়। পদ্মজা হিংস্র বাঘিনী হয়ে উঠে। আমিরের শোকে তার মাথা কাজ করছে না। দুই দিন হয়ে গেল আমিরের দেখা নেই। সারা শরীরে ব্যথা। তার নিজেকে উন্মাদ মনে হচ্ছে। সে রাগে রিদওয়ানের গলা চেপে ধরে। রিদওয়ান পদ্মজার হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করে। পদ্মজাকে নানাভাবে আঘাত করে। পদ্মজা কিছুতেই ছাড়ে না। তার শরীরের শক্তি যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আমির তার জীবনে কতোটা মূল্যবান তা কেউ জানে না। আমিরের জন্য সে সবকিছু করতে পারে। খলিল এক হাতে পদ্মজার চুল মুঠ করে ধরে,অন্য হাতে পদ্মজার গাল চেপে ধরে বলে,'বে*র ছেড়ি,আমার ছেড়ারে ছাড়।'

তাও পদ্মজা ছাড়ে না। মজিদ এগিয়ে আসে। পদ্মজাকে টেনে সরায়। পদ্মজার শরীর কাঁপছে। সে চিৎকার করে বলছে,'উনার কিছু হলে আমি কাউকে ছাড়ব না। মেরে ফেলব। মেরে ফেলব একদম।'

রিদওয়ান ছাড়া পেয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। তারপরই তেড়ে এসে পদ্মজার গালে থাপ্পড় বসায়। পদ্মজার গালের ক্ষত থাপ্পড়ের ভার নিতে পারেনি। চামড়া অনেক বেশি ছিঁড়ে যায়। পদ্মজার দুই হাত মজিদ ধরে রেখেছেন। পদ্মজা মজিদকে খেয়াল করেনি। সে চেঁচিয়ে ফরিনাকে ডাকে,'আম্মা,আম্মা আপনি কোথায়? আম্মা ওরা আপনার ছেলেকে মেরে ফেলবে। আম্মা...'

ফরিনা আসেন না। খলিল হুংকার ছাড়েন,'এই খা*কির ছেড়ির আগুন বেশি গত্রে। ছেঁইড়া দে রিদু।'

পদ্মজার কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সে মুখভর্তি থুথু ছুঁড়ে দেয় খলিলের মুখের উপর। তাৎক্ষণিক রিদওয়ান পদ্মজার শাড়ির আঁচল দিয়ে পদ্মজারই গলা পেঁচিয়ে ধরে কিড়মিড় করে বলল,'এই মা*র ঝি, তোরে অনেক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছিলাম। ভালো কথা কান দিয়ে ঢুকে না? মায়ের মতো হইছস? তোর মারেও মেরে দিতাম। যদি নিজে থেকে না মরতো।'

পদ্মজার চোখ উল্টে যাচ্ছে। মজিদ রিদওয়ানকে বলে,'রিদওয়ান ওরে ছেড়ে দে। মরে যাবে।'

রিদওয়ান তাও ছাড়ে না। খলিল রিদওয়ানকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরালেন। পদ্মজার শরীরের সব শক্তি শেষ। সে কাশতে কাশতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। চোখ বুজে আসে। কল্পনায় ভেসে উঠে,আমিরের শ্যামবর্ণের মায়াময় মুখ। আর মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে ডাকে, আম্মা। তারপরই জ্ঞান হারায়। তিনজন পুরুষের মাঝে লুটিয়ে পড়ে আছে পদ্মজা। বুকে শাড়ি নেই। খয়েরি রঙের ব্লাউজ পরা। গলায় লাল দাগ। মুখে নখের আঁচড়। গালে চেপে ধরার দাগ। চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ার রক্ত। ফর্সা দুই হাত শক্ত করে চেপে ধরার দাগ জ্বলজ্বল করে ভেসে আছে। চুল কয়টা ছিঁড়ে পড়ে আছে আশেপাশে। পায়ের সাদা ব্যান্ডেজ আবার লাল হয়ে উঠেছে। আগুন সুন্দরী পদ্মজার খুঁতহীন রূপে খুঁতের মেলা বসে গেছে! জানালা দিয়ে আসা উত্তরে হাওয়ায় হুঁশহারা পদ্মজার রক্ত ধীরে ধীরে শুকাতে থাকে। কেউ নেই তাকে বুকে আগলে ধরার জন্য। পদ্মজার অবস্থা দেখে যেন ঘরের দেয়ালগুলোও গুমরে গুমরে কাঁদছে।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

(চরিত্র উপাস্থাপনার প্রয়োজনে গালি ব্যবহার হয়েছে। কেউ বিভ্রান্ত হবেন না।)#আমিপদ্মজা - ৫৯

মাথার উপর সূর্য নিয়ে কলসি কাঁখে পূর্ণা আজিদের বাড়িতে ঢুকে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন অথচ কাঁখে পিতলের প্রকাণ্ড কলসি! খালি কলসির ভারেই একটু বাঁকা হয়ে পড়েছে সে। পানিভর্তি কলসি নিয়ে কী করে বাড়ি ফিরবে কে জানে! সকাল থেকে তাদের টিওবওয়েলে সমস্যা। পানি আসছে না। সকালে বাসন্তী আজিদের বাড়ি থেকে পানি নিয়েছেন। এখন আবার আসতে চেয়েছিলেন,পূর্ণা আসতে দিল না। সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। বাসন্তী অনেকবার বলেছেন,'এইটুকু শরীর নিয়ে পারবি না।'

পূর্ণা অহংকার করে বলেছে,'আমি পারি না এমন কিছু নেই। তুমি ঘরে যাও তো।'

আজিদের বাড়ির সামনে পুকুর আছে। সেখানে নতুন ঘাট বাঁধানো হয়েছে। ঘাটে গোসল করছে আজিদের বউ আসমানি। মাসেক ছয় আগেই বিয়ে হলো। আসমানির সাথে পূর্ণার অনেকবার কথা হয়েছে।

পূর্ণা আসমানিকে দেখেনি। আসমানি পূর্ণাকে দেখে ডাকল,'কি গো পূর্ণা! ফেইরাও চাইলা না। ভাবিরে চোক্ষে পড়ে নাই?'

পূর্ণা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। অপরাধী কণ্ঠে বলল,'খেয়াল করিনি ভাবি।'

'পানি নিতে আইছো?'

'হুম,আমাদের টিউবওয়েল-

'শুনছি খালাম্মার কাছে। একটু বইসো। আমি ডুব দিয়া আইতাছি।'

'আচ্ছা ভাবি।'

পূর্ণা মুখে আচ্ছা বললেও সে মনে মনে পরিকল্পনা করে পানি নিয়ে অন্য পথ দিয়ে বাড়িতে চলে যাবে। আসমানি একবার কথার ঝুড়ি নিয়ে বসলে, কথা ফুরোয়ই না। পূর্ণা আড্ডাবাজি খুব পছন্দ করে। কিন্তু এখন তার তাড়া আছে। তাড়াতাড়ি ফেরা চাই। দুপুর হয়ে গেছে। পদ্মজাকে এখনও দেখতে যেতে পারেনি সে। গতকাল বিকেলে যে দেখে এলো,তারপর আর খোঁজ মিলেনি। চিন্তায় সারারাত ঘুম হয়নি পূর্ণার। আজিদের বাড়ির অঙ্গন শূন্য, ঘরের বাইরে কেউ নেই। পূর্ণা সোজা কলপাড়ে চলে আসে। দ্রুত কল চেপে কলসি পানি ভর্তি করে। তারপর কলসি কাঁখে তুলতে গিয়ে হয় সমস্যা। কিছুতেই তুলতে পারছে না। আসমানি গামছা দিয়ে চুল মুছতে মুছতে এগিয়ে আসে। ফর্সা, সুন্দর একটা মুখ। নতুন বউ,নতুন বউ ছাপটা যেন এখনও মুখে লেগে আছে। আসমানি কাছে এসে হেসে বলল,'এত বড় কলসি নিবা কেমনে? খালাম্মারে পাঠাইতা।'

'তুমি একটু সাহায্য করো।'

'কী কও? আমি লইয়া যামু কলসি?'

'আমি কি তা বলছি ভাবি! কাঁখে তুলতে সাহায্য করো।'

আসমানি ঠোঁটে হাসি নিয়ে বলল,'ওহ! বাড়ির বউ তো শরম লজ্জার ডরেই বাইর হই না। নয়তো বাড়ি অবধি দিয়া আইতাম।'

'বাড়ি থেকে বের হতেই লজ্জা, ভাসুরের সাথে শুতে লজ্জা নাই!'

পূর্ণা কটাক্ষ করে বলল। ঠোঁটে তিরস্কার করা হাসি। আসমানির চোখমুখের রঙ পাল্টে যায়। ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠে। চোখ ছাপিয়ে জল নামে। ক্ষণমুহূর্ত পূর্ণার দিকে চেয়ে থাকে আসমানি। তারপর এদিক ওদিক দেখে পূর্ণার এক হাত চেপে ধরে চাপা স্বরে বলল,'কী কইরা জানছো?'

পূর্ণা এক ঝটকায় আসমানির হাত সরিয়ে দিল। বলল,'তোমার সাথে দেখা করার জন্য এসেই জানালা দিয়ে এই নোংরামি দেখেছি। আজিদ ভাই মাটির মানুষ। কত ভালো উনি। উনাকে কেন ঠকাচ্ছো ভাবি?'

আসমানি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাত দুটি অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। চোখ থেকে জলের ধারা নেমেছে। পূর্ণার দেখে মায়া হয়। সে কণ্ঠ নরম করে বলল,' কাউকে বলিনি আমি। বারো-তেরো দিন যখন চেপে রাখতে পারছি, সারাজীবন পারব। ভালো হয়ে যাও ভাবি। আজিদ ভাইকে ঠকিও না। পাপ করো না।'

আসমানি অশ্রুরুদ্ধকর কণ্ঠে বলল,'আমারে খারাপ ভাইবো না।'

পূর্ণা কিছু বলল না। খারাপ কাজ করার পরও কী করে খারাপ না ভেবে থাকা যায়! সে আসমানিকে অগ্রাহ্য করে কলসি তোলার চেষ্টা চালালো। আসমানি দ্রুত পায়ে কলপাড় ছাড়ে। পূর্ণা কলসি কাঁখে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু ভার খুব বেশি। এখনই কোমর মচকে যাবে বোধহয়। পূর্ণা কলপাড় ছাড়তেই সামনে এসে দাঁড়ায় আসমানি। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে, এক নিঃশ্বাসে বলল,'কাউরে কইয়ো না পূর্ণা। আমারে তোমার ভাই আর ঘরে রাখব না। আমি চাই নাই এমন করতে। শফিক ভাই তো আমগোর থানার পুলিশ মানুষ। আমার ছোড্ড বইনডা এক মাস ধইরা হারায়া গেছে। অনেক খুঁজছি পাই নাই। পুলিশ দিয়া খোঁজানোর ক্ষেমতা আমার বাপের নাই। শফিক ভাইরে কইছিলাম,তহন উনি কইছে,উনার সাথে-

আসমানি ফোঁপাতে থাকে। চোখের জলে সমুদ্র বয়ে যাবে এক্ষুণি। পূর্ণা খুব অবাক হয়। একটা মানুষ কতোটা নিকৃষ্ট হলে এভাবে ছোট ভাইয়ের বউয়ের বিপদে সাহায্য করার নামে এমন কুৎসিত শর্ত রাখতে পারে? পূর্ণার রাগ হয় খুব। আসমানিকে আশ্বাস দিয়ে পূর্ণা বলল,'ভাবি কেঁদো না। যে মানুষ এমন শর্ত দিতে পারে সে কখনোই কাউকে সাহায্য করতে পারে না। উনি তোমার বোনকে খুঁজবে না। কিন্তু আশা দেখিয়ে ভোগ ঠিকই করবে। আর সুযোগ দিও না। দোয়া করো শুধু,তোমার বোন যেন ফিরে আসে।'

আসমানি শাড়ির আঁচল দিয়ে দুই চোখ মুছে বলল,'জানো পূর্ণা,আমি আমার বইনরে ছাড়া একটা দিনও থাকতে পারতাম না।'

'তোমার সাথে তো এক মাসে আরো দুইবার দেখা হয়েছে। কখনো তো বললে না,তোমার বোনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আম্মা কইছে,ছেড়ি মানুষ হারায়া গেলেও কেউরে কইতে নাই। মানুষ ভাববো ছেড়া নিয়ে পলাইছে।'

'আচ্ছা ভাবি,আমি আসি আজ। কাল এসে সব শুনব। অনেক কথা বলব।'

আসমানি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। পূর্ণা ধীর পায়ে আজিদের বাড়ির উঠোন ছাড়ে। পথে উঠতেই দেখা হয় আজিদের মার সাথে। নাম মালেহা বানু।সাথে আবার পাশের বাড়ির বৃদ্ধা জয়তুনি বেগম রয়েছেন। বৃদ্ধার মাজা বয়সের ভারে ঈষৎ ভেঙ্গে শরীর সামনে ঝুঁকে পড়েছে। পূর্ণাকে দেখে মালেহা বললেন,'কি রে ছেড়ি, পানি নিতে আইছিলি?'

'জি,খালা।'

'কলসির ভারে দেহি সাপের লাহান বাঁইকা গেছস লো!' বললেন জয়তুনি বেগম।

পূর্ণার সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। সে কলসি নামাল। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিল। মালেহা বললেন,'বিয়েশাদী কি করবি না? তোর বইনে না আইছে বিয়া দিব?'

'দিবে মনে হয়।'

'তোর লগে হাওলাদার বাড়ির কোন ছেড়ার নাকি ঢলাঢলি চলে?' বললেন জয়তুনি বেগম। কথা বলার ভঙ্গিটা দৃষ্টিকটু ছিল। পূর্ণার গা জ্বলে উঠে। রেগে যায়। বলে,'আপনাকে কে বলেছে?'

'এইসব কিচ্ছা বাতাসে ছড়ে। এমন আর করিছ না পূন্না। গায়ের রঙডা ময়লা,বয়সও বেশি আবার তো আরেক কিচ্ছাও আছে। কয়েক বছর আগে বেইজ্জতি হইছিলি গ্রামবাসীর হাতে। এহন আবার এমন কিচ্ছা কইরা বেড়াইলে কেউ বিয়া করব না। এহন দেখ তোর বইনে কোনো ল্যাংড়া, লুলা দেইখা বিয়া দিতে পারেনি।' বললেন মালেহা।

পূর্ণার মাথার আগে মুখ চলে বেশি। সে কিছু কড়া কথা শোনাতে উদ্যত হয়। তার পূর্বেই একটা প্রিয় পুরুষ কণ্ঠ ধেয়ে আসে,'পূর্ণারে কে বিয়া করব না করব সেটা তো আপনেরে দেখতে কয় নাই কেউ।'

পূর্ণা না তাকিয়েই চিনে যায় কণ্ঠটির মালিককে। বুকের বাঁ পাঁজর ছ্যাঁত করে উঠল। উপস্থিত তিনজন একসাথে ঘুরে তাকায়। কিছুটা দূরে মৃদুল দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় গামছা বাঁধা। পরনে কালো শার্ট আর নীল লুঙি। রোদের আলোয় গায়ের ফর্সা রঙটা চিকচিক করছে। কী সুন্দর! পূর্ণা হেসে আবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। মৃদুল মালেহাকে উদ্দেশ্য করে আবার বলল,'নিজের চরকায় তেল দেন। পূর্ণার গায়ের রঙ ময়লা আর আপনের কি পরিষ্কার? নিজের রঙডা আগে দেখেন।'

'এই ছেড়া তুমি কই থাইকা আইছো? বাপের নাম কিতা?' বললেন মালেহা।

'কেন? পছন্দ হইছে? ছেড়ি আছে? বিয়া দিবেন? ছেড়ির গায়ের রঙ পরিষ্কার তো?'

মালেহা বানু হকচকিয়ে গেলেন। এ কেমন জাতের ছেলে! কেমন ফটফট করে! মৃদুল যেন বিরাট রসিকতা করেছে,এমনভাবে হাসল পূর্ণা। মৃদুল কলসি কাঁধে তুলে নিল। পূর্ণাকে আদেশের স্বরে বলল,'হাসি থামায়া,হাঁটো।'

মালেহা বানু ও জয়তুনি বেগমকে অবাক করে মৃদুল, পূর্ণা চলে যায়। কিছুটা দূর এসে পূর্ণা প্রথম মুখ খুলল,'কখন এসেছেন?'

'কিছুক্ষণ আগে। মুখটা শুকনা দেখাইতাছে কেন?'

'আপাকে দেখেছেন আপনি?'

'না। অন্দরমহলে ঢুকি নাই।'

পূর্ণা চুপ হয়ে যায়। মৃদুল বলল,'এতো ভার কলসি নিতে পারছো?'

'কষ্ট হয়েছে।'

'তো নিতে গেলা কেন?'

পূর্ণা আবার চুপ হয়ে গেল। মৃদুল দাঁড়িয়ে পড়ে। আর এক মিনিট হাঁটলেই মোড়ল বাড়ি। সে পূর্ণার মুখের দিকে চোখ রেখে বলল,'খুশি হও নাই?'

'কী জন্য?' পূর্ণা অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'এইযে আইয়া পড়ছি।'

পূর্ণা চোখ নামিয়ে ফেলে। মুচকি হাসে। চোখেমুখে লজ্জা ফুটে উঠে। মৃদুলও হাসল। সে যা বোঝার বুঝে যায়। আশেপাশে অনেক গাছপালা। বড় একটা গাছের ছায়ায় তারা দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের কেউ দেখে ফেলবে,এই ভয় দুজনের কারোর মধ্যে নেই। পূর্ণার পরনের কাপড়খানি ভেজা। কলসি থেকে পানি পড়েছে বোধহয়। কিছু অংশ পেট ও এক পাশের কোমড়ের সাথে কাপড় লেপ্টে আছে। মাথায় ঘোমটা নেই। গাছের পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে এক ঝলক রোদ পূর্ণার মুখ ঘেঁসে কাঁধ ছুঁয়ে মাটিতে পড়ে। সবকিছু মৃদুলের খেয়ালে চলে আসে। সে চমৎকার করে পূর্ণাকে বলল,'ঘোমটা দিয়ে পথে হাঁটবা। বুঝছো ডাগরিনী?'

পূর্ণা ঠোঁটে হাসি রেখেই বাধ্যের মতো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। তারপর চট করে ঘোমটা টেনে নিল। মৃদুলের ডাগরিনী শব্দটা তার মন কাঁপিয়ে তুলেছে। খুশিতে উড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। ডাগরিনী বলেছে মানে,তার চোখ দুটি ডাগর,ডাগর যা মৃদুলের ভালো লেগেছে! তার প্রশংসা করেছে!

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সম্পন্ন করে পূর্ণা তৈরি হয় হাওলাদার বাড়ি যাওয়ার জন্য। সাথে তৈরি হয় বাসন্তী, প্রেমা ও প্রান্ত। তখন মগা আসে। পূর্ণার হাতে চিঠি দিয়ে বলে,'তোমার বইনে দিছে।'

চিঠি হাতে নিয়ে পূর্ণা মনে মনে ভয় পেল। আপা চিঠি কেন পাঠাবে? অজানা আশঙ্কায় পূর্ণার বুক ধুকপুক করতে থাকে। মগা চলে যায়। পূর্ণা চিঠি খুলে-

আদরের বোন,

তুই আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিস আমি জানি। আমার সব কথাও মানিস। মাঝে মাঝে ফাঁকিবাজিও করিস তবে এখন আমি তোকে যা করতে বলব একদম অমান্য করবি না। এটা আমার অনুরোধ।

যতদিন না আমি আসছি বা চিঠি লিখছি একদম এই বাড়িতে আসবি না। কেউ যদি বলে,আমি পাঠিয়েছি তোকে আনতে। তাও আসবি না। চোখ-কান খোলা রাখবি। প্রেমাকে দেখে রাখবি। আমি ভালো আছি। পায়ে একটু আরাম পেয়েছি। একদম চিন্তা করবি না। আমি খুব দ্রুত আসব। কেন নিষেধ করেছি আসতে তা নিয়ে মাথা ঘামাস না। আমি একদিন তোকে সব বলব। এখন আমার কথাটা রাখ। এমুখো হস না। আমি ভালো আছি। আবার ভাবিস না,আমি কোনো বিপদে আছি। শুনবি কিন্তু আমার কথা। আমার কথা অমান্য করলে আমার সঙ্গ আর পাবি না,মনে রাখবি। খাওয়াদাওয়া করবি ঠিকমতো। নামায পড়বি। ঘরের কাজকর্মে হাত লাগাবি।

ইতি

তোর আপা।

লেখাগুলো এলোমেলো, অগোছালো। মনে হচ্ছে,তাড়াহুড়ো করে লিখেছে অথবা অনেক কষ্টে একেকটা অক্ষর লিখেছে। কপালে ছড়িয়ে থাকা এক গাছি চুল কানে গুঁজে পূর্ণা আবার চিঠিটা পড়ল। পড়ার পর এতটুকু নিশ্চিত হয়েছে,তার বোন ভালো নেই। বড় বিপদে আছে।

#পদ্মজা

চলবে....

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা - ৬০

ঘুম ভাঙতেই পদ্মজা হকচকিয়ে যায়। চোখের সামনে সব কালো। কালো রঙ ব্যাতীত কিছু নেই। ঘোর অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। পদ্মজা চোখ কচলে আবার তাকায়। না,কিছুই পরিবর্তন হয়নি! সবকিছু কালো। বিকেলে সে বৈঠকখানার সোফায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। তারপর নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ে। আর ঘুম ভাঙতেই দেখছে সব অন্ধকার! পদ্মজা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় দেয়ালের সুইচ। তখন সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে একটা আলো। আলোয় ভেসে উঠে আমিরের মুখ। পদ্মজা দেয়াল থেকে হাত সরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আমির পদ্মজার চেয়ে দুই হাত দূরে এসে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি আবেগপ্রবণ। পদ্মজার হৃদস্পন্দন থমকে যায়। কাচুমাচু হয়ে প্রশ্ন করল,'আপনি সব বাতি নিভিয়েছেন?'

আমির জবাব না দিয়ে হাতে থাকা সুন্দর কাচের হারিকেনটি পাশে রাখল। তারপরই পদ্মজা কিছু বুঝে উঠার আগে পদ্মজাকে কোলে তুলে নিল। পদ্মজা আমতাআমতা করে শুধু বলতে পারল,'এ...এ...ই কি...কি?'

আমির তাদের নিজস্ব ঘরে নিয়ে আসে পদ্মজাকে। পদ্মজা ঘর দেখে অবাক হয়। ঘরের চারিদিকে অদ্ভুত সুন্দর কাচের ছোট হারিকেন। আর মাঝে এক ঝুড়ি পদ্মফুল! সময়টা শরৎকাল। দিনের বেলা শরতের সাদা মেঘ নীল আকাশে পাল তুলে, ছবির মতো ঝকঝকে সুন্দর করে তুলে আকাশ। কমে এসেছে যখন তখন বৃষ্টির জ্বালাতন।

সময় বিল ঝিল ঝাপিয়ে শাপলা আর পদ্ম ফোটার। এতো পদ্ম ফুল দেখে মনে হচ্ছে বড় এক বিলের সব পদ্ম ফুল তুলে নিয়ে এসেছে আমির। পদ্মজা প্রশ্ন করার পূর্বে আমির পিছন থেকে দুই হাতে পদ্মজার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল,'মনে আছে,প্রথম রাতে বলেছিলাম একদিন পদ্ম ফুল দিয়ে আমার পদ্মাবতীকে সাজাব! সময়টা নিয়ে এসেছি। দেখো তাকিয়ে।'

পদ্মজা ঝুড়ি ভর্তি পদ্ম ফুলগুলোর দিকে তাকায়। তার চোখ দুটি জলে ছলছল করে উঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে আমিরের দিকে চেয়ে আবেগমাখা কণ্ঠে বলল,'সে কথাটাও মনে রেখেছেন!'

উত্তরে আমির হেসেছিল। প্রথম রাতের চেয়ে কোনো অংশে কম সুন্দর ছিল না সেই রাত। পদ্মজা সেজেছিল পদ্ম ফুল দিয়ে। স্বামী যত্ন করে সাজিয়েছিল। সময়টাকে আরো সুন্দর করে তুলতে প্রকৃতি দিয়েছিল মৃদু শীতল বাতাস।

জানালা দিয়ে প্রবেশ করা বাতাসের দাপটে পদ্মজার ঘুম ছুটে যায়। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। হাত বাড়িয়ে আমিরকে খোঁজে। নেই,বিছানা খালি! আবার সে পুরনো দিনের আরেকটি সুন্দর মুহূর্ত স্বপ্নে দেখেছে। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠে। আজ পাঁচ দিন আমির নেই। তার কাছে তার স্বামী নেই। কোনো এক অজানা জায়গায় বন্দি হয়ে আছে। পদ্মজা এক হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছল। বালিশের উপর থাকা আমিরের শার্টটা হাতে নিয়ে চুমু খেল। তার চোখ দুটি আবার ভিজে উঠে। সেদিন রিদওয়ান, খলিল,মজিদ দ্বারা আহত হওয়ার পর তাকে ওখান থেকে কে এনেছে সে জানে না। চোখ খুলে ফরিনাকে দেখেছিল। তিনি ডুকরে কাঁদছেন আর চোখের জল মুছছেন। লতিফাকে জিজ্ঞাসা করে পদ্মজা জানতে পারে,সময়টা দুপুর । সর্বাঙ্গে তখন বিষধর ব্যথা। উঠার শক্তিটুকু নেই। গলায় ব্যথা একটু বেশি ছিল। প্রথমে তার মাথায় আসে আমিরের কথা। রাতের ঘটনা মনে পড়তেই বুঝে যায়,এভাবে সে এদের সাথে পারবে না। তাকে তার মায়ের মতো শান্ত হতে হবে। সময়-সুযোগ বুঝে কাজ করতে হবে। ফরিনা আদর করে খাইয়ে দেন। তিনি পদ্মজার উপর করা নির্মম অত্যাচার আটকাতে পারেননি বলে বারবার ক্ষমাও চেয়েছেন। তিনি নাকি চেষ্টা করেছিলেন। কীরকম চেষ্টা করেছেন সেটা বলেননি। পদ্মজা জিজ্ঞাসাও করেনি। এরপর পদ্মজা কাঁপা হাতে পূর্ণাকে চিঠি লিখে,ফরিনার হাতে দেয়। তিনি যেন মগাকে দিয়ে দেন।

তারপরের দিনগুলো চুপচাপ কাটিয়ে দেয় পদ্মজা। আমিরের শোকে ভেতরে ভেতরে ঝড় বইলেও সামনে সে নিশ্চুপ থেকেছে। সুস্থ হওয়াটা আসল। নয়তো কাজের কাজ কিছুই হবে না। উল্টো নর্দমার কীটগুলোর হাতে মরতে হবে। আমিরের জন্য দোয়ায় দুই হাত তুলে অঝোরে কেঁদেছে,যেন আমির ভালো থাকে। আর তার কাছে ফিরে আসে। খুব মনে পড়ে মানুষটাকে! হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে পদ্মজার। পদ্মজা আমিরের শার্ট বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। ফরিনা এসে দাঁড়ান দরজার সামনে। কেউ একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল হতেই,পদ্মজা হাতের উলটোপাশ দিয়ে চোখের জল মুছে তাকাল। ফরিনা ঘরে প্রবেশ করেন। গায়ে সাদা-খয়েরি মিশ্রণের শাল। পদ্মজা আমিরের শার্ট বালিশের উপর রেখে বলল,'আছরের আযান পড়েছে আম্মা?'

মৃদুল অন্দরমহলের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। তাকে মদন কিছুতেই অন্দরমহলে ঢুকতে দিচ্ছে না। গত চারদিন ধরে সে চেষ্টা করছে অন্দরমহলে ঢোকার। গত তিন দিন ভুড়িওয়ালা একজন ঢুকতে দিত না। এখন দিচ্ছে না মদন। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে সে মৃদুলের সাথে তর্ক করছে। মৃদুল বলছে,'দুলাভাই ঢুকতে দেন কইতাছি। সমস্যাটা কিতা ঢুকলে? সেটাই তো বুঝতাছি না।'

'দেহো মৃদুল মিয়া এইডা আমার কথা না। মজিদ চাচার কথা। উনি কইছে বাড়ির ভিতরে নতুন কেউরে ঢুকতে না দিতে।'

'আমি তো আত্মীয় নাকি? আমার সাথে এমন করা হইতাছে কেন? আগে তো ঠিকই ঢুকতে দিত। এহন দেয় না কেন?'

'হেইডা তো আমি জানি না।'

'সরেন কইতাছি। নইলে ওইযে গাছের মোড়াড়া ওইডা দিয়ে আবার মাথাডা ফাডায়া দিব। একবার মারছে আপাই এহন আমি মারাম।'

'হেইডাই করো,তবুও আমি চাচার কথা অমান্য করতে পারতাম না।'

'আমার কিন্তু কইলাম, রাগ উঠতাছে। মাটির তলায় গাইরালামু।'

'মিয়া ভাই তুমি আমারে যা ইচ্ছা কইরালাও। আমি-

মৃদুলের মাথা বরাবরই চড়া! হুট করে খুন করার মতো রাগ চেপে যায় মাথায়। সে মদনের গলা চেপে ধরে। মদন কাশতে থাকল। আলো কান্না শুরু করে। আলোর কান্না শুনে খলিল বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। সদর দরজার সামনে এমন দৃশ্য দেখে তিনি দৌড়ে আসেন। মৃদুলকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন। হুংকার ছাড়েন,'তোমার এতো সাহস কেমনে হইছে? আমার জামাইয়ের গলা চাইপা ধরো!'

মৃদুলের নাক লাল হয়ে গেছে রাগে। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। রাগী মেজাজ নিয়েই দুই হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে বলল,' আপনার জামাই আমারে ভেতরে ঢুকতে দেয় না।'

'তুমি মেহমান মানুষ, আলগ ঘরে থাকবা। এইহানে কী দরকার?'

'এই নিয়ম কবে করছেন আপনেরা? আগের বার যখন ছিলাম তহন তো ঠিকই ঢুকতে দিছেন।'

'এহন আর ঢুহন যাইব না। এইডা অন্দরমহল। বাড়ির বউ-ছেড়িদের জায়গা।'

'সত্যি কইরা কন তো,বাড়ির ভিতর কী চলে?'

খলিলের মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে,অসভ্য ছেলেটার কানের নিচে কয়টা দিয়ে দিতে। তিনি কটাক্ষ করে মৃদুলকে বললেন,'নিজের বাড়ি রাইখা এইহানে পইড়া রইছো কেন? মাইনষের অন্ন নষ্ট করতাছো। নিজের বাড়িত যাও।'

অপমানে মৃদুল বাকহীন হয়ে পড়ে! সে ক্ষণকাল কথা বলতে পারে না। তার আপন ফুফা এমন কথা বললো! ক্ষণমুহূর্ত পর সে জ্বলে উঠে বলল,'আপনের বাড়ির উপর থুথু মারি। আমি ব্যাঠা মিয়া বংশের ছেড়া। শত বিঘার মালিক আমি একাই। আপনের অন্নের ঠেকা পড়ে নাই আমার। আমার বাড়িত কামলাই আছে দশ-বারো জন। আমি কাইলই চইলা যাইয়াম বাড়িত।'

মৃদুলের আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না। সে ঘুরে দাঁড়ায়। কাছেই একটা বিরাট পাতিল ছিল। কোনো কাজে হয়তো বের করা হয়েছে। সে পাতিলে জোরে লাথি মেরে হনহন করে চলে যায়। পূর্ণা তার বোনের খবর নিয়ে দিতে বলেছে বলেই,সে বার বার অন্দরমহলে ঢোকার চেষ্টা করেছে। নয়তো মৃদুলকে কেউ একবার কোনো ব্যাপারে না করলে,সে দ্বিতীবারের মতো সেখানে ফিরেও তাকায় না।

পদ্মজার কথার জবাব দিলেন না ফরিনা। তিনি পদ্মজার পাশে গিয়ে বসলেন। পিছনে রিনু আসে। হাতে খাবারের প্লেট। তিনবেলা ফরিনাই খাইয়ে দিচ্ছেন। যত্ন নিচ্ছেন পদ্মজার। মায়ের চেয়ে কোনো অংশে কম করছেন না। তবুও এই মানুষটা কোন কারণে সেদিন তার চিৎকার শুনেও বাঁচাতে যায়নি? ফরিনা প্লেট হাতে নিতেই পদ্মজা বলল,'আমি এখন মোটামুটি ভালোই আছি আম্মা। আমি খেয়ে নিতে পারবো। হাঁটতেও তো পারি।'

পদ্মজার এক কথায় খাবারের প্লেট পদ্মজার হাতে তুলে দিলেন ফরিনা। আর রিনুকে চলে যেতে বললেন। পদ্মজা চুপচাপ খেয়ে নেয়। তার খেতে ইচ্ছে করে না একদমই। কিন্তু সামনের যুদ্ধটার জন্য তার খেতেই হবে। তাকে সুস্থ থাকতে হবে। সুস্থতা ছাড়া যুদ্ধে সফল হওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ পদ্মজা খেল,ততক্ষণ ফরিনা পাশে বসে থাকলেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পর পদ্মজা ফরিনাকে বলল,'আব্বাকে খুব ভয় পান আম্মা?'

ফরিনা স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলেন,'সব বউরাই স্বামীরে ডরায়।'

'না,আপনি একটু বেশি ভয় পান। যমের মতো।'

'কবিরাজের দেওয়া ঔষধডি খাও এহন।'

'আপনি কথা এড়াচ্ছেন আম্মা। আচ্ছা,ঔষধ দেন আগে।'

ফরিনা আলমারি খুলে ঔষধ বের করলেন। তারপর এগিয়ে দিলেন পদ্মজার কাছে। পদ্মজা ঔষধ খেয়ে বলল,'কবিরাজ আনার অনুমতি ওরা দিয়েছিল ভেবে আমি অবাক হয়েছি আম্মা! ওরা কেন চায়? আমি সুস্থ থাকি?'

ফরিনা কিছু বললেন না। পদ্মজা ফরিনার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মানুষটার আয়ু কী শেষের পথে? কেমন যেন মৃত, মৃত ছাপ মুখে। চোখ বুজলে মনে হবে,অনেক দিনের উপোষ করে মারা গিয়েছেন। পদ্মজার মায়া হয় মানুষটার জন্য। কোন দুঃখে তিনি ধুঁকে,ধুঁকে মরছেন! পদ্মজা বিছানা থেকে নেমে এসে ফরিনার সামনে দাঁড়াল। বলল,'আম্মা, আপনি আমাকে নিজের মেয়ে ভেবে একটা আবদার রাখবেন?'

'তুমি তো আমার ছেড়িই।'

'তাহলে আবদার রাখবেন?'

'রাখাম।' ফরিনার শুষ্ক চোখ। অথচ গলা ভেজা মনে হলো!

পদ্মজা বলল,'তাহলে আপনার সব গোপন কথা আমাকে বলুন। যা ভেবে ভেবে আপনি কষ্ট পান।'

ফরিনা দুই হাতে পদ্মজার দুই হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু খান। এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে পদ্মজার হাতে। মমতাময়ী স্পর্শ! পদ্মজার শরীরের

লোম খাড়া হয়ে যায়। ফরিনা বললেন,'তার আগে কও আমি সব কওয়ার পর তোমারে যা করতে কইয়াম তাই করবা তুমি।'

পদ্মজা অপলক নয়নে ফরিনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি করতে বলবেন তিনি? যদি সে সেটা করতে না পারে! সম্ভব না হয়! পদ্মজা বলল,'আপনি যা বলবেন আমাকে তার সাথে যদি যা করতে বলাটা মানানসই হয়,যুক্তিগত হয়। আমি তাই করব আম্মা।'

ফরিনা চোখের জল মুছেন। তারপর বললেন,'আমি বাবুর বাপরে দেইখা আইতাছি। তুমি শুইয়া থাকো।'

কথা শেষ করেই ফরিনা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যান। পদ্মজার মাঝে উত্তেজনা কাজ করছে। সে জানে না সে কী শুনতে চলেছে,তবে সেটা কোনো সাধারণ ঘটনা বা কথা হবে না এটা নিশ্চিত। সে ঘরে পায়চারি করতে করতে জানালার ধারে আসে। দেখতে পায় রিদওয়ানকে। হাতে একটা পলিথিন নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। এই জঙ্গলের মাঝেই তো আছে তালাবন্ধ রহস্যজাল। যার চাবি বোধহয় তার কাছে আছে। আলমগীরের দেয়া চাবিটাকে পদ্মজার কোনো তালাবন্ধ রহস্যজালের চাবি মনে হয়! রিদওয়ান গত দিনগুলোতে তিন-চার বার তাকে দেখতে এসেছে। কিন্তু কিছু বলেনি। রিদওয়ানের মতিগতি বোঝা যায় না। অদ্ভুত সে। রিদওয়ানকে দেখলে পদ্মজার শরীর রাগে কাঁপে।

বেশ কিছুক্ষণ পর পায়ের শব্দ আসে কানে। শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে পুরুষের পায়ের শব্দ। পদ্মজা দ্রুত এসে বিছানার এক কোণে বসে। যে কোণে ছুরি রাখা আছে। ঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান। পদ্মজাকে দেখেই লম্বা করে হেসে বলল,'তারপর বলো কেমন আছো?'

পদ্মজার থেকে জবাব না পেয়ে রিদওয়ান আবার প্রশ্ন করল,'সুস্থ আছো তো?'

পদ্মজা সাড়া দিল না। রিদওয়ান চেয়ার টেনে বসল। বলল,'তোমাকে এত চুপচাপ দেখে অবাক হচ্ছি। কী পরিকল্পনা করছো বলোতো?'

পদ্মজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। বলল,'কাপুরুষ বোধহয় আপনার মতো মানুষকেই বলা হয়।'

রিদওয়ানের ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায়। চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। তারপর হুট করেই হেসে দিল। বলল,' কাপুরুষের কী করেছি?'

'স্বামীর অবর্তমানে তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছেন। আবার সেই স্ত্রী অসুস্থ ছিল। এমন তো কাপুরুষরাই করে।'

'এতো কথা না বলে চুপচাপ যা বলি শুনো। আমির আমাদের ব্যপারে অনেক নাক গলিয়েছে। অনেক সমস্যা করেছে। তবুও আমরা আমিরকে এক শর্তে ফিরিয়ে দেব। যদি তুমি সেই শর্ত মানো।'

'কী শর্ত?'

'তুমি আমিরকে নিয়ে ঢাকা চলে যাবে। কখনো অলন্দপুরে ফিরবে না।'

'যদি না মানি?'

'অবুঝের মতো প্রশ্ন করতে বলিনি। শর্ত দিয়েছি,মানা না মানা তোমার ব্যপার।'

'আপনারা আমাকে ভয় পাচ্ছেন কেন?'

রিদওয়ান হাসল। পদ্মজা বলল,'সেদিন মেরে আধমরা করেছেন। এবার একদম মেরে দিন। তাহলেই আপনাদের সমস্যা শেষ। বেহুদা, আমাদের মুক্তি দিয়ে ভেজাল কেন বাড়াচ্ছেন? ঢাকা ফিরে গিয়ে পুলিশ নিয়েও তো আসতে পারি।'

রিদওয়ান বিরক্তিতে 'চ' সূচক উচ্চারণ করল। বলল,'তোমাকে মারা যাবে না।'

'আমাকে দিয়ে আপনাদের কী কাজ হবে যে মারা যাবে না?'

'এতো প্রশ্ন কেন করছো?'

'মনে আসছে তাই।'

রিদওয়ান রাগে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে,'তুমি শর্তে রাজি নাকি না?'

'আগে বলুন,কার কাজে আমি লাগব? কার খাতিরে আমাকে মারা যাবে না?'

'তুমি শর্তে রাজি নাকি সেটা বলো। এইযে আমার পাঞ্জাবিতে তাজা লাল দাগটা দেখছো এটা কিন্তু রক্তের। আর রক্তটা আমিরের।'

পদ্মজার চোখ দুটি জ্বলে উঠে। এমনিতেই এই হিংস্র মানুষটার হাসি,কথা তার গা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তার উপর তার স্বামীর রক্ত দেখাচ্ছে রিদওয়ান। পদ্মজা উঁচু গলায় প্রশ্ন করল,'উনাকে জঙ্গলেই রেখেছেন তাই না?'

'শর্তে রাজি তুমি?'

'না।'

'তোমাকে তো আমি-

রিদওয়ান রেগে তেড়ে আসে। পদ্মজা পাশের টেবিল থেকে ঔষধের কাচের বোতলটা নিয়ে রিদওয়ানের মাথায় আঘাত করে। রিদওয়ান আকস্মিক আক্রমণে বিছানায় পড়ে যায়। পদ্মজা দ্রুততার সাথে ছুরি হাতে নেয়। রিদওয়ান বিছানায় পড়ার দুই সেকেন্ডের মধ্যে তার পিঠে ছুরি দিয়ে হেঁচকা টান মারে। রিদওয়ান আর্তনাদ করে উঠল। পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ছুরির আঘাত শরীরের মাংস অবধি চলে গিয়েছে। সুযোগ পদ্মজার হাতের মুঠোয়। সে এই সুযোগ হারাবে না। এতদিন সে এদের মানুষ ভেবে এসেছে। অথচ,এরা মানুষরূপী শয়তান। আর শয়তানকে বুঝেশুনে নয়, ইচ্ছামত আঘাত করা উচিত। পদ্মজা দ্রুত কাঠের চেয়ার তুলে নেয় হাতে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে বারি মারে রিদওয়ানের মাথায়। রিদওয়ানের কানের পাশ দিয়ে রক্তের ধারা নামে। নিস্তেজ হয়ে পড়ে তার শরীর। পদ্মজা হিংস্র বাঘিনীর মতো হাঁপাতে থাকে। মিনিট দুয়েক পর শাড়ির আঁচল মেঝে থেকে তুলে বুকে জরিয়ে নেয়। হুট করেই যেন শান্ত সমুদ্র গর্জন তুলে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে চারপাশ।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ#আমিপদ্মজা - ৬১

ফরিনা পদ্মজার ঘরে প্রবেশ করে ঘাবড়ে গেলেন। বিছানায় রক্তাক্ত দীর্ঘদেহী একজন পুরুষ সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়ে আছে। নাকি মরে গেছে? ফরিনা শিউরে উঠেন। পদ্মজা ফরিনাকে এক নজর দেখে জগ থেকে গ্লাসে জল নিয়ে ঢকঢক করে পান করল। ফরিনার মনে হচ্ছে বিছানায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত পুরুষ মানুষটি রিদওয়ান! যখন শতভাগ নিশ্চিত হলেন এটা রিদওয়ান, মনে তীব্র একটা ভয় জেঁকে বসে। তিনি নিঃশ্বাস আটকে পদ্মজার কাছে ছুটে আসেন। চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন,'রিদু কি মইরা গেছে?'

পদ্মজা তাৎক্ষণিক জবাব দিতে পারলো না। সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে বলল,'মরেনি বোধহয়। তবে বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে মরে যাবে।'

পদ্মজার তরঙ্গহীন গলার স্বর ফরিনার ভয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তিনি পদ্মজাকে আচমকা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। পদ্মজা থতমত খেয়ে গেল। ফরিনার হৃৎপিণ্ডের কাঁপুনি টের পায় সে। ফরিনা অস্থির হয়ে বললেন,'ও মা-

পদ্মজা ফরিনার বুক থেকে মাথা তুলে বলল,'কী হয়েছে আম্মা?'

ফরিনার চোখের দৃষ্টি অস্থির। তিনি ঢোক গিলে বললেন,'তুমি পলাইয়া যাও। আর আইবা না। রুম্পার মতো চইলা যাও।'

'আম্মা,ওরা আমাকে মারবে না। রিদওয়ান ভাইয়াই বলেছে।'

'মিছা কথা...মিছা কথা কইছে।'

'আম্মা,আপনি এমন করছেন কেন?'

ফরিনা দ্রুত সংজ্ঞাহীন রিদওয়ানকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর বললেন,'তুমি পলায়া যাও। তোমার আব্বা,ওই শকুনের বাইচ্ছা আমার নিষ্পাপ কলিজার টুকরা বাবুরে মাইরা ফেলছে কিন্তু...'

জুতার ছপছপ আওয়াজ শুনে ফরিনা থমকে যান। এরকম আওয়াজ মজিদের জুতোয় হয়। মনে হয় জুতায় পানি নিয়ে হাঁটছে। তিনি আতঙ্কে চোখ দুটি বড় বড় করে তাকালেন। মজিদ তো ঘরে ছিল না! কখন চলে এলো? আর যতক্ষণ মজিদ ঘরে থাকে ততক্ষণ ফরিনাকেও ঘরে থাকতে হয়। তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত মজিদ এখন পদ্মজার ঘরে আসবে। আর রিদওয়ানকে দেখে ফেলবে! তিনি পদ্মজার আলমারি খুলে তালা-চাবি বের করলেন। একটা ঝড় থামতেই যেন আরেকটা ঝড় শুরু হয়েছে। পদ্মজা ফরিনাকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল,'আম্মা,কিন্তু কী? বাবু মানে উনাকে মেরে ফেলেছে মানে? আপনি কীভাবে জানেন? আম্মা..."

ফরিনা নিজের এক হাতে পদ্মজার এক হাত শক্ত করে চেপে ধরেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। বারান্দায় পা রাখতেই মজিদের সাথে দেখা হয়। ফরিনা মজিদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে পদ্মজাকে টেনে নিয়ে যান তিন তলায়। মজিদ হতভম্ব হয়ে দেখলেন ঘটনাটা। পদ্মজা বার বার জিজ্ঞাসা করছে ফরিনাকে,'আম্মা,আপনি এটা কী বললেন! আমার বুক কাঁপছে। আম্মা কোথায় যাচ্ছেন?'

মজিদ পদ্মজার ঘরে উঁকি দিলেন। তার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। বিছানার উপর রিদওয়ানকে দেখতে না পেলেও,রিদওয়ানের পা জোড়া চোখে পড়ে যায়। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। চাদর সরিয়ে রিদওয়ানকে দেখে আঁৎকে উঠলেন। এদিকে,ফরিনা পদ্মজাকে ঠেলে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেন। ঘরের দরজাটি লোহার। পদ্মজা

ধাক্কা খেয়ে ঘরের মধ্যিখানে পড়ে। সে মেঝে থেকে উঠতে উঠতে ফরিনা বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। পদ্মজা আচমকার ঘটনায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। তার মাথায় বার বার বাজছে,তোমার আব্বা,ওই শকুনের বাইচ্ছা আমার নিষ্পাপ কইলজার টুকরা বাবুরে মাইরা ফেলছে!'

পদ্মজা দুই হাতে মুখ চেপে ধরে। মনে হচ্ছে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখুনি মারা যাবে। বুকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ফরিনা বলেছিলেন,সম্পত্তির জন্য হলেও আমিরকে ওরা জানে মারবে না! এজন্যই পদ্মজা ধৈর্য ধরে পাঁচটি দিন কাটাতে পেরেছে। ভেবেছিল, শরীরে একটু শক্তি জমিয়ে তারপর সে তার স্বামীকে খুঁজে বের করবে। কিন্তু একটু আগে ফরিনা যা বললেন তাতে পদ্মজার কলিজা ফেটে যাচ্ছে। রিদওয়ান শর্ত দিয়েছিল, পদ্মজা ঢাকা চলে গেলে আমিরকে ছেড়ে দিবে। পদ্মজা তাই মানতো। শুধু না করে আরেকটু কথা বের করতে চেয়েছিল সে। তার আগেই রিদওয়ান আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আর পদ্মজাও আঘাত করে বসে। পাঁচ দিনের সব ধৈর্য, পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে গেল ফরিনার এক কথায়। পদ্মজা দরজায় থাপ্পড় দিয়ে ডাকল,'আম্মা...আম্মা কেন আটকালেন আমাকে? দরজা খুলুন। আম্মা আপনার ছেলের কী হয়েছে? কী বললেন? আম্মা...'

ফরিনা হাতের চাবিটা দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছে দপদপ! তিনি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখেন,অস্বাভাবিকভাবে হাত কাঁপছে। কাঁপছে পা। মজিদ,খলিল একসাথে উঠে আসে। ফরিনার সামনে এসে দাঁড়ায়। ফরিনা ভয়ে জমে গেছেন। মজিদের চেহারা ক্ষুব্ধ। তিনি রাগে গজগজ করতে করতে প্রশ্ন করলেন,'রিদওয়ানকে পদ্মজা আঘাত করেছে?'

ফরিনা কিছু বললেন না। মজিদের গলার স্বর শুনে পদ্মজা চুপ হয়ে যায়। ফরিনা এলোমেলো দৃষ্টি নিয়ে কাঁপছেন। খলিল বললেন,'ভাবিরে জিগাও কেন? ওই ছেড়ি ছাড়া আর কার এতো সাহস আছে? এই ছেড়ি এই ঘরের ভিতরে?'

ফরিনা দরজার সাথে লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছেন। খলিলের প্রশ্ন শুনে আরো শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। মজিদ ফরিনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। দরজায় তালা! তখনই পদ্মজা দরজায় থাপ্পড় দিয়ে ডাকল,'আম্মা...আম্মা দরজা খুলুন। কী হচ্ছে ওখানে?'

মজিদের ক্ষুব্ধ চেহারা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠে। তিনি ফরিনার কাছে চাবি চাইলেন,'চাবি দাও। কি বলছি,কানে যায় না? চাবি দাও।'

ফরিনা আমতাআমতা করে বললেন,'ন...না-ই।'

মজিদ ফরিনার মুখ চেপে ধরেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন,'চাবি দাও।'

ফরিনা তাও বললেন,চাবি নেই। মজিদ আরো একবার বললেন,'চাবি দাও বলছি। শাড়ির কোন ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছো?'

'চাবি নাই। চাবি নাই আমার কাছে।' গলা উঁচিয়ে বললেন ফরিনা।

খলিল দরজায় জোরে কয়টা লাথি দিলেন। তালা ভাঙার চেষ্টা করলেন। দুপদাপ শব্দ! সেই সাথে পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে নোংরা গালি। খলিলের মুখের ভাষা শুনে পদ্মজার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ঘৃণায় চোখমুখ কুঁচকে যায়। ফরিনার উঁচুবাক্য শুনে মজিদ হাওলাদার রাগে কাঁপতে থাকলেন। ফরিনার এতো সাহস কবে হলো! তিনি ফরিনার শরীর হাতড়ে চাবি খুঁজতে খুঁজতে বললেন,'চাবি কোথায় রাখছো? জলদি বলো। নয়তো এরপর যা হবে,ভালো হবে না।'

ফরিনার শরীর কাঁপছে ভয়ে। তিনি জানেন,এই মুহূর্তে তিনি খুন হয়ে যেতেও পারেন। তবুও চাবি দিবেন না। নয়তো ওরা পদ্মজাকে খুন করে ফেলবে। ওরা পারে না এমন কিছু নেই! মজিদের নিকৃষ্ট অনেক কাজের সাক্ষী তিনি। এই মানুষটা তার জীবনের জাহান্নাম। মজিদ রাগে হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফরিনা কিছুতেই কথা মানছে না বলে, ছোট ভাইয়ের সামনে ফরিনার শাড়ি টেনে খুলে ফেললেন তিনি। আর বললেন,'চাবি কোন চিপায় রাখছো? বলো,নয়তো মেরে পুঁতে ফেলবো।'

ফরিনা টু শব্দও করলেন না। খলিলের সামনে যুবতীকালে তাকে বিবস্ত্র করেও মজিদ মেরেছে! সম্মান-ইজ্জত কবেই হারিয়ে গেছে। নতুন করে হারানোর কিছু নেই। বয়সও অনেক হয়েছে! তবে এদের শিকার পদ্মজাকে হতে দিবেন না কিছুতেই। মজিদ কোনোভাবেই ফরিনার কাছ থেকে চাবি উদ্ধার করতে পারেননি। এদিকে রিদওয়ানের অবস্থা খারাপের দিকে। খলিল দ্রুত নিচে চলে গেলেন। মজিদ ফরিনাকে মেঝেতে ফেলে ইচ্ছেমত লাথি,থাপ্পড় দেন,সাথে বিশ্রি গালিগালাজ। চারপাশ ফরিনার কান্নায় ভারী হয়ে উঠে। ফরিনার কান্নার স্বর পদ্মজার কানে আসতেই সে চিৎকার করে বলল,'আব্বা,আম্মাকে মারবেন না। আব্বা...দোহাই লাগে। আম্মা লাশের মতো হয়ে গেছে। আব্বা,আম্মাকে মারবেন না। আমাকে মারেন। আব্বা। আম্মা আপনি দরজা খুলুন। আম্মাকে এভাবে

কেন মারছেন আব্বা ? আপনি তো অলন্দপুরের ফেরেশতা ছিলেন আব্বা। আপনার এমন রূপ কেন? আম্মা দরজা খুলুন। আব্বা,আম্মা খুব কষ্ট পাচ্ছে। অনুরোধ করছি,আর মারবেন না।'

বাইরে ফরিনার কান্না,ঘরের ভেতর পদ্মজার কান্না। আর দরজায় এলোপাথাড়ি থাপ্পড়ের আওয়াজ। সব মিলিয়ে চারপাশ যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। খলিলের ডাক শুনে মজিদ চলে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার পূর্বে ফরিনার পেটে বড় একটা লাথি বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরিনার মুখ দিয়ে বমি বেরিয়ে আসে। মজিদ চলে যাওয়ার মিনিট দুয়েক পর লতিফা দৌড়ে আসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় সে দুইবার হোঁচট খেল। তারপর ফরিনার মাথা নিজের কোলে নিয়ে কেঁদে বলল,'খালাম্মা আপনি কেন খালুর বিরুদ্ধে গেলেন। ও খালাম্মা কথা কন। খালাম্মা?'

লতিফার ব্যকুল কণ্ঠস্বর শুনে পদ্মজা আরো জোরে থাপ্পড় দিল দরজায়। বলল,'লুতু বুবু আম্মার কী হয়েছে? লুতু বুবু দরজা খুলো। ও লুতু বুবু।'

ফরিনা অস্পষ্ট স্বরে লতিফাকে বললেন,'তোর খালু চইলা গেছে?'

'হ,গেছে।'

'বাড়ি থেইকা বাইর হইছে?' ফরিনার কণ্ঠ নিভে আসছে।

লতিফা ফরিনার মাথাটা সাবধানে মেঝেতে রেখে বারান্দা থেকে বাইরে উঁকি দিল। মজিদ,খলিল,মদন আর বাড়ির দারোয়ান মিলে গরু গাড়ি দিয়ে রিদওয়ানকে নিয়ে যাচ্ছে। গেইটের কাছাকাছি চলে গেছে। সে ফরিনাকে এসে বলল,'বাইর হইয়া গেছে খাল্লাম্মা।'

পদ্মজা দরজায় এলোপাথাড়ি থাপ্পড় দিচ্ছে। বিকট শব্দ হচ্ছে! ফরিনা আঙ্গুলের ইশারায় ডান দিকটা দেখিয়ে বললেন,'ওইহানে খুঁইজা দেখ,চাবি পাবি একটা। দরজাডা খুইলা দে।'

লতিফা ফরিনার কথামতো চাবি খুঁজল। পেয়েও গেল। তারপর দরজা খুলতেই পদ্মজা হুড়মুড়িয়ে বের হয়। ফরিনাকে দেখে তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। গায়ে শাড়ি নেই। পেটিকোট হাঁটু অবধি তোলা। মিষ্টি রঙের ব্লাউজে রক্তের দাগ। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। দুই চোখ ফুলে গেছে। হাতে,পায়ে জখম। বয়স্ক মানুষটাকেও

ছাড়েনি! পদ্মজা হাঁটুগেড়ে বসে ফরিনাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল,' আম্মা,আপনি কেন চাবিটা দিলেন না? এরা মানুষ? নিজের বউকে কেউ এভাবে মারে? লুতু বুবু আম্মাকে ধরো।'

লতিফা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল,'পদ্মজা তুমি কিচ্ছু জানো না। খালু এমনেই মারে।'

'এখন ধরো আম্মাকে।'

লতিফা,পদ্মজা দুজন মিলে ফরিনাকে ধরে ধরে তিন তলার আরেকটি ঘরে নিয়ে যায়। যে ঘরটিতে প্রথম রুম্পা ছিল,তারপর রানি। নিচ তলা অবধি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফরিনা মেঝেতে পা সোজা করে ফেলতে পারছেন না। চোখ দুটি বার বার বুজে যাচ্ছে। পদ্মজা একটা অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করছে। যেমনটা তার মায়ের মৃত্যুর আগে অনুভব হয়েছিল। পদ্মজার গা কেঁপে উঠে। চোখ ছাপিয়ে জল নামে। মনে মনে কেঁদে বলল,'আল্লাহ! কেন আমার সাথে এমন হচ্ছে! কীসের পরীক্ষা নিচ্ছো তুমি? আমার চারপাশ এতো নির্মম কেন? কোথায় আছো আম্মা। কোথায় আছেন পারিজার আব্বু। আমি ভীষণ একা। ভীষণ।'

পদ্মজার হেঁচকি উঠে গেল। সে ঢোক গিলে নিজেকে সামলায়। ফরিনার যত্ন নিতে হবে তার। ফরিনাকে বিছানায় শুইয়ে দিতেই তিনি থেমে থেমে বললেন,'আমার কৈ মাছের জান। আমি মরতাম না। তুমি,তুমি পলায়া যাও।'

'আম্মা,আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। লুতু বুবু হালকা গরম পানি,আর আমার ঘরের আলমারির ডান পাশের ড্রয়ার থেকে স্যাভলন আর তুলা নিয়ে আসো।'

পদ্মজার আদেশ পাওয়া মাত্র লতিফা বেরিয়ে গেল। ফরিনা করুণ চোখে পদ্মজার দিকে চেয়ে বললেন,'কান্দো কেরে? কাইন্দো না।'

পদ্মজার সুন্দর দুটি চোখে জলের পুকুর। বিরতিহীনভাবে পানি গড়িয়ে পড়ছে গলায়,বুকে। সে ফরিনার এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে হতাশ হয়ে ব্যর্থ কণ্ঠে বলল,'আম্মা,আমি কী করব? যখনই ভাবি এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তখনই ভয়ংকর সব ঘটনার সম্মূখীন হতে হয়। আমি আর পারছি না। এতো খারাপ পরিবেশ আমি আর নিতে পারছি না আম্মা। নিজেকে কিছুক্ষণ আগেও শক্তিমান মনে হয়েছে। মনে হয়েছে,আমি চাইলে সব পারব। কিন্তু এখন খুব দূর্বল মনে হচ্ছে। আমি ওদের বিরুদ্ধে পেরে উঠছি না। আপনি ভালো হয়ে উঠুন আম্মা। আপনার ছেলে কি সত্যি-"

পদ্মজা তাকিয়ে দেখল, ফরিনার চোখ বোজা অবস্থায় আছে। পদ্মজার বুক ছ্যাঁত করে উঠল। সে ফরিনার নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা করল,নিঃশ্বাস নিচ্ছে নাকি। নিঃশ্বাস নিচ্ছে! সেই সময় লতিফা স্যাভলন,তুলা,আর হালকা গরম পানি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

ফরিনা ঘুমাচ্ছেন। কথা বলার অবস্থায় নেই। পদ্মজার পায়ে ঘা হয়েছে। পাঁচদিনে কি ছেঁড়াকাঁটা ভালো হয়? শীতের কারণে উলটো আরো কষ্ট বাড়ে। পায়ের অবস্থা যা তা! তাতে অবশ্য যায় আসে না পদ্মজার। সে অস্থির হয়ে আছে। বুকে এক ফোঁটাও শান্তি নেই। রিদওয়ান দুপুরে জঙ্গল থেকে ফিরেছিল। পদ্মজার ধারণা,আমির জঙ্গলের কোথাও বন্দি আছে। অথবা লাশটা হলেও আছে! ভাবনাটা পদ্মজার মাথায় আসতেই সে দ্রুত মাথা চেপে ধরে বিড়বিড় করে,' না! আমি কী ভাবছি! কিছু হয়নি। কারো কিছু হয়নি। সবাই ভালো আছে।'

সে লতিফার দায়িত্বে ফরিনাকে রেখে নিচ তলায় নেমে আসে। সাথে ছুরি,রাম দা নিয়েছে। আজ খোঁপা করেনি। বেণী করেছে। বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। সব হাসপাতালে। ওরা ফিরলে সে আর আস্তো থাকবে না। তার আগেই আমিরকে বের করতে হবে। সেই সাথে লুকোনো গুপ্ত রহস্য। সদর ঘরে আমিনা ছিলেন। তিনি আলোকে খিচুরি খাওয়াচ্ছেন। নির্বিকার ভঙ্গি! কোনো তাড়া নেই,চিন্তা নেই! রিদওয়ানের অবস্থা কী দেখেনি? এই মানুষটা শুধু রানির জন্যই কাঁদেন। আর কারোর জন্য না! কিন্তু কেন? পরিবারের সবার সাথে দূরত্ব বজায় রাখেন। যদিও কথা বলেন,তা অহংকারী, কটু কথা। পদ্মজা বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার নামায পড়েই বেরিয়েছে। আজ জঙ্গলে মরবে নয়তো আগামীকাল এই বাড়ির পুরুষগুলোর হাতে! সে মনে মনে মৃত্যু মেনে নিয়েছে। ধীর পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকে। বোনদের কথা খুব মনে পড়ছে। সে মারা গেলে, ওদের কী হবে? খুব কী কাঁদবে? কাঁদতে কাঁদতে জ্বর উঠে যাবে বোধহয়! পূর্ণার তো খুব কান্নার পর জ্বর হয়। প্রেমা নিজেকে সামলাতে পারবে। এসব ভাবতে ভাবতে একসময় পদ্মজা মানুষের উপস্থিতি টের পেলো। ফিসফিসিয়ে কাছে কোথাও কেউ কথা বলছে। পদ্মজা এখনও ভালো করে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করেনি। সে হিজল গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে দুটি মানুষ চোখের পর্দায় ভেসে উঠে। তারা জঙ্গলের পশ্চিম দিক থেকে এসেছে। অস্পষ্ট তাদের মুখ। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অন্দরমহলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। একটা মুখ চিনতে পারে পদ্মজা। মৃদুল! মৃদুলের হাতে টর্চ। সেই টর্চের আলোতে পাশের জনের হাত ভেসে উঠে। এক হাতে লাল তাজা রক্ত, অন্য হাতে রামদা। পদ্মজা শিউরে উঠে। ঘামতে থাকল। উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার উপক্রম। গলা শুকিয়ে কাঠ। মৃদুল কিছু একটা বলে। উত্তরে আগন্তুক কিছু একটা বলে। ঝাপসা আলোয় মৃদুলের সাথের লোকটার দেহ আর চুল স্পষ্ট হয়। লম্বা শরীর,মাথায় ঝাকড়া চুল। চারপাশ থমকে যায়। পদ্মজার শরীর বেয়ে যেন মুহূর্তে শীতল কিছু একটা ছুটে যায়। সে বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে পারছে না।

#পদ্মজা

চলবে...

®ইলমা বেহরোজ

(আমাদের সমাজে অহরহ অনেক নোংরা ঘটনা ঘটছে! সেরকম অনেক দৃশ্য এই উপন্যাসে চলে আসবে। চরিত্রের প্রয়োজনে! আশা করি,এসব নিয়ে কেউ অভিযোগ তুলবেন না। আমি পদ্মজা থ্রিলারধর্মী উপন্যাস।)#আমিপদ্মজা-৬২

চন্দ্র তারকাহীন ম্লান আকাশের কারণে চারপাশ অদ্ভুত ভয়ংকর হয়ে আছে। পদ্মজার মুখ ঘেঁষে একটা পাতা মাটিতে পড়লো। সাথে সাথে সে ভয় পেয়ে দুই পা পিছিয়ে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, নিজের ভয় পাওয়া দেখে নিজের উপর খুব বিরক্ত হয়। দুই পা এগিয়ে এসে অন্দরমহলের পিছনে তাকায়। আধো অন্ধকারে আবিষ্কার করলো, মৃদুল এবং আগন্তুক নেই! চোখের পলকে যেন মুহূর্তেই ভোঁজবাজির মতো নাই হয়ে গেল! পদ্মজার মস্তিষ্ক সাবধান হয়ে উঠলো। মৃদুলের মধ্যে ঘাপলা আছে ভাবতেই ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সে সবকিছু ভাবতে পারে। সবকিছু! পদ্মজা তার পরিকল্পিত পথ ধরে হাঁটা শুরু করলো। মনে মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, মৃদুল জঙ্গলের ভেতরে ঢুকেনি তো? আর দীর্ঘদেহী, ঝাঁকড়া চুলের আগন্তুকও কি সাথে রয়েছে? পদ্মজা এক হাতে ছুরি নিল, অন্য হাতে রাম দা। তার চোখের দৃষ্টি প্রখর। চারপাশে চোখ বুলিয়ে সাবধানে এক পা,এক পা করে এগোচ্ছে। নিঃশ্বাস যেন আটকে আছে। এই বুঝি কেউ আক্রমণ করে বসল! সেদিন যতটুকু এসেছিল সে,ঠাওর করে করে নিরাপদভাবে ঠিক ততটুকুই চলে আসে পদ্মজা। সামনে বড় বড় গাছপালা ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ভূতুড়ে পরিবেশ। পদ্মজা কেন জানি নিশ্চিত,আজও কেউ থাকবে এখানে, অজানা রহস্যজাল পাহারা দেয়ার জন্য। আর আশেপাশেই আছে সেই গুপ্ত রহস্যজাল। পদ্মজার শিরায়,শিরায় প্রবল উত্তেজনা বয়ে যায়। কয়েকটা গাছ পেরিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। একটা শব্দ ভেসে আসছে কানে। পদ্মজা দুরু দুরু বুকে শব্দোৎস লক্ষ করে তাকাল। কিছুটা দূরে একজন লোক উবু হয়ে বসে আছে। সম্ভবত প্রস্রাব করছে। পদ্মজা প্রস্তুত হয় লোকটিকে পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু অগত্যা কারণে তার হাত কেঁপে উঠলো। সে কাউকে প্রাণে মারতে পারবে না। সেই সাহস হচ্ছে না। একটা খুন করেছে ভাবলেই তার গাঁ কেঁপে উঠে। সেদিনের খুনটা তার নিজের অজান্তেই হয়ে গিয়েছে। সে যেন ছিল অন্য এক পদ্মজা। সেই পদ্মজাকে সে নিজেও চিনতো না।

পদ্মজা অস্থির হয়ে কিছু একটা খোঁজে। লোকটা উঠে দাঁড়ায়। পদ্মজা দ্রুত একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে। লোকটির মুখ অস্পষ্ট। অবয়ব শুধু স্পষ্ট। দুলকি চালে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পরনে লুঙ্গি ও সোয়েটার পরা। মাথায় টুপিও রয়েছে। লোকটার হাঁটা

দেখে মনে হচ্ছে না, সে টের পেয়েছে অন্য কারো উপস্থিতি। তবুও পদ্মজার নিঃশ্বাস আটকে যায়। সে রাম দা শক্ত করে ধরলো। লোকটি তার কাছে আসতেই সে শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে মাথায় আঘাত করে। লোহার রাম দার এক পাশের আঘাতে লোকটি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। গোঙানির শব্দ করে, হাত পা ধাপড়াতে থাকলো। সেকেন্ড কয়েক পরই দেহ নিস্তেজ হয়ে যায়। পদ্মজার বুক ফুঁড়ে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। তবে লোকটাকে কাঁচা খেলোয়ার মনে হলো! এক আঘাতেই কুপোকাত! পদ্মজা একবার ভাবল,টর্চের আলোয় লোকটার মুখ দেখবে। তারপর মাথায় এলো,টর্চের আলো দেখে যদি ওত পাতা বিপদ তার উপস্থিতি টের পেয়ে এগিয়ে আসে! তাই আর টর্চ জ্বালাল না। সে নিথর দেহটিকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। বাতাসের সাঁ,সাঁ শব্দ,ঝিঁঝিঁপোকার ডাক,আর অশরীরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা, আর রাতের অন্ধকার বার বার পদ্মজার গা হিম করে দিচ্ছে। পদ্মজা প্রমোদ গুণে নিজের মধ্যে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে। বড় বড় গাছপালা ফেলে সে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। সামনে কোনো বড় গাছ নেই। জঙ্গলের মাঝে এরকম খোলা জায়গা কেন? এতে কি কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে! একদমই খোলা তাও নয়। জংলি লতাপাতা রয়েছে। তবে একটু অন্যরকম। লতাপাতার মাঝে জোঁক বা কোনো বিষাক্ত জীব থাকতে পারে। বিপদের কথা ভেবেও পদ্মজা ঝুঁকি নিলো। সে পা বাড়াল সামনে। কয়েক কদম এগোতেই জুতা ভেদ করে কাঁটা ফুঁটে পায়ে! আঘাতে আবার আঘাত লেগেছে। ব্যথায় পদ্মজার কলিজা যেন ছিঁড়ে যায়। সে কাঁটা বের করার চেষ্টা করে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল বেরোয়। রক্তজবা ঠোঁট দুটি জলে ভিজে যায়।

মৃদুল এদিকওদিক দেখে বলল,'লিখন ভাই, চলো চইলা যাই।'

অসহনীয় যন্ত্রনায় লিখনের কপালে বিন্দু,বিন্দু ঘাম জমেছে। সেসবকে তোয়াক্কা করে সে বলল,'পদ্মজার খোঁজ নিতে হবে আগে।'

মৃদুল বুঝতে পারছে না কি করবে সে! লিখনের হাত থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। দুপুরে সে পূর্ণার সাথে দেখা করতে মোড়ল বাড়িতে গিয়েছিল। পূর্ণা চোখমুখ ফুলে যা তা অবস্থা। অনেক কান্নাকাটি করে পদ্মজার জন্য। পূর্ণা আশঙ্কা করছে,তার বোন ভালো নেই। মৃদুলেরও তাই মনে হয়। সে যেতেই পূর্ণা ঝরঝর করে কাঁদতে থাকল। তখন লিখন শাহ আসে। তার শুটিং শেষের দিকে। সপ্তাহখানেক পর ঢাকা ফিরবে। তাই পূর্ণাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল। পূর্ণাকে ওভাবে কাঁদতে দেখে লিখন বিচলিত হয়ে পড়ে। তারপর প্রশ্ন করে বিস্তারিত জানতে পারে। লিখন,হাওলাদার বাড়িতে আসতে চাইলে,মৃদুল না করলো। সে বললো,ঢুকতে দিবে না। লিখন মৃদুলের কথা শুনে না। চলে আসে হাওলাদার বাড়িতে। পিছু পিছু আসে মৃদুল। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত দারোয়ান গেইটের ভেতরেই ঢুকতে দিল না লিখনকে। তখন মৃদুল, লিখনের সাথে পরিকল্পনা করলো, তারা বাড়ির পিছনের

ভাঙা প্রাচীর পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকবে। লিখন প্রথম রাজি না হলেও,পরে রাজি হলো। সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পদ্মজার খোঁজ নেই কথাটা সে ভাবতেই পারছে না! এতো বয়সে এসেও সে একটা মেয়ের জন্য এতো ব্যকুল হয়ে পড়ছে! তাও বিবাহিত মেয়ে! এমন মেয়েকে ভালোবেসে ব্যকুল হওয়া তো সমাজের চোখে খারাপ। এই সমাজের জন্যই সে পদ্মজার থেকে নিজের এতো দূরত্ব রাখে। যাতে কোনো খারাপ কথা,কোনো দূর্নাম পদ্মজাকে ছুঁতে না পারে। পদ্মজা যেন অসুখী না হয়। সেই পদ্মজার নাকি চারদিন ধরে খোঁজ নেই! মৃদুল দেখা করতে চাইলে,তাও করতে দেয়া হচ্ছে না! লিখনের মাথার রগরগ দপদপ করতে থাকে। আঁধার নামতেই দুজনে হাওলাদার বাড়ির পিছনের ভাঙা প্রাচীর দিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ে। বাড়ির পিছনে যে জঙ্গল,সেই জঙ্গলসহ পুরো বাড়ির সীমানা মিলিয়ে চারিদিকে গোল করে প্রাচীর দেয়া। তাই পিছনের প্রাচীর দিয়ে তারা আগে পশ্চিম দিকের জঙ্গলে পা রাখে। মৃদুল একবার মদনের সাথে পশ্চিম দিকে এসেছিল। একটা ঔষধি পাতা নিতে। তাই সে জানতো,এদিকে বড় বড় কাঁটা আছে। যা পথ রোধ করে। এজন্য সে রামদা নিয়ে এসেছে। যা লিখনের হাতে ছিল। লিখন অসাবধানবশত কাঁটার লতাপাতা কাটতে গিয়ে নিজের হাতে আঘাত করে বসে। ফলে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে। গলগল করে বেরিয়ে আসে রক্ত। রক্তাক্ত হাত নিয়ে বেরিয়ে আসে জঙ্গল থেকে। মৃদুল চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল,'ভাই, রক্ত তো বন্ধই হইতাছে না।'

'কী করা যায় বলোতো?'

'আসো চইলা যাই। বাজারে যাইবা। নয়তো ডাক্তারের বাড়িতে নিয়া যাব।'

'ব্যস্ত হয়ো না মৃদুল।'

লিখন এক জায়গায় বসল। তারা অন্দরমহলের বাম দিকে আছে। মৃদুলের হাত থেকে টর্চ নিয়ে লিখন চারিদিকে কিছু দেখল। তারপর বলল,'ওইযে দেখা যাচ্ছে,ওই পাতাটা নিয়ে আসো।'

'আচ্ছা,ভাই। '

মৃদুল লিখনের দেখানো কয়েকটা পাতা নিয়ে আসে। তারপর কচলে নরম করে লিখনের ক্ষতস্থানে লাগায়। লিখন বলল,'হয়েছে এবার। রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আমরা চইলা যাইলেই পারতাম।'

'পদ্মজার খোঁজ না নিয়ে কীভাবে যাই?'

'পদ্মজা ভাবিরে এতো ভালোবাসো ভাই,অবাক করে আমারে।'

লিখন মুচকি হেসে বলল,'এসব বলো না মৃদুল। এসব বলতে নেই।'

'সত্যি কথা কইতে ডর কীসের?'

লিখন ঠোঁটে হাসি রেখেই উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে বলল,'বিবাহিত নারী নিয়ে এসব বলতে নেই। সমাজ ভালো চোখে দেখে না।'

'সমাজরে আমি জুতা মারি।'

'তোমার বয়স বেড়েছে ঠিকই,জ্ঞান হয়নি।' বলতে বলতে লিখন অন্দরমহলের পিছনে এসে দাঁড়াল। গা হিম করা ঠান্ডা বইছে। তার পরনে শীতবস্ত্র নেই। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে সে। মৃদুল বলল,'এই কথা আমার আম্মাও বলে।'

'এসব কথা বাদ দাও এখন। শুনো,আমরা বাড়ির সামনে যাব নাকি পিছন থেকেই কিছু করব?'

লিখনের ভাবগতি বোঝা যাচ্ছে না। মৃদুল লিখনের দৃষ্টি অনুকরণ করে অন্দরমহলের দুই তলায় তাকাল। পদ্মজার ঘরের জানালার দিকে। প্রশ্ন করলো,'পিছনে কী করার আছে?'

'পদ্মজার ঘরের জানালার পাশে রেইনট্রি গাছটা দেখেছো? গাছে উঠে উঁকি দিলেই পদ্মজাকে দেখা যাবে। কথা বলাও যাবে।'

'উঠতে পারো গাছে?'

'আরে পুরুষ মানুষ হয়েছি কীজন্যে?'

'তাইলে গাছে উঠমু আমরা?'

'একবার সামনে দিয়ে চেষ্টা করা উচিত। তুমি যাও,গিয়ে দেখো ঢুকতে দেয় নাকি।'

মৃদুল মুখ কালো করে বললো,'দিবে না। আবার অপমান হতে ইচ্ছা করতাছে না।'

'তাহলে চলো গাছে উঠি।'

মৃদুল চুল ঠিক করতে করতে গুরুতর ভঙ্গিতে বলল,'তুমি যহন কইছো, আমি যাবো।'

লিখন হাসলো। পূর্ণার মতোই মৃদুলের স্বভাব। পূর্ণাকে যে কারণে ভালো লাগে,ঠিক একই কারণে মৃদুলকেও ভালো লাগে। মৃদুল চলে যায়। লিখনের মাথাটা ব্যথা করছে। সে দু হাতে কপালের দু পাশ চেপে ধরে পদ্মজার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে ভাবে, একজন জনপ্রিয় অভিনেতা হয়ে এভাবে প্রাচীর ডিঙিয়ে,লুকিয়ে এক পাক্ষিক ভালোবাসার মানুষের খোঁজ নিতে আসাটাকে হয়তো কারো চোখে পাগলামি মনে হবে। কিন্তু তার চোখে গুরুত্বপূর্ণ

দায়িত্ব! নিজেকে ভালো রাখার দায়িত্ব! পদ্মজা ভালো আছে ভেবেই সে মানসিকভাবে ভালো থাকে। এ কথা ঠিক, পদ্মজার সাথে আমিরের এতো সুখ দেখে তার বুকে চিনচিন ব্যথা হয়। তবে এটাও ঠিক পদ্মজার সুখ দেখে সে শান্তিও পায়! বেঁচে থাকার মানসিক মনোবল পায়। আশা থাকে মনে, আছে! বেঁচে আছে পদ্মফুল! চাইলেই দূর থেকে দেখা যাবে। চাইলে কথা বলাও যাবে। কিন্তু যদি নাই বা থাকে? তবে-

মৃদুল এসে জানালো,'শালার ব্যাঠা দুলাভাই নাই। কেউই নাই দরজার সামনে।'

লিখন বলল,'তাহলে চলো। সামনে দিয়েই যাই। আমারও কেমন লাগছিল,এভাবে লুকিয়ে বাড়ির পিছন দিয়ে... " লিখন হাসলো। ম্লান হাসি। সে এগিয়ে গেল। সাথে মৃদুল। দুজন অন্দরমহলে প্রবেশ করলো নির্বিঘ্নে। কোনো বাধা আসেনি। আমিনা সদর ঘরে বসে ছিলেন। তিনি লিখনকে দেখে বললেন,'তুমি এইহানে কেরে আইছো?'

মৃদুল ঘরে ঢুকে বলল,'ফুফুআম্মা,পদ্মজা ভাবি কই?'

আমিনা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মৃদুলের কাছে এসে আদুরে গলায় বললেন,'কই আছিলি বাপ? তোর ফুপায় বকছে বইলা চইলা যাবি কেন? আমি তোর ফুফুআম্মা আছি না? তুই এইহানেই থাকবি। যতদিন ইচ্ছা থাকবি।'

মৃদুল কপালে ভাঁজ সৃষ্টি করে বলল,'ধুর! বাদ দেও এসব কথা। তোমার জামাই একটা ইবলিশ। ইবলিশের ধারেকাছে মানুষদের থাকতে নাই।'

আমিনা মৃদুলের মুখ ছুঁয়ে বললেন,'এমন কয় না বাপ।'

'আদর পরে কইরো। এখন কও তো পদ্মজা ভাবি কই?'

'ঘরেই আছে।'

'ভাবির কি শরীর ভালা আছে?'

আমিনা ক্ষণমুহূর্ত সময় নিয়ে লিখনকে দেখলেন। তারপর বললেন,'হ ভালা।'

'আচ্ছা,ফুফুআম্মা আমরা উপরে যাইতাছি।'

আমিনা লিখনের দিকে আঙ্গুল তাক করে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন,'এই ছেড়াও যাইবো?'

লিখন চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। পরপুরুষ হয়ে পদ্মজার মতো মেয়েকে দেখতে যাওয়া ঠিক হবে না বোধহয়। মৃদুল তো এই বাড়ির আত্মীয়। সে গেলে সমস্যা নেই। মৃদুল কিছু বলার পূর্বে লিখন বলল,'আমি এখানে বসি। তুমি যাও।'

'না ভাই,তুমি আইয়ো।'

'আরেএ,মৃদুল যাও তো।'

মৃদুল সিঁড়িতে পা রাখলো। আমিনা ভাবছেন,পদ্মজা তো ঘরেই আছে। বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। এরকম সময়ে যদি পদ্মজার নিচে নেমে আসে? লিখনের সাথে কথা বলে! আর এ খবর কোনোভাবে খলিল হাওলাদারের কানে যায়। তবে তার রক্ষে নেই। তিনি উঁচুকণ্ঠে ডাকলেন,' মৃদুলরে?'

মৃদুল তাকালো। আমিনা জানেন না,পদ্মজা সত্যি যে ঘরে নেই। তিনি মিথ্যে ভেবে বললেন,'পদ্মজায় তো ঘরে নাই।'

লিখন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলো,'কেন? কোথায় গিয়েছে?'

আমিনা নির্বিকার কণ্ঠে বললেন,'আমি কিতা কইতাম? গেছে কোনো কামে।'

মৃদুল সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসলো,'ভাবি একলা গেছে?'

আমিনা আরেকটা মিথ্যা বললেন,'না,একলা যায় নাই। আমিরের লগে গেছে?'

মৃদুল উৎসুক হয়ে জানতে চাইলো,'আমির ভাই বাড়িত আছিলো? আমি যে দেহি নাই। ভাবছি,জরুরি কোনো কামে ঢাকাত গেছে।আচ্ছা,ফুফুআম্মা অন্দরমহল নজরবন্দিতে আছিলো কেন? আমারে ঢুকতে দিতো না।'

আমিনা তৃতীয়বারের মতো মিথ্যে বললেন,'আমির তো ঢাকাতই গেছিলো। কাইল রাইতে আইছে। আমির নাই এজন্যে পদ্মজার-'

লিখন কথা কেড়ে নিয়ে বলল,'বুঝতে পেরেছি। সিকিউরিটি মানে নিরাপত্তা দিয়ে গিয়েছিল। আমি আছিতো গ্রামে! আমির হাওলাদার খুব ভালোবাসেন পদ্মজাকে!' শেষ শব্দ তিনটি লিখন জোরপূর্বক হেসে বলল। তার চোখের মণি চিকচিক করছে। মৃদুল আফসোস করে বললো,'ধুর,দেখা হইলো না।'

'আসি চাচি।' বললো লিখন।

মৃদুল,লিখন বেরিয়ে আসে। মৃদুল বললো,'পদ্মজা ভাবির চিঠি দেখে তো মনে হয় নাই এতো সহজ ব্যপার।'

'হু। পদ্মজা একটা রহস্যময়ী,মায়াময়ী। তাই বোধহয় রহস্য রেখে চিঠি লিখেছে। আর,মিস্টার আমির যেহেতু এখন সাথে আছে নিশ্চয় পদ্মজা ভালো আছে।'

মৃদুল গভীর মগ্ন হয়ে কিছু ভাবছে। সে লিখনের কথার জবাবে বললো,' উমম।'

'তবুও, আগামীকাল পদ্মজা পূর্ণার সাথে যোগাযোগ না করলে আমরা আবার আসব না হয়।'

মৃদুল লাফিয়ে উঠে বলল,'এটাই ভাবছিলাম।'

লিখনের হাতের রক্তপড়া বন্ধ হলেও খুব ব্যথা হচ্ছে। তা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মৃদুল বললো,'ভাই,সাইকেল নিয়া আসি। এ অবস্থায় হেঁটে যাওয়া ঠিক হইব না।'

লিখনও সায় দিল। মৃদুল আলগ ঘর থেকে সাইকেল নিয়ে আসে। মৃদুল সামনে, লিখন পিছনে বসলো। তাদেরকে দারোয়ান দেখে অবাক হয়। তবে বেশিকিছু বলতে পারেনি,মৃদুল হুমকি-ধামকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাতের স্নিগ্ধ বাতাসে লিখন অনুভব করলো,তার বুকের সূক্ষ্ম ব্যথাটা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। সে একবার ঘুরে তাকাল হাওলাদার বাড়ির গেইটের দিকে! খ্যাতিমান, সুদর্শন, ধনী লিখন শাহ, যে সবসময় ঠোঁটে প্লাস্টিকের হাসি ঝুলিয়ে রাখে তাকে দেখে সবার কত সুখী মনে হয়! কত যুবক স্বপ্ন দেখে লিখন শাহর অবস্থানে আসার! কিন্তু তারা কী কখনো জানবে, লিখন শাহ সর্বক্ষণ বুকের ভেতর বিষাক্ত সূচ নিয়ে হাসে। যে সূচের তীব্রতা তাকে এক মুহূর্তও শান্তি দেয় না।

পদ্মজা চারিদিকে হাঁটছে। কিন্তু চোখে পড়ার মতো কিছু পাচ্ছে না। কী এমন আছে এখানে? যা পাহারা দেয়ার জন্য কেউ না কেউ থাকে। কিছুই তো নজরে আসছে না। পদ্মজা জংলি লতাপাতার উপর হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে আসে। শিশিরের জলে পায়ের তালু থেকে হাঁটু অবধি ভিজে গিয়েছে। পা জোড়া ঠান্ডায় জমে যাওয়ার উপক্রম। থেকে থেকে কাছে কোথাও শেয়াল ডাকছে। পদ্মজার বুক ধুকপুক,ধুকপুক করছে।

মনে হচ্ছে,কয়েক জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করে বসবে। ছিঁড়ে খাবে দেহ! ভাবতেই,পদ্মজার গা শিউরে উঠলো। সে ঢোক গিলল। তারপর আয়তুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিল। আয়তুল কুরসি যতবার সে পড়ে,ততবার নিজের মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করে। ভরসা পায়। এই মুহূর্তেও তার ব্যক্তিক্রম হয়নি। সে সামনে এগোতে এগোতে একসময় আবিষ্কার করলো,তার পায়ের নিচে মাটির বদলে অন্যকিছু আছে! চকিতে পদ্মজার মস্তিষ্ক চারগুণ গতিতে সচল হয়ে উঠলো। সে পায়ের নিচের লতাপাতা সরাতে গিয়ে দেখল, এই লতাপাতাগুলোর শেকড় নেই! পদ্মজা দ্রুতগতিতে সব লতাপাতা সরালো। তখনই আবছা আলোয় চোখে ভেসে উঠলো,লোহার মেঝে! পদ্মজার মুখে একটি গাঢ় বিস্ময়ের ছাপ প্রতীয়মান হয়ে উঠলো। তার উত্তেজনা বেড়ে যায়। শীতল শরীর উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করলো। লোহার মেঝেটা খুব একটা বড় নয়। পদ্মজা টর্চ জ্বালায়। খুঁটিয়ে, খুঁটিয়ে দেখে। এক পাশে ছিদ্র রয়েছে। মনে হচ্ছে,এখানে চাবি ব্যবহৃত হয়! চকিতে পদ্মজার মাথায় এলো,আলমগীরের দেয়া চাবিটার কথা। সে দ্রুত পেটিকোটের দুই ভাঁজ থেকে চাবিটি বের করলো। প্রবল উত্তেজনায় তার হাত মৃদু কাঁপছে। বিসমিল্লাহ বলে,চাবি ছিদ্রে প্রবেশ করালো। এবং কাজও করে! পদ্মজা বিস্ময়ে বাকহারা হয়ে পড়ে! কী হতে চলেছে? সে লোহার এই অংশটি দুই হাতে তোলার চেষ্টা করলো। যতটা ভারী ভেবেছিল,ততটা নয়! পদ্মজা লোহার ভাবলেও,এটা বোধহয় লোহার নয়। ধীরে ধীরে পদ্মজা আবিষ্কার করলো,এটি একটা দরজা,গুপ্ত কোনো ঘরের দরজা। সে আতঙ্কে হিম হয়ে যায়। নিচের দিকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। পদ্মজা তার কাঁপতে থাকা পা এগিয়ে দেয় ভেতরে। সে ভয় পাচ্ছে না তা নয়! খুব ভয় হচ্ছে। এমন আচানক ঘটনার সম্মূখীন তো আগে হয়নি। সিঁড়ি ভেঙ্গে সে অনেক দূর অবধি নেমে আসে। ভীষণ ঠান্ডা এদিকে। মনে হচ্ছে সব স্বপ্ন! কোনো রূপকথার গল্পের রাক্ষসপুরীতে চলে এসেছে! চোখের সামনে ভেসে উঠে আরেকটি দরজা। এই দরজাটি অদ্ভুত ধরণের। তাদের ঢাকার বাড়িতে হুবুহু একইরকম দরজা আছে! এই দরজার আড়ালে যাই হয়ে যাক বাইরে শব্দ আসে না! পদ্মজা অস্পষ্ট একটা সন্দেহে বিভোর হয়ে উঠে। এই দরজাটি খুলতে আলমগীরের দেয়া চাবিটাই কাজ করে! পদ্মজা চাবিতে চুমু খায়। এতো গুরুত্বপূর্ণ চাবি আলমগীর তাকে দিল কেন? এসব ভাবার সময় এখন নয়। বাকিটুকু তাকে দেখতে হবে। দরজা খুলে অন্য একটি অংশে প্রবেশ করতেই মুখে তীব্র আলো ধাক্কা খেল। পদ্মজা কপাল কুঁচকে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে আলোর গতিবেগ রোধ করে মুখে অস্ফুট বিরক্তিসূচক শব্দ করলো। তারপর ধীরে ধীরে পিটপিট করে তাকালো। চারিদিকে রঙ-বেরঙের বাতি জ্বলছে। এই বাতিগুলোও তার চেনা। তাদের বাড়িতে আছে। যখন বিদ্যুত থাকে না,ব্যাটারিচালিত এই বাতিগুলো পুরো বাড়ি আলোয় আলোয় ভরিয়ে তুলে! দুইদিকে আরো দুটো দরজা। প্রথম দরজাটিতে লেখা 'স্বাগতম'। দ্বিতীয়টিতে লেখা 'ধ-রক্ত।' রুম্পা তো এমন কিছুই বলেছিল! পদ্মজা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। দ্বিতীয় দরজাটির দিকে হেঁটে আসে। এটার কোনো তালা নেই। তাহলে খুলবে কী করে? পদ্মজা ধাক্কা দিল। সাথে সাথে খুলেও গেল। পদ্মজার মুখ হা হয়ে যায়। তার ঠোঁট বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে। এ কোথায় এসেছে সে! আর কি ফিরতে পারবে নিজের ঘরে? আচমকা পদ্মজার কানে ভেসে আসে মেয়েদের কান্নার চিৎকার! পদ্মজার রক্ত হিম হয়ে যায়। এরকম একটা

জায়গায় এতোগুলো মেয়ে কেন কাঁদছে? কত কষ্ট,যন্ত্রণা সেই কান্নায়! কান্নার বেগ বাড়ছে। যেন কেউ বিরতিহীনভাবে আঘাত করছে। পদ্মজা দুই হাতে ছুরি ও রাম দা শক্ত করে ধরলো। তারপর সেই কান্না অনুসরণ করে এগিয়ে গেলো সামনে। যত এগুচ্ছে কান্নাগুলো তীব্র ধাক্কা দিচ্ছে বুকে। পদ্মজার নিঃশ্বাস আটকে আছে। সে চলে এসেছে খুব কাছে। চোখের সামনে আরেকটা ঘরের দরজা। দরজাটি একটু খোলা। সে সাবধানে দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর তাকালো। আর ঠিক তখনই তার পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু অবধি শিরশির করে উঠলো। চোখের সামনে দেখা দৃশ্যটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো। মনে হচ্ছে জায়গায় জমে গেছে সে। বিবস্ত্র অবস্থায় পাঁচ-ছয়টি মেয়ে হাতজোড় করে কাঁপছে,কাঁদছে। তাদের শরীর রক্তাক্ত। আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা শ্যামবর্ণের দেহ। গায়ে শার্ট নেই। প্যান্ট নেমে এসেছে নাভির অনেক নিচ অবধি। তার হাতে বেল্ট! সম্ভবত বেল্ট দিয়েই,মেয়েগুলোকে আঘাত করছিল! প্রশস্ত ও তুষ্টপুষ্ট শরীরের গড়নের মানুষটিকে চিনতে পেরে পদ্মজার বুকের পাঁজর টনটন করে উঠল। তার হাত থেকে পড়ে যায় ছুরি ও রাম দা। বিকট শব্দ হয়। সেই শব্দ অনুসরণ করে উপস্থিতি মানুষগুলোর চোখ পড়ে দরজার দিকে। পদ্মজা ধপ করে বসে পড়ে মাটিতে। শরীরের সবটুকু শক্তি নিমিষেই কে যেন চুষে নিয়েছে! পদ্মজাকে দেখে মানুষটির চোখ হিংস্র জন্তুর মতো জ্বলজ্বল করে উঠে। কপালের শিরা ভেসে উঠে,হিংস্র চাহনি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। সে ভাবতেই পারছে না, পদ্মজা এত দূর চলে এসেছে! পদ্মজা বিস্ময়ভরা ছলছল চোখ দুটি সেই মানুষটার দিকে তাক করে অস্পষ্ট স্বরে বলল,' ছিঃ!'

#পদ্মজা

প্রথম খন্ড সমাপ্ত

আসল বই এই পর্ব পর্যন্তই প্রকাশিত।

বিঃদ্রঃ এতদিন যারা সাথে ছিলেন পুরো গল্পটা নিয়ে অনুভূতি বলে যাবেন। আর গল্প শেষ হওয়ার পর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বিভিন্ন গ্রুপে রিভিউ দেয়। তাদের কাছে আমার রিকুয়েষ্ট,রিভিউ দেয়ার সময় স্পয়লার দিবেন না। এমনভাবে রিভিউ লিখবেন যেন গল্পের ভেতরের গোপনীয়তা থাকে।

উপন্যাসের ভেতর অনেক কুসংস্কার রয়েছে। পুরনো সময়কারের গ্রামের চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলতে কুসংস্কার আনা প্রয়োজন ছিল। দয়া করে কেউ বিব্রত হবেন না।

Collection source

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553673170522&mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555396623280&mibextid=ZbWKwL

